সত্যমেব জয়তে

আমার দেশ

১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গ, চন্দননগর ও সিকিমের পরিচয়
১৯৫৩ সালের মে মাসে মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার সাধারণ বিবরণী হইতে
শ্রীভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত

অশোক মিত্র
ভারতীয় সিভিল সার্ভিস
পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট
ও
জয়েন্ট ডেভেলপ্মেন্ট কমিশনার

অধীক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
আলিপুর, কলিকাতা
১৯৫৪

জনগণনা সংক্রান্ত গ্রন্থমালা

শ্রীঅশোক মিত্র, আই সি এস, পশ্চিমবঙ্গের জনগণনার অধিকর্তা ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার যুক্ত কমিশনার কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় রচিত জনগণনা ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপক গ্রন্থাবলী—প্রত্যেক পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো ৮¾ × ১১¼ ইঞ্চি।

জনগণনা বিবরণী (১ক খণ্ড)—মুখবন্ধ, ভূমিকা ও পাঁচটি অধ্যায়, একটি পুস্তকতালিকা ও বিষয়সূচী। ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ বিবরণী ও প্রধান উপজীবিকা-গুলির বর্তমান আর্থিক অবস্থা। ৩০০র উপর সারণী ও ১৮টি চিত্র। পূর্বভারতের একটি বিশদ ম্যাপ। ৬০৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

জন্মমৃত্যু ১৯৪১-৫০ (১খ খণ্ড)—ভূমিকা ও ৬০টি সারণী। উপরন্তু কতকগুলি বিশেষ বিবরণী ও সারণী। ৭৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

জনগণনা বিবরণী (১গ খণ্ড) ষষ্ঠ অধ্যায় জনগণনার উপসারণীসমূহ। বিবাহিত স্ত্রীলোকদের সন্তানধারণ ক্ষমতার বিবরণী। আইন ই আকবরী, বর্নিয়ার, বুকানন হ্যামিলটন, কোলব্রুক, জেমস ফার্গুসনের কতকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎসরবরাহের বিশদ আলোচনা, কৃষির প্রসার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্যসামগ্রী সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা ও দুইটি বিশদ পুস্তক ও প্রবন্ধতালিকা। ৫১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

জনগণনা সারণী (২য় খণ্ড)—পশ্চিমবঙ্গের মূল জনগণনা সারণীসমূহ। ৫৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

কলিকাতা মহানগরী (৩য় খণ্ড)—কলিকাতা নগরীর সারণীসমূহ, বিবরণী ও কলিকাতার বৃদ্ধির ইতিহাস। প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

কলিকাতা শিল্পাঞ্চল (৪র্থ খণ্ড)—কলিকাতা ও ভাগীরথীর উভয় তীরের শিল্পাশ্রয়ী শহরের সারণীসমূহ। প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

জনগণনার সংগঠন বিবরণী (৫ম খণ্ড)—জনগণনা কিভাবে সংগঠিত হইয়াছিল তাহার বিবরণী। ৯৬ পৃষ্ঠা, বিক্রয়ের জন্য নহে।

পশ্চিমবঙ্গের জাতি ও উপজাতি (The Tribes and Castes of West Bengal)—১৯৫১ সালের সারণী-সমূহ। জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণী, নবশাখ জাতি ও তাহাদের ব্যবসার বিবরণী, পশ্চিমবঙ্গের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও বিভিন্ন সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জাতি সম্বন্ধে উদ্ধৃতি। লেখক শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুধাংশুকুমার রায়, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অশোক মিত্র। ৪১৫ পৃষ্ঠা, ১৯টি চিত্রসম্বলিত। মূল্য ২০৲।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিবরণী ১৮৭২-১৯৫২ (An Account of Land Management in West Bengal, 1872-1952)—পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ বিবরণী, জলবায়ু, তাপ, মাটি, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বলিত প্রত্যেকটি জেলার গত আশি বছরের কৃষিব্যবসার গতিপ্রগতি সম্বন্ধে সারণী, আলোচনা ও উদ্ধৃতি। ৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০৲।

পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও উৎসব (Fairs and Festivals of West Bengal)—প্রত্যেকটি জেলার প্রতিটি থানার মৌজাগুলির কোথায় মেলা হয়, কি উৎসব উপলক্ষে করা হয়, কতদিন ধরিয়া হয়, কি পূজা হয়, তাহার তালিকা। ৭৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার বিবরণী (District Handbooks)—প্রতি জেলার সাধারণ বিবরণী, কবে কিভাবে জেলা গঠিত হইল, ভূতত্ত্ব, নদীতত্ত্ব, পশু, পক্ষী, মাছ, অন্যান্য জীব, গাছপালা, জলবায়ু, তাপ, মাটি, ইতিহাস, লোকবিবরণী, জাতি বিবরণী, বিশিষ্ট ধর্ম ও পূজাপদ্ধতি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ বা ব্যবসা, রাস্তাঘাট, জমিস্বত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণী। জেলার ৮২টি সারণী। প্রতিটি মৌজার বিবরণ। মেলা, উৎসব, হাটবাজার, পুরাতন কীর্তির বিবরণী। প্রতিটি নামকরা গ্রাম বা শহরের বিবরণী ও গত আশি বছরের কৃষি বিবরণী। উপরন্তু পুরানো বিবরণীসমূহ হইতে সবিস্তার উদ্ধৃতি। ২৫০ হইতে ৫৫০ পৃষ্ঠা, একখণ্ডে একটি জেলা, ১৭টি খণ্ড, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০৲।

পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত প্রাচীন কীর্তিসমূহ (A Catalogue of the better known ancient monuments of West Bengal)—১৮০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে প্রস্তুত প্রাচীন কীর্তিসমূহের বিবরণী। প্রায় ৬০০ চিত্র সম্বলিত। পশ্চিমবঙ্গে যত লিপি ও অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার ইংরেজী অনুবাদ। বিদেশী যেসকল অনুশাসনে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা।

মুখপত্র

১৯৫১ সনের ভারতীয় জনগণনা জাতীয় আত্মোপলব্ধির ইতিহাসে একটি মহৎ ঘটনা। প্রভূত চিন্তা, বিবেচনা ও দরদের ফলে জনগণনার মহাধিনায়ক এমন কতকগুলি প্রশ্নের এবং সারণীর ছক প্রস্তুত করেন যাহাতে সদ্যশৃঙ্খলমুক্ত জাতির একটি প্রকৃত পরিচয় অল্পায়াসে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়।

সাধারণত জনগণনার বিবরণী বিজ্ঞপ্রাজ্ঞের প্রয়োজনে নাড়াচাড়ার জন্যই লেখা হইত। সাধারণ নাগরিক তাহার সন্ধান পাইতেন না। জনগণনার মহাধিনায়ক জনগণনার মাধ্যমে দেশের পরিচয় ভালমতে বাহির হয়, শুধুমাত্র তাহার জন্যই চেষ্টিত ছিলেন না, যাহাতে এই পরিচয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং সাধারণ নাগরিক দেশের এই সন্ধিক্ষণে এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হন ও চিন্তা করেন, সেইজন্য মহাধিনায়ক এই বিবরণীসমূহ যাহাতে স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থাও ভারতীয় জনগণনার ইতিহাসে প্রথম প্রবর্তন করেন।

পূর্বে জনগণনার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিত লোকসংখ্যা, ধর্ম ও ভাষাবিষয়ক তথ্য। ১৯৫১ সনে মুখ্য উদ্দেশ্য হইল নাগরিকের সামাজিক ও আর্থিক পরিচয়।

ভারতীয় জনগণনার সারণীসুদ্ধ বিবরণী "ভারতের জনগণনা" বলিয়া পরিচিত। ইহা বহু ভাগে ও খণ্ডে সম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের বিবরণী হইল ষষ্ঠ ভাগ। এই ষষ্ঠ ভাগে পাঁচটি খণ্ড। তাহার মধ্যে প্রথম খণ্ড তিনটি উপখণ্ডে সম্পূর্ণ। এই বইটি এই তিনটি উপখণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় উপখণ্ড হইতে সংকলিত।

সংকলন ও অনুবাদ করিয়াছেন আমার বহুদিনের পরিচিত ঢাকা বিক্রমপুরের মালখানগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার শিক্ষা বোধ, সুরুচি, নিষ্ঠা, যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত এই সংকলন প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। মূল বিবরণীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠা রাখিয়া এরূপ সুখপাঠ্য ভাষা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

অশোক মিত্র

রাজভবন,
কলিকাতা
৩০ নভেম্বর, ১৯৫৩

সূচী

পৃষ্ঠা

ভূমিকা . . . . ১—২৯

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১, সাধারণ বিবরণ : হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ ১-২, সমতলক্ষেত্র ২-৩, নদনদী ৩-৪, হিমালয়ে উৎপন্ন নদনদী ৪, ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদনদী ৪-৫, গঙ্গা ও গঙ্গার শাখাপ্রশাখা ৫, প্রধান নদীর গতি পরিবর্তন ৫, বিল ৫, উষ্ণপ্রস্রবণ ৫-৬, ভূপ্রকৃতি ৬-৭, পাললিক শিলা ৭, পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ ৭-৯, মৃত্তিকা ৯-১২, জলবায়ু ১২, বন ১২-১৩, বন ধ্বংসের কুফল ১৩, গাছপালা ১৩, বনজ সম্পদ ১৩-১৪, বন্য জীবজন্তু ১৪, পাখী ১৪, সরীসৃপ ১৪, মৎস্য ১৪, হিন্দুর বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি ১৪-১৬, ধর্ম ১৬, জলসেচ ও নদীর দান ১৬-১৭, কৃষিজ সম্পদ ১৭-১৮, গোচারণ ভূমি ১৮, শিল্পায়ন ১৮-১৯, [illegible] সালের [illegible] ১৯, [illegible] সনের মেদিনীপুরের ঝড়বৃষ্টি ১৯, পঞ্চাশের মন্বন্তর ১৯-২০, দামোদরের বন্যা ২০-২১, শরণার্থী ২১, মহাযুদ্ধের অন্যান্য [illegible] ২১-২২, [illegible] বাড়াও আন্দোলন ২১, বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ২১, বিশ্বযুদ্ধের অবসান ২১-২২, বাংলার [illegible] ২২-২৩, উদ্বাস্তু আগমন ২২-২৩, জনগণের বৈষয়িক অবস্থা ২৩, মালিকচাষীর অবস্থা ২৩-২৪, ভাগচাষীর অবস্থা ২৪, কৃষিমজুরের অবস্থা ২৪-২৫, বাগান শ্রমিকের অবস্থা ২৫, শিল্পশ্রমিক ২৫-২৬, শ্রমিক কল্যাণ ২৬-২৭, ব্যবসায় বাণিজ্য ২৭, পরিবহন ২৭-২৮, অন্যান্য পেশা ও উপার্জনের বিবিধ উপায় ২৮-২৯, অপরাধ ও দেওয়ানী মামলা ২৯

প্রথম অধ্যায়, লোক-পরিচয় . . . . ৩০—৭৩

প্রথম অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন রাজ্যের সহিত তুলনা . . . . ৩০—৩২

উদ্বাস্তু ৩১-৩২, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৩২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, জনবিন্যাস ও বসতির ঘনত্ব . . . . ৩২—৪৬

জনগণনার একক ৩২, জনগণনার স্থান ৩২, থানা ৩২-৩৩, শহর ও নগর ৩৩, গণনার বিশুদ্ধতা ৩৩, অন্যান্য রাজ্যের জেলার সহিত পশ্চিমবঙ্গের জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনা ৩৩, জেলার আয়তন ও লোকবৃদ্ধি ৩৩, জনবিন্যাসের ধারা ৩৩-৩৪, কলিকাতার শিল্পাঞ্চল ৩৪, [illegible] ৩৪-৩৫, গণনার এককে লোকসংখ্যা এবং প্রতি বর্গমাইলে গণনার বাড়ির সংখ্যা ৩৫, একান্নবর্তী পরিবার ৩৫, শহরের সংখ্যা ও শ্রেণী ৩৫-৩৬, বসতির ঘনত্ব ৩৬, শহর ৩৬, গ্রাম ৩৬, হ্রাসবৃদ্ধির ধারা ৩৭, থানার ঘনত্ব ৩৭-৩৮, [illegible] পল্লী-থানা ৩৮, চব্বিশপরগনার [illegible] পল্লী থানা ৩৮-৩৯, মুর্শিদাবাদ ৩৯, মালদহ ৩৯, শিল্পবিহীন থানা ৪০, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার শিল্প-থানা ৪০, অন্যান্য শিল্প থানা ৪০-৪১, আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল ৪১-৪২, হুগলি হাওড়া এবং ব্যারাকপুর [illegible] বজবজ শিল্পাঞ্চল ৪২-৪৩, আধা-পল্লী শহর ৪৩-৪৪, শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসের সহিত শহরের ইতিহাস জড়িত ৪৪-৪৫, পল্লী-অঞ্চলের ঘনত্বের সীমা ৪৫-৪৬, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৪৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ, লোকের বৃদ্ধি ও চলাচল . . . . ৪৬—৫৯

জনসংখ্যার পূর্ব বিবরণ ৪৬-৪৭, আশি বৎসরের দুই যুগ ৪৭, ১৯২১ সন লোকবৃদ্ধির ধারার বিভাজিকা ৪৭, উভয় যুগের বৈষম্যের কারণ ৪৭-৫৮, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৫৮-৫৯

চতুর্থ অনুচ্ছেদ, গমনাগমন . . . . ৫৯—৬৩

আভ্যন্তরীণ গমনাগমন ৫৯-৬০, ভারতীয় আগন্তুক ৬০-৬৩, অভারতীয় আগন্তুক ৬৩, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৬৩

পঞ্চম অনুচ্ছেদ, জন্ম, মৃত্যু ও মৃতাবশেষ . . . . ৬৪—৬৫

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ, জনগণের জীবিকার পরিচয় . . . . ৬৫—৬৮

আর্থিক পর্যায় অনুসারে জনগণের বিভাগ ৬৫-৬৬, উপজীবিকার শ্রেণী ৬৭, বেকার সমস্যা ৬৮, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৬৮

সপ্তম অনুচ্ছেদ, উপসংহার . . . . ৬৯—৭৩

ভারতের ও অন্যান্য দেশের লোকবৃদ্ধি ৬৯-৭২, জনসমস্যা সমাধানের উপায় ৭২-৭৩, তথ্য ও সিদ্ধান্ত ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়, পল্লীবাসী . . . . ৭৪—৭৫

প্রথম অনুচ্ছেদ, পূর্বাভাষ ৭৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, সাধারণ ও বিশেষ জনবিন্যাস ৭৫

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়, পুরবাসী . . . . **৭৬—৮০**

প্রথম অনুচ্ছেদ, পূর্বাভাষ . . . . ৭৬—৮০

বৈশিষ্ট্য অনুসারে শহর বিভাগ ৭৭, শহরে নারী ৭৮-৭৯, ইংলণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের তুলনা ৭৯, শ্রমিকের বয়স ৭৯-৮০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, উপসংহার ৮০

চতুর্থ অধ্যায়, কৃষিবর্গ . . . . ৮১—৯০

প্রথম অনুচ্ছেদ, ভূমিকা . . . . ৮১—৮৬

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিবৃত্ত ৮১-৮২, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি ৮২, কাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত ৮২-৮৩, বন্দোবস্তের শর্ত ৮৩, রায়তের অবস্থা ৮৩, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল ৮৩-৮৪, মধ্যস্বত্বভোগী ৮৪, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৮৪-৮৫, [illegible] ৮৫, কৃষির অবস্থা ৮৫-৮৬, ভারত-সরকারের অভিমত ৮৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, কৃষিজীবীর হার . . . . ৮৬—৮৭

কৃষিজীবীর গৌণ উপজীবিকা ৮৭

তৃতীয় অনুচ্ছেদ, জোতের পরিমাণ . . . . ৮৭—৮৮

রাজস্ব ও খাজনা ৮৮, মধ্যস্বত্ব ৮৮, ভূমির গড় পরিমাণ ৮৮

চতুর্থ অনুচ্ছেদ, লোকবৃদ্ধি ও চাষের অগ্রগতি ৮৯

পঞ্চম অনুচ্ছেদ, উপসংহার . . . . ৮৯—৯০

পঞ্চম অধ্যায়, অ-কৃষিবর্গ . . . . ৯১—৯৩

কর্মহ্রাস ৯১-৯২, কর্মবৃদ্ধি ৯২, উপসংহার ৯২-৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায় . . . . ৯৪—৯৭

জাতি ও বিশেষ সম্প্রদায় ৯৪, ধর্ম ৯৪-৯৫, পরিবারের আকার ও গঠন ৯৫, স্ত্রীপুরুষের হার ৯৫, বিবাহ ৯৫, বয়স ৯৫, শিক্ষা ৯৬, ভাষা ৯৬-৯৭

আমাদের প্রতিবেশী . . . . ৯৭—৯৮

চন্দননগর ৯৭, সিকিম ৯৭-৯৮

পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় . . . . ৯৯—১৭৮

আয়তন ১০১-১০৪, জনসংখ্যা ১০৫-১১২, বসতির ঘনতা ১১৩-১১৮, লোকের হ্রাসবৃদ্ধি ১১৯-১২৪, নারী ১২৫-১২৮, বহিরাগত ১২৯-১৩৬, উদ্বাস্তু ১৩৭-১৪০, বয়স ১৪১-১৪৪, শিক্ষা ১৪৫-১৫২, উপজীবিকা ১৫৩-১৬২, ভাষা ১৬৩-১৬৬, ধর্ম ১৬৭-১৭০, বিবিধ ১৭১-১৭৮

ভৌগোলিক বিবরণ ১৭৯

চিত্রসূচী

নগর, শহর, সেনানিবাস ও থানা . . . . মুখপাত
বাঙলার নদনদী ৩
হুগলি নদীর অববাহিকা ৫
ভূমির পরিচয় ৬
জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা ৩৩
হুগলির শিল্পাঞ্চল ৪১
কলিকাতার শিল্পাঞ্চল ৪৩
পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গমনাগমন, ১৯৫১ . . . . . . ৬০
উপজীবিকার পরিচয় ৬১

CITIES, TOWNS, CANTONMENT & POLICE STATIONS

WEST BENGAL

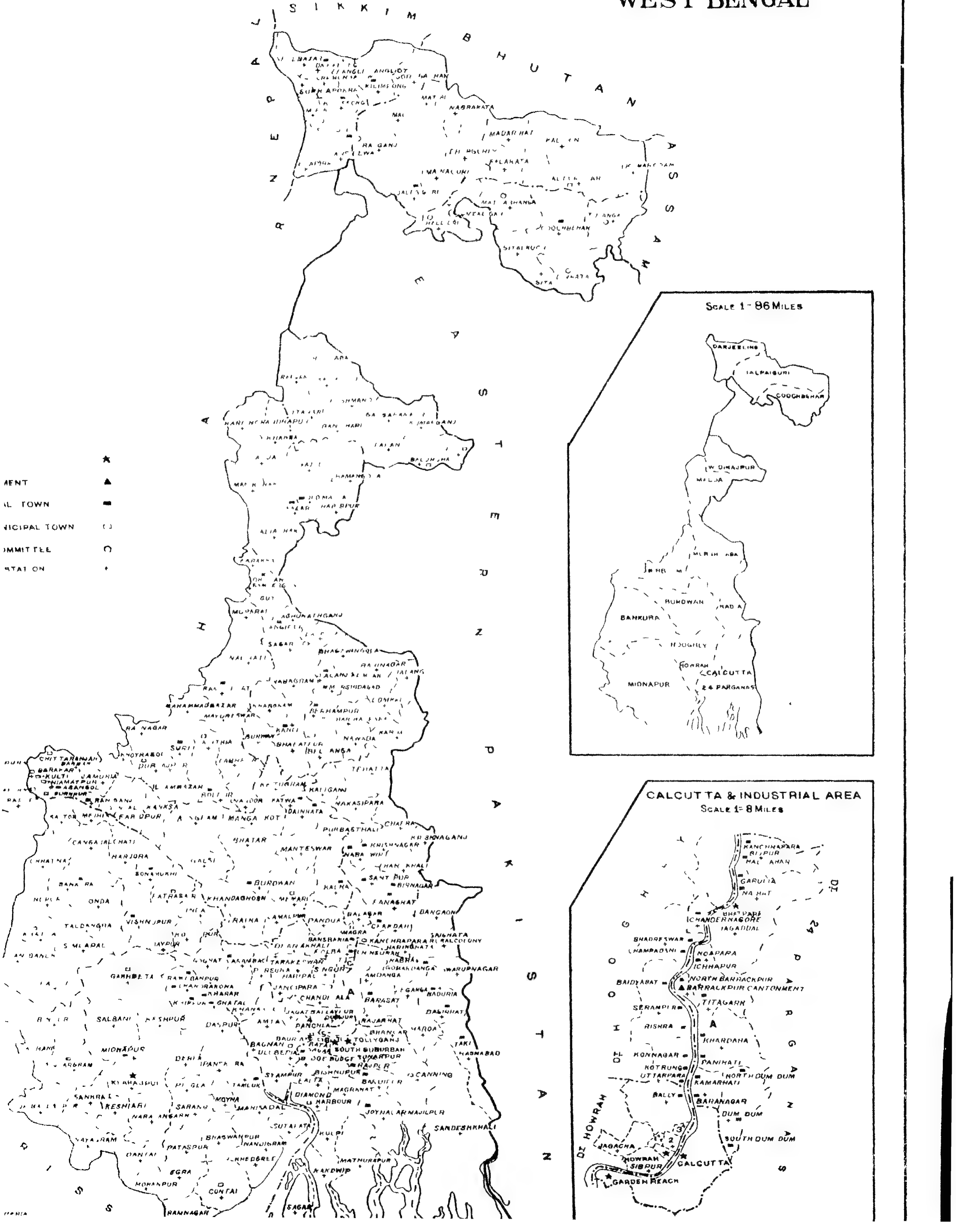
S I K K I M
B H U T A N
A S S A M
N E P A L
E A S T E R N P A K I S T A N
B I H A R
O R I S S A
★
MENT ▲
L TOWN ▬
NICIPAL TOWN □
MMITTEE ○
STATION +
KILIMPONG
NAGRAKATA
MADARIHAT
MATHABHANGA
COOCHBEHAR
SITALKUCHI
BALURGHAT
RAGHUNATHGANJ
BHAGWANGOLA
BERHAMPUR
MURSHIDABAD
SURI
CHITTARANJAN
BARAKAR
KULTI
NIAMATPUR
ASANSOL
BURNPUR
RANIGANJ
KATWA
KALIGANJ
NAKASIPARA
DAINHATA
PURBASTHALI
MANTESWAR
KRISHNAGAR
SANTIPUR
BIRNAGAR
BURDWAN
MEMARI
RANAGHAT
BANGAON
VISHNUPUR
BANKURA
SONAMUKHI
GHATAL
CHANDRAKONA
KHARAR
DASPUR
AMTA
SALBANI
KESHPUR
MIDNAPUR
KHARAGPUR
TAMLUK
MOYNA
MAHISADAL
SUTAHATA
BHAGWANPUR
PATASPUR
EGRA
CONTAI
RAMNAGAR
DIAMOND HARBOUR
KAKDWIP
SAGAR
CANNING
BASIRHAT
BARASAT
TOLLYGANJ
SOUTH SUBURBAN
BUDGE BUDGE
SANDESHKHALI
MATHURAPUR
Scale 1" = 86 Miles
DARJEELING
JALPAIGURI
COOCHBEHAR
W. DINAJPUR
MALDA
MURSHIDABAD
BIRBHUM
BURDWAN
NADIA
BANKURA
HOOGHLY
HOWRAH
CALCUTTA
MIDNAPUR
24 PARGANAS
CALCUTTA & INDUSTRIAL AREA
Scale 1" = 8 Miles
KANCHRAPARA
BIJPUR
HALISAHAR
GARULIA
NAIHATI
BHATPARA
CHANDERNAGORE
JAGADDAL
BHADRESWAR
CHAMPADANI
NOAPARA
ICHHAPUR
BAIDYABATI
NORTH BARRACKPUR
BARRACKPUR CANTONMENT
SERAMPORE
TITAGARH
RISHRA
KHARDAHA
KONNAGAR
PANIHATI
KOTRUNG
UTTARPARA
KAMARHATI
NORTH DUM DUM
BALLY
BARANAGAR
DUM DUM
SOUTH DUM DUM
JAGACHA
HOWRAH
SIBPUR
CALCUTTA
GARDEN REACH
HOOGHLY DT.
HOWRAH DT.
24 PARGANAS DT.

ভূমিকা

বাঙলার পক্ষে ১৯৪১-৫১ দশকের সর্বপ্রধান ঘটনা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমা পরিবেষ্টিত গঙ্গার ব-দ্বীপ প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও মোঙ্গল জাতির মিশ্রণে এখানে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং এক নূতন ভাষা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতি ও সংস্কৃতির ঐক্য রক্ষার জন্য বাঙালী সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকে বঙ্গবিভাগ রহিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বাঙালীর সেই বঙ্গজননী ১৯৪৭ এর ১৫ই অগাস্ট বিভক্ত হইয়া গেল। সহস্রাধিক বৎসরের বন্ধন, সুখদুঃখের অসংখ্য স্মৃতি একদিনে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য বাঙলার তরুণেরা হাসিমুখে রক্তদান করিত। বাঙালী ভারতের স্বাধীনতার চরম মূল্য দিয়াছে বেদনাপ্লুত হৃদয়ে। পাঁচ বৎসর পরে অঙ্গচ্ছেদের ক্ষত এখনও রক্তস্রাবী। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। বাস্তুত্যাগীদের আগমন হ্রাস পাইলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। বিভাগের ফলে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির এক বৃহৎ অংশ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন আসামের সহিত কলিকাতার সংযোগ রক্ষা করা কঠিন। শিল্প ও বাণিজ্যে নানা প্রকার অভিনব বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পাটশিল্পের সংকটই সর্বাধিক। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত এই বিষাদের কালো ছায়া বাঙালীর মন হইতে বিলুপ্ত হইবার দিন এখনও বহুদূরে।

১৯০৫ এর বঙ্গবিভাগ ছিল একই কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে প্রদেশ বিভাগমাত্র। ১৯৪৭ এ অসমান খণ্ডে বিভক্ত বাঙলার দুই অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শযুক্ত দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আইনকানুনের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠিয়াছে দুই ভাগের মাঝখানে। বাঙালীর আদর্শ ও সংস্কৃতির ঐক্যরক্ষা আর সম্ভব নহে। বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর। অবিভক্ত বাঙলার আয়তন ৮৫ হাজার বর্গমাইল ছিল। প্রায় আট ভাগের তিন ভাগ, পৌনে একত্রিশ হাজার বর্গমাইল, লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে।

যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা চব্বিশপরগনার আয়তন প্রায় ৩২০ বর্গমাইল বৃদ্ধি করিয়াছে। ১২টি থানা হারাইয়া নদিয়া জেলা হইয়াছে পূর্বের অর্ধেক অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি। মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণ একটি থানাও বিচ্ছিন্ন হয় নাই বটে, কিন্তু কয়েকটি সীমান্তবর্তী থানার কতিপয় মৌজা হয় পাকিস্তান অধিকার করিয়াছে, নতুবা তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে বিরোধ চলিতেছে। প্রত্যেকে ৫টি করিয়া থানা হারাইয়া মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলা হারাইয়াছে যথাক্রমে ৬০০ ও ৭০০ বর্গমাইল স্থান। ১,৩৮৫ বর্গমাইল ভূমি লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর গঠিত হইয়াছে। কোচবিহারের ৫৬টি ছিটমহল পাকিস্তান-পরিবেষ্টিত। কয়েক সহস্র ভারতীয় নাগরিক প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় তথায় কালযাপন করিতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ‘ক’ শ্রেণীভুক্ত ৯টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রতম।

পশ্চিমবঙ্গ ১৫টি জেলায় বিভক্ত। বর্ধমান বিভাগ বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া এই ৬টি জেলা লইয়া গঠিত। প্রেসিডেন্সি বিভাগে চব্বিশপরগনা, কলিকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এই ৯টি জেলা। জেলাগুলি ৪৫টি মহকুমা ও ২৮০টি থানায় ভাগ করা হইয়াছে। এই রাজ্যের শহরের সংখ্যা ১১৪, গ্রামের সংখ্যা ৩৫,০৬৩। জেলার মধ্যে চব্বিশপরগনা বৃহত্তম এবং দার্জিলিং ক্ষুদ্রতম।

সাধারণ বিবরণ

এই রাজ্য দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত, হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্র। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা লইয়া গঠিত হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আয়তনে এই ভূখণ্ড প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল। ইহার উত্তরে সিকিম ও ভুটান। কালিম্পং ও সিকিমের মধ্যবর্তী রাংপো নদী এবং জলপাইগুড়ি ও ভুটানের মধ্যবর্তী সিঞ্চুলা পাহাড় ইহার উত্তর সীমা। জলপাইগুড়ি ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে প্রবহমান সংকোশ নদী এবং দার্জিলিং ও নেপালের মধ্যস্থিত মেচি নদী যথাক্রমে ইহার পূর্ব ও পশ্চিম সীমা। ইহার দক্ষিণে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা এবং পাকিস্তানের দিনাজপুর ও রংপুর জেলা।

এই অঞ্চলের ভূ-সংস্থান বহুবৈচিত্র্যময়। সিকিম হইতে নামিয়া তিস্তা বা ত্রিস্রোতা দার্জিলিং জেলাকে দুই অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। তিস্তার পূর্বে কালিম্পং এবং পশ্চিমে দার্জিলিং ও কার্সিয়াঙের পাহাড়পুঞ্জ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও কালিম্পং ছিল বনাকীর্ণ। নিম্ন হিমালয়ের শৈলশিরা ও গভীর উপত্যকায় পশ্চিমাংশ পরিপূর্ণ। পাহাড়গুলি ৬,০০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চ এবং পাদমূল হইতে চূড়া পর্যন্ত সবুজ তরুলতায় আচ্ছাদিত। দার্জিলিং শহর ৭,৪৩২ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ঘুমের উচ্চভূমি দক্ষিণ দিকের দৃষ্টি অবরোধ করে বলিয়া সমভূমির শোভা দার্জিলিং হইতে উপভোগ করা যায় না। উত্তরদিকে হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর মূর্তির বিশালতায় হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। আলো আঁধারের লুকোচুরি আর মেঘ ও কুয়াশার অবিরাম রূপবদল মেঘমুক্ত আকাশের তলে উন্মুক্ত দৃশ্যের মতই মনোহর। ছয় মাইল দূরে ৮,৫১৫ ফুট উচ্চ টাইগার হিল শত শত দর্শককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ওক, ম্যাগনোলিয়া ও রডোডেনড্রনের পরম রমণীয় বনের মধ্য দিয়া ঘুম পার হইয়া টাইগার হিলে পৌঁছিতে হয়। আকাশ যদি নির্মল থাকে পাহাড়ের চূড়া হইতে বাঙলার সমভূমির এক মনোরম দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। পর্বতের প্রসারিত শাখা-প্রশাখা যেন ক্রমে সমভূমিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তিস্তা, বালাসন, মহানদী ও মেচি নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ স্পষ্ট দেখা যায়।

উত্তরে যে দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত শোভা সম্ভবত পৃথিবীতে আর নাই। সম্মুখে চার মাইল প্রশস্ত ও চার হাজার ফুট গভীর রাংনু উপত্যকা, যাহার এক প্রান্তে নিরাবরণ দার্জিলিঙের শৈলশিরা ও অপব প্রান্তে বনাচ্ছাদিত তাকদহ শৈলশিরা, দূরে রংগীত উপত্যকা। উহা পার হইয়া মধ্যপথে মোচাকৃতি তেনদং শৃঙ্গ। তারপর পশ্চাতে ১০,০০০ ফুট উচ্চ মাইনম পর্বত। মাইনমের পর উত্তর দিগন্তব্যাপী তুষারমণ্ডিত পর্বতের এক সারি। উহাদের মধ্যস্থলে সর্বপ্রধান কাঞ্চনজঙ্ঘা দণ্ডায়মান। কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চাতে পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে তিনটি তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। সিকিমের পর্বতের তুলনায় ইহাদিগকে ক্ষুদ্র মনে হয়। কিন্তু উহাদের অনাড়ম্বর মধ্য পর্বতটিই পৃথিবীর চূড়া এভারেস্ট। দার্জিলিং পাহাড়ের পাদপীঠ শিলিগুড়ি মহকুমা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ৩০০ ফুট উচ্চ। ইহার সবটাই সমভূমি। শিলিগুড়ির সীমান্তপ্রদেশে অতট পাহাড়গুলি যেন অকস্মাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

হিমালয়ের পাদদেশের অরণ্যানীর নাম তরাই। শিলিগুড়ি মহকুমা ও কার্সিয়াঙের পূর্বাংশের সংকীর্ণ অঞ্চল "দার্জিলিং তরাই" নামে অভিহিত। কোচবিহারের উত্তর, কালিম্পং ও ভুটানের দক্ষিণ এবং তিস্তা ও সংকোশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম ডুয়ার্স। তরাই ও ডুয়ার্সের ভূপ্রকৃতি অভিন্ন। অরণ্য, নদী, বিচ্ছিন্ন পাহাড়, সংকীর্ণ উপত্যকা এবং বহু কর্ষণযোগ্য সমভূমি ডুয়ার্স-এর সর্বত্র। উত্তরদিকে ক্রমশ উচ্চ হইয়া ডুয়ার্স হিমালয়ের প্রথম ঢালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পাঁচশত হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চ পর পর অনেক মালভূমি গঠন করিয়া হিমালয়ের প্রথম ঢাল আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল মালভূমিতে বিখ্যাত চায়ের বাগানসমূহ অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসককে ডুয়ার্স-এর অনেক কিছু দিবার আছে। মেঘের উপব মেঘের মত নীল আকাশের গায়ে গাঢ় নীলের শৈলশিরাগুলি পর পর ঊর্ধ্বে উঠিয়া সুদূরের তুষারের শুভ্রতার মধ্যে হারাইয়া যায়। বড় বড় নদী ও অগণিত খরস্রোতা পার্বত্য ঝোরা তরাই ও ডুয়ার্সকে যেন কাটিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া ইহারা অনুচ্চ তটের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। অনাবৃষ্টির মরসুমে গুটিকয়েক বড় নদী ছাড়া আর সকলে ঝিরঝির ক্ষীণ ধারায় সজীবতার সাক্ষ্যপ্রদান করে মাত্র। পর্বতে প্রবল বর্ষণের পর ইহারা কূল ছাড়িয়া, নূতন পথ কাটিয়া, সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া, সবকিছু ভাসাইয়া, ডুবাইয়া উন্মাদের মত ছুটিয়া চলে। তিস্তার ধ্বংসলীলা এইরূপেই সংঘটিত হয়। জলপাইগুড়ির উত্তরে সিঞ্চুলা পাহাড়ের উচ্চতা ৪০০ হইতে ৬,০০০ ফুট। বক্সার সেনানিবাস কোচবিহারের সোজা উত্তরে ছোট সিঞ্চুলা পাহাড়ের গায়ে ১,৮০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। বক্সা দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের বন্দিশালা ছিল। বক্সা রোড স্টেশন হইতে আকাশ ফোঁড়া শালবনের মধ্য দিয়া তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে নীল আকাশের সাদা ঘুড়ির মত নিবিড় নীল পাহাড়ের কোলে সাদা সান্ত্রীঘর চোখে পড়ে, আর শিলাস্তূপের বাধায় বিক্ষুব্ধ ফেনিল পার্বত্য নদীর গর্জন কানে পৌঁছে। বক্সায় দাঁড়াইলে একদিকে পর্বতের গায়ে ভুটিয়া পল্লী, অপরদিকে বাগানের চা-গাছের মত খর্বাকৃতি সবুজ শালের বিশাল ক্ষেত্র ও তাহার মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা রুপালী বালুকাময় ছোট ছোট নদীর খাত দৃষ্টিগোচর হয়। ফাল্গুন চৈত্রের রাত্রিতে কোন কোন দিন বনবিধ্বংসী দাবানল জ্বলিতে দেখা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে জলপাইগুড়ি শহরের উচ্চতা মাত্র ২৭১ ফুট। কোচবিহার জেলা প্রধানত নিম্ন সমতলক্ষেত্র। শীতকালে কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে জল জমিয়া বরফ হইতে কখনও দেখা যায় নাই। কালিম্পঙে সময় সময় তাপ হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়, দার্জিলিঙে উহা বার্ষিক ঘটনা। বাঙলায় সমতলক্ষেত্রে গ্রীষ্ম আরম্ভ হইয়া গেলেও শীত এই অঞ্চল আঁকড়াইয়া থাকে। হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গে কালিম্পঙের ৮৬ ইঞ্চি হইতে বক্সার ২১০ ইঞ্চি পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণের বারিপাত হইয়া থাকে।

সমতল ক্ষেত্র

গঙ্গা ও তাহার শাখানদী ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর দ্বারা গঠিত খণ্ডের আয়তন ২,৭৯৩ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর ; পূর্বে দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজসাহী ; পশ্চিমে পূর্ণিয়া ও গঙ্গা; দক্ষিণেও গঙ্গা। গঙ্গার উপর সেতু নির্মিত হইলে মুর্শিদাবাদ জেলার সহিত ইহা যুক্ত হইতে পারে। এই অংশের ঢাল দক্ষিণ দিকে। পশ্চিম দিনাজপুর বৈচিত্রাহীন সমতল ক্ষেত্র। সর্বত্র বাঁশের ঝাড় চোখে পড়ে। খিয়র নামে ছাইরঙা দোআঁশ মাটি বৃষ্টিপাতের পর কাদার মত নরম হয়, শুষ্ক ঋতুতে লোহার মত শক্ত থাকে। তখন কোন শস্য জন্মিতে পারে না। বর্ষা ও শরৎকালে উহা সুবিস্তীর্ণ সবুজের সাগরে এবং শীত ও বসন্তে হলুদ খড়ের সীমাহীন প্রান্তবে রূপান্তরিত হয়। জেলার পশ্চিমাংশ কোন কোন বৎসর বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়। কালিয়াগঞ্জ থানায় পশ্চিম দিনাজপুরের সর্বাপেক্ষা বড় বোরো বিল অবস্থিত।

মহানন্দা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া মালদহ জেলাকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। এই দুই খণ্ডের ভূ-প্রকৃতির বিস্তর প্রভেদ। পূর্বদিকের "বারিন্দ" বা বরেন্দ্র তরঙ্গায়িত, উন্মুক্ত উচ্চভূমি। মৃত্তিকা সাধারণত লাল, কোথাও হলুদ এবং কঙ্করময়। ছোট ছোট শালবন স্থানে স্থানে দেখা যায়। বিরলবসতি বারিন্দের গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্তি পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে। পথহীন, ছায়াহীন, লৌহসদৃশ কঠিন মৃত্তিকা; মধ্যে মধ্যে ডোবা থাকিলেও পানীয় জল দুর্লভ ; শুধু উচ্চভূমিব ঢাল কাটিয়া নির্মিত ক্ষেত্রেব শুষ্ক নগ্ন ধাপগুলি চক্ষে পড়ে। শরৎকালে কিন্তু বারিন্দের কঠোর ভৈরব রূপ আমন ধানের নয়নানন্দকর সবুজে ঢাকা পড়িয়া যায়। মহানন্দার পশ্চিমদিক ক্রমশ ঢালু হইয়া "টাল" বা নিম্নভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তরে মহানন্দা ও দক্ষিণে কালিন্দ্রীর মধ্যস্থিত এই "টাল" বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমেই মালদহের সযত্নরক্ষিত সুবিখ্যাত আম্রকানন ও গুটিপোকার খাদ্য তুঁতের দেশ। পশ্চিম ও দক্ষিণে গঙ্গার তীরবর্তী নূতন পলিতে গড়া আট কি দশ মাইল প্রশস্ত ভূমি দিয়ারা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলেও বহু আমবাগান। জেলার সকল অঞ্চলেই বিল দেখা যায়। দক্ষিণ বাঙলা অপেক্ষা পূর্ণিয়ার জলবায়ুর সহিত মালদহের জলবায়ুর সাদৃশ্য অধিক। শীতের রাত্রিতে তাপের মাত্রা ৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত নামিতে দেখা গিয়াছে। ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম হইতে "লু" বহিতে থাকে। বায়ুতে আর্দ্রতা অল্প থাকায় উত্তাপের তীব্রতা বিশেষ অস্বস্তিকর হয় না।

গঙ্গার দক্ষিণে, ভাগীরথীর পূর্বে, বঙ্গোপসাগরের উত্তরে, এবং পাকিস্তানের কুষ্ঠিয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের দ্বিতীয় ভূভাগ অবস্থিত। ইহার আয়তন

Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XIX. Pl. XII.

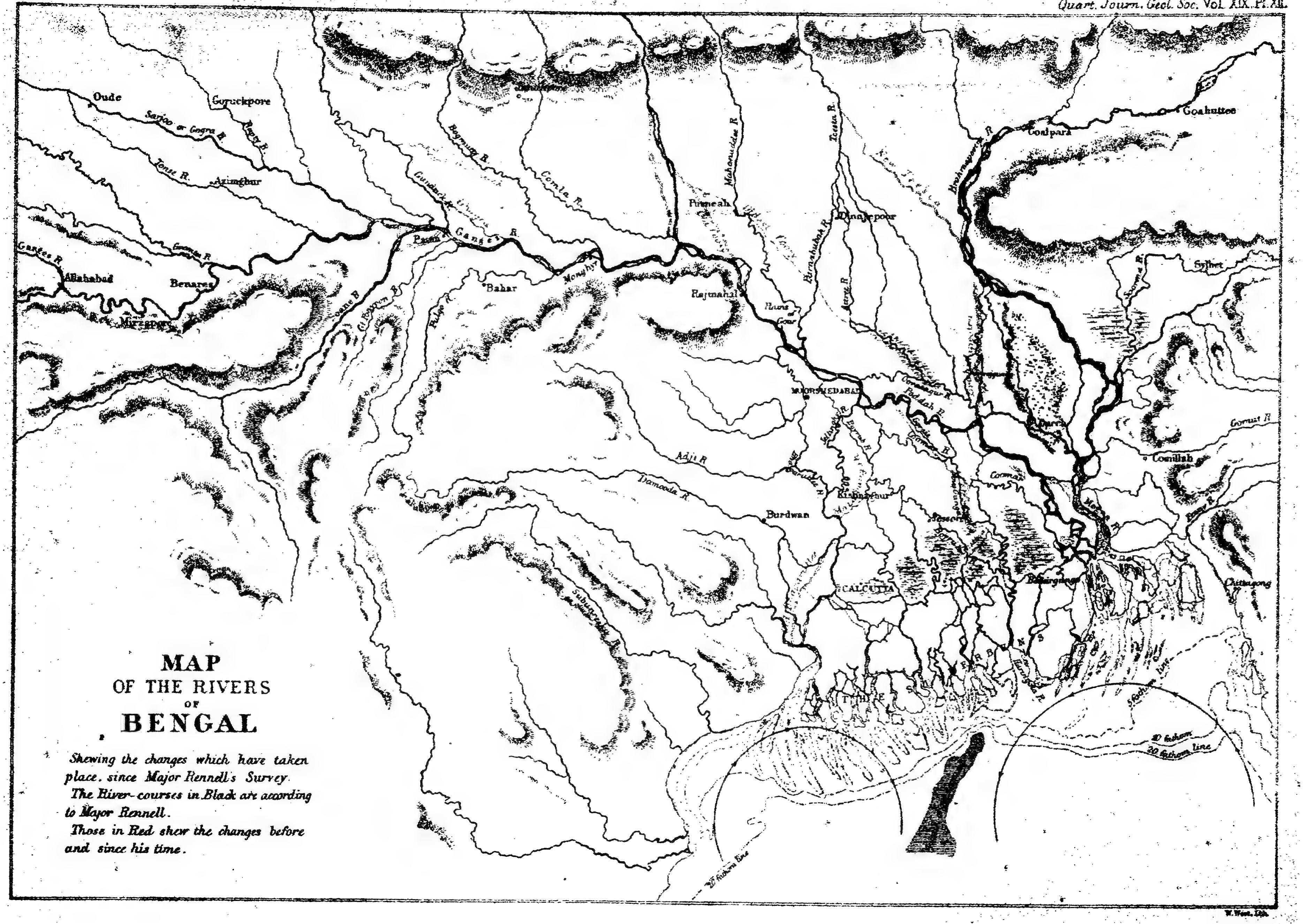
Oude
Goruckpore
Sarjoo or Gogra R.
Rapty R.
Tonse R.
Azimghur
Goomty R.
Ganges R.
Allahabad
Benares
Mirzapore
Soane R.
Gt Berrun R.
Patna
Ganges R.
Gunduck R.
Bogmutty R.
Comla R.
Fulgo R.
Bahar
Monghyr
Rajmahal
Purneah
Mahanuddee R.
Ruins of Gour
Purnabubah R.
Teesta R.
Dinajepoor
Attree R.
Brahmapootra R.
Goalpara
Goahuttee
Soormah R.
Sylhet
Goomty R.
Comillah
MOORSHEDABAD
Cossimbazar R.
Paddah R.
Gorai R.
Cooma R.
Jellinghy R.
Burruah R.
Adji R.
Damooda R.
Burdwan
Kishnaghur
Jessore
Coomar
Megna R.
Fenny R.
Chittagong
CALCUTTA
Bakirgunge
Subunreeka R.
T H E S U N D E R B U N S
Hooringotta R.
5 fathom line
10 fathom
20 fathom line

MAP
OF THE RIVERS
OF
BENGAL

Shewing the changes which have taken place, since Major Rennell's Survey.
The River-courses in Black are according to Major Rennell.
Those in Red show the changes before and since his time.

W. West. Lith.

প্রায় ৮,০০০ বর্গমাইল। চব্বিশপরগনা, কলিকাতা, নদিয়ার প্রায় সমস্ত ও মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ধাংশ লইয়া এই খণ্ড গঠিত। এই ভূখণ্ড গঙ্গার সর্বশেষ দান। চব্বিশপরগনার দক্ষিণাংশের গঠন এখনও অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক সময় ছিল যখন ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান জলধারা বহন করিত। তখন এই অংশ গঙ্গার পলি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ক্রমশ ভাগীরথীর খাদ ভরাট হইয়া আসিতে থাকিলে গঙ্গা পূর্বদিকে নূতন পথ কাটিয়া নেয়। ইহার ফলে ইচ্ছামতী, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা পর পর গঙ্গার পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের পলিতে শস্য-উৎপাদন ও দেশগঠন উভয়ই হইত। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের সরকারের অবিবেচনা-প্রসূত কার্যের ফলে এই অঞ্চলের পূর্ব সমৃদ্ধির উৎস গঙ্গার জল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও চব্বিশপরগনা এখন মজা নদী ও বদ্ধ বিলের দেশ এবং ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। লুপ্ত সমৃদ্ধির নিদর্শন মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বিস্তর। চব্বিশপরগনার দক্ষিণের অসংখ্য খাড়ি দ্বারা সমুদ্রের জোয়ার জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কলিকাতার উচ্চতা মাত্র ২১ ফুট। চব্বিশপরগনার ভূমি কত নিম্ন ইহা হইতে বুঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলার মধ্যে চব্বিশপরগনা আয়তনে বৃহত্তম। কিন্তু ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সুন্দরবনের রক্ষিত বনাঞ্চল।

অবিভক্ত বাঙলার "পশ্চিমবঙ্গ" বর্ধমান বিভাগ, ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার এক বৃহৎ অংশের নাম রাঢ় ছিল। এই খণ্ডের পূর্বে ভাগীরথী ; উত্তরে সাঁওতাল পরগনা ; পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা, মানভূম ও সিংহভূম এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর ও বঙ্গোপসাগর। সমগ্র রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বর্ধমান বিভাগের ছয়টি জেলা ব্যতীত ইহাতে মুর্শিদাবাদের পশ্চিমার্ধ ও নদিয়া জেলার সংকীর্ণ একাংশ রহিয়াছে। এই ভূভাগের ঢাল পূর্বদিকে। এখানে ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও লাল ল্যাটেরাইট মাটির প্রাধান্য। ইহার পূর্বভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পশ্চিমভাগ যেন মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলেরই সম্প্রসারিত অংশবিশেষ। বাঙলার সমতল অপেক্ষা ছোটনাগপুরের পাহাড়ের সহিত পশ্চিমাংশের সাদৃশ্য বেশি। তরঙ্গায়িত ভূমি স্থানে স্থানে পাহাড় ও টিলার সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষাদি ছোটনাগপুর পাহাড় অঞ্চলের অনুরূপ। পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা যে পাহাড়ের অধিবাসীদেরই সগোত্র তাহারও পরিচয় সুস্পষ্ট।

বিন্ধ্যপর্বত যেন বীরভূমে প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। নলহাটি থানায় ছোট ছোট আটটি পাহাড় আছে। পূর্বাংশের ন্যায় বোলপুর, লাভপুর ও ইলামবাজার থানা সমতল। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের রাঢ়েরই সমধর্মী। বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়া মহকুমা, বর্ধমান জেলার মোট পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ, একটি পলি-গঠিত পুরাতন ব-দ্বীপ। মৃত্তিকা জলসিক্ত এবং স্থানে স্থানে জলাভূমি। বড় বড় শালবন দেখা যায়। ধানের মরসুমের বিশাল সবুজের ক্ষেত্র শস্যহীন অবস্থায় উঁচু আলের দ্বারা বিভক্ত বিরাট দাবার ছকের মত দেখায়। পশ্চিমদিকে আসানসোল মহকুমায় বর্ধমান জেলা পনর মাইল প্রশস্ত প্রস্তরময় তরঙ্গায়িত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মধ্যভারতের পাহাড় অঞ্চলের একাংশ যেন এখানে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহা বন্ধ্যা প্রস্তরময় অঞ্চল ; অজয়ের দক্ষিণতীরে ছোট ছোট লালমাটির পাহাড়। ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার পাহাড় উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা প্রায় তরুলতাহীন অঞ্চল। বাঁকুড়া জেলা পলি-গঠিত বাঙলার সমতলক্ষেত্র ও ছোটনাগপুরের মালভূমির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহার পূর্বাংশ বর্ধমান ও হুগলির অনুরূপ পলি-গঠিত সমতল ধান্যক্ষেত্র। লালমাটির বন্ধুর মধ্যভাগ স্থানে স্থানে শালের বনে আচ্ছাদিত। পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমির দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ভূমি ততই তরঙ্গায়িত ও বন্ধুর। এখানে-সেখানে প্রস্তরশিলা মাথা তুলিয়াছে ; দক্ষিণদিকে মানভুম পাহাড়েরই পূর্বাংশ বাঁকুড়ায় প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। সদর মহকুমার সহিত ছোটনাগপুরের এবং বিষ্ণুপুরের সহিত বাঙলার সাদৃশ্য বিদ্যমান। পশ্চিমাঞ্চল সাঁওতাল প্রভৃতি ও পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন শ্রেণীর বাসস্থান। মেদিনীপুরেরও একই অবস্থা। ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও সদর মহকুমার একাংশের সহিত জঙ্গলাকীর্ণ ছোটনাগপুরের উচ্চভূমির সাদৃশ্যই অধিক। অধিবাসীরা আদিবাসী। পূর্বাঞ্চলের সমভূমিতে বাঙালী অথবা বাঙালী ও উড়িয়ার মিশ্রণে উৎপন্ন জাতির বাস। বঙ্গোপসাগরের নীল জল কাঁথি মহকুমায় রামনগর ও কাঁথি থানার দক্ষিণ প্রান্ত ধৌত করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলের ভাবী স্বাস্থ্যনিবাস দিঘা রামনগর থানায় অবস্থিত। হাওড়া ও হুগলি বৈশিষ্ট্যবিহীন পাললিক সমতল ক্ষেত্র। হিজলী হইতে চব্বিশপরগনার পূর্ব সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়িভাঙ্গার মোহনা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপকূল। এখানে নদীমুখে অসংখ্য খাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যে হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত সাগরদ্বীপ প্রধান। ভারতে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যাহার একপ্রান্তে শুভ্র তুষারের মুকুট-পরা "অম্বরচুম্বিত" হিমাচল ও অপরপ্রান্তে "নীল-সিন্ধু জলধৌত" সমতট।

নদনদী

পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টিবহুল মৌসুমী বায়ুর অঞ্চল। এখানে জলনিকাশের জন্য বহুসংখ্যক নদনদী থাকা স্বাভাবিক। অনেক নদী আছে কিন্তু একটিও দীর্ঘ নহে। এই রাজ্যের উত্তরে গগনস্পর্শী হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তথাপি কোন নদীই হিমালয়ে উত্থিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় নাই। হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির জন্ম হিমালয়ের অনুচ্চ পাদশৈলে। মহানন্দা ও মেচি ব্যতীত তাহাদের সকলেরই গতি দক্ষিণ পূর্ব দিকে। ছোটনাগপুরের পাহাড় বর্ধমান বিভাগের নদীর উৎপত্তিস্থল। উহারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে। রাজ্যের অন্য প্রধান নদীগুলি গঙ্গার শাখাপ্রশাখামাত্র। অনুচ্চ পর্বতগাত্র ও পাহাড় হইতে উৎপন্ন নদীর ধর্মই পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীর। বর্ষাকালে জলপূর্ণ থাকে, অন্য সময়ে অতি শীর্ণ অগভীর জলধারায় পরিণত হয়, কোন কোন স্থানে একেবারে শুখাইয়া যায়। হিমালয়ে বা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে প্রথম প্রবল বর্ষণের পর নদীর জল অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১০ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত বাড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। জল নামিয়াও যায় অল্প সময়ে।

নদীর প্রধান কার্য তাহার অববাহিকার জল নিষ্কাশন। পলি দ্বারা ভরাট হইয়া যাওয়াতে গঙ্গার শাখানদীগুলি মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও চব্বিশপরগনার সকল জল বহন করিতে অসমর্থ। ইহাই ঐ সকল জেলায় জলাভূমির আধিক্যের কারণ। অল্পব্যয়ে পণ্য ও যাত্রিবহনের জলপথরূপে নদীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। সারা বৎসর জল থাকে না এবং বর্ষায় খরস্রোতা বলিয়া অধিকাংশ নদীই বাণিজ্যের উপযোগী নৌবাহনযোগ্য নহে। যাহারা পূর্বে

নাব্য ছিল সঞ্চিত পলির জন্য তাহাদের অনেকে এখন অগভীর হইয়াছে। এই জন্যই হুগলি ব্যতীত অন্য নদীতীরে উল্লেখযোগ্য বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্রের অভাব। মালদহে উৎপন্ন আম ও ধান মহানন্দার নদীপথে অল্পদিন আগেও রপ্তানি হইত। জলপথ হিসাবে হুগলির স্থান প্রথম। গঙ্গা হইতে ভাগীরথীর প্রবেশদ্বার প্রায় রুদ্ধ হওয়াতে গঙ্গাকে জলপথরূপে ব্যবহারের সুযোগ হইতে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত। শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিয়া শস্যোৎপাদনে সাহায্য করা নদীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্য। পশ্চিমবঙ্গের নদী এই কাজেরও উপযোগী নহে। শস্যক্ষেত্রে যখন জলের প্রয়োজন সেই অনাবৃষ্টির মরসুমে ছোটনাগপুরের অনুচ্চ পাহাড় হইতে নির্গত নদনদী প্রায় জলশূন্য হইয়া যায়। অধিকন্তু শীর্ণ নদীগুলি পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত জল শোষণ করিয়া নিজ নিজ দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। মহানন্দা, রায়দক, মেচি প্রভৃতি নদী তাহাদের পার্বত্য অংশে এবং গঙ্গা মালদহ ও মুর্শিদাবাদে অবিরাম এক তীর ভাঙ্গিয়া অপর তীর ভরাট করিতেছে। বহু ঘরবাড়ি, বাগান, শস্যক্ষেত্র নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। নদীর আকস্মিক ধ্বংসলীলার রূপ বন্যা। দামোদর ও তিস্তার প্লাবনে বাড়িঘর, জনপ্রাণী ও শস্যাদির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। বন্যার জল কোন কোন সময় বালি ও লবণ ছড়াইয়া উর্বর শস্যক্ষেত্রকে অনুর্বর করিয়া দেয়। এই সকল কারণে মনে প্রশ্ন উদিত হয়, নদনদী পশ্চিমবঙ্গের আশীর্বাদ না অভিশাপ?

হিমালয়ে উৎপন্ন নদনদী

উত্তরে সিকিমের ২১,০০০ ফুট উচ্চ এক হিমপ্রবাহ হইতে তিস্তার উৎপত্তি। তিস্তা একটি খরস্রোতা প্রশস্ত পার্বত্য নদী। স্থানে স্থানে ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪ মাইল। গিরিখাতে আবদ্ধ থাকায় ইহার জল অকস্মাৎ স্ফীত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। উত্তর সিকিমের তুষার গলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার জল বাড়িয়া যায়। মৌসুমী বর্ষণ আরম্ভ হইলে ইহা অধিকতর স্ফীত হয়। রংগিত উপনদীর সহিত মিলিত হইবার পর তিস্তা এক গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া দার্জিলিং জেলা অতিক্রম করিয়াছে। দার্জিলিঙে ইহা ১০০ গজ প্রশস্ত। সমভূমিতে প্রবেশ করিবার পর তিস্তা ২০০ হইতে ৩০০ গজ চওড়া হইয়াছে।

দার্জিলিঙে তিস্তার তীরের দৃশ্য অতীব মনোরম। সংকীর্ণ সর্পিল গিরিখাতের খাড়া পাড় দুইটি গভীর বনে আচ্ছাদিত। উহার গাছপালা ও কীটপতঙ্গাদি উষ্ণমণ্ডলীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

তিস্তা ও রংগিতের মিলনস্থলে এক মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দুই নদীর জলের রঙের বিস্তর প্রভেদ, তিস্তার জল মেঘের মতো কালো ও ঘোলাটে, রংগিতের জল গাঢ় সবুজ ও নির্মল। এ যেন রঙীন জলের ঢেউ খেলানো শতরঞ্জি। রংগিতের জল যে তিস্তার জল অপেক্ষা উষ্ণতর তাহা অনুভব করা যায়।

সিঞ্চল পাহাড় হইতে আসিয়া রাংনু তিস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। রাংনুর উপত্যকা কয়েক হাজার ফুট গভীর। উপত্যকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দেখা যায়, নদীর গর্জন শোনা যায়, কিন্তু উপত্যকা এত গভীর যে নদীর প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয় না।

তিস্তা উত্তর-পশ্চিম কোণে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশের পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া জলপাইগুড়ি শহর দক্ষিণে রাখিয়া কোচবিহারের ছিটমহলের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের রংপুর জেলা পার হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে। প্রবল বর্ষণের সময় তিস্তা জলপাইগুড়ি জেলার অনেক অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া থাকে। দামোদরের বন্যার মত তিস্তার বন্যা মানুষের বহু দুঃখের কারণ। চা-বাগানের জন্য তিস্তার তীরবর্তী ভূমি অরণ্যমুক্ত করার ফলে প্লাবন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সনে তিস্তার ধ্বংসলীলার স্মৃতি এখনও অম্লান রহিয়াছে। জলঢাকা উত্তরদিক হইতে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুদূরে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইবার পর দক্ষিণ-পূর্বে মোড় ফিরিয়া কোচবিহারের উপর দিয়া পাকিস্তানে ঢুকিয়াছে। দক্ষিণাভিমুখী তোরসা জলপাইগুড়ি জেলা অতিক্রম করিয়া কোচবিহারে প্রবেশের পর দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া কোচবিহার শহর বামে রাখিয়া ক্রমে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। সংকোশ বা গদাধর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এই উভয় জেলার পূর্ব সীমান্তে প্রবাহিত। ছোট বড় আরও বহু নদী হিমালয় হইতে নামিয়া জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। দার্জিলিঙ ও নেপালের মধ্যবর্তী মেচি নদী পূর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কার্সিয়াঙের নিকট দার্জিলিঙ পাহাড় হইতে উত্থিত হইয়া মহানদী বা মহানন্দা শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সীমানা গঠন করিয়াছে। এই অঞ্চলের অন্য নদীর ন্যায় দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত না হইয়া মহানন্দা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পূর্ণিয়া জেলা ঘুরিয়া মালদহের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশ করিয়াছে। খরবা থানা পর্যন্ত পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মহানন্দা মালদহ জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দক্ষিণে গোদাগাড়িতে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। মহানন্দার পূর্ববর্তী পুরাতন মালদহ এবং চার মাইল দক্ষিণে পশ্চিমতীরে ইংরেজবাজার অবস্থিত। বর্ষায় ৫০০ মণ ও শীতকালে ২০০ মণ পণ্যবাহী নৌকা মহানন্দার পথে মালদহ শহর পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। মালদহের নিকট নদীর বিস্তৃতি শীত ঋতুতে ১০০ গজ এবং বর্ষায় সিকি মাইল। টাংগন জলপাইগুড়ি জেলায় উৎপন্ন হইয়া দিনাজপুরের মধ্য দিয়া ইংরেজবাজারের ১০ মাইল দক্ষিণে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদনদী

দামোদর ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদনদীর মধ্যে প্রসিদ্ধ। দুই হাজার ফুট উচ্চে বিহারের পালামৌ পাহাড়ে দামোদরের উৎপত্তি। উৎসমুখ হইতে প্রথম দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া বর্ধমান শহরের দুই মাইল পশ্চিমে অকস্মাৎ দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরিয়া হুগলি ও হাওড়ার মধ্য দিয়া চলিয়া কলিকাতার ত্রিশ মাইল দক্ষিণে হুগলি নদীতে তাহার বহিয়া-আনা জলবালি ও কাদা ঢালিয়া দিতেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে দামোদর ৩৩৬ মাইল পথ কাটিয়া আসিয়াছে। বরাকর সহ দামোদরের উপনদী নয়টি। বরাকরের উপনদী পাঁচটি। এই চৌদ্দটি নদীর বিপুল জলরাশি একা দামোদর বহন করে। চীনের হোয়াংহোর মত দামোদর পশ্চিমবঙ্গের “দুঃখ-নদী”। দামোদর নদের উপত্যকার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং উৎপত্তিস্থলের অরণ্য নির্মূল করিবার ফলে নিম্ন উপত্যকায় অকস্মাৎ বন্যা দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালের বন্যায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। ১৯৪৩ সন পর্যন্ত দামোদর মানুষের কোন শাসন মানে নাই। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাহাকে সংযত করিয়া তাহার বিপুল শক্তি মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিবার কাজ পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হইতেছে।

দামোদরের ন্যায় অজয়ও ছোটনাগপুরের অনুচ্চ পাহাড়ে উত্থিত নদ। পাহাড়ে নদীর ধর্মই ইহাদের। বর্ষায় অকস্মাৎ স্ফীত হইয়া যায় এবং অনাবৃষ্টির ঋতুতে থাকে অত্যন্ত শীর্ণ। অজয় বর্ধমান ও বীরভূমের মধ্য দিয়া পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে। মোর বা ময়ূরাক্ষী দেওঘরের অল্প পূর্বে সাঁওতাল পরগনায় উত্থিত হইয়া

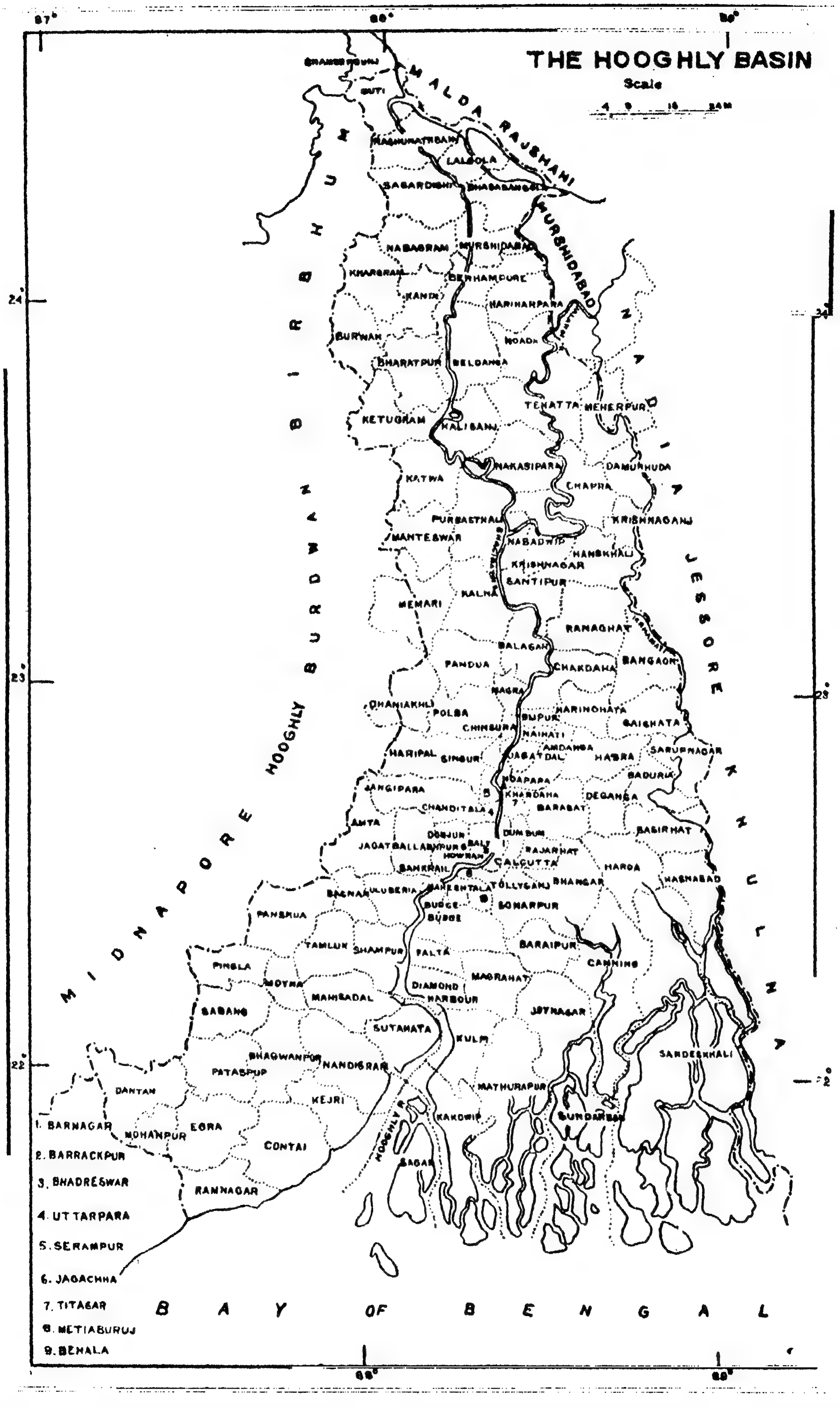
THE HOOGHLY BASIN
Scale
4 8 16 24M
87°
88°
89°
24°
23°
22°
MALDA
RAJSHAHI
MURSHIDABAD
NADIA
JESSORE
KHULNA
BIRBHUM
BURDWAN
HOOGHLY
MIDNAPORE
BAY OF BENGAL
HOOGHLY
SUTI
RAGHUNATHGANJ
LALGOLA
SAGARDIGHI
BHAGABANGOLA
NABAGRAM
MURSHIDABAD
KHARGRAM
BERHAMPURE
KANDI
HARIHARPARA
BURWAN
NOADA
BHARATPUR
BELDANGA
TEHATTA
MEHERPUR
KETUGRAM
KALIGANJ
NAKASIPARA
DAMURHUDA
KATWA
CHAPRA
PURBASTHALI
KRISHNAGANJ
MANTESWAR
NABADWIP
HANSKHALI
KRISHNAGAR
SANTIPUR
KALNA
MEMARI
RANAGHAT
BALAGAR
PANDUA
CHAKDAHA
BANGAON
MAGRA
DHANIAKHLI
POLBA
HARINGHATA
BIJPUR
GAIGHATA
CHINSURA
NAIHATI
AMDANGA
HARIPAL
SINGUR
JAGATDAL
HABRA
SARUPNAGAR
NOAPARA
BADURIA
JANGIPARA
KHARDAHA
DEGANGA
CHANDITALA
BARASAT
AMTA
DUM DUM
BASIRHAT
DOMJUR
BALY
JAGATBALLABHPUR
HOWRAH
RAJARHAT
SANKRAIL
CALCUTTA
HAROA
TOLLYGANJ
BHANGAR
HASNABAD
BAGNAN
ULUBERIA
MAHESHTALA
BUDGE-BUDGE
SONARPUR
PANSKURA
TAMLUK
SHAMPUR
FALTA
BARAIPUR
CANNING
PINGLA
MOYNA
MAGRAHAT
DIAMOND HARBOUR
MAHISADAL
JOYNAGAR
SABANG
SUTAHATA
KULPI
SANDESHKHALI
BHAGWANPUR
NANDIGRAM
PATASPUR
MATHURAPUR
DANTAN
KEJRI
KAKDWIP
SUNDARBAN
MOHANPUR
EGRA
CONTAI
SAGAR
RAMNAGAR
1. BARNAGAR
2. BARRACKPUR
3. BHADRESWAR
4. UTTARPARA
5. SERAMPUR
6. JAGACHHA
7. TITAGAR
8. METIABURUJ
9. BEHALA

বীরভূমের মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াছে। বক্রেশ্বরের জন্ম বীরভূম জেলাতেই। বক্রেশ্বর ও তাহার উপনদী কোপাই অজয় এবং মোরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের জলনিকাশ করে। মুর্শিদাবাদে যাইয়া বক্রেশ্বর মোরের সহিত মিলিয়াছে। দ্বারকা সাঁওতাল পরগনা হইতে আসিয়া বীরভূমের উত্তরাংশের উপর দিয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেরই গন্তব্যস্থল ভাগীরথী। দ্বারকেশ্বর বাঁকুড়া জেলাকে প্রায় সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা বেশ বড় নদী। বাঁকুড়া জেলায় ইহার পরিসর প্রায় ৪০০ গজ। বাঁকুড়া হইতে দ্বারকেশ্বর হুগলির উত্তর-পশ্চিম কোণে আরামবাগ মহকুমায় প্রবেশ করিয়াছে। চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া কিছুদূর প্রবাহিত হইবার পর শিলাবতী বা শিলাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তদবধি ইহার নাম রূপনারায়ণ। উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে গেঁওখালির বিপরীত দিকে হুগলি নদীতে পতিত হওয়া পর্যন্ত ইহা মেদিনীপুরের সীমা নির্দেশ করিতেছে। কোলাঘাটের অনতিদূর পর্যন্ত উচ্চ বাঁধ দ্বারা সীমাবদ্ধ খাতে সংকীর্ণ প্রবাহে চলিয়া রূপনারায়ণ ইহার পর হঠাৎ গড়ে প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। চওড়া হইলেও বহু চর ও জলের অগভীরতার জন্য নদীর জাহাজ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে না। দ্বারকেশ্বরের উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়া শহরের নিকট এবং বিড়াই বিষ্ণুপুরের নিকটে আসিয়া উহাতে মিলিত হইয়াছে। কংসাবতী বা কাঁসাই ছোট নাগপুর পাহাড়ে উত্থিত হইয়া বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ও রায়পুর থানা অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অত্যন্ত কুটিল গতিতে মেদিনীপুর শহর অতিক্রম করিয়া ইহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। দক্ষিণের শাখা দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণে যাইয়া কালিঘাই এর সহিত মিলিত হইবার পর হলদি নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া হুগলিতে পতিত হইয়াছে। সুবর্ণরেখার উৎপত্তিস্থলও ছোটনাগপুরের পাহাড়। মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের উপর দিয়া উড়িয্যায় প্রবেশ করিবার পর সুবর্ণরেখা বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

গঙ্গা ও গঙ্গার শাখাপ্রশাখা

রাজমহল পাহাড় হইতে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরিয়া মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। ভাঙা ও গড়া গঙ্গার নিত্যকর্ম। একপাড় ভাঙে ও অপর পাড়ে চর ভাসিয়া উঠে। মালদহ জেলার ভাগীরথী, পাগলা ও কালিন্দ্রী গঙ্গার শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী এক সময়ে গঙ্গার সমুদ্রে যাইবার প্রধান পথ ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৩২০ মাইল। ভাগীরথী ক্রমে পলিতে ভরাট হইতে আরম্ভ করিলে নৈসর্গিক কারণে গঙ্গার মূল প্রবাহ পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বহিতে থাকে। গঙ্গা হইতে নির্গমনের পথ প্রায় রুদ্ধ হওয়াতে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে অল্পই প্রবেশ করে। প্রধানত ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদীর লাল জলে হুগলি পরিপুষ্ট। হুগলি পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল হুগলির উভয় তীরে অবস্থিত। ইহার তীর ও নদীবক্ষে বিরামহীন কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্যের পণ্য-চলাচলের ইহাই একমাত্র পথ। গঙ্গা বা পদ্মা হইতে উৎপন্ন জলঙ্গী, ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। জলঙ্গী কৃষ্ণনগরের নিকট পশ্চিমবাহিনী হইয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সংগম-স্থল হইতে ভাগীরথীর সমুদ্র পর্যন্ত অংশের ইংরাজি নাম হুগলি। চব্বিশপরগনার পশ্চিম সীমান্তে হুগলি ও পূর্ব সীমায় ইচ্ছামতী। নদিয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা ইচ্ছামতী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার সময় প্রথম কালিন্দী বা কালীনদী এবং পরে রায়মঙ্গল নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। হুগলি ও ইচ্ছামতী চব্বিশপরগনার সীমানার মধ্যে নাব্য। মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগনার অধিকাংশ নদীতেই সমুদ্রের জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া থাকে।

অন্যান্য নদীর মধ্যে বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণী, বাবলা, খাড়ি ও বাঁকা, হুগলি জেলার বেহুলা, কুন্তী, মুক্তেশ্বরী ও সরস্বতী, বীরভূমের বাঁশলই, মেদিনীপুরের শিলাই ও রসুলপুর, চব্বিশপরগনায় বিদ্যাধরী ও মাতলা, মালদহের পুনর্ভবা ও পশ্চিম দিনাজপুরের আত্রাই ও জলপাইগুড়ির করতোয়া উল্লেখযোগ্য।

প্রধান নদীর গতি পরিবর্তন

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে গঙ্গা রাজমহল হইতে সোজা পূর্ব দিকে মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়া পর্যন্ত প্রবাহিত হইত, পরে ভাগীরথীর পথে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছিল। ক্রমশ ভাগীরথী ভরাট হইতে থাকিলে ও ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে গঙ্গা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে ইচ্ছামতী জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা, পর পর গঙ্গার প্রধান জলধারা বহন করিতে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বোধ হয় গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী হইয়া পদ্মা নামে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দামোদর তাহার কালনা পর্যন্ত পূর্বাভিগামী গতি পরিবর্তিত করিয়া কালনার ১২ মাইল দক্ষিণে নওসরাইতে হুগলি প্রবেশের পথ করিয়া নেয়। ঐ সময়েই জলঙ্গী হুগলিতে পড়িতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দামোদর পুনরায় গতি পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিস্তা তাহার দক্ষিণ গতি পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রে পড়িতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসর পরে মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী পশ্চিম দিকে হুগলিতে পড়িতে থাকে।

বিল

পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক হ্রদ নাই বটে কিন্তু বিল বা ঝিল অনেক আছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নানা কারণে নীচে নামিয়া যাইবার ফলে কোন কোন বিল জলশূন্য হইয়া পড়িতেছে। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে বহু বিল আছে। রাঢ়ের হিজল বিল ও বগাড়ির কালান্তর প্রসিদ্ধ। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে মুর্শিদাবাদ শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অশ্বখুরাকৃতি মতিঝিলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগীরথীর দুই মাইল পশ্চিমে, খাগড়াঘাট রেল স্টেশনের সন্নিকটে তিন মাইল দীর্ঘ ও পৌনে তিন মাইল প্রশস্ত তেলকর বিল। বহরমপুরের পূর্বে বিষ্ণুপুর, চালতিয়া ও চন্ডা বিল। বিষ্ণুপুর ও চালতিয়া বিলের আকার দ্বিতীয়ার চন্দ্রসদৃশ। চন্ডা বিলের দৈর্ঘ্য চার মাইল।

উষ্ণপ্রস্রবণ

বীরভূম জেলায় কয়েকটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে প্রসিদ্ধ তীর্থ বক্রেশ্বর অবস্থিত। এই পীঠস্থানে সাতটি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়। দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্বেত সরোবর নামক উষ্ণকুণ্ড। বক্রেশ্বরের নদীগর্ভেও অসংখ্য উষ্ণ উৎস আছে। বাতাসে গন্ধকমিশ্রিত জলযান গ্যাস থাকে। উৎস হইতে জল তুলিবার পর উহাতে গন্ধকের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু জল কয়েক ঘণ্টা খোলা পাত্রে রাখিয়া দিলে গন্ধ অনেক কমিয়া থাকে। একবার ডিসেম্বর মাসে উষ্ণতম কুণ্ডের

জলের তাপ ১৬২ °ফা দেখা গিয়াছে। উষ্ণপ্রস্রবণ যেখানে উত্থিত হইতেছিল তথায় নদীর উপরের বায়ুর তাপ ৮৩°। উষ্ণপ্রস্রবণের কয়েক ফুটের মধ্যে শীতল প্রস্রবণও আছে। উষ্ণপ্রস্রবণ হইতে খানিক দূরে নদীর বালি ৬ ইঞ্চি নীচে হাতে অত্যন্ত গরম বোধ হয়। উষ্ণতম কুণ্ড হইতে প্রতি মিনিটে ১২০ ঘনফুট জল ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হইত। সঞ্চিত পাঁক ও ময়লার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ দিয়া জল উত্থিত হইত। কুণ্ডে শিলা দেখা যাইত না। আধুনিক পরীক্ষায় অগ্নিকুণ্ডের জল তেজস্ক্রিয় (Radio active) বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কুণ্ডগুলির জলের রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী নদীতেও উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। রোগমুক্তির আশায় পাহাড়িয়াদের কেহ কেহ উহাতে অবগাহন করে।

ভূ-প্রকৃতি

উৎপত্তি অনুসারে শিলা প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ (১) আগ্নেয় শিলা, যাহা প্রথম উত্তপ্ত তরল অবস্থায় ছিল, পরে ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া কঠিন হইয়াছে। গ্র্যানিট, বেসল্ট প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (২) পাললিক শিলা। ইহা নদীবাহিত চূর্ণ বস্তু দ্বারা গঠিত। অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রণের ফলে ও চাপে জলের তলানিও শক্ত হইয়া যায়। বালি পাথর ও শেল এইরূপ কঠিন শিলার উদাহরণ। (৩) অর্গানিক শিলা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আগ্নেয় বা পাললিক শিলার পরিবর্তিত রূপকে অর্গানিক শিলা বলা হয়। এইরূপে চুনা পাথর হইতে মার্বল ও শেল হইতে স্লেট উৎপন্ন হইয়া থাকে। আগ্নেয় শিলা গলিত অবস্থা হইতে কঠিন হইবার সময় মিছরির দানার মত দানা বাঁধিয়াছে, কিন্তু স্তর সৃষ্টি হয় নাই। পাললিক শিলা জলের তলানিতে গঠিত বলিয়া নদীবাহিত পদার্থের বিভিন্নতা অনুসারে জলের সমান্তরালভাবে বিভিন্ন স্তরে গঠিত। ভূপৃষ্ঠের কম্পনের ফলে অনেকস্থলে পাললিক শিলার স্তর সমান্তরাল থাকে না, বাঁকিয়া বা ভাঙিয়া যায়।

ভূবিজ্ঞানীরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে হিমালয় সহ উত্তর ভারত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত সহ দাক্ষিণাত্য এবং আফ্রিকা হইতে অস্ট্রেলিয়া এক মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মহাদেশের নাম গণ্ডোআনাল্যান্ড। কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে হিমালয় ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং গণ্ডোআনাল্যান্ড হইতে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে।

নর্মদা নদীর দক্ষিণে গোন্ড জাতির রাজ্য ছিল। তাহাদের রাজ্যের নাম গণ্ডোআনা। এখানকার ভূমিতে কতকগুলি বিশেষ-প্রকার স্তর দেখা যায়, এই সকল স্তরকে গণ্ডোআনা পর্যায় বলা হয়।

হিমালয় যখন ছিল না তখন বিন্ধ্যাচল ছিল। হিমালয়ের মত বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীও পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। কিন্তু উহা হিমালয়ের মত একটানা নহে, বিক্ষিপ্ত এবং পূর্ব দিকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত এই বিক্ষিপ্ত পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং প্রাকৃতিক লক্ষণ অনুসারে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত এবং অবশিষ্টাংশ গাঙ্গেয় উপত্যকা বা উত্তর ভারতের অংশ। গাছপালা বা জীবজন্তু যখন পৃথিবীতে ছিল না সেই সময়কে বলা হয় আর্কিয়ান (Archaean) যুগ। সেই যুগের নাইস (Gneiss) নামক এক রকম রূপান্তরিত শিলা বীরভূমে, বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে এবং মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমাংশে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের এই জাতীয় শিলার বিস্তৃত ক্ষেত্রের পূর্ব প্রান্তই বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। মেদিনীপুরে এই শিলায় অভ্রের ভাঁজ ও স্লেট-জাতীয় শক্ত মৃৎপদার্থ (Phyllites) আছে।

গণ্ডোআনা পর্যায়ের (Gondwana System) পাললিক শিলাস্তর অজয় নদের উত্তরে বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে মোরের উত্তর তীরে অবস্থিত টাংসুলি খনি হইতে আসানসোলের রানীগঞ্জ অঞ্চল সহ বাঁকুড়ার উত্তরাংশে মেজিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঁকুড়া শহরের সোজা উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় ১৫ মাইল দূরে আনন্দপুর গ্রামের নিকটে চার বর্গমাইল স্থানে সম্প্রতি গণ্ডোআনা শিলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসানসোলের গণ্ডোআনা শিলা দুই স্তরে বিভক্ত। ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্তরের প্রভেদ সুস্পষ্ট। তালচের, দামুদা ও পাঁচেট এই তিন উপবিভাগে নিম্নস্তর ভাগ করা হইয়াছে। গণ্ডোআনা স্তর দক্ষিণে ঢালু হইয়া, ৫° হইতে ২৫° পর্যন্ত কোণ রচনা করিয়াছে। দক্ষিণ সীমায় স্তর দুইটি ঊর্ধ্বগামী হইয়া স্তরের ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। রানীগঞ্জের পূর্ব দিকে গণ্ডোআনা শিলা গভীর পলিস্তরের নিম্নে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তালচের স্তর গণ্ডোআনা পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। কর্দমজাত শেল (Shale) নামক পাললিক শিলা ও নরম বেলে পাথরে উহা গঠিত। এই শিলায় পলকাটা নুড়ির অস্তিত্ব ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নুড়িগুলি যে বরফের দ্বারা বাহিত হইয়াছে পল তাহারই প্রমাণ। তালচের স্তরের উপরে দামুদা স্তর। উহার তিন উপবিভাগ, ঊর্ধ্বক্রমানুসারে তাহাদের নাম বরাকর, লোহাপাথর শেল ও রানীগঞ্জ স্তর। বরাকর স্তরে জলে ক্ষয়িত পাথরের টুকরার যুক্ত পিণ্ড, বেলে পাথর, শেল ও টেরাবাঁকা কয়লার স্তর দেখা যায়। রানীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলে বরাকর স্তরের উপর খুব পুরু কাল বা ধূসর শেলের সহিত দীর্ঘ ফালি অথবা ডেলার আকারে মৃৎ লোহা-পাথর (Clay-iron stone) আছে। রানীগঞ্জ স্তর অতি পুরু মোটা ও মিহি বেলে পাথর, শেল ও কয়লা দ্বারা গঠিত। এই সকল স্তর একটানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। পাঁচেট লাল মাটি ও বেলে পাথরের স্তর। কয়লার খনি অঞ্চলের দক্ষিণাংশের গণ্ডোআনা পর্যায়ের ঊর্ধ্ব স্তর ১,০০০ ফুট গভীর লাল ও ধূসর বেলে পাথর এবং শেলের দ্বারা গঠিত। দুর্গাপুরের আশেপাশে বেলে পাথরের সঙ্গে লাল ও সাদা মাটির বহু ফালি উপরেই দেখা যায়। জলপাইগুড়ি জেলায় গণ্ডোআনা বেলে পাথর ও শেলের অগভীর এক স্তর টারসিয়ারী ও বক্সা স্তরের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। দার্জিলিং জেলাতেও অল্পপরিমাণে গণ্ডোআনা শিলা দেখা যায়। প্রাথমিক আগ্নেয় শিলার কয়েকটি কাল প্রাচীর বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের আর্কিয়ান ও গণ্ডোআনা স্তরগুলি খণ্ডিত করিয়াছে।

গ্র্যানিট (Granite) একপ্রকার আগ্নেয় শিলা; ইহার দানা (Grain) সুস্পষ্ট দেখা যায়। বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে এক পিণ্ড গ্র্যানিট আছে। বাঁকুড়ার আর্কিয়ান শিলা প্রধানত নাইস (Gneiss) নামক রূপান্তরিত শিলা; উহা স্থানে স্থানে গ্র্যানিট, গ্রাফাইট গ্র্যানিট ও কোয়ার্টস্ দ্বারা খণ্ডিত। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের সংযোগস্থলে আট মাইল দীর্ঘ ও চার মাইল প্রস্থ স্থান জুড়িয়া গ্র্যানিট আছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের উপরিভাগ কোআর্টসাইট (Quartzite) নামক সাদা দানাদার রূপান্তরিত বেলে পাথরে গঠিত। বাঁকুড়া শহরে, তাহার পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হর্নব্লেন্ড নাইস (Hornblende Gneiss) গ্র্যানিটের শিরা দেখা যায়।

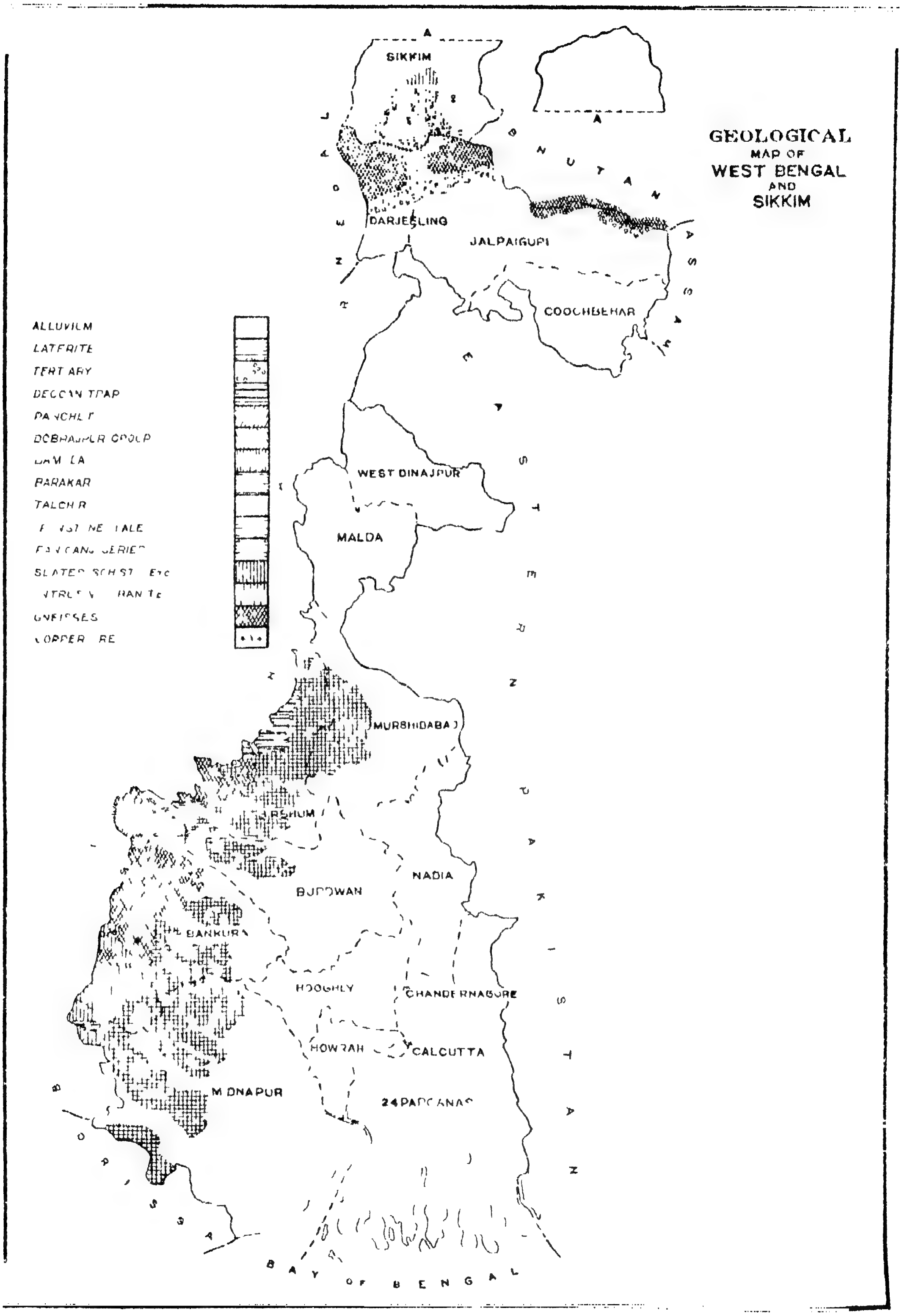
GEOLOGICAL
MAP OF
WEST BENGAL
AND
SIKKIM
ALLUVIUM
LATERITE
TERTIARY
DECCAN TRAP
PANCHET
DUBRAJPUR GROUP
DAMUDA
BARAKAR
TALCHIR
SLATES SCHISTS ETC
GNEISSES
COPPER ORE
SIKKIM
DARJEELING
JALPAIGURI
COOCHBEHAR
WEST DINAJPUR
MALDA
MURSHIDABAD
BIRBHUM
NADIA
BURDWAN
BANKURA
HOOGHLY
CHANDERNAGORE
HOWRAH
CALCUTTA
MIDNAPUR
24 PARGANAS
NEPAL
BHUTAN
ASSAM
EASTERN PAKISTAN
ORISSA
BAY OF BENGAL
A
A

ল্যাটেরাইট (Laterite) নামক পাথরের রং পাটল বা সুরকির মত, দেখিতে ফোঁপরা। খনি হইতে তুলিবার সময় নরম থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগিলে কালক্রমে শক্ত হয়। ভাঙ্গা ল্যাটেরাইট চাপ পাইলে ক্রমশ জোড়া লাগে। বীরভূমের পশ্চিমাংশের মাঝামাঝি এইরূপ ল্যাটেরাইট আছে। মোর ও অজয়ের উপত্যকায় ল্যাটেরাইট অনেক জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমের উচ্চাংশে পলির সঙ্গে কাঁকররূপে ল্যাটেরাইট মিশ্রিত। কোন কোন অঞ্চলে মাটির উপরেই ল্যাটেরাইট পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের মৃত্তিকা অংশত ল্যাটেরাইট। ল্যাটেরাইটের ফাঁকে ফাঁকে বালি ও কাঁকর, ইহাই বাঁকুড়া জেলার সাধারণ নিয়ম। খাঁটি ল্যাটেরাইটের শক্ত বড় বড় খনি এবং কাঁকরও দেখা যায়। বাঁকুড়া শহরের পূর্ব দিকে হর্নব্লেন্ড নাইস (Hornblende Gneiss) ক্রমশ ল্যাটেরাইট ও মোটা বালি-মিশ্রিত কাদামাটিতে (Clay) ঢাকা পড়িয়াছে। কোন কোন স্থানে ল্যাটেরাইটের কাঁকর ক্রমশ অজ্ঞাতসারে কঠিন ল্যাটেরাইটে পরিণত হইয়াছে এবং পুনরায় এমন জমাট বাঁধিয়াছে যে, ল্যাটেরাইট শিলা হইতে উহার প্রভেদ সহজে ধরা পড়ে না। আবার উহা পূর্বের মতই ক্রমশ অজ্ঞাতসারে মোটা বালি-মিশ্রিত কাদামাটিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার মাঝে মাঝে অল্পসংখ্যক ল্যাটেরাইটের ডেলা থাকে; উহাতে সমস্ত মাটির রং লাল হইয়া উঠা শক্ত। উত্তরাঞ্চলে কোন বিস্তৃত স্থানে ল্যাটেরাইট দেখা যায় না। বড়জোড়াতে ল্যাটেরাইট আছে। বাঁকুড়া শহরের আশেপাশে খণ্ড খণ্ড ল্যাটেরাইট দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার স্তর পুরু নহে। সোনামুখী ও ধলকিশোর পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ ও অসমতল ভূমিতে গুল্মাচ্ছাদিত শিরাগুলির (Ridge) অধিকাংশই ল্যাটেরাইটের কাঁকরে আবৃত। মাঝে মাঝে পুরু, কঠিন, বৃহদাকার ল্যাটেরাইটের খনিও আছে। বাঁকুড়া শহর হইতে দক্ষিণে বেনিয়াপুকুর অবধি ল্যাটেরাইটের অনেক অনুচ্চ ঊর্মিশিরা (Ridge) গঠিত হইয়াছে। ইহারা মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। মেদিনীপুরের সমস্ত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল ল্যাটেরাইটময়। কমবেশি একটানা ল্যাটেরাইট শিলা জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই কঙ্কর ও ডেলা দেখা যায়। অন্য রকম শিলার ক্ষুদ্র গোলাকৃতি খণ্ডও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ল্যাটেরাইটের ডেলা প্রায়ই অসংলগ্ন কাঁকরের মত থাকে; কিন্তু উহার জমাট-বাঁধা পিণ্ডও অসাধারণ নহে। এই জমাট-বাঁধা ল্যাটেরাইটের কাঁকর হাওয়া লাগিলে পুনরায় অসংলগ্ন হইয়া যায়। হাওয়াতে ল্যাটেরাইট শক্ত হয় কিন্তু এইক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকার বড় অংশ ল্যাটেরাইটের মৃৎপদার্থ (Clay) ও বালি। হুগলি জেলার গোঘাট থানায় পলির সহিত বাঁকুড়া জেলার উচ্চভূমি হইতে আগত ল্যাটেরাইট মিশ্রিত হইয়াছে।

পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

পর্বত হইতে নির্গত হইয়া আসিবার সময় নদী বিশ্লিষ্ট ও ক্ষয়িত পাথরের নুড়ি, বালি ও মাটি বহিয়া আনে। সমভূমিতে, বিশেষত সমুদ্রের নিকটে আসিলে স্রোতের বেগ মন্দীভূত হয়। তখন নুড়ি, বালি ও মাটি তলানিরূপে স্তরাকারে জমা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভূমি এইরূপ পলিমাটিতে গড়া।

বীরভূমের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পলিমাটির সমতলক্ষেত্র। কালো কাদামাটি হইতে বালি পর্যন্ত নানা শ্রেণীর মৃত্তিকায় উহা গঠিত। আসানসোল মহকুমা ব্যতীত বর্ধমান জেলার অন্যান্য স্থান পলিস্তরে আবৃত। এই পলির অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ইহার মধ্যে ঘোলাটে লালচে বাদামী রঙের মাটিতে কঙ্কর ও ক্ষুদ্র লৌহযুক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কণা থাকে। বাঁকুড়ার পূর্বাঞ্চলে আধুনিক পলিগঠিত বিস্তীর্ণ সমভূমি। মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পূর্বভাগে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পলিস্তর। গোঘাট থানা ছাড়া হুগলি জেলার সমস্ত পলিমাটিতে গঠিত। হাওড়া জেলায় পলি ভিন্ন অন্য কিছু নাই এবং পলিস্তরের গভীরতা খুব বেশি। সাঁতরাগাছিতে ৭১৪ ফুট পর্যন্ত নল বসাইয়া শুধু পলিমাটিই পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। চব্বিশপরগনার পলিস্তর অতিশয় গভীর। গার্ডেনরীচ পৌরাঞ্চলে ১,৩০৬ ফুট পর্যন্ত নল বসাইয়াও কঠিন প্রস্তর বা সামুদ্রিক তল পাওয়া যায় নাই। ক্যানিং-এ ছোট একটি পুকুর কাটাইবার সময় দশ ফুট মাটির নীচে প্রায় চল্লিশটি গাছ পাওয়া গিয়াছে। শিয়ালদহে বিভিন্ন স্তরে প্রায় ৩০ ফুট পর্যন্ত নীচে সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি দেখা গিয়াছে। "কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে ভূমির ৩০ ৪০ ফুট নীচে একটি গরান ও সুন্দরী কাঠের স্তর দেখা যায়। কাঠের লাল রং এখনও বজায় আছে। এককালে এখানে সুন্দরবনের তুল্য জঙ্গল ছিল, তারপর প্লাবনের ফলে তার উপর গভীর পলি পড়িয়াছে।" পলির চাপে মাটি বসিয়া যাওয়াতে বন ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে।

নদিয়া জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চল আধুনিক পলি দ্বারা গঠিত। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশে নূতন পলিমাটি এবং পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে শক্ত মৃৎপদার্থের (Clay) সহিত কাঁকর ও ঘুটিং নামে ডেলা ডেলা পাথরযুক্ত পুরাতন পলি। এই পুরাতন পলির উচ্চভূমি বর্ধমানের দিকে নামিয়া সাধারণ পলিস্তরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মাটির পাহাড় আছে।

মালদহ জেলা পলিস্তরে আবৃত। পূর্বাংশের বারিন্দ বর্ধমানের প্রাচীন পলির অনুরূপ ফ্যাকাসে লালচে বাদামী রঙের মৃৎপদার্থ (Clay), জল ও বাতাসে পীতাভ দেখায়। ইহার মধ্যে মধ্যে কঙ্কর ও ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহজাতীয় কণা। মহানন্দার পশ্চিমের নিম্নভূমি আধুনিক পলিতে গঠিত। পশ্চিম দিনাজপুরের সমস্তই আধুনিক পলিতে গড়া। খিয়র নামে একপ্রকার ছাই-রঙা মাটি বর্ষায় নরম থাকে কিন্তু অন্য ঋতুতে সিমেন্টের তুল্য জমাট বাঁধিয়া শক্ত হয়। কোন কোন স্থানে বারিন্দের অনুরূপ প্রাচীন পলিস্তরও আছে। হিমালয় হইতে ধুইয়া আনা নুড়ি, কাঁকর, বালি, মাটি ও উদ্ভিদাদির গলিত অংশ দ্বারা কোচবিহারের মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে। পার্বত্য উত্তরপ্রান্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ জলপাইগুড়ি জেলা পলি দ্বারা গঠিত। পাহাড়ের সন্নিকটের পলি মোটা কঙ্করময়, ইহার দক্ষিণে বালিমিশ্রিত মৃৎপদার্থ (Clay) ও পাঁক (Loam)। তিস্তা ও জলঢাকার মধ্যে এক খণ্ড কালো মাটি আছে। দার্জিলিঙের তরাই এবং হিমালয়ের পাদদেশের সমভূমি অসংবদ্ধ বালি, মাটি, নুড়ি ও কঙ্করময়।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ

এই রাজ্যের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা প্রধান। সর্বোৎকৃষ্ট কয়লার নাম অ্যান্থ্রাসাইট (Anthracite)। উহাতে কার্বনের ভাগ শতকরা ৯৩·৫, জ্বালিলে খুব তাপ হয় কিন্তু শিখা ও ধোঁয়া হয় না। জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তীর নিকটে সামান্য পরিমাণে অ্যানথ্রাসাইটিক অর্থাৎ অ্যানথ্রাসাইট অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়লা দেখা যায়। এ দেশে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা নাই। ইহার পরেই বিটুমিনাস (Bituminous) কয়লার স্থান; জ্বালিলে শিখা আর ধোঁয়া হয়। কার্বনের ভাগ শতকরা ৮৪·২। পশ্চিমবঙ্গের কয়লা প্রধানত বিটুমিনাস। গণ্ডোআনা পর্যায়ের স্তরে প্রাপ্ত এই কয়লার বয়স কয়েক কোটি বৎসর।

খনি হইতে প্রাপ্ত কাঁচা কয়লার ইংরাজি নাম কোল। বাহিরে রাখিয়া অথবা রুদ্ধপাত্রে কোল পোড়াইলে যখন ধোঁয়া প্রভৃতি উঠা বন্ধ হইয়া যায় তখন যাহা পড়িয়া থাকে তাহা কোক নামে পরিচিত। লৌহ নিষ্কাশনের জন্য প্রচুরপরিমাণে কোকের প্রয়োজন। কয়লার দুই শ্রেণী, কোকিং ও নন-কোকিং। কোকিং কয়লা বিহারের ঝরিয়াতে অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে আসানসোল মহকুমায় কয়লার খনি আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমে উহা প্রায় ৫০ মাইল বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্বের বিস্তৃতি প্রায় ২০ মাইল। ইহাই রানীগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ কয়লার খনি। ইহার স্তর চার ফুট হইতে দুই হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর। কয়লার পরিমাণ ১,০০০ ফুট পর্যন্ত ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন এবং ২,০০০ ফুট পর্যন্ত ২৫ কোটি টন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট নন কোকিং এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা বিপুল পরিমাণে আছে।

বীরভূমের মোর নদীর উত্তরের টাংসুলি কয়লাক্ষেত্র আকারে ছোট এবং উহার কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। বাঁকুড়া জেলার উত্তর প্রান্তে মেজিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড়ের মধ্যে কয়লার স্তর আছে। রানীগঞ্জের কয়লার স্তরই এই দুই জেলায় সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কয়লার অর্ধপরিণত রূপের নাম লিগ্‌নাইট (Lignite), রং ব্রাউন। ইহাকে ব্রাউন কয়লাও বলা হয়। দার্জিলিং জেলায় জয়ন্তী হইতে দেড় মাইল দূরে জয়ন্তী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে উৎকৃষ্ট লিগ্‌নাইট বহুলপরিমাণে আছে। পর্বতের পাদদেশে দার্জিলিঙেও কয়লার খনি আছে। কয়লার আনুমানিক পরিমাণ দুই কোটি টন। কিন্তু দার্জিলিঙের কয়লা গুড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। কোক না করিলে অথবা কয়লার ইট প্রস্তুত না করিলে উহা দূরে চালান দেবার অথবা কাজে লাগাইবার সুবিধা হইবে না।

কয়লাকে বলা হয় 'কালো মাণিক'; মাণিকই বটে। কয়লা যান্ত্রিক শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। লোহাপাথর হইতে লৌহ নিষ্কাশন ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য কোক অপরিহার্য। বদ্ধপাত্রে কোক প্রস্তুত করিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের উপজাত (bye product) পাওয়া যায়। উহা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা শহরের রাস্তায় আলো দেয় এবং রান্নার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কয়লার উদ্বায়ী অংশ তরল হইলে কোল টার পাওয়া যায়। এই কোল টার হইতে বেনজিন, কার্বলিক অ্যাসিড, নানাবিধ রঙ, সুগন্ধি দ্রব্য, চিনি হইতে ৫০০ গুণ অধিক মিষ্ট স্যাকারিন এবং আরও অনেক কিছু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এ দেশে এখন পর্যন্ত বদ্ধপাত্রে কয়লা পোড়াইয়া উহার মূল্যবান গ্যাসীয় পদার্থের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা অপ্রচুর।

হিমাটাইট (Haematite) বা লোহা পাথর

এই পাথর খুব শক্ত, ভারী, রং লালচে কালো এবং দেখিতে উজ্জ্বল। এ দেশের হিমাটাইটে ৬২ হইতে প্রায় ৭০ ভাগ লোহা থাকে। আসানসোলের কয়লার খনি অঞ্চলে, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে হিমাটাইট পাওয়া যায়। রানীগঞ্জের আশে-পাশে বার্নপুর, কুলটি ও বরাকরে লৌহ প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কারখানায় বিহার এবং ময়ূরভঞ্জ হইতেও হিমাটাইট আনা হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় গাওপাতা (২৬° ৪৬´ঃ ৮৯° ৩৪´) ও অন্যত্র হিমাটাইট পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিয়া থাকে। দার্জিলিং জেলায় বেশি মাত্রায় লৌহযুক্ত মৃৎপদার্থ (Clay) হইতে আরম্ভ করিয়া বাদামী রঙের অবিশুদ্ধ হিমাটাইট পর্যন্ত নানা শ্রেণীর লৌহ আকরিক লোহারগড় নামক স্থানে পাওয়া যায়। পূর্বে এখানে লোহা প্রস্তুত হইত। তিস্তার পূর্ব দিকে, শিকবারের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে শামলবং নামক স্থানে গন্ধক ও ফস্‌ফরাস-মুক্ত উচ্চ শ্রেণীর ম্যাগনেটাইট ও অভ্রযুক্ত হিমাটাইটের ২০ ফুট গভীর একটি স্তর আছে। পূর্বে এই খনির আকরিক হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইত বলিয়া শোনা যায়।

বালি

পলস্তারা, কংক্রিট ইত্যাদির অন্যতম উপাদান বালি। খোঁচা খোঁচা মোটা বালি এই কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কলিকাতার কলের জল পরিশ্রুত করিবার জন্য বালির প্রয়োজন। কাচের অন্যতম উপাদান বালি। দামোদর, বরাকর, অজয়ের খাতে বালির অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। কয়লার খনির শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য এই বালি বিশেষ উপযোগী। হুগলি জেলার কানা নদীর বালি গাঁথুনির কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। পলস্তারা ও কংক্রিট ইত্যাদির বালি গঙ্গা ও দামোদরের ধারে পাওয়া যায়। আসানসোলে কাচের উপযুক্ত বিশুদ্ধ সাদা বালি (Quartz sand) পাওয়া যায়। পোর্সিলেনের উপাদানরূপেও এই বালি চলে। নিকৃষ্ট কাচের জন্য খুব বিশুদ্ধ বালি দরকার হয় না।

কেওলিন বা চিনামাটি

চিনামাটিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণীবিভাগে উহা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়। রানীগঞ্জে চিনামাটি আছে। চিনামাটি দ্বারা বাসনাদি প্রস্তুত করা হয়। বোয়েম, হাতমুখ ধোবার বেসিন ইত্যাদি (stoneware) তৈরি করিবার উপযুক্ত মাটিও রানীগঞ্জে পাওয়া যায়। যেখানে আগুনের আঁচ বেশি, যেমন বয়লারের চুল্লিতে, সেখানে সাধারণ ইটের গাঁথনি চলে না। রানীগঞ্জের কয়লার খনির স্তরে ফায়ার ক্লে (Fire clay) নামে এক রকম মাটির মতন বস্তু পাওয়া যায় তাহা হইতে ফায়ার ব্রিক (Fire brick) নামক তাপসহ (Refractory) ইট, ধাতু গলাবার মুচি এবং অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত হয়। দুর্গাপুরের কারখানায় চিনামাটির টালি, পাইপ ও স্যানিটারি ফিটিং তৈয়ারি করা হইতেছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার সালতোরা থানায় অবস্থিত বেরিয়াথল মৌজায় চিনামাটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ফেলস্পার (Felspar)

একপ্রকার পাথর; বেশি তাপে গলিয়া কাচের মত হয়। অন্যান্য উপাদানের সহিত ইহার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পোর্সিলেনের উপর লেপ দেওয়াতে উহা কাচের মত মসৃন দেখায়। যে কেওলিন পিণ্ডে জিনিস গড়া হয় তাহাতেও ফেলস্পার থাকে। স্টোন-ওয়ারের উপরও এইরূপ লেপ দেওয়া হয়। আসানসোল অঞ্চলে ও বাঁকুড়ায় ফেলস্পার পাওয়া যায়।

সোপস্টোন (Soapstone)

একপ্রকার সাদা বা পাটল নরম পাথর, নখে আঁচড় কাটা যায়, স্পর্শ সাবানের মত মসৃণ। ট্যাল্ক পাউডার নামে ইহার চূর্ণ বহু শিল্পে লাগে। গায়ে মাখিবার পাউডারের উপাদান এই চূর্ণ। সাবানের সঙ্গে ইহার ভেজাল দেওয়া হয়। ইহার ময়লা-চূর্ণের নাম ফ্রেঞ্চ চক। এই পাথর কাটিয়া বাসন ও মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানার অন্তর্গত কাঠখুরা, কাটচুয়া ও গোহালবেরিয়া মৌজায় সোপস্টোন আছে। তাহা হইতে বাসনপত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

বেলে পাথর (Sandstone)

এই পাথর সহজে কাটা যায়। অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপ, মোগল বাদশাহদের মসজিদ ও প্রাসাদ, নূতন দিল্লীর সভাভবন ও রাষ্ট্রপতির বাসভবন এই পাথরে নির্মিত। আসানসোল মহকুমায় বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ বেলে পাথর আছে। দার্জিলিঙে গৃহাদি নির্মাণের জন্য অন্যপ্রকার পাথর পাওয়া যায়।

ল্যাটেরাইট

গৃহনির্মাণের জন্য ল্যাটেরাইটও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্য খনি হইতে তোলা ল্যাটেরাইটে গাঁথনি করিবার সময় চুনসুরকির দরকার হয় না।

চুনাপাথর

দার্জিলিঙে তিন উপায়ে চুন পাওয়া যাইতে পরে, চুনাপাথর, ডলোমাইট (dolomite) ও ক্যালকেরিয়াস টুফা হইতে। ডলোমাইট হইতে উত্তম চুন প্রস্তুত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রধান খনিজ ডলোমাইট। বর্ষায় স্রোতবেগে ডলোমাইটের বড় বড় খণ্ড (boulder) পাহাড় হইতে নামিয়া আসে। এইরূপে প্রকৃতিই যেন ডলোমাইটের যোগান দিয়া থাকে। অনেকস্থানে প্রাচীন নদীখাতে কঙ্কর বা ঘুটিং নামে এক রকম ডেলা ডেলা পাথর পাওয়া যায়, তাহা হইতে ঘুটিং চুন হয়। চুনা পাথর বা কঙ্করের গুঁড়ার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় মৃৎপদার্থ (clay) মিশ্রিত করিয়া পোড়াইলে সিমেন্ট প্রস্তুত হয়। আসানসোল, বাঁকুড়া ও হুগলিতে ঘুটিং আছে।

উলফ্রাম

বিজলীবাতির ফিলামেণ্ট এবং একপ্রকার স্টীল তৈরির জন্য এই ধাতুর প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানায় ছেঁদাপাথর নামক মৌজাতে উলফ্রামের আকর আছে।

অভ্র (Mica)

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে অনেক জায়গায় দেখা গেলেও ঠিক লাভজনক পরিমাণে কোথাও অভ্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তামা

জলপাইগুড়ির বক্সা ডুয়ার্সে তামা দেখা যায় কিন্তু লাভজনক পরিমাণে নহে। দার্জিলিঙেও তামা আছে কিন্তু উহা আহরণের কোন চেষ্টা হয় নাই।

গ্রাফাইট

দার্জিলিং জেলার রঙ্গিত নদী অঞ্চলে নিকৃষ্ট ধরনের গ্রাফাইট দেখা যায় কিন্তু ব্যবসায়ের দিক হইতে উহা মূল্যহীন।

লবণ

মেদিনীপুরে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

পেট্রল

সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলে পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরবনে পেট্রলের সম্ভাবনা ব্যতীত পলিস্তরে এ পর্যন্ত কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্তে সীমাবদ্ধ। দামোদর উপত্যকার গণ্ডোআনা স্তর নানাবিধ মূল্যবান খনিজের আধার। আসানসোল অঞ্চল দামোদর উপত্যকারই একাংশ। এখানকার খনিজ সম্পদ মানভূম, সিংহভূম অঞ্চলের অনুরূপ। কিন্তু কোন কোন আকরিকের পরিমাণ এত অল্প যে তাহার আহরণ লাভজনক নহে। খনিজের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। ভবিষ্যতে হয়তো আরও খনিজের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যান্ত্রিক শিল্পের তিনটি শক্তির উৎসের দুইটি, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ, পশ্চিমবঙ্গে এখনই আছে বলা যায়। দামোদর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইলে জলবিদ্যুতের উৎস উন্মুক্ত হইবে। সুন্দরবনে পেট্রলের যে ইঙ্গিত সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে তাহা সত্য প্রমাণিত হইলে শক্তির তৃতীয় উৎসও এখানে মিলিবে। রাজ্যের সীমানার ঠিক বাহিরেই রাজমহল, মানভূম, সিংহভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল নানাবিধ খনিজের আকর। তাহা হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া আসানসোল অঞ্চল শিল্পে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে কয়লা, লৌহ ও চুন, লৌহশিল্পে প্রয়োজনীয় এই তিনটি খনিজই অল্প পরিমাণে দেখা যায়। অনুসন্ধানের ফলে ইহাদের ভাণ্ডারের প্রাচুর্য আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

মৃত্তিকা (Soil)

রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্ত ব্যতীত অন্যত্র মৃত্তিকায় বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। পশ্চিমপ্রান্ত ব্যতীত ভূগর্ভস্থ জল সাধারণত সমস্তরে বিদ্যমান। সচ্ছিদ্র উর্ধ্বস্তর একটি অপ্রবেশ্য মাটির নিম্নস্তরের উপর স্থাপিত। ইহাতেই মাটির আর্দ্রতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চলের মাটি রাসায়নিক ও বাহ্যিক বিচারে মধ্যবঙ্গের মৃত্তিকা হইতে পৃথক্। পশ্চিমের সবটা এবং পূর্বের বেশির ভাগ সিংহভূম, মানভূম ও ছোটনাগপুরের পাহাড়ের ভাঙ্গাচুরা গলনে গড়া। পশ্চিমাংশের অনেক স্থানে বৃষ্টি, তাপ, বায়ু প্রভৃতি ক্ষয়সাধক প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সন্নিহিত শিলা হইতে সরাসরি মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগ ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদীবাহিত মাটি, প্রস্তরচূর্ণ প্রভৃতি পদার্থে গঠিত। হিমানীর ক্রিয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন-সংবলিত মৃত্তিকাও দৃষ্ট হয়। মাটির কতকাংশ অল্পাবিস্তর পরিবর্তিত লাল ল্যাটেরাইট আর কতকাংশ বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট মোটা লাল বালির অনুরূপ বালি। দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও অজয়ের খাতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া এই বালি দেখা যায়। ধান ও আখ, বর্ধমানের এই দুইটি বিশেষ শস্য, লাল মাটি ও লাল বালি এই উভয় মৃত্তিকাতেই জন্মিয়া থাকে। দুই প্রকারের মৃত্তিকার মিশ্রণে গঠিত ভূমিই আখের পক্ষে উত্তম। লাল মাটির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কঠিন কাজ। বৃষ্টির জল পড়িলে এমন কাদা হয় যে সহজে তাহা ছাড়ানো যায় না, রৌদ্রে হয় পাথরের মত শক্ত। এই লাল মাটিতে প্রচুর ফস্‌ফরাস ও লৌহ (sesqui-oxide of iron) মিশ্রিত আছে।

আবাদী অঞ্চলের বেশির ভাগই নিম্নভূমি। মৃত্তিকা কাদামাটিতে (clay) গঠিত। নদীবাহিত পলি দ্বারা দিয়ারা ভূমি গঠিত হয়। প্রতি বর্ষায় জমিতে পলির এক নূতন প্রলেপ পড়ে। এই জন্য বিনা সারে শীতের ও বসন্তের শস্য, ডা'ল, গম, যব, তৈলবীজ ও তরিতরকারি জন্মিয়া থাকে। কৃষকের নিকট নদীখাতের বা নদীতীরের এরূপ জমির বিশেষ আদর।

বীরভূমের "মেটেল" মৃত্তিকায় আর্দ্রতা রক্ষিত হয় বলিয়া উহা আমন ধান, আখ, গম, ছোলা ও কলাই-এর বিশেষ উপযোগী।

“এঁটেল” মাটির রং অনেকটা বাদামী, ভিজিলে আঠাল, শুখাইলে শক্ত এবং লম্বা ফাটল ধরে। ইহা নিকৃষ্ট ধরনের মৃত্তিকা; সার প্রয়োগ করিলে ধান জন্মিতে পারে কিন্তু জলসেচের দ্বারাও রবিশস্য জন্মান যায় না। ‘বাধা এঁটেল’ লালচে মাটি, আঠাও সহজে ছাড়ান যায় না, শুখাইলে অত্যন্ত শক্ত, অন্য মাটি অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকাল আর্দ্রতা রক্ষা করিতে পারে। এঁটেল মাটির মত ইহাও নিকৃষ্ট মাটি। সার প্রয়োগ করিলে ধান জন্মে কিন্তু অন্য কোন শস্য জন্মে না। নদীর খাতে ও প্লাবন অঞ্চলে তলানি পড়িয়া যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহাই “পলি । ইহা পীতাভ, আঁটবাধা নহে, সহজে চূর্ণ হয়। পলি খুব উর্বর মৃত্তিকা। আখ, গম, ছোলা, আলু বাঁধাকপি ও অন্যান্য তরিতরকারির বিশেষ উপযোগী। অধিকতর মূল্যবান শস্যের জন্য রক্ষিত হয় বলিয়া ইহাতে বেশি ধানের চাষ করা হয় না। পলিতে বিনা সেচে রবিশস্য জন্মে। ইহা হইতে মৃৎশিল্পের উপাদান উৎকৃষ্ট মাটি সরবরাহ হয়। “বেতি” বা বেত’ সাধারণত পলির প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় ইহা শুধু হালকা ধরনের “পলি’ বুঝাইতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা লালচে শিথিল-বন্ধন এবং সহজে চূর্ণ হয়। বেতিতে ধান জন্মে না তরিতরকারি, গম, যব প্রভৃতির বিশেষ উপযোগী, জলসেচ করিলে রবিশস্য জন্মিয়া থাকে।

“বিন্দি” একপ্রকার বেলে মাটি। চাষ করিতে করিতে ইহার উন্নতি হয়। লালচে শিথিলবন্ধন সহজভঙ্গুর মাটি, আর্দ্রতা রক্ষায় অসমর্থ, ইহা এক রকম নিকৃষ্ট মৃত্তিকা, ধান জন্মিতে পারে, সেচের দ্বারা রবিশস্য জন্মান যায়। কাদামাটি ও বালি-মিশ্রিত মৃত্তিকাকে বলা হয় দোআঁশ’। ইহা কালচে, আঁটা নহে, সহজে চূর্ণ হয় এবং আর্দ্রতা খুব বেশি রক্ষা করিতে পারে না। ইহা উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা সকল শস্যের উপযোগী, রবিশস্যের জন্য সেচ আবশ্যক। সাদাটে বাঁধনছাড়া বেলে মাটি’ সহজে গুঁড়া হইয়া যায়, আর্দ্রতা রক্ষা করিতে পারে না। ইহা নিকৃষ্ট ধরনের মাটি, শুধু ধান ও সবজি চাষের উপযোগী। জলসেচ করিলেও রবিশস্য জন্মে না। ‘কাঁকড়ে” একপ্রকার লালচে শিথিল, সহজে চূর্ণ হয় এরূপ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা। ইহার উৎপাদিকা শক্তি সামান্য, কেবলমাত্র বাজরা ভুট্টা, কুরাথি, মটর মারুয়া ও গন্দালি উৎপাদন করিতে সক্ষম। জলসেচের দ্বারা রবিশস্য জন্মান যায়। কাঁঠাল গাছ এই মাটিতে বেশ জন্মে। ‘বাস্তু” রবিশস্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় বেশি, ইহা কালচে, সহজভঙ্গুর ও উর্বর মৃত্তিকা। ইহাতে ঘুটের ছাই ও গ্রামের অন্যান্য আবর্জনার সার প্রয়োগ করা হয়। আর্দ্রতা বেশি রক্ষা করিতে পারে না বটে কিন্তু ইহা ধান, আখ, গম মটর, তিসি, তিল, তামাক, ভুট্টা ও বাজরা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাঁকুড়ার বেশির ভাগ মাটিই হয় বেলে দোআঁশ অথবা ল্যাটেরাইটের কাঁকর। সাধারণভাবে বলা যায় যে “ডাঙা” মাটির উর্বরতা অতি অল্প, তথাপি ইহাতে কিছু আউশ ধান, ভুট্টা ও রবিশস্য জন্মে। নিম্নভূমি ও উপত্যকার মৃত্তিকা সাধারণত উর্বর। উচ্চভূমির গলন আসিয়া নিম্নভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইন্দাস ও কোতলপুর থানার এবং সোনামুখী থানার উত্তরাংশের মৃত্তিকা আধুনিক পলিতে গঠিত। ইহা একপ্রকার দোআঁশ এঁটেল মাটি।

মেদিনীপুরের পলি গঠিত অঞ্চলে একপ্রকার আঠালো মাটিকে বলা হয় “এঁটেল” এবং “দোআঁশ” মাটির নাম “দোআঁশ”, “দোরস” বা “দোসেতা”। আর এক রকম মাটির নাম “বেলে দোআঁশ”। লাল মাটির অঞ্চলে অধিকাংশ মৃত্তিকাই দোআঁশ অথবা “বেলে দোআঁশ”। মাটির রং লালঘেঁষা বাদামী। পলি অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা এই মাটি উর্বরতায় হীন।

আঠালো মাটি চার শ্রেণীতে বিভক্তঃ “খরা এঁঠেল’, খুব শক্ত মাটি, রং কালচে হইতে পীতাভ, নিকৃষ্ট মৃত্তিকা, শস্য-উৎপাদনের জন্য অনেক সার প্রয়োজন। ঘরের দেওয়ালের জন্য এই মাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “নোনা এঠেল” বা ‘কুশ মাটি” সমুদ্রের ধারে ও সমুদ্রের জোয়ার আসে এরূপ নদী ও খালের পাশে দেখা যায়। লবণ-ভরা এই মাটি চাষের অযোগ্য, বর্ষার সময় আঠা ও পিচ্ছিল, বৃষ্টিহীন ঋতুতে লবণের সাদা আবরণে ঢাকা ও অত্যন্ত কঠিন। “বনমাটি” বা “পশুমাটি’ নরম ও লালচে, ধান চাষের উপযোগী। “দুধ এঠেল” কালোমাটি, মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

জলাভূমিকে বলা হয় “পাণিমাটি”। নদীবাহিত মৃত্তিকার নাম পলি”, পাঁক মাটি”, “গড়ের মাটি”। রায়তের বাড়ির নিকটবর্তী গোবর, ছাই ও বাড়ি ঝাটের আবর্জনা জমিয়া যে মাটি হয় তাহার নাম ‘খড় মাটি”।

হুগলি জেলার গোঘাটের মৃত্তিকা উচ্চভূমির ভাঙা ল্যাটেরাইট, কংকর ও পুরাতন পলিমিশ্রিত গলনে গঠিত। জেলার অন্য সর্বত্র সম্পূর্ণ নূতন পলি। এই পলির গভীরতা ৫ হইতে ১০ ফুট। পলিস্তরের নিম্নে ১০ হইতে ৩০ ফুট পুরু আঠালো মাটির স্তর। হুগলি ও তাহার শাখা সরস্বতীর কাদায় (Silt) যে পলির আস্তরণ উপরিভাগে গঠিত হইয়াছে তাহা খুব এঁটেল। কিন্তু দামোদর ও তাহার শাখায় আনীত পলি হালকা ও সচ্ছিদ্র। স্থানে স্থানে নীচের স্তরের উপর দ্বারকেশ্বরের ন্যায় দামোদর এক বালির স্তর গঠন করিয়াছে। মগরা ও আরামবাগ থানায় উহা দেখা যায়। যেসকল জলাভূমিতে গ্রামের জল নামিয়া আসে তাহার তলার মাটি শক্ত এঁটেল। জেলার উত্তর দিকের মাটি খানিক এঁটেল ল্যাটেরাইট, আর খানিক লাল মোটা বালি।

হাওড়া জেলার সর্বত্র পলিমাটি, নদীর তলায় বালি জেলার অভ্যন্তরে মজা নদীর খাতে এঁটেল মাটি এবং জলাভূমিতে কাদা প্রভৃতি মৃত্তিকার নানা অবস্থা দেখা যায়। এঁটেল ও গভীর দোআঁশ মাটি উত্তরাংশে বেশি দক্ষিণের নূতন পলি হালকা দোআঁশ মাটি। গঠন অনুসারে মাটির নাম বেলে এঁটেল পেঁকো বা কাদামাটি, ধসা বা জলাভূমির মাটি এবং এইরূপ আরও অনেক।

চব্বিশপরগনার মাটি চার শ্রেণীতে বিভক্তঃ মাটিয়াল দোরসা বা দোআশ, বালিয়া ও নোনা। মাটিয়াল আবার তিন রকমঃ কালা মাটাল, রাঙা মাটাল ও ঝাঝড়া মাটাল। খুব বেশি স্বাভাবিক উর্বরতাবিশিষ্ট আঠা কালো মাটির নাম কালা মাটাল। এই মাটিতে সর্বপ্রকার শস্য জন্মান যায়। রাঙা মাটালের রং লালচে, অনাবৃষ্টির ঋতুতে মাটিতে ফাটল ধরে, বর্ষায় উহা বসিয়া গিয়া গর্ত হয়। আমন ধানের বেশ উপযোগী, উঁচু জমিতে পাট ও ভাদই শস্য জন্মে। পূর্বোক্ত উভয় প্রকারের মাটি হইতে ঝাঝরা মাটাল নিকৃষ্ট। মাটির রং প্রায় কালো, শুকনো মাটি সহজে চাষ করা যায়। “দোরসা” মাটিতে বালি ও মাটি মিশ্রিত থাকে। ভাদই, রবিশস্য ও আখের উপযোগী। গ্রামের পার্শ্ববর্তী উচ্চ-ভূমির নাম “ডিহি”। উহাও দোরসা মাটি। “ডিহি’তে সার পড়ে খুব বেশি। আখ, তামাক, লংকা ও তরিতরকারি উৎপাদনের জন্যই এই সকল জমি সংরক্ষিত হয়। মাটি অপেক্ষা বালির ভাগ বেশি থাকিলে সেই মৃত্তিকাকে বলা হয় “বালিয়া”। তামাক, আলু, আউশ ধান ও মুগ এই মাটিতে জন্মে। ‘নোনা” মাটি আর্দ্র ও

লবণাক্ত। সাধারণ বৎসরে চাষের জন্য যতটা প্রয়োজন তত শুষ্ক ইহা হয় না। বৃষ্টি বিলম্বে আরম্ভ হইলে এই জমিতে শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে।

আমন ধানকে সুন্দরবনের একমাত্র শস্য বলা যাইতে পারে। মাটির শ্রেণী চারঃ "মাটিয়াল," রং সাদাটে, শিথিল ও হালকা, "পাটনাই" ধানের বিশেষ উপযোগী; তাহার পরই "বালিয়ারা" বা "দোরসার" স্থান, লালচে রঙ, অন্যান্য মাটি অপেক্ষা আর্দ্রতা রক্ষার ক্ষমতা অধিক, মোটা ধান জন্মে কিন্তু ফলন লাভজনক নহে, "ধাপ" বা "চূড়া" অন্য জমি অপেক্ষা উঁচুতে অবস্থিত, মাটির রঙ সাদাটে, জলে প্লাবিত হয় না, সুতরাং প্রবল বারিপাত ব্যতীত লবণ ধুইয়া যাইতে পারে না। সাধারণত ইহাতে কোন শস্য জন্মে না, ঘর ছাইবার জন্য উলু জন্মে। বৃষ্টিতে লবণ ধুইয়া ফেলিবার পর ধানের চাষ করা যায় কিন্তু ফলন সাধারণত খুব কম। "ঢাল" জমি সর্বাপেক্ষা নীচু; প্লাবিত হয় সবার আগে, মাটির লক্ষণ রাঙা মাটালের অনুরূপ অল্প বৃষ্টি হইলে মোটা ধান উৎপন্ন করা যায় কিন্তু বেশি বৃষ্টি হইলে শস্য উৎপাদন করা অসম্ভব।

কালান্তর অঞ্চল, করিমপুর থানা ও রাণাঘাট মহকুমার কোন কোন অংশ ব্যতীত নদিয়া জেলার প্রায় সর্বত্র হালকা বেলে দোআঁশ মৃত্তিকা, আর্দ্রতা রক্ষায় অসমর্থ এবং উর্বরতা অতি অল্প। নদিয়ার কৃষিক্ষেত্র বন্যাবাহিত পলি দ্বারা এখন আর আচ্ছাদিত হয় না। কালান্তর নামে পরিচিত অঞ্চলের মৃত্তিকা জেলার অন্যান্য অংশের মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন। পনর মাইল দীর্ঘ ও আট মাইল প্রস্থ এই ভূমিখণ্ড ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী স্থানে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা নিম্নভূমি, উপরিভাগ কালো শক্ত মাটিতে পরিণত হইয়াছে, অনুকূল অবস্থায় ভাল আমন ধান জন্মে, জল জমিয়া থাকায় শরৎকালে শস্য জন্মিতে পারে না, নিয়মিত শীতের শস্যেরও অনুপযোগী।

মৃত্তিকার শ্রেণী অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলা তিন অঞ্চলে বিভক্ত। ভাগীরথীর পূর্বে অবস্থিত জেলার উত্তর-পূর্বার্ধ, বগড়ি নামে পরিচিত। ইহা নিম্ন প্লাবনভূমি। এখানকার পলি মৃত্তিকা অতি উর্বর। আউশ ধান ও পাট প্রধান শস্য। ধান ও পাট উঠিয়া গেলে প্রচুর শীতকালের শস্য উৎপন্ন হয়। কালান্তর নামে পরিচিত দক্ষিণ পূর্বের নিম্নভূমির একমাত্র শস্য আমন ধান। ভাগীরথীর পশ্চিমের রাঢ় ভূমি সাধারণত উচ্চ হইলেও বহু বিল ও মজা নদীর খাতে ইহা বিভক্ত। রাঢ়ের শক্ত মাটির প্রধান শস্য আমন ধান। শীতকালের অন্য শস্য খুব সামান্য। তবে আখ, তুঁত, তামাক, আলু ও নানাবিধ শাক সবজিও জন্মে।

মৃত্তিকার কয়েকটি শ্রেণী আছে। মাঠাল বা মেঠেল মাটি গ্রীষ্মকালে ফাটিয়া যায় এবং বৃষ্টি পড়িলে কাদা ছাড়ানো কঠিন। রঙ ও মাটির আঁট (consistency) অনুযায়ী 'মাঠাল' মাটিকে নানা উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর "পলির" সাধারণ নাম দোআঁশ। ইহা খুব উর্বর এবং ইহাতে সর্বপ্রকার শস্য জন্মিয়া থাকে। নদীর তীরে অথবা মরা নদীর খাতে থাকে 'বেলে" মাটি। উপরে পলি না পড়া পর্যন্ত ইহার চাষ লাভজনক হয় না। পলি পড়ার পর "বেলে" মাটিতে প্রধানত তরিতরকারি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

মালদহ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে সঞ্চিত গঙ্গার পলি অতিশয় উর্বর। উর্বরতায় দ্বিতীয় স্থান জেলার উত্তরাংশের। উভয় অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই দুই ফসল জন্মে। উর্বরতায় সর্বাপেক্ষা হীন বারিন্দের উচ্চভূমি। বামনগোলা ও হবিবপুরের "ডুবা" ও "টালের" মাটির উৎপাদিকা শক্তি কম। গুণ ও উপাদানের তারতম্য অনুসারে মাটির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের উত্তর পূর্বাংশের মৃত্তিকা ফিকে ছাই-রঙা বেলে দোআঁশ। দক্ষিণ দিকে উহা ক্রমশ শক্ত আঠাল মাটিতে পরিণত হইয়াছে। দোআঁশ মাটির নাম পলি, ইহা আর্দ্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম দোফসলা ভূমি। দক্ষিণের মাটির নাম "খিয়র", সাধারণত এক-ফসলা জমি। বড় নদীর তীরে খিয়র অঞ্চলে কোন কোন স্থানে হালকা মৃত্তিকার খণ্ড দেখা যায়। জেলার দক্ষিণপ্রান্তে মালদহের বারিন্দ সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার উচ্চ অংশ বন্ধ্যা চাষের চেষ্টাও করা হয় না। বারিন্দের নিম্নভাগের মাটি শক্ত ও লাল। ইহাতে উৎকৃষ্ট আমন ধান ব্যতীত অন্য কোন শস্য জন্মে না।

জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর পলিতে আবৃত। বেশির ভাগ পলিই বেলে দোআঁশ মাটি, কিন্তু তিস্তা ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে শক্ত কালো মাটি। এই মৃত্তিকা ইট ও মাটির দ্রব্যাদি নির্মাণের পক্ষে উত্তম। এখানে উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে। ডুয়ার্স এর নদীর পরিত্যক্ত পুরানো খাতগুলি মানুষের কোন কাজেই আসে না।

দার্জিলিং তরাই এর মৃত্তিকা সাধারণত পলি-গঠিত হালকা বেলে দোআঁশ। চায়ের অযোগ্য বেলে ও কাঁকরে স্থানও কম নহে। পাহাড়ের মৃত্তিকা সাদা লাল ও কালো এই তিন শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে কালো মৃত্তিকা সর্বোৎকৃষ্ট, সাদা নিকৃষ্ট এবং লালের স্থান উভয়ের মধ্যে। প্রচুর সার ব্যবহারের দ্বারা লাল মাটির শস্যোৎপাদিকা শক্তি কালো মাটির তুল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কালো মাটি দেখিতে পাওয়া যায় বড় শিলাস্তুপের ফাঁকে ফাঁকে। ইহা ভুট্টা, মারুয়া প্রভৃতি শুষ্কাঞ্চলের শস্যের উপযোগী।

কোচবিহারের সাধারণ পলি গঠিত কিন্তু উহা প্রচুর বালি মিশ্রিত। পলির অধিকাংশই হালকা দোআঁশ মাটি আর্দ্রতা রক্ষা করিতে এবং সহজেই উহা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ভূমিতে কখনও জল জমিয়া যায় না। শুষ্ক অবস্থায়ও মৃত্তিকা শক্ত হয় না সামান্য চাপেই উহা ভাঙিয়া যায় এবং জলে গলে। চাষ করা মোটেই শক্ত নহে। উপরিভাগের দোআঁশ মাটির স্তর সাধারণত দুই ফুটের অধিক পুরু নহে। তাহার নীচে এক কি দুই ফুট গভীর সূক্ষ্ম বালি এবং তাহার নীচে মোটা বালির স্তর। মেকলিগঞ্জ অপেক্ষা মাথাভাঙ্গা পরগনায় বালি কম। কোচবিহার পরগনার মাটিতে মাথাভাঙ্গা অপেক্ষা বালির ভাগ বেশি। তুফানগঞ্জ অনেকটা কোচবিহারের অনুরূপ হইলেও উহাতে বালির অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প। দিনহাটায় বালি অপেক্ষা মাটি অধিক, কোচবিহার জেলার ডাঙা বা উচ্চ ভূমিতে নিম্নভূমি অপেক্ষা বালির ভাগ বেশি সুতরাং উর্বরা শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। উপযুক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার করিলে তামাক, আখ, সুপারি ও বাঁশের ফসল ভাল হয়। বিলের পার্শ্ববর্তী ভূমি উর্বর হইলেও তাহার অতি অল্পই চাষ করা

হয়। সেখানে সামান্য পরিমাণে বোরো ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উচ্চ ও নিম্নভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অধিক উর্বর এবং উহাতে ধান ও পাট জন্মে। এই উচ্চ শ্রেণীর দোআঁশ মাটিতে দুই ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

বালুময় চর ব্যতীত কোচবিহারের সকল জমিই উর্বর; উর্বরতা হ্রাসের লক্ষণও দেখা যায় না।

জলবায়ু

পশ্চিমবঙ্গে আসানসোল হইতে দক্ষিণের সবটা উষ্ণমণ্ডলে এবং অবশিষ্টাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য গ্রীষ্মের তীব্রতা কম। জলীয় বাষ্পে বাতাস থাকে ভরপুর। শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে কিন্তু শীত দীর্ঘস্থায়ী নহে। এক কথায় বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এইরূপ জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। ইহাতে মানুষকে দুর্বল করে এবং তাহার কর্মস্পৃহা হ্রাস করিয়া দেয়।

সূক্ষ্ম বিভাগ বাদ দিলে এখানে বার মাসকে তিন ঋতুতে ভাগ করা যায়। ফাল্গুনের শেষের দিক হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্ম, আষাঢ়ের প্রথম হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ষা; আশ্বিনের শেষাংশ হইতে ফাল্গুনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শীতকাল। বর্ষাকালে সমভূমিতে ৪০ ইঞ্চি হইতে ৫০ ইঞ্চি পর্যন্ত বারিপাত হয়। সাধারণত ডিসেম্বরই সর্বাধিক বৃষ্টিবিরল মাস। শীতের সময় জলবায়ু বেশ মনোরম। হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গে শীত দীর্ঘস্থায়ী। দার্জিলিঙের শীত তীব্র, তাপ প্রতি বৎসরই হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়, কোন কোন বৎসর তুষারপাতও ঘটে। সমভূমিতে মালদহ জেলায় শীতকালে তাপ ৪০ ডিগ্রীর নীচে নামিতে দেখা গিয়াছে। তারপরই আসানসোলের স্থান। গ্রীষ্মের তাপ চরমে উঠে জ্যৈষ্ঠে। ষাট বৎসরে একবার আসানসোলের তাপ উঠিয়াছিল ১১৭ ডিগ্রী। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বহরমপুরে ১১৫ ডিগ্রী, কলিকাতায় ১১১ ডিগ্রী ও মালদহে ১১০ ডিগ্রী। দার্জিলিঙের তাপ ৮০ ডিগ্রীর ঊর্ধ্বে কখনও উঠিতে দেখা যায় নাই। গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙের শীতলতা বেশ রমণীয়। বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্ক সুতরাং স্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়ার রাজত্বের পূর্বে বীরভূম ও বাঁকুড়া স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল। এখন অনেক সম্পন্ন বাঙালী ঝাড়গ্রামে তাঁহাদের স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণ করেন। মালদহের জলবায়ুর সহিত বিহারের জলবায়ুর সাদৃশ্য অধিক; গ্রীষ্মকালে "লু" বহিতে থাকে।

জ্যৈষ্ঠের উত্তাপ আষাঢ়ের বৃষ্টিপাতের পর ১২-১৩ ডিগ্রী নামিয়া যায়। তাপ হ্রাস পাইতে পাইতে আসিয়া পড়ে শীতকাল। ফাল্গুনের শেষের দিকে তাপ বাড়িতে থাকে। বৃষ্টির দিনের সংখ্যাও বাড়ে। বৃষ্টির দিনের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি আষাঢ় ও শ্রাবণে। বক্সায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১০ ইঞ্চি। ইহাই এই রাজ্যের সর্বোচ্চ বারিপাতের পরিমাণ। সর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি হয় বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরে। সেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৩৮ ইঞ্চি মাত্র। কলিকাতায় বৎসরে গড়ে বৃষ্টি হয় ৬২ ইঞ্চি। সাগরদ্বীপে ইহা অপেক্ষা ৭ ইঞ্চি বেশি বর্ষণ হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সাগরদ্বীপে বার্ষিক বারিপাত ৬৮·৮ ইঞ্চি কিন্তু উত্তরপ্রান্তে ১,৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বক্সায় বৃষ্টি হয় ২১০ ইঞ্চি। মৌসুমী বায়ুর গতি দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বে; বায়ুতাড়িত মেঘ আসামের খাসিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হইবার পর বাঁকিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে আরম্ভ করে। প্রথম ৬,০০০ ফুট উচ্চ সিঞ্চুলা পর্বতে বাধা পাইবার পর তাহার নীচে বক্সায় প্রবল বর্ষণ হইয়া যায়। পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে; কার্সিয়াঙে ১৫৯ ইঞ্চি, দার্জিলিঙে প্রায় ১২৬ ইঞ্চি। সমভূমির কোচবিহারে বারিপাত ১৪৫ ইঞ্চি এবং জলপাইগুড়িতে ১২৯ ইঞ্চি।

চৈত্র মাসের শেষ ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে অপরাহ্নে প্রায়ই তুফান হয়। ইহার নাম কালবৈশাখী। ধূলি-ঝড়, বজ্রপাত ও বৃষ্টি কালবৈশাখীর সহচর। কালবৈশাখীর আশঙ্কায় বৈশাখের প্রথম সাত দিন জেলেদের বড় বড় নদীতে মাছ ধরা বন্ধ রাখা নিয়ম। মালের নৌকা চলাচল বন্ধ থাকে প্রায় সারা বৈশাখ। আশ্বিনের শেষের দিকে অথবা কার্তিকে মৌসুমী বায়ুর বিদায়ের সময়ে প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। সময় সময় উহা বাঙলায় প্রবেশ করিয়া ধনসম্পত্তি ও জনপ্রাণীর ধ্বংস সাধন করে। বাঙলার ইতিহাসে এইরূপ বহু প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথম কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টির সহিত বাতাস বহিতে থাকে; ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়িয়া উহা ঝড়ে পরিণত হয়। "আশ্বিনের ঝড়" নামে ইহা পরিচিত। ঝড়ের সঙ্গে বা পরে হয় প্রবল বর্ষণ, কিন্তু বজ্রপাত হয় না।

ইহাই পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক ঋতুচক্র। গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় সংকীর্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণিবায়ু এবং শীতকালের কুয়াসা অনিয়মিত ঘটে।

বন

বনজ সম্পদ প্রদান ছাড়াও বন পরোক্ষভাবে আমাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। অরণ্যের বৃক্ষরাজি বায়ুর জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া আংশিকভাবে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের বৃষ্টিপাতের ধারা বনের সংস্থানের উপর খানিকটা নির্ভরশীল। গাছপালা কঠিন শিলার ভিতর শিকড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রস্তর ভগ্ন ও মৃত্তিকায় পরিণত করিতে সাহায্য করে। বৃক্ষাদির ঝরাপাতা ও অন্যান্য গলিত অংশে নূতন মাটির সৃষ্টি হয়। ঘাস, গুল্ম ও বৃক্ষের শিকড়ের বন্ধন মাটির ক্ষয় রোধ করিয়া থাকে। লোকবৃদ্ধি ও সভ্যতা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বনাঞ্চল ক্রমশ সংকুচিত হইতে বাধ্য। কিন্তু অরণ্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বৃক্ষচ্ছেদের কুফলের পরিচয় পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সে, কোচবিহারের দিনহাটা ও সদর মহকুমায়, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে, মালদহের ভালুকা, রাতুয়া ও মানিকচকে, বীরভূমের নলহাটী, রাজনগর, মহম্মদবাজার ও দুবরাজপুর থানায়, আসানসোল মহকুমায়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমার্ধে, মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদীর পশ্চিমে এবং সুন্দরবনে নিবিড় অরণ্য ছিল। ইহা ছাড়াও নদী সংগমের নিকটস্থ বিল ও জলাভূমি ঘিরিয়া ঘন বন ছিল। জলপাইগুড়িতে তিস্তা ও জলঢাকার মধ্যে, কোচবিহারে তিস্তা ও তোরসার মধ্যে, মালদহে মহানন্দা ও কালিন্দী এবং টাঙ্গন ও পুনর্ভবার মধ্যে, মুর্শিদাবাদের হিজল বিল ও কালান্তরে, হুগলি জেলার

দামোদর ও হুগলি নদীর মধ্যবর্তী বিলের ধারে, হাওড়া জেলার দামোদর ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী জলাভূমি বেষ্টন করিয়া মেদিনীপুরে কালিঘাই ও রূপনারায়ণের মধ্যস্থিত বিল ঘিরিয়া এবং কলিকাতার পূর্ব দক্ষিণের জলা অঞ্চলে বেশ ঘন বন ছিল। কিন্তু গত একশত বৎসরের ইতিহাস সিকিম, ভুটান ও দার্জিলিং পাহাড়ের বন ধ্বংসেরই ধারাবাহিক কাহিনী। চাষের জমি দ্রুত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের বৃক্ষরাজির উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। প্রথম বিশ্ব সংগ্রাম আরম্ভের পর বীরভূম মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বনের ধ্বংসকার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে। গত এক শতাব্দীতে সুন্দরবনের সহস্রাধিক বর্গমাইল বনাঞ্চল অরণ্যমুক্ত করিয়া আবাদযোগ্য করা হইয়াছে। সংরক্ষিত বন ব্যতীত সুন্দরবনে আর বন নাই বলা যায়। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পর সরকার-পরিচালিত অধিক শস্য ফলাও" অভিযানের ফলে বহু বন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বন ধ্বংসের কুফল

দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে, তরাই ও ডুয়ার্সে বৃক্ষ বিনাশ করিয়া চা বাগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্যার সংখ্যা ও বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫০ সনের তিস্তার বন্যা প্রবলতম বন্যার অন্যতম। উৎপত্তিস্থলের নিকট ছোটনাগপুর পাহাড়ের অরণ্য মুক্তি দামোদরের বন্যার প্রবলতা বৃদ্ধির কারণ। বৃক্ষরাজির বিনাশের ফলে দেশের বৃষ্টিপাতের চিরন্তন ধারার পরিবর্তন ঘটে। বৃক্ষহীন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিম্নে নামিয়া যায়। বন কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার ফলে বিলের চিরকালের জল আর থাকে না। মালদহের টাল অঞ্চলে মুর্শিদাবাদের হিজল ও কালান্তর বিলে এবং হুগলি হাওড়া মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগনার বিস্তৃত জলাভূমিতে কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি কিন্তু শস্যক্ষেত্রের এই প্রসারতায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলস্তরের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে অনাবৃষ্টির সময় নিকটস্থ ক্ষেত্রে জলসেচের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং গোচারণের ভূমি লোপ পাইয়াছে তাহা লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

নির্বিচারে বৃক্ষাদি ছেদনের ফল এই রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশের ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ মৃত্তিকা অগভীর, বৃক্ষের শিকড় প্রবেশের ফলে ভগ্ন প্রস্তরকণা ও গলিত পত্রে গঠিত। বৃক্ষ গুল্ম ও ঘাস বিনষ্ট করাতে বর্ষার প্রবল জলস্রোত বন্ধনহীন মৃত্তিকা কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধুইয়া নিয়া নীচের কঠিন শিলা অনাবৃত করিয়া দেয়। এই মাটির পরিবর্তে নূতন মৃত্তিকা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে না। পরিণামে এই নিরাবরণ অখণ্ড শিলাময় স্থান চাষ আবাদের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ১৯১৭ সনে গড়বেতা চন্দ্রকোণা শালবনী ও কেশপুর থানায় পূর্বাপেক্ষা ১৩০ বর্গ মাইল চাষের ভূমি হ্রাস পাইয়াছিল। বন কাটিবার ফল যে বাঁকুড়ায় ভাল হয় নাই তাহা ১৯২৭ সনের জরিপের বিবরণীতে দেখা যায়। চাষের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইলেও ফসল বৃদ্ধি বা জন সাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় নাই। চল্লিশ বৎসরে জেলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া শতকরা দুই জন হ্রাস পাইয়াছিল। বনের পশুপক্ষীও প্রায় লোপ পাইয়াছে। বর্ধমান বীরভূম বাকুড়া মেদিনীপুর নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের বেসরকারী বনের অধিকাংশ বন্যজন্তু ও পাখি শিকার ও বিতরণের ফলে এই সকল জেলায় পশুপক্ষী খুব কমিয়া গিয়াছে।

ভূমিক্ষয়ের ও মৃত্তিকায় গলিত উদ্ভিজ্জের সম্পূর্ণ অভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন মিলে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বর্ধমানের দুর্গাপুর ও গোপভূম অঞ্চলে। এইসকল স্থানে বেসরকারী বন আইন কিছুকাল যাবৎ বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রয়োগ করা হইতেছে ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। তাহার ফলে বন কাটায় বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অল্প কাল পূর্বেও যে ক্ষত দেখা যাইত তাহা ক্রমশ নিরাময় হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

১৯৫১ সনের ৩১এ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রকারের বন ছিল ৫১৭৩ বর্গমাইল বা রাজ্যের আয়তনের ১/৬ অংশ।

গাছপালা

পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায় দার্জিলিং ও সিকিমে। ৫০০০ হইতে ১২,০০০ ফুট উচ্চস্থানে পাইন ফার প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের সরল বর্গীয় বৃক্ষের জন্মভূমি। নিম্নে তরাই অঞ্চলে আকলুস রবার বাঁশ ফার্ন প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য। সমভূমিতে জন্মে শাল সেগুন বট অশ্বত্থ দেবদারু তেঁতুল বেল আম জাম প্রভৃতি মৌসুমী অঞ্চলের বৃক্ষ। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে বিস্তর মহুয়া গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থানে তাল নারিকেল সুপারি ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর।

সুন্দরবনের অরণ্য জোয়ারের অরণ্যের মধ্যে গণ্য। এই অরণ্যে প্রচুর কাদা। জোয়ারের সময় অরণ্যের মধ্যে জল দাঁড়ায় ভাটার সময় সরিয়া যায়। সাধারণ গাছ এই অবস্থায় বাঁচিতে পারে না। কেওড়া নামক এক রকম বড় গাছ নদীর ধারে জন্মে। সুন্দরবনের অন্য গাছ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রধান গাছ সুন্দরী পশ্চিমে গরান সঙ্গে হিন্তাল নামক খেজুরজাতীয় এক রকম গাছ গেঁওয়া ইত্যাদি। অরণ্য বিশাল হইলেও গাছের রকমারি খুব কম।

বনজ সম্পদ

কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় এবং গৃহনির্মাণ ও আসবাবের উপযোগী নানাবিধ কাঠ এ রাজ্যের বনে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে বাবুল হলদু শিরিশ কদম চাপলাস, শিমুল, দেবদারু, শিশু গর্জন জারুল গামারি সুন্দরী, কেওড়া শাল সেগুন প্রভৃতি প্রধান। নারিকেল ও সুপারিগাছ গৃহনির্মাণে এবং গ্রাম্য নদী ও খালের উপর সেতুরূপে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে জ্বালানি কাঠ ও গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ উভয়ই পাওয়া যায়।

ঔষধের গাছগাছড়ায় এ রাজ্যের কয়েকটি জেলা বেশ সমৃদ্ধ। জলপাইগুড়ির বনে চিরতা মুর্শিদাবাদে শতমূলী ও অনন্তমূল পাওয়া যায়। গুলঞ্চ ও নাটা এখানকার বনৌষধির মধ্যে অন্যতম। দার্জিলিঙের বনের সর্জিত ও তরাইর দারু হলদি হইতে লাল রঙ উৎপন্ন হয়। গরান গাছের বাকল হইতেও রঙ পাওয়া যায়। চামড়া পাকা করিবার জন্যও গরানের বাকল ব্যবহৃত হয়। মেদিনীপুরের জঙ্গলের একপ্রকার গাছের বাকল হইতেও রঙ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

দার্জিলিঙের পুনফা ও শিশু নামক ঘাস (Thistle) হইতে সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করা যায়। আদ্রার আঁশ দ্বারা দড়ি তৈয়ারি করা হয়। মুর্শিদাবাদের শালবনে ও মেদিনীপুরে তসর উৎপন্ন হয়।

মালদহের বড়ই গাছে পূর্বে গালা উৎপন্ন হইত। এখন উহার চাষ হ্রাস পাইয়াছে। নদিয়ার বাবলা গাছের আঠা সংগ্রহ করা হয়।

মধু ও মোম বিস্তর সংগৃহীত হয় সুন্দরবন ও মুর্শিদাবাদে। সুন্দরবনের খড় ও গোলপাতা ঘরের ছাউনির জন্য ব্যবহৃত হয়। জলাভূমির হোগলায় মণ্ডপের ছাউনি ঘরের বেড়া ও মাদুরের কাজ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত বনানী হইতে জ্বালানি কাঠ পাখির পালক প্রভৃতিও সংগৃহীত হয়।

বন্য জীবজন্তু

বনভূমি দ্রুত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার ফলে এই রাজ্যের বন্য জীবজন্তু বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলই এখন পশুপক্ষীর প্রধান আবাসস্থল। বাঘ চিতাবাঘ হাতী বাইসন গণ্ডার প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ার এখানে দেখা যায়। শেষোক্ত তিনটির বাস তিস্তার পূর্বে। হরিণ আছে পাঁচজাতীয়। পাদশৈলের নিকটস্থ বনে সময় সময় ভল্লুক আসিয়া থাকে। বন্য মহিষ কদাচিৎ দেখা যায়। বন্য শূকরে বন ভর্তি। ক্ষুদ্র জন্তুর মধ্যে বনবিড়াল শজারু খরগোশ উদবিড়াল শেয়াল ও পিঁপড়েখেকো প্রধান। শৃগাল ঘুরিয়া বেড়ায় নিকটের বনে ও গ্রামের রাস্তায়। বন্য কুকুর অতি বিরল। বানর ও হনুমান যেমন দেখা যায় বনে তেমনই দেখা যায় লোকালয়ে। সুন্দরবনে পশুর শ্রেণী এখন অত্যন্ত সীমায়িত। বাঘ চিতল হরিণ বন্য শূকর কুমির ও মগর ঘড়িয়াল ও নানা রকমের গোসাপই সুন্দরবনের কেবলমাত্র জন্তু। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে খরগোশ ও চিতাবাঘ ব্যতীত অপর কোন বন্যপশু দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে কালেভদ্রে একটি হায়না অথবা একটি নেকড়ে চোখে পড়ে। বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোন কোন সময় ভল্লুক দেখা যায়। কোন সময় হয়তো ময়ূরভঞ্জ হইতে একটি দলছাড়া হাতী আসিয়া ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হয়। বন্য শূকর বানর হনুমান খরগোশ ও শৃগাল প্রভৃতি শস্যের শত্রু রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

পাখি

কাক চিল শঙ্খচিল শকুন বাজ পেঁচা শালিক কোকিল শালিখ শ্যামা দোয়েল নীলকণ্ঠ পায়রা ঘুঘু চড়ুই টিয়া ময়না ফিঙা চাতক মাছরাঙা বৌ কথা কও প্রভৃতি বহু প্রকারের পাখি বাঙলা দেশে দেখা যায়। ডাহুক জলপিপি বিল হাঁস, কোড়া পানকৌড়ি প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পাখি বিলে থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি যাযাবর পাখি বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলায় আসে এবং বর্ষাশেষে অন্যত্র চলিয়া যায়। দোয়েল ও মাছরাঙা বাঙলার বাহিরে দেখা যায় না।

সরীসৃপ

কেউটিয়া ও গোক্ষুর প্রভৃতি বিষধর সর্প ময়াল চন্দ্রবোড়া দাঁড়াস ঢোঁড়া ও অন্যান্যজাতীয় সাপ, গোসাপ ও কুম্ভীর প্রভৃতি বাঙলার সরীসৃপ।

বন্য পশুপক্ষীর দিক হইতে হিমালয়াঞ্চলিক বিভাগ এই রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। সরকার ইহাদের জন্য এখানে তিনটি নিরাপদ পশুসদন রক্ষা করিতেছেন। জলপাইগুড়ি বন বিভাগে গরুমারা ও চাপড়ামারি এবং কোচবিহার বিভাগে জলদাপাড়া এই সংরক্ষিত অঞ্চল। গরুমারা ও জলদাপাড়ার নীলপাড়া অরণ্য গণ্ডারের জন্য এবং চাপড়ামারি পাখির জন্য প্রসিদ্ধ।

মৎস্য

বাসস্থান অনুসারে মৎস্যের প্রধান শ্রেণী তিনটিঃ মিঠাজলের মাছ নদীর মোহনার মাছ ও সামুদ্রিক মাছ। নদী খাল, বিল ও পুকুরের মাছের তালিকা বেশ দীর্ঘ। মাগুর, সিঙি, কই, শোল গজার চ্যাঙ খলিশা পুঁটি, নাদুস ও ফলি বিল ও পুকুরের পাঁকে বাস করে। আইর বোয়াল ও চিতল পুকুর, খাল ও নদীতে দেখা যায়। নদীতে ইহারা আকারে বড় হয়। বাচা কাজলি পাঙ্গাস তপসে ভোলা বিঠা সিলন প্রভৃতি নদীরই মাছ। কালিবাউস রুই কাতলা মৃগেল পারশে পুকুর এবং নদী উভয় স্থানেই বৃদ্ধি পায়। মহাশোল কোন কোন বড় নদীর পার্বত্য অংশে দেখা যায়। ইলিশ ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনার নিম্ন অঞ্চলে ধৃত হয়। খরস্রোতে উজান বহিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ চলিতে থাকে। ভেটকি বড় নদীর মোহনায় থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মাছের নামের পূর্ণ তালিকা এখনও প্রস্তুত করা হয় নাই। মাছ ব্যতীত জলজ খাদ্যের মধ্যে রহিয়াছে চিংড়ি কাঁকড়া কচ্ছপ ও কেঁচো। পশ্চিমবঙ্গের মাছ এ রাজ্যের প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। অবিভক্ত বঙ্গের মৎস্যের আগার ছিল পূর্ববঙ্গের যমুনা পদ্মা মেঘনা ও অন্যান্য নদী। উহাতে বঞ্চিত হওয়াতে এ রাজ্যে নিত্য আহার্য প্রোটিনের অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য জলচর প্রাণীর মধ্যে কুমির কামট ও শুশুক কোন কোন নদীর মোহনায় দেখা যায়। সময় সময় হুগলিতে হাঙর ধরা পড়ে।

হিন্দুর বিভিন্ন জাতি ও খন্ডজাতি

ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ অস্বীকার করা হইয়াছে তথাপি অনুন্নত সমাজের লোকদিগকে দেশের অপরদের সম পর্যায়ে উন্নীত করা সাপেক্ষে কয়েক বৎসরের জন্য তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রয়োজনের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গে ৫৮টি হিন্দু জাতি ৭টি খন্ডজাতি ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের পৃথক বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। অপরাপর জাতির সকলে হিন্দু ইহা ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় তাহাদের নাই। এই রাজ্যে তফসিলী হিন্দুদিগের মোট সংখ্যা প্রায় ৪৭ লক্ষ এবং তফসিলী খন্ডজাতির সংখ্যা প্রায় পৌনে বার লক্ষ। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাড়ে একত্রিশ হাজার। মুসলমানের সংখ্যা সওয়া উনপঞ্চাশ লক্ষ। বাগদী, রাজবংশী পোদ বাউরী নমঃশূদ্র ও মুচি এই ছয়টি তফসিলী জাতির মোট সংখ্যাই ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার। খন্ডজাতির দুই তৃতীয়াংশের বেশি সাঁওতাল। খন্ডজাতি ও তফসিলী হিন্দুর মিলিত সংখ্যা ৫৮,৬১,৫৪২; তন্মধ্যে সাঁওতাল ও উল্লিখিত ছয়টি তফসিলী জাতির মোট দাঁড়ায় সওয়া চল্লিশ লক্ষ। ওরাওঁদের সংখ্যা দুই লক্ষের উপর। মুসলমানদের সকলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী নহে। ১৯৫১ সনের ১লা মার্চ এখানে পাকিস্তানী ছিল প্রায় পৌনে তিন লক্ষ। তাহাদের অধিকাংশ নিশ্চয়ই মুসলমান। ইহা ছাড়া অবাঙালী ভারতীয় ও ভিন্নদেশীয়

মুসলমানও রহিয়াছে। ইহা হইতে এই রাজ্যের জনসমষ্টির গঠনের আভাস পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলায় লোকসংখ্যার ১/৩ অংশ তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতি। বাগদী সাঁওতাল বাউরী, সদ্গোপ, গোপ ও আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় দ্বারা জনগণের সর্ববৃহৎ নিম্নস্তর গঠিত। আসানসোলের খনি ও কারখানার আকর্ষণে ভারতের সকল রাজ্য, বিশেষত বিহার ও মধ্যপ্রদেশ, হইতে বর্ধমানে লোক আসিয়াছে। সুন্নী মুসলমানদের বড় বড় বসতি আছে অজয়ের তীরে চুরুলিয়া ও কাংসায়, আসানসোলের মিলে ও কারখানায়, মন্তেশ্বর থানার মামুদপুরে, রায়না মঙ্গলকোট কালনা এবং কাটোয়াতে। আসানসোলে আছে কোরা যেখানে ধান জন্মে সেখানেই সাঁওতালদের বড় বড় বস্তি।

তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতির লোকসংখ্যা বীরভূমের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও বেশি। তন্মধ্যে বাগদী ও সাঁওতালের সংখ্যাই সর্বাধিক। জনসংখ্যার শতকরা ২৭ জন মুসলমান। বীরভূমে মুসলমানের অনেক বসতি আছে। কোন কোন বস্তি বেশ বড় ও পুরাতন। রাজনগরের মুসলমান বস্তি এইরূপ। মুসলমানদের খুব বড় অংশই হইতেছে শেখ পাঠান সৈয়দ এবং জোলাও দেখা যায়। হিন্দু ও খণ্ডজাতির মধ্যে বাগদী সদগোপ সাঁওতাল মুচি ডোম ব্রাহ্মণ মাল বাউরী ও হাড়ীর সংখ্যাই অধিক। সংখ্যাল্পদের মধ্যে আছে ভোলা ও যাদু পটুয়া।

বাকুড়ার জনসংখ্যার শতকরা ৪২ জন তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয় লোক। প্রতি ২৫ জন লোকের মধ্যে মুসলমান মাত্র একজন। উত্তরাঞ্চলের কয়লার খনিতে বিহার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক কাজ করিতে আসে। ফসল কাটার মরসুমে মানভূমে ও সিংহভূমের কৃষাণেরা এই জেলায় বাসা বাঁধে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের অনেকের কিন্তু কাজের সন্ধানে বাড়ি ছাড়িয়া চা বাগানে কলিকাতায় বা অন্যত্র যাইতে হয়। মুসলমান বেশি দেখা যায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিশেষ করিয়া কোতুলপুর ও ইন্দাস থানায়। ইহারা সুন্নী শেখদের সংখ্যাই অধিক। খণ্ডজাতির মধ্যে সাঁওতালই সওয়া লক্ষের উপর। অপরাপর খণ্ডজাতির সংখ্যা মাত্র ৫০০। তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে বাউরী সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয় স্থান বাগদীর। ব্রাহ্মণ, তেলী ও গোপের সংখ্যাও বেশ বড়। বাকুড়ার অধিকাংশ স্থানেই বাউরী সাঁওতাল ও বাগদীর বাস।

তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয় লোকের সংখ্যা মেদিনীপুরে ১/৫ অংশেরও বেশি। প্রতি ১৫ জন লোকে একজন মুসলমান। মেদিনীপুর শহর ও তাহার চারধারে খড়্গপুরে এবং তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার কোন কোন অংশেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস। জেলার অভ্যন্তরস্থ খড়্গপুর বহু জাতির মিলনক্ষেত্র। রেলের কারখানায় কাজ করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের লোক এখানে আসিয়াছে। সমস্ত কাঁথি মহকুমা, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর দাঁতন কেশীয়াড়ী ও নারায়ণগড় থানায় বিকৃত উড়িয়াভাষী বহু লোকের বাস। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উড়িয়া ভাষা বাংলা শব্দবহুল কিন্তু পশ্চিমাংশের উড়িয়াতে সাঁওতালী শব্দের প্রচুর মিশ্রণ রহিয়াছে। মেদিনীপুরে বহু হিন্দুজাতি ও খণ্ডজাতির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান মাহিষ্য কৈবর্ত সাঁওতাল বাগদী, সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বৈরাগী বা বৈষ্ণব তাঁতী, কুর্মি তেলী, রাজু, গোপ করণ, ভূমিজ, কায়স্থ, নাপিত, কদমা, ধোবা, নমঃশূদ্র, কামার, লোহার, পোদ শুঁড়ি, কুমার, কান্ঠা, হাড়ী ও লোধা। গুজরাটীর এক উপভাষা শিয়ালগির নামে মোহনপুরের এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। গেঁওখালিতে গোয়ার খ্রীস্টানদের এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কৌতুহলের উদ্রেক করে। শুঁড়ি ও তাঁতিয়াগণ বৃত্তি অনুসারে দুইটি মুসলমান জাতি (Functional Muslim castes)। মাহিষ্যগণ সুনিপুণ কৃষক নূতন আবাদে অগ্রণী স্বাজাত্যবোধ ও দৃঢ় শৃঙ্খলা দ্বারা সুসংবদ্ধ। মেদিনীপুরে জাতিহিসাবে তাহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

নদীতীরে হুগলি জেলার ত্রিশ মাইল দীর্ঘ সংকীর্ণ পৌরাঞ্চলে হুগলির চটকল ও অন্যান্য কারখানায় বহু অবাঙালী বহিরাগত কর্মে নিযুক্ত আছে। জেলার অন্যত্র বহিরাগতের সংখ্যা অতি অল্প। লোকসংখ্যার ১/৫ অংশের অধিক তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতি। মুসলমান শতকরা ১৩ ২৭। হুগলি পাণ্ডুয়া বলাগড় ও ধনিয়াখালি থানায় বেশি মুসলমানের বাস চণ্ডীতলা ও গোঘাট থানাতেও কিছু দেখা যায়। মুসলমানদের অধিকাংশ শেখ। আজলফ বেদিয়া ধাওয়া বা মল্লিক কিছু কিছু আছে। মমিন বা জোলাদেরই সংখ্যাধিক্য। হিন্দুর মধ্যে বেশি হইতেছে বাগদী বৈষ্ণব বাউরী ব্রাহ্মণ ডোম গোপ মাহিষ্য বৈবং কামার কায়স্থ কাওরা মুচি নাপিত সদগোপ তাঁতী ও তেলী। খণ্ডজাতীয়ের মধ্যে সংখ্যায় অধিক সাঁওতাল ওরাওঁ ভূমিজ ও খয়রা। সাঁওতালদের ধনিয়াখালি পাণ্ডুয়া ও হরিপাল থানায় বলাগড়ে ভূমিজ, পাণ্ডুয়াতে খয়রা এবং শ্রীরামপুর চণ্ডীতলা ও সিঙ্গুরে ওরাওঁদের প্রধান আড্ডা।

হাওড়া জেলার বালী লিলুয়া হাওড়া সিটি রেলওয়ে উপনিবেশ ও বাউড়িয়াতে বহু বহিরাগত আছে। ভারতের নানা রাজ্য হইতে ইহাদের আগমন এবং পৌর শিল্পাঞ্চলে ইহাদের অধিকাংশের বাস। জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন মুসলমান। অধিক সংখ্যার মুসলমান দেখা যায় হাওড়া সিটি ডোমজুড় উলুবেড়িয়া আমতা, শ্যামপুর ও জগদ্বল্লভপুর থানার। পল্লীগ্রামের মুসলমানদের মধ্য হইতে বহুলোক কলিকাতায় কারিগরের কাজ করিতে যায়। অনেকেই সুন্নী বেশির ভাগ শেখ। মল্লিক, পাঠান অথবা সৈয়দের সংখ্যা খুব কম। খণ্ডজাতীয় লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা শুধু ওরাওঁ এবং সাঁওতাল ডোমজুড় থানাতেই বেশি দেখা যায়। হিন্দুর মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ কায়স্থ গোপ সদগোপ কৈবর্ত মাহিষ্য বাগদী তিয়র পোদ ও কাওরা।

বহিরাগতের সংখ্যা চব্বিশপরগনা ও কলিকাতায় সর্বাধিক। ইহারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আসিয়াছে। হুগলি নদীর পূর্ব তীরে, উত্তরে কাচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত তিন মাইল প্রশস্ত স্থান ব্যাপিয়া বিপুলসংখ্যক বহিরাগতের বাস। ইহা ভারতের সর্বাধিক বিচিত্র জনসমাবেশপূর্ণ অঞ্চলের অন্যতম। চব্বিশপরগনার অধিবাসীর শতকরা ২৫ জন মুসলমান। বারাসত ও বসিরহাট মহকুমাতে ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহারা সুন্নী শেখের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তারপর আজলফ ও জোলাদের সংখ্যা। খণ্ডজাতীয়েরা ছোটনাগপুরের লোক। সুন্দরবনের জমি আবাদের জন্য ইহাদিগকে নিয়োগ করা হয়। মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা সাফল্যের সহিত অতি দ্রুত তাহাদের স্থান দখল

করিয়া লইতেছে। খণ্ডজাতির মধ্যে আছে ওরাওঁ ও মুণ্ডা, সাঁওতাল অতি অল্প। হিন্দু জাতির মধ্যে পোদ, মাহিষ্য কৈবর্ত, বাগদী, ব্রাহ্মণ, গোপ, কাওরা, তিয়র, কায়স্থ, মুচি, নাপিত, বৈষ্ণব ও নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল প্রধান। এই জেলায় তফসিলী ও খণ্ডজাতীয় লোক শতকরা ২৪ জন। নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুর শহরে এবং রানাঘাটের রেলওয়ের বস্তিতে অল্পসংখ্যক বাহিরের লোক আছে। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২২। তাহারা রানাঘাট মহকুমার পূর্বাংশে কোন কোন স্থানে এবং করিমপুর ও তেহট্ট থানায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বেশির ভাগই শেখ, জোলা ও আজলফদের সংখ্যা অতি অল্প। খণ্ডজাতীয় লোক কম কিন্তু বৈষ্ণব আছে বহু। তফসিলী ও খণ্ডজাতীয় লোক জনসংখ্যার ১/৫ অংশেরও অধিক। প্রধান হিন্দু জাতি হইতেছে মাহিষ্য, কৈবর্ত, আহির, গোপ ব্রাহ্মণ, বাগদী, মুচি নমঃশূদ্র, কায়স্থ ও মালো। বুনোদের ছোট্ট এক সম্প্রদায়ও আছে।

মুর্শিদাবাদে বহিরাগত কম। মুসলমান শতকরা ৫৫। সদর লালবাগ, জঙ্গীপুর মহকুমায় ইহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কান্দী মহকুমার ভরতপুর, বরোঞা ও খাড়গ্রাম থানায় মুসলমানেরা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। লালবাগে ছোট এক সিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমানদের আর সকলেই সুন্নী ও শেখ। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উদ্যমশীল শেরশাবাদিয়া মুসলমানদের বাস।

সাঁওতাল পরগনা হইতে আসিয়া সাঁওতালেরা জঙ্গীপুর, সাগরদীঘি নবগ্রাম ও খাড়গ্রাম থানায় বসতি স্থাপন করিয়াছে। ওরাওঁ কোড়া এবং মুণ্ডাও আছে। হিন্দুদের মধ্যে মাহিষ্য, সদ্‌গোপ চাঁই মণ্ডল ব্রাহ্মণ, গোপ ও পুড়ো প্রধান।

বাহির হইতে কিছু লোক আসিয়া মালদহে বসতি স্থাপন করিয়াছে। হিন্দু আসিয়াছে পূর্ণিয়া হইতে শেরশাবাদিয়া মুসলমান মুর্শিদাবাদ হইতে সাঁওতালেরা সাঁওতাল পরগনা হইতে এবং পলিয়াগণ আসিয়াছে দিনাজপুর ও বগুড়া হইতে। কালিয়াচক মাণিকচক ও রতুয়া থানার পলিমাটির অঞ্চলেই মুসলমানদের অধিকসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প কয়েকটি সৈয়দ মুঘল ও পাঠান পরিবার ব্যতীত অপর সকলই শেখ। কৃষিজীবীদের মধ্যে শেরশাবাদিয়াগণ একটি স্বতন্ত্র উপদল। বৃত্তিমূলক সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে জোলা (তাতী), ধুনিয়া (তুলাধুনকর) নলুয়া (নল বিক্রেতা) নিকারী (মৎস্য বিক্রেতা), কুঁজরা (ফল বিক্রেতা) ও পীর কোদালা (বেলদার)। রতুয়াতে আছে এক অদ্ভুত ফকির সম্প্রদায়। খণ্ডজাতির প্রায় সবই সাঁওতাল। হিন্দুর মধ্যে আছে কয়েকটি বিহারী জাতি। তাহাদের মধ্যে নাগর প্রধান। বিশেষরূপে এই জেলারই জাতি দুইটি, চাষাটি কৃষিজীবী এবং পুড়ো গুটি পোকা উৎপাদক। গণেশ ও গদাই যথাক্রমে তাঁতী ও কুম্ভকার প্রধানত মালদহেই দেখা যায়। ইহারা কৃষিকার্যও করিয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে কোচ পলিয়, রাজবংশী ও দেশীই সংখ্যায় অধিক। বিহারের সহিত সংশ্লিষ্ট চাঁই জাতির লোক জেলার পশ্চিমাঞ্চলের দিয়ারা থানাগুলিতে বহুসংখ্যায় দেখা যায়। মালদহের জনসংখ্যার সাত ভাগের একভাগ তফসিলী ও খণ্ড জাতীয় এবং মুসলমান শতকরা ৩৭ জন।

পশ্চিম দিনাজপুরের জনগণ অনেকটা সমজাতীয়। মুসলমানেরা প্রধানত ধর্মান্তরিত রাজবংশীদের বংশধর। কৃষিজীবী মুসলমানদের অধিকাংশ শেখ হইলেও ইহারা 'নস্য (অর্থাৎ যাহাদের মূল ধর্ম নাশ করা হইয়াছে) নামেই অধিক পরিচিত। অল্পসংখ্যক সৈয়দ (পুরোহিত), পাঠান (পুলিস ও পিয়ন) ও মুঘল (পশমী বস্ত্রব্যবসায়ী) আছে। হেমতাবাদ থানার বালিয়াদীঘি মৌজায় অদ্ভুত এক শ্রেণীর ফকির আছে। সাঁওতাল পরগনা এবং ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আগত সাঁওতাল, ওরাওঁ ও মুণ্ডাগণ খণ্ডজাতির প্রতিনিধি। হিন্দু জাতির মধ্যে প্রধান কায়স্থ, রাজপুত, চাষী কৈবর্ত বা মাহিষ্য, হাড়ী, যুগী, তাঁতী, নাপিত ও বৈষ্ণব। সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হইতেছে রাজবংশী, দেশী বা দেশী রাজবংশী ও পলিয়। কিছু কস্তাই এবং কোচও আছে। শতকরা ৩০ জন মুসলমান ও ২৮ জন তফসিলী ও খণ্ডজাতীয় লোক।

জলপাইগুড়ির চা বাগানের জনসমষ্টি যেন বিহার, মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ হইতে আগত বিচিত্র জনগণের এক সতরঞ্চ (Mosaic)। অধিকাংশ মুসলমানই শেখ। ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল লেপচা, গারো, মেচ, তোতো এবং অজ্ঞাতপরিচয় ভুটানীদের দ্বারা খণ্ডজাতির জনসমষ্টি গঠিত। তিব্বতী, নেপালী ও সিকিমীও আছে। হিন্দুদের মধ্যে আছে রাজবংশীয় কোচ এবং ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ হইতে আগত উচ্চবর্ণের হিন্দু। শতকরা ৪৬ জন তফসিলী ও খণ্ড জাতীয় লোক এবং ১০ জন মুসলমান।

দার্জিলিঙের চা বাগানের জনগণ জলপাইগুড়ির বাগানের লোকের মতই বহিরাগত ও বহু বিচিত্র। পাহাড় অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা অল্প এবং অধিকাংশ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সুন্নী ও শেখ। খণ্ডজাতির মধ্যে সাঁওতাল মেচ, ওরাওঁ, মুণ্ডা, ভুটিয়া ও লেপচা বিভিন্ন সংখ্যায় আছে। বাঙালী মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী ও বিহারীও আছে। নেপালীদের মধ্যে প্রধান রায় শেরপা, ছত্রী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভুজেল যোগী। মংগর নেওয়ার, তমাঙ, দমাই গুরুং লিম্বু কামী কাগাতে, সুনাওয়ার যক্ষ সরকী ও ঘারতী এই সকল নেপালী খণ্ডজাতি। শিলিগুড়ি মহকুমায় রাজবংশী বেশ আছে। মুসলমান শতকরা দেড় জন এবং তফসিলী হিন্দু শতকরা ১৫ জন। কোচবিহারে রাজবংশী সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোচ গারো, মেচ বা বরা সংখ্যায় অল্প। মুসলমানের সংখ্যা কম নহে। ইহাদের বেশির ভাগই ধর্মান্তরিত হিন্দু, কৃষিজীবী শেখ এবং ময়মনসিংহ হইতে আগত লোক। ইহা ব্যতীত অল্পসংখ্যক অন্যান্য হিন্দুজাতিও আছে। শতকরা ২৯ জন মুসলমান এবং তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতির লোক শতকরা ৪৫ জন।

ধর্ম

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ ৪৫ জন হিন্দু, ১৯ ৮৫ জন মুসলমান, ৩ ৭০ খ্রীস্টান ০ ৪৪ জন খণ্ডজাতীয়, বৌদ্ধ ০ ৩৩ শিখ ০ ১২ জৈন ০ ০৮ এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

জলসেচ ও নদীর বাঁধ

অজানা লোক শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে এতগুলি ছোট বড় নদী থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যের নদী হইতেছে জলসেচের ক্ষুদ্রতম পন্থা। বৃষ্টিহীন দারুণ গ্রীষ্মে নদনদী কার্যত জলসেচের কোনই সাহায্য করে না। বেশির ভাগ নদীই গরমের দিনে শস্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে তাহাদের খাতের মধ্য ভাগ দিয়া সর্পিল

গতিতে ঝির ঝির করিয়া ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে অথবা বর্ষায় প্লাবনের পলিতে অধিকাংশ নদীর তীর অতি উচ্চ হইয়া গিয়াছে। অতিনিম্ন নদীগর্ভ হইতে প্রাচীন পদ্ধতিতে জলোত্তোলন মোটেই লাভজনক নহে। নদীবাহিত মৃত্তিকা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে; কিন্তু অনাবৃষ্টির মরসুমে, যখন জলের প্রয়োজন সর্বাধিক, তখন নদীর জল পলিহীন নির্মল থাকে। সঙ্গে যে-কিছু বালি থাকে তাহা সকল সময় শস্যক্ষেত্রের পক্ষে হিতকর নয়। যেসকল অঞ্চলে নদীস্রোত শস্যক্ষেত্র হইতে বহু নিম্নে প্রবাহিত হয় সেখানে নদী উপকার তো করেই না বরং উহা গ্রীষ্মকালে এক জঞ্জাল বিশেষ হয়; কারণ নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জল শোষণ করিয়া ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেকখানি নীচে নামাইয়া দেয়। বর্ষাকালেও নদী বিশেষ উপকারে আসে না, কারণ মন্থরগতিতে হিতকর প্লাবন অপেক্ষা আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে দেশ ভাসাইয়া দেওয়াই এই সকল নদীর ধর্ম। জল দাঁড়াইয়া তাহার জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করুক বা তাহার শস্যের পুষ্টি সাধন করুক ইহা অপেক্ষা চাষী উৎকণ্ঠিত চিত্তে বন্যার জল নামিয়া যাইবার দিনের প্রতীক্ষায় থাকে বেশি। দেখা যাইতেছে নদীর দেশে নদী প্রায়শই পরোক্ষে হিতসাধন করিয়া থাকে। প্রায় প্রতিবারেই ভবিষ্যতের শুভ ফলের জন্য বর্তমান লাভের আশা বিসর্জন দিতে হয়। ক্ষেত্রস্থিত শস্যের বিনিময়ে পলিসঞ্চয়, সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া দেশের ক্লেদমুক্তি, কৃষিক্ষেত্রের ও গবাদি পশুর অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোন কোন সময় বন্যা অস্বাস্থ্যকর বদ্ধজলের ডোবা পশ্চাতে রাখিয়া যায়। খরস্রোতা নদীসমূহ অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা অনেক সময় কূল ছাপাইয়া উঠে এবং উভয় তীরের ভাঙ্গাগড়ার কাজ করিয়া চলে অবিরাম। এই ভাঙ্গাগড়া চাষের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা আনিয়া দেয় এবং চাষীদের মধ্যে মামলাবাজী ধাত সৃষ্টি করে। বন্যা পলি বহন করিয়া আনিয়া কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবে অথবা বালি ছড়াইয়া উহাকে দীর্ঘকাল বন্ধ্যা করিয়া রাখিবে, তাহা দৈবাধীন। সুন্দরবনের নদী পলিবাহী নহে। উহাদের বন্যা নোনা জলে শস্যক্ষেত্র ডুবাইয়া নিমজ্জিত অঞ্চলের সর্বনাশ সাধন করে।

অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের ফলে নদীর দেশে নদী হইয়াছে অভিসম্পাতস্বরূপ। বহু বাঁধ, হঠকারিতার সহিত স্রোতের স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ, পরিণাম চিন্তা না করিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের ও নদীতীরের বন ধ্বংস এবং স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নদীর গতির পরিবর্তন সাধন, এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। জলসেচের জন্য এখন বৃষ্টি, পুকুর ও বিলের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিক ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনা এবং অন্য কয়েকটি খাল ব্যতীত বাঁধ নির্মাণ দ্বারা নদীকে তাহার খাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখাই রাজ্যের প্রায় সকল সেচ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে নদীর বুকগুলি নদীবাহিত বালি দ্বারা ক্রমে ভরাট হইয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তীরের বাঁধ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিতে হইল। পাহাড়প্রমাণ বাঁধ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জল নিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিত। দামোদরের বাঁধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাঁধের জন্য নদীর খাত এতটা ভরাট হইয়াছিল যে উহা বাম পার্শ্বের জমি হইতে উঁচু হইয়া পড়িল। সুতরাং নদীর দক্ষিণ তীরে আরামবাগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। প্রতিবারেই ডানদিকের ভূমি প্লাবিত হওয়াতে উহা সাত কি আট ফুট উচ্চ হইয়া গিয়াছে। ফলে তীর হইতে দূরে জলাভূমি সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাম তীরে বাঁধের নীচে সৃষ্টি হইয়াছে বদ্ধ জলের বিল। দামোদর বাঁধ এবং উহার উৎসমুখে বন ধ্বংসের ফলে পর পর অনেক জনপদ-বিধ্বংসী বন্যা হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সনের বন্যার ধ্বংসলীলার জন্যই দামোদরকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে দামোদর পরিকল্পনা রচিত হইয়া তদনুসারে কার্য চলিতেছে। অবিবেচনাপ্রসূত বাঁধনির্মাণের অপর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মেদিনীপুরে। বাঁধের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—জল নিয়ন্ত্রণ নহে, জলকে বাধা দেওয়া এবং প্লাবন অঞ্চলের ক্ষতিসাধন করিয়া নূতন জমি আবাদযোগ্য করিয়া তোলা। এই দ্বৈতনীতির ফল হইয়াছে অত্যন্ত অশুভ। বাঁধের ফলে সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের খাত ভরাট হইয়া উচ্চতায় পার্শ্ববর্তী ভূমি ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বারবার যে বিধ্বংসী বন্যা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাঁধ না থাকিলে বন্যা এত ক্ষতিকর হইত না। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব অঞ্চল নদীবাহিত পলি গ্রহণের উপযুক্ত, বাঁধনির্মাণে সেই অঞ্চলের জলের পথ রুদ্ধ করিয়া উহাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। উহা এখন পলিবঞ্চিত জলাভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে; ম্যালেরিয়া-সৃষ্টি, জমির উর্বরতা ও উৎপাদন-হ্রাস, শিল্পের অবনতি এবং জনসংখ্যার হ্রাস ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

সমুদ্রের স্রোত সুন্দরবনের যেসকল খাড়িতে আসে তাহাতে বাঁধ দেওয়াতে সমুদ্রে ভূমিগঠন ব্যাহত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক বন সৃষ্টিরও বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

কৃষিজ সম্পদ

ধান ও পাট এই দুই শস্যের নামোল্লেখ করিলেই এই রাজ্যের কৃষিজাত দ্রব্যের সার সংকলন করা হইয়া যায়। উৎপাদনের সময়ভেদে ধান তিন প্রকার। শীতের অবসানে নদীর চরে, বিলের ধারে ও জলাভূমিতে বোরো ধান রোপণ করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে ইহার অপর নাম ষেটে ধান অর্থাৎ বপন বা রোপণের পর ষাট দিনে ধান পাকে। বৈশাখের শিলাবৃষ্টি পাকধরা বোরো ধানের ভীষণ ক্ষতি করে। আকাশে পুঞ্জীভূত কালো মেঘ কৃষকের হৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া থাকে। বসন্তের শেষের দিকে আশু বা আউশ ধানের বীজ বপন করা হয়। চারার বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। সাধারণত বর্ষার দ্বিতীয় মাসে ধান কাটা হয়। নাম আশু হইলেও ইহা বোরো অপেক্ষা শীঘ্র জন্মে না। বর্ষার বারিধারায় সিক্ত ভূমিতে শরতের প্রারম্ভে আমন ধান রোপণ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর আমন ধান শীতকালের বিভিন্ন সময়ে ঘরে তোলা হইয়া থাকে। বর্ষাগমে যে-জমি প্লাবিত হইয়া যায় সেখানে আমন ধান বসন্তকালে বপন করিতে হয়। এইরূপ জমিতে কেহ কেহ আউশ ও আমন একত্রে বপন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে আউশ কাটা হয় এবং শীতে কাটা হয় আমন।

বর্ধমানের কৃষিক্ষেত্রের ৪/৫ অংশে এবং বীরভূমের অর্ধাংশের বেশি জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। আমন ধানই বাঁকুড়া জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মেদিনীপুরের ধানের ৯৩ শতাংশ আমন। হুগলিতে ও হাওড়ায় আমন ধানের চাষই প্রধান। চব্বিশপরগনায় চাষের জমির শতকরা ৮০ ভাগে আমন উৎপন্ন হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নদিয়াতে। চাষের জমির ¼ অংশে আউশ ধান জন্মে। মুর্শিদাবাদের অর্ধেক রাঢ় ভূমি। সুতরাং আউশ অপেক্ষা আমন বেশি জন্মে। মালদহে

ও পশ্চিম দিনাজপুরে আউশ, আমন ও বোরো তিন রকম ধানই জন্মে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের ধান আমন। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অল্পপরিমাণে বোরো ও আউশ জন্মে।

অর্থকর শস্যের মধ্যে পাট প্রধান। কিছুকাল পূর্বেও বাঙলা দেশ ছিল পাটের একমাত্র জন্মভূমি। পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গেই সর্বোৎকৃষ্ট পাট জন্মে। কিন্তু বিদেশে পাট রপ্তানি ও চটকলের জন্য পাটের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক। বঙ্গভঙ্গের পর হইতে কাঁচা মালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে সঙ্কট উপস্থিত হয়। পাটে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে পাটের চাষ-বৃদ্ধির সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। অধিকতর লাভজনক বলিয়া কোন কোন জেলায় পাট ধানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; ধানের চাষ সংকুচিত করিয়া পাটের চাষ বাড়ানো হইতেছে। বর্ধমান জেলায় আগে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ ছিল কালনা ও জামালপুর থানায়। এখন উহা প্রায় সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুরে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। হুগলির বিস্তৃত অঞ্চলে পাটের চাষ হইয়া থাকে। হাওড়া জেলায়ও পাট জন্মে। নদিয়ায় পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। মুর্শিদাবাদে চলিতেছে ধান ও পাটের প্রতিযোগিতা। মালদহে পাট অন্যতম প্রধান শস্য। জলপাইগুড়িতে পাট ক্রমেই তাহার যোগ্য স্থান অধিকার করিতেছে। কোচবিহারে ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ বাড়িতেছে। দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চলে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়।

গম, যব, ভুট্টা ও মারুয়ার চাষে বেশি জলের দরকার হয় না। উত্তাপ প্রয়োজন ৬০ ডিগ্রীর কাছাকাছি। এইজন্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে শীতকালে গমের চাষ হইয়া থাকে। যেখানে গম হয় সেখানেই যব হইতে পারে। ভুট্টার জন্য গড়ে বার্ষিক ৩০ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত দরকার। মারুয়াও ঐরূপ। আবহাওয়ার দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ এই সকল শস্য-উৎপাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়িতে অল্পপরিমাণে গম জন্মে। মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়িতে যব হয়। বর্ধমান জেলার পশ্চিমপ্রান্তে এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে ভুট্টা জন্মে। মারুয়া দার্জিলিঙে হয়। হাওড়া, দার্জিলিঙ ও কোচবিহার ব্যতীত আর প্রতি জেলাতেই আখ জন্মে। ডা'ল ও তৈলবীজ প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিঙ ও কোচবিহার। তামাক মেদিনীপুরেও জন্মে। রেশমশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বীরভূম ও মেদিনীপুরে তুঁতের চাষ প্রায় লোপ পাইয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে এখনও বিস্তৃত অঞ্চলে তুঁতের চাষ করা হয়। অতসী (Flax) বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে জন্মে। হাওড়ায় শণ (Hemp` জন্মে। কোচবিহার ও হুগলিতে আলু জন্মে প্রচুর। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, চব্বিশপরগনায় নানাবিধ সবজির চাষ হয়। আগে যেখানে ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন শোনা যাইত সেই রাজ্যে তুলার চাষ লুপ্তপ্রায়। নীল-দর্পণের রঙ্গমঞ্চে নীলের চাষ এখন বন্ধ।

ফলের বাগান, চা-বাগান, পানের বরজ ঠিক কৃষির মধ্যে পড়ে না। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে মূল্যবান ফলের বাগান আছে। জেলার চাহিদা মিটাইয়া প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার আম মালদহের বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির চা-বাগান পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সম্পদ। হুগলি, মেদিনীপুর ও দার্জিলিঙের পানের বরজ এই রাজ্যের চাহিদা আংশিক মিটাইতে সক্ষম।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে দোফসলী জমির পরিমাণ অতি সামান্য। অন্য জেলাতেও খুব বেশি নাই।

গোচারণ ভূমি

এই রাজ্যের গবাদি পশুর খর্বাকৃতি ও স্বাস্থ্যহীনতা কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। গোচারণের মাঠের একান্ত অভাব এই দুর্দশার কারণ। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে এখনও ঘাসের জমি আছে বটে কিন্তু অন্যান্য জেলায় উহার দারুণ অভাব। এইজন্য মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম ও গোপী-বল্লবপুর থানার চতুর্দিকে বহু মাইল পর্যন্ত গরু নাই বলা চলে। যে কয়েকটা আছে তাহা চাষের বলদ। বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলেও এইরূপ। অধিক শস্য ফলাবার আন্দোলনের দ্বারা মানুষের খাদ্য বাড়াইবার চেষ্টায় গোচারণের মাঠ খর্ব করিয়া গবাদি গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য হ্রাস করা হইয়াছে।

শিল্পাঞ্চল

চায়ের উৎপাদন শ্রমশিল্পের মধ্যে গণ্য করা হয়। সহজ-ভঙ্গুর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, কিন্তু তাহা দাঁড়াইতে না দিয়া অতি-দ্রুত জলনিকাশ, এবং অপেক্ষাকৃত কম রৌদ্রতাপ চা গাছের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। এই অনুকূল অবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তে দুর্বাধিগম্য স্থানে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স ও দার্জিলিঙে চা-বাগান রচিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চা-শিল্পের প্রয়োজনে ঐ অঞ্চলে যাতায়াতব্যবস্থার এখন প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে ভূগর্ভে নানাবিধ আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। খনিজ দ্রব্যের জন্য মানুষ খনি অঞ্চলে ছুটিয়া যায়। সুতরাং উত্তরে ও দক্ষিণে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সংকীর্ণ দুই ফালি ভূমিসহ আসানসোল মহকুমার শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশ কয়লার খনি এখানে অবস্থিত। অদূরেই সিংহভূম, মানভূম ও ছোটনাগপুরের লৌহ, মৃত্তিকা ও অ্যালুমিনিয়মের খনি। আসানসোলের খনিতেও লোহা, ফায়ার ক্লে, সোপস্টোন ও কেওলিন পাওয়া যায়। উন্নত বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা রানীগঞ্জ বরাকর ও দিশেরগড়ে আছে। সুবিধাজনক স্থানে রেলের শেষ সীমা অবস্থিত। সহজলভ্য কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি মাল আমদানি ও রপ্তানির সুবিধা এবং স্থানীয় খনিতে আকরিক থাকায় এখানে লৌহ নিষ্কাশন, লৌহ ঢালাই, ইস্পাত নির্মাণ, তাপসহ দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। দুইটি রেলের কর্মশালা ও চিত্তরঞ্জনের চলিষ্ণু ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা এই অঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

পাট-উৎপাদনে অবিভক্ত বাঙলার প্রায় একাধিকার ছিল। সুতরাং পাটশিল্প বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এই মহাদেশে প্রায় পাঁচ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হয়। হুগলি নদীর উভয় তীরে তিন কোটি মণ পাট নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করিবার উপযোগী চটকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর সাধারণত এক হইতে দেড় কোটি মণ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইত। এরূপ বিরাট পরিমাণ মাল নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা একমাত্র কলিকাতা বন্দরেরই ছিল। বঙ্গদেশ,

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে জলপথে ও স্থলপথে পাট কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিত। প্রধানত মাল আমদানি ও রপ্তানির সুবিধার জনাই কলিকাতার সন্নিকটে পাটশিল্প কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পরে এই শিল্পে বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি এখনও উহা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প। ১৯৪৮ সনে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়-লব্ধ অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাট হইতে আসিয়াছে। কঠিন মুদ্রার ৬৬ শতাংশ পাটের জন্য পাওয়া গিয়াছে।

বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের শ্রমিক কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে আমদানি করা সহজ। বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সস্তায়। বাহির হইতে কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা এখানে প্রচুর। পৌরাঞ্চলেব সুবিধাগুলি এখানে সহজলভ্য। সর্বোপরি হুগলি নদীর প্রশস্ত জলপথ নিকটবর্তী রেল স্টেশন ও বন্দরের সহিত অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুক্ত করিয়াছে। পাটশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে বহু উপশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (secondary industries)। হুগলির পূর্বতীরে কাঁচরাপাড়া হইতে বজবজ এবং পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী হইতে বাউড়িয়া পর্যন্ত ঘনবিন্যস্ত বহু বিচিত্র শিল্পালয় স্থাপিত হইয়াছে। ডুয়ার্স, দার্জিলিঙ ও আসামের চায়ের মিশ্রণ ও বাজারে উপস্থিত করিবার মত বিবিধ আকারের ছোট বড় পাত্রে ভর্তি করিবার কারখানা কলিকাতায় আছে। আসানসোল অঞ্চলে নিষ্কাশিত মৌলিক ধাতু হইতে নানাবিধ দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করা হয়। মোটর গাড়ি নির্মাণ ও মেরামত, নানা রকম যন্ত্র নির্মাণ ও মেবামত, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত, কাপড়ের কল; সেলাইয়ের কল নির্মাণ ও মেরামত; তেলকল, চাউল কল, ময়দার কল, বিস্কুট ও রুটি ইত্যাদির কারখানা; যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানা, লৌহ ঢালাইযের কাবখানা, অ্যালুমিনিয়মের বাসন প্রস্তুতের কাবখানা, চীনামাটির ও কাচেব দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা, কাগজের কল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি অসংখ্য কলকারখানা এই সীমায়িত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হুগলি তীরের শিল্পের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। এই রাজ্যের পক্ষে কিন্তু হুগলি তীরের চটকদার ও মুনাফা উপার্জক উপশিল্প অপেক্ষা আসানসোলের মৌলিক শিল্পাঞ্চল অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রেলের বড় এক ওয়ার্কসপ আছে বলিয়া খড়্গপুরকেও শিল্পাঞ্চল বলা হয়। ঐ কারখানা আশ্রয় করিয়া খড়্গপুরে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছে।

শক্তিচালিত কলের মধ্যে তেল কল, চাউল কল, করাত কল, পাটের গাঁটবাঁধা কল, ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি প্রায় প্রতি জেলাতেই আছে।

তাঁতী, কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি পল্লীর শ্রমশিল্পী। ইহারা সাধারণত একক অথবা পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে ব্যবসায় পরিচালনা করে।

সুসংগঠিত আধুনিক শিল্প পশ্চিমবঙ্গের মাত্র চারিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। কলিকাতার আশেপাশে প্রায় একশত চটকল আছে এবং তাহাতে প্রতি বৎসর সাড়ে চারশত কোটি (১৯৫০ সালের দরে) টাকার ধনসম্পদ উৎপন্ন হইতেছে। চা-শিল্প ও কয়লা-শিল্পে ধনসম্পদ উৎপন্ন হইতেছে বিপুলপরিমাণে। কলিকাতার আশেপাশে বহু বিচিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়া বিপুলপরিমাণ বাণিজ্য চলে। কিন্তু এই শিল্প ও বাণিজ্যে এই রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকার, কর্তৃত্ব ও লভ্যাংশ নগণ্য। শিল্পাঞ্চলের বাহিরে শতকরা পঁচাত্তর জন পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য রহিয়াছে জরাজীর্ণ সমাজ আর আবহমান কাল হইতে অনুসৃত পদ্ধতিতে কর্ষিত হীনশক্তি কৃষিক্ষেত্র।

১৯৪১-৫০ সনের ঘটনাপঞ্জী

এই দশ বৎসর বাঙলার অতি দুঃসময়ের যুগ। এক বিপদ কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই আর এক বিপদ আসিয়া হাজির হইত। বিশ্বসংগ্রামের দ্বিতীয় বৎসরে দশক আরম্ভ হয়। বৎসরের শেষ মাসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জাপান বাঙলার সীমান্তের অনতিদূরে রণক্ষেত্র আগাইয়া আনিয়াছিল। জাপানী-অধিকৃত দেশের সহিত বাণিজ্য অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানি বন্ধ হইল। সমুদ্রপথের নিরাপত্তা আর রহিল না। বহির্বাণিজ্য সংকুচিত হইল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর হুহু করিয়া বাড়িয়া গেল। রণসম্ভার সরবরাহের প্রয়োজনে পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে বহু লোকের কর্মের সংস্থান হইল। কিন্তু কর্মহীন ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকেরা জীবনধারণের জন্য হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতায় বোমা পতনের ফলে ত্রাসের সঞ্চার হইল এবং কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিত্যাগের হিড়িক পড়িয়া গেল। জাপানী-অধিকৃত ব্রহ্মদেশ হইতে দুর্গম পথ বাহিয়া কয়েক সহস্র সর্বস্বান্ত বাঙালী আসিয়া দাঁড়াইল আশ্রয়প্রার্থিরূপে।

১৯৪২ সনের মেদিনীপুরের ঝড়বৃষ্টি

এই সংকটের মধ্যে ১৯৪২ সনের ১৬ই অক্টোবর সকাল সাতটায় আরম্ভ হইয়া শেষ রাত্রি পর্যন্ত মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনার উপব দিয়া প্রচন্ড ঝড় বহিয়া গেল। ঝড়ের তাড়নায় বৈকাল বেলা বঙ্গোপসাগরের বান ডাঙ্গায় উঠিয়া এই দুই জেলার বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ঝড়ের সঙ্গে কোথাও প্রবল বারিপাত হইয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ে বৃষ্টি হইয়াছিল ১২ ইঞ্চি। ঝড়, বৃষ্টি ও বানে চব্বিশপরগনা ও মেদিনীপুরের সকল নদীতে বন্যার জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। প্রায় ১৪,৫০০ লোক ও ১,৯০,০০০ হাজার গবাদি গৃহপালিত জন্তুব প্রাণহানি ঘটিল। গ্রামাঞ্চলে দেখা যাইত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ আর গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ। প্রত্যেকটি কাঁচা ঘব হয় ভূমিসাৎ অথবা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পাকা ছাদের নিঃসঙ্গ পাকা বাড়িই শুধু অক্ষত অবস্থায় এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সঞ্চিত খাদ্য ও জমির শস্য বিনষ্ট হওয়াতে লোকের দুর্দশার সীমা রহিল না। ঐ অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্যদল মৃতদেহ ও ধ্বংসস্তূপ অপসাবণের কাজ প্রথম আরম্ভ করে। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সাত মাসে দুই কোটি টাকার অধিক ব্যয় করা হইয়াছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

১৯৪৩ সন পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য বাঙলার ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। লোকক্ষয়, জন্মহ্রাস, নারীপুরুষের মৃত্যুর হারের বৈষম্য ও বিভিন্ন বয়সের উপর দুর্ভিক্ষের প্রভাব বাঙালীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির ধারার পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। বাঙলার খাদ্যসংকট দেখা দেয় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে। বৃহত্তর

কলিকাতার খাদ্যাভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৩ সনের মার্চ মাসে অতি তীব্র আকার ধারণ করে। বৃহত্তর কলিকাতা তখন ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম সমরঘাটি (Base)। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থায় এই অঞ্চলের বিপদ কাটিয়া যায়। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষের যে তাণ্ডব শুরু হইয়া গেল বৎসরের শেষে আমন ধান ঘরে না তোলা পর্যন্ত উহা অপ্রতিহতগতিতে চলিতে লাগিল।

উডহেড দুর্ভিক্ষ কমিশন মন্বন্তরের নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করিয়াছেনঃ

১। ১৯৪২ সনে উৎপন্ন আমন ধানের এবং ঐ সালের উদ্বৃত্ত পুরাতন চাউলের পরিমাণ হ্রাসহেতু অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৪৩ সনে বাঙলার মোট চাউলের গুরুতর ঘাটতি পড়িয়াছিল।

২। জনগণের যে বৃহৎ অংশ সারা বৎসর অথবা কয়েক মাস চাউল কিনিয়া খায় তাহারা যে-দরে ক্রয় করিতে সক্ষম সেই দরে তাহাদিগকে চাউল দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ দুইটিঃ (ক) দেশের তখনকার অবস্থায় চাহিদার ও যোগানের অবাধ নীতি অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে লোকের ক্রয়ক্ষমতার যোগ্য মূল্যে চাউল বিক্রয় করা সম্ভব ছিল না; এবং (খ) লোকের ক্রয়ক্ষমতার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও খাদকের উপর যেপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন ছিল বাঙলা-সরকার তাহা করেন নাই।

৩। স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙলার বাহির হইতে যে চাউল ও গমের চালান আসিত ১৯৪২ সনের শেষের কয়েক মাস ও ১৯৪৩ সনের প্রথম ভাগে তাহা পাওয়া গেল না। ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানি বন্ধ ইহার এক কারণ; উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি প্রদেশে খাদ্যশস্য প্রেরণের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনে বিলম্ব ইহার অপর কারণ।

৪। ১৯৪২ সনে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় সমর-বিভাগ পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করিয়া বহু মালবাহী নৌকা ও গোলায় সঞ্চিত চাউল বিনষ্ট করিয়া দেয়। নৌকা ধ্বংসের ফলে প্রদেশের অভ্যন্তরে উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় চাউলের আমদানি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের জন্য এবং শত্রুদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বহু চাউল ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করে। সামরিক-বিভাগের মাল সরবরাহকারী ঠিকাদারেরা অনেক চাউল হস্তগত করিয়া ফেলিল। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল কিনিয়া রাখিয়াছিল। এক নূতন শ্রেণীর চাউলের ব্যবসায়ী চাউল মজুদ করিয়া শুধু টাকার জোরে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল।

কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধির ফলে অবিভক্ত বাঙলায় ১৫ লক্ষের মত লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অপরের হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা ঢের বেশি। সমগ্র প্রদেশে দুর্ভিক্ষে মৃতের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। কোন কোন স্থানে, যেমন কলিকাতায়, ইহার বিপরীতও ঘটিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে মৃতের শতকরা ৫৬·৭ পুরুষ এবং ৪২·৩ নারী। বিভিন্ন কেন্দ্রের দুর্ভিক্ষ হাসপাতালের নথিপত্রে মৃত্যুর এই হারের সমর্থন মিলে।

দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক ও বালিকার মৃত্যুর হার প্রায় সমান। দশ হইতে পনর বৎসর মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর হার একটু বেশি। দশ হইতে ষাট বৎসরের পুরুষ ও নারীর মৃত্যুর অনুপাত ৫২ : ৪৪। ১৯৪৩ সনের অনাহারজনিত মৃতের ১০ লক্ষের মধ্যে পৌনে দুই লক্ষ ১ হইতে ১০ ও ৬০ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়সের লোক ছিল।

জন্মের হার যে বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কোন কোন জেলায় ১৯৪৭ সনের পূর্বে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বৃদ্ধি পায় নাই। অধিকাংশ জেলায় কেবলমাত্র ১৯৪৬ সনের মাঝামাঝি মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বেশি দেখা গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় জীবিত সন্তানের জন্ম হ্রাস পাইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ প্রথম দেখা দেয় পূর্ববঙ্গে। হুগলি ও মালদহ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের আর সকল জেলাতেই জুলাই মাসে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। অগাস্ট মাস হইতে মৃত্যুহার দ্রুত বাড়িয়া চরমে পৌঁছিল ডিসেম্বরে। কলিকাতায় অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক হইয়াছিল ১৯৪৩ এর অক্টোবরে। খাদ্যবণ্টন, অনশনক্লিষ্ট রোগীদের জন্য হাসপাতালে স্থানবৃদ্ধি, অধিকতর যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ও নিঃস্বদিগকে নগরীর বাহিরের শিবিরে প্রেরণের ফলে নভেম্বরে ও ডিসেম্বরে মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দেখা গিয়াছে।

মেদিনীপুর সাধারণত উদ্বৃত্ত জেলা। কিন্তু ১৯৪২ সনের বীজ বপনের সময় অনাবৃষ্টি, অক্টোবরে ঝড় এবং ঝড়ের পরে ধানের ব্যাধির জন্য বৎসরের শেষে ধান অত্যন্ত কম জন্মিল। এইরূপে দুর্ভিক্ষের আসর প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৯৪৩-এর প্রথমদিকে বাঙলার গভর্নমেন্টের মতে বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি "ক্রয় অঞ্চল" বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এই সকল জেলা প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত তাহা বলা অসম্ভব। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সনে বন্যা ও পোকায় বর্ধমানের দুই মহকুমার শস্যহানি হইয়াছিল। এইমাত্র বলা যায় যে রাজ্যের অপরাপর অংশ হইতে এই সকল জেলায় অভাবের তীব্রতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বাড়তি মৃত্যুর হার মালদহে শতকরা ২·৮, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বর্ধমানে ৪৫-এর অনধিক এবং বীরভূমে ৬০·৫ ছিল। পক্ষান্তরে মেদিনীপুরে ঐ হার ৫৮·১, হাওড়ায় ৭১ ৫, চব্বিশপরগনায় ৭৬·১, নদিয়াতে ৮২·৪ এবং মুর্শিদাবাদে ৯৬·৫। প্রথম ছয় মাস স্থানীয় অভাবের অনুপাতে মৃত্যুর হারের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছিল। যে জেলায় খাদ্যাভাব ছিল না সেখানেও চালের দরবৃদ্ধির জন্য অনশনে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

দামোদরের বন্যা, ১৯৪৩

বর্ধমান জেলার আমিরপুরের নিকটে ১৬ই জুলাই রাত্রিতে দামোদরের মাঝারি রকমের বন্যায় বামদিকের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। বাঁধের বাহিরেই ছিল দেবীদহ নামে দামোদরের এক পুরাতন খাত। এই দহে প্রবেশ করিয়া দামোদর শক্তিগড় ও কালনার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল জলমগ্ন করিয়া দিল। স্থানে স্থানে জলের গভীরতা ছয়-সাত ফুট হইয়াছিল। অনেক গ্রাম ধ্বংস হইয়া গেল। বর্ধমানের উভয় দিকের রেলওয়ে ও অন্যান্য রাস্তার যোগাযোগ ব্যবস্থা তিন মাসের জন্য অচল হইয়া পড়িল। রেল কোম্পানির বিপুল আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল। পূর্ব-ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হইল।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের প্রস্তুতি এই বন্যার জন্য ছয় মাস পিছাইয়া গেল। বন্যায় বেশি লোকক্ষয় হয় নাই বটে কিন্তু বর্ধমান জেলায় ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহামারী

১৯৪৪ সনে খাদ্যাবস্থার উন্নতি হইল, কিন্তু খাদ্যশস্যের দর তখনও দুর্ভিক্ষে সর্বস্বান্ত নিম্নবিত্ত জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে রহিয়াছিল। শহরে পূর্ণ রেশনিং ও গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিং অন্নকষ্টের কিছু লাঘব করিল। কিন্তু মন্বন্তরের সময় অখাদ্য-কুখাদ্য ও প্রয়োজন অনুপাতে অল্প খাদ্য আহারের ফলে জনগণের অনেকাংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হাতপা-ফোলা শীর্ণদেহ, ক্ষীণশক্তি লোক গ্রামে গ্রামে দেখা যাইত। দুর্বলতার সুযোগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া গেল। গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বাড়াইয়া ও নূতন হাসপাতাল খুলিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন হইল অপ্রচুর। মহামারীতে বাঙলাদেশে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইল। যে অঞ্চলে খাদ্যাভাব, ব্যাধি সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বৎসরের প্রথম ছয় মাসে বীরভূম, চব্বিশপরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে বাড়তি মৃত্যুর হার শতকরা নব্বই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। মালদহের অবস্থা হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। দার্জিলিঙ ও কোচবিহার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

মন্বন্তরের অন্যান্য ফল

দুর্ভিক্ষে পুরুষের মৃত্যু বেশি হওয়াতে অনেক শিশু ও নারী অনাথ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনাথ-আশ্রম খুলিতে হইয়াছিল। ক্ষুধার জ্বালায় ঘর ও জমি বিক্রয় করিয়া অনেকে গৃহহীন ও ভূমিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রীত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অর্থাভাবে ও ক্রেতার চতুরতায় বিক্রীত ভূমির অতি সামান্য অংশই পুনরায় পূর্ব-মালিকের হস্তগত হইয়াছে।

ফসল বাড়াও আন্দোলন

দুর্ভিক্ষের পরে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করিয়া গভর্নমেণ্ট উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ, সার উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া, জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা করা, দুগ্ধবতী গাভী ও কর্মক্ষম বলদ প্রভৃতি হত্যা নিবারণ, কৃষির যন্ত্রাদি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য কৃষকদিগকে লোহা ও ইস্পাত সরবরাহ, ট্র্যাক্টর প্রভৃতির আমদানি, কৃষকদিগকে পতিত জমি আবাদ করিতে বাধ্য করা, জমি পত্তন আইনের উন্নতিবিধান প্রভৃতি উপায়ে কৃষির উন্নতির জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ

১৯৪২-৪৩ সনে গভর্নমেণ্ট নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের দর বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহাদের সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা সাধারণ লোকের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও অভ্যাসের পরিবর্তন সাধিত হইল। মজুদ করা, বেআইনি আমদানি ও রপ্তানি, অতিরিক্ত মুনাফা ও কালোবাজারি বহুলপরিমাণে সংকুচিত হইল। জনগণের এক বৃহৎ অংশ সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। নিয়ন্ত্রণ, লাইনে দাঁড়াইয়া পালাক্রমে জিনিস ক্রয়, ও নির্দিষ্টহারে দ্রব্য বণ্টন, সমাজে নিঃশব্দে বিপ্লব আনয়ন করিয়া দিয়াছে। লোকের অসুবিধা হইলেও ইহাতে নূতন সামাজিক চেতনা ও নিয়মানুগত্য আনিয়া দিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন লোকের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া থাকে বলিয়া ইহা বিরক্তিকর। ইহা হইতে এক শ্রেণীর নূতন সমাজবিরোধী বেআইনি আমদানিকারক কালোবাজারী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হইয়াছে।

বিশ্বযুদ্ধের অবসান

১৯৪৫ সনে যুদ্ধের অবসান ঘটিল কিন্তু জনগণের দুঃখের অবসান না হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধ যতদিন ছিল কর্মের সংস্থান ও মাল আমদানির জন্য মুদ্রাস্ফীতির কুফল বেশি ক্ষতি করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিল্প সংকুচিত হইল, নির্মাণকার্য বন্ধ হইল, আমদানি-রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইল এবং অকস্মাৎ বহু লোক বেকার হইয়া পড়িল। কৃষির ঘটিল অবনতি। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত আর্থিক কাঠামোর সামঞ্জস্যবিধানের অক্ষমতার দরুন এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অবাধ মুদ্রাস্ফীতির কুফল পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল। দেশের শিল্প ও আর্থিক নীতি নির্ধারণে অনিশ্চয়তা ও দোলায়মান ভাব উপস্থিত হইল। ইহা প্রতিফলিত হইল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। এই ক্ষীণসম্বল রাজ্যের অবস্থা অধিকতর সংকটপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাহার খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ও সরবরাহের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। পূর্বে বিনিময়ের ভিত্তিতে ভারত যেসকল দেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিত সেই সকল দেশ যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া পড়াতে সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং খাদ্যের জন্য ভারতের নূতন সরবরাহকারী দেশ খুঁজিয়া নিতে হইতেছে। দেশবিভাগের ফলে গম ও ধান উৎপাদনের বিশাল অঞ্চলসমূহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের অতি সামান্য অংশেরই কৃষিক্ষেত্রে পুনর্বসতি করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং উদ্বাস্তুগণের খাদ্য-সরবরাহের দায় দেশের কৃষির উপর বর্তিয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে ভারতে খাদ্যশস্যের নিত্য অভাব। খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে ভারতের দীর্ঘ সময় কাটিয়া যাইবে মনে হয়।

লোকের জীবনাদর্শ, চিন্তাধারা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর যুদ্ধের প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের রাষ্ট্রবিরোধের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত থাকিতে পারে এবং উহাই পরিণামে সকল জাতির দুঃখদুর্দশার কারণ হইতে পারে, এই উপলব্ধি, সাধারণ মানুষকেও অপর দেশের ঘটনার গতি অনুধাবন করিতে আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক দেশই এখন যেন অপরের প্রতিবেশী। বিমান ও বেতার দূরত্ব হ্রাস করিয়া পৃথিবীকে সংকুচিত করিয়া দিয়াছে। জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও ব্যয়বৃদ্ধি জীবনসংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। চিরাভ্যস্ত ধীরমন্থর জীবনস্রোত যুদ্ধোত্তরকালে দ্রুততালে বহিতেছে। বহির্জগৎ সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য

জিনিসের অনটন, খাদ্যবণ্টন, "আগে আসে আগে পায়" এই নীতি অনুসারে সারিতে দাঁড়াইয়া বস্তুসংগ্রহ প্রভৃতি মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধি করিয়াছে। বেআইনিভাবে মালের আমদানি ও রপ্তানি, সরকার-নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা উচ্চমূল্যে জিনিস বিক্রয়, অতি-মুনাফা লাভের আশায় আবশ্যকীয় পণ্য ধরিয়া রাখা প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য সম্বন্ধে লোক অধিকতর সচেতন হইয়াছে। অর্থসঞ্চয়ের অভ্যাস হ্রাস পাওয়াতে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের জন্য পুঁজি গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। অনিশ্চয়তার মধ্যে নূতন শিল্প বা ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগে শংকা যুদ্ধের অন্যতম ফল।

যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যের লোকের গমনাগমন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে প্রভাবিত হইয়াছে। জনসংখ্যা ও তাহাদের জীবিকার সমস্যা যুদ্ধের ফলে অন্তরাল হইতে চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। লোকবৃদ্ধির অনুপাতে শস্যবৃদ্ধি হয় নাই। যে-হারে শহরে লোকের বসতি বাড়িয়াছে সেই হারে স্থায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। ফল হইয়াছে প্রয়োজন অপেক্ষা কম অর্থ-উপার্জনকারীর সংখ্যাবৃদ্ধি। এই দশকে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনা জনসংখ্যা ও জীবিকার সমস্যাকে অধিকতর কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

কলিকাতার বীভৎস হত্যাকান্ড

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তান লাভে বিলম্ব ঘটিবে মনে করিয়া মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' সংকল্প গ্রহণ করে। সংগ্রাম ভারতের বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নহে, হিন্দু জনসাধারণের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগাস্ট কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। বাঙলাদেশে তখন মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ সংবাদপত্রের মতে কলিকাতার বাহির হইতে লোক আমদানি করিয়া তাহাদিগকে ৮ ফুট লম্বা লাঠি সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রই অনুযোগ করে যে, রাস্তায় অপরের বাহির হওয়া যখন নিষিদ্ধ তখন দুর্বৃত্তেরা অনায়াসে পেট্রোল ও গাড়ি পাইত। চারদিন পরে কলিকাতা দেখা গেল প্রচন্ড বিমান-আক্রমণে বিধ্বস্ত শহরের মত। চতুর্দিকে মৃতদেহ, আহত ও ধ্বংসস্তুপ। নারী ও শিশু সহ বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরুষেরা বিকালের দিকে ফিরিয়া দেখিত বাড়ি নাই, স্ত্রী নাই, সন্তান নাই। গৃহহারার দল যেখানে সেখানে, রাস্তার ধারে, যে-কোন খোলা জায়গায়, অনাহারে পড়িয়া আছে। গৃহহীন লোকদিগকে কেহ আশ্রয় দিলে তাহাকে বাড়ি হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ঠেঙানো হইত। প্রত্যেক হাসপাতাল আহতে ভর্তি, খাট, মেজে, এমনকি খোলা জায়গায়ও ইহারা ছিল। ডাক্তার ও নার্সেরা দিনের পর দিন সারা দিন ধরিয়া খাটিত। হাজার হাজার লোককে পশুর মত ক্ষতবিক্ষত করা হইয়াছে। চূর্ণ চোয়াল, উৎপাটিত চক্ষু, ভগ্ন হস্তপদ, পঙ্গু শিশু, নারী ও পুরুষ রাজনৈতিক দাবিপূরণের যুক্তি হইয়াছিল।

মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪,০০০; রাস্তায় রাস্তায় বহু আহত লোক জড় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের ঠিক সংখ্যা আন্দাজ করিতে গেলে নিশ্চয় ভুল হইবে। বহু সহস্র বাসভবন, গুদাম ও দোকানপাট লুট, ক্ষতিকরা ও জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আগুন নিভাইবার জন্য ফায়ার ব্রিগেডের ৪০০ ডাক আসিয়াছিল। প্রত্যেক ডাকে ৪টি আগুনের খবর ছিল। ১,০০০ ডাকে ফায়ার ব্রিগেড সাড়া দিতে পারে নাই।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রায় দেড় লক্ষ লোক কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ১৮৫টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। এক সময়ে এই সকল কেন্দ্রের মোট আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা উঠিয়াছিল ১,৩০,০০০।

কলিকাতার হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে দেখা দিল। সেখানে উৎপীড়িত হইয়াছিল মুসলমানগণ। অক্টোবরে নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর ইহার প্রতিশোধ নেওয়া হইল।

'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ঠিক এক বৎসর পরে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। কলিকাতা, পাটনা ও নোয়াখালির বীভৎস ঘটনার স্মৃতি বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরের বাস্তুত্যাগের হেতু।

উদ্বাস্তুর গমনাগমন

বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল ব্যাপক বাস্তুত্যাগ। কলিকাতার হত্যাকান্ডই স্থানত্যাগের সূচনা করিয়াছিল। ১৯৪৬ ৪৭ সনে বাঙলার লীগ গভর্নমেন্ট বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার আশ্রয়শিবিরে বহুসংখ্যক বিহারী মুসলমানকে ঠাঁই দিয়াছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ইহারা পূর্ববঙ্গে সরিয়া পড়িল। নোয়াখালি দাঙ্গার পর হইতে হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে। বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দুর আগমনের বেগ বৃদ্ধি পাইল। প্রথম যাতায়াত হয় সরকারী কর্মচারীদের। হিন্দু কর্মচারী চিরকালের জন্য পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসে। বিস্তর মুসলমান কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গে পরিবারবর্গ রাখিয়া পাকিস্তানে চাকরি করিতে যায়। কলিকাতার ব্যবসায়ী মুসলমানদের কেহ কেহ ভাগ্যপরীক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গে গিয়াছে। হিন্দু সরকারী কর্মচারী বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করায় হিন্দুসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। অনেকে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের দুর্দশার সংবাদ পূর্ববঙ্গে পৌঁছিলে দেশত্যাগের গতি হ্রাস পায় এবং ভিটামাটি ত্যাগ করিবে না বলিয়া অনেকে স্থির করিয়া ফেলিল। ১৯৪৯ সনে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৯৪৭ সনের অর্ধেক হইয়া যায়। কিন্তু ১৯৫০ সনের প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অনেকে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য পাকিস্তানে চলিয়া গেল। পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিল। ১৯৫০ সনের বাস্তুহারার সংখ্যা সওয়া নয় লক্ষ। এই হৃতসর্বস্ব বিরাট আগন্তুকের দলের চাপে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। বেগ মন্দীভূত হইলেও ছিন্নমূল নরনারীর প্রবাহ ছয় বৎসর পরেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই।

১৯৪৭ সন হইতেই খাদ্যশস্যের অবস্থা খারাপ চলিতেছিল। ১৯৫০ সনে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরও অবস্থার উন্নতি ঘটিল না। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ সন পর্যন্ত খাদ্যাবস্থা সংকটপূর্ণ ছিল।

১৯৫০ সনে জুনের প্রথমার্ধে প্রবল বারিপাতজনিত ধসে দার্জিলিঙ ও সিকিমের ধনসম্পত্তি ও চা-বাগানের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই সময়েই তিস্তার বন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার এক মূল্যবান সুবিস্তৃত অরণ্য ভাসাইয়া নিয়া যায় এবং বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া দেয়। যে ঝড়বৃষ্টি সিকিম, দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির ক্ষতি করিয়াছিল তাহা এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই অল্পবিস্তর ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

জনগণের বৈষয়িক অবস্থা, ১৯৩১-৫০

জনগণনায় রাজ্যের লোকদিগকে প্রথম কৃষি ও অকৃষি এই দুই বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষি বর্গের চার শ্রেণীঃ মালিকচাষী, ভাগচাষী, কৃষিমজুর ও খাজনাভোগী। অকৃষি বর্গের শ্রেণীও চারঃ শিল্পাশ্রয়ী, ব্যবসায়ী, পরিবহনকারী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী। জীবিকার এই আট শ্রেণী অনুসারে রাজ্যের জনগণের বৈষয়িক অবস্থার পরিচয় এখানে দেওয়া হইবে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম ও তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতি আলোচ্য দশকে জীবনযাত্রার ব্যয় যুদ্ধপূর্ব কাল হইতে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। ব্যয়ই শুধু পূর্বসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া যায় নাই, জীবনযাত্রার মানও কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্তু পূর্ব পূর্ব দশক হইতে এই দশকের প্রভেদ জীবনযাত্রার মানে ততটা নহে যতটা ব্যয় বৃদ্ধিতে। আয় বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অবকাশে যতটুকু সম্ভব জীবনযাত্রার মান বাড়ানো হইত। ১৯৫০-৫১ সনে আয় ও মূল্যের হার প্রায় সমস্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন দেশে বৃদ্ধি পায় নাই, বিদেশী মালও বেশি আমদানি হইত না। সুতরাং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সামান্যই ঘটিয়াছিল। জিনিসপত্রের বিস্ময়কর মূল্যবৃদ্ধিই এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯৩০-৫০ সনের মধ্যে গভর্নমেণ্ট জনগণের আর্থিক অবস্থার পরিচয়-সংবলিত কয়েকটি সুদক্ষ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রামাণ্য গ্রন্থের তথ্য সংকলন করিয়া জনগণের বৈষয়িক অবস্থার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এক বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহাই হইবে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আর্থিক পরিচয়ের পটভূমি। আশা করা যায় ইহা গণচিত্রের পরিবর্তন উপলব্ধির সহায়ক হইবে।

মালিকচাষীর অবস্থা, ১৯৩১-৫০

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে হান্টার লিখেছেন, নিজের চাষে ৫ একর নিজস্ব জমি থাকিলেও একজন কৃষকের অবস্থা ৮ টাকা বেতনের এক কর্মচারীর মত স্বচ্ছল হইবে না। হান্টারের মতে তখন একজন কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল গড়ে ৫ একর অথবা তাহার সামান্য বেশি। কৃষকের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার সময় হান্টারের এই নিরিখ ধরিয়া কাজ করাই সুবিধা।

১৯৪০ সনে ভূমিরাজস্ব কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রতি পরিবারের দখলীয় ভূমির পরিমাণ গড়ে ৪ ৪ একর এবং মোট জমির ৩৪ শতাংশ বর্গা প্রথায় অথবা মজুরের দ্বারা চায করা হইয়া থাকে। কমিশনের মতে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৮ মণ ৩২ সের ধান উৎপন্ন হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান সমিতি (Bengal Provincial Banking Enquiry Committee) ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রতি চাষী পরিবারের আয় ৪০৬ টাকা এবং গড় ঋণ ১৪৭ টাকা। এই হিসাব অনুসারে অবিভক্ত বাঙলার কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। পল্লী-ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত আর্থিক অনুসন্ধান পর্যদ (Board of Economic Enquiry) ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতি পরিবারের গড় ঋণ স্থির করিয়াছিলেন ১৪৭ টাকা হইতে সামান্য কম। ১৯২৯ সনের অর্থ-সংকটের দরুন ১৯৩১ সনে কৃষিদ্রব্যের দর পড়িতে লাগিল; জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হইল এবং চাষীর দুঃখকষ্ট বাড়িয়া গেল।

শস্যাদির দরে মন্দা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ঋণের বোঝা যে ক্রমশ দ্রুত ও নিশ্চিতরূপে বাড়িতে লাগিল তাহার প্রচুর প্রমাণ আর্থিক অনুসন্ধান পর্যদ কর্তৃক প্রকাশিত সাতটি জেলার ১৯৩৩ সনের মালিকচাষীর নমুনা (typical) পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য ঋণদানের ব্যবস্থা সংকুচিত হওয়াতে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ১৯৩৫ সনের বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইন এবং ১৯৩৯ সনের বঙ্গীয় মহাজনী আইন, ১৯৩৭ সনের পর ঋণভার বহুলপরিমাণে লাঘব করিয়া দিল বটে কিন্তু ইহাতে পল্লীর ঋণদান ব্যবস্থা প্রায় লোপ পাইল অথবা ইহা এমন সব নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইল যাহা চাষীর পক্ষে অধিকতর অকল্যাণকর। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে ২৯·০ শতাংশ মালিকচাষী পরিবার ঋণগ্রস্ত ছিল এবং প্রতি পরিবারের ঋণ গড়ে ৮৫৷৷০ টাকা ছিল; ১৯৪৪ সনে ঋণগ্রস্ত পরিবারের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬ ৭ শতাংশ হয় এবং পরিবারপ্রতি গড়ে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২·১ টাকা। ঋণের পরিমাণ হ্রাসে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কৃষকের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। আসল কথা এই যে, দুর্ভিক্ষের সময় বহু চাষী তাহাদের জমি মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে এবং নূতন ব্যবস্থায় জমির মালিক হইতে সে বর্গাদারে পরিণত হয়। ইহাতে প্রতি পরিবারের গড় ঋণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত লঘু দেখায়। সাধারণত নিজ মহাজনের নিকটই চাষী তাহার জমি বিক্রয় করিত। দখলী রেহানের রেওয়াজ প্রায় উঠিয়া গিয়া জমিই একেবারে হাতছাড়া হইতেছে। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৯ সন মধ্যে সাত বৎসরের হিসাবে দেখা যায় জমিবিক্রয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পরিচয় জমিবিক্রয়ের সংখ্যায় রহিয়াছে। সেই বৎসর ৪,০৮,৮৩৫ বিক্রয় কবালা রেজেস্ট্রী হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর রেজেস্ট্রী হইত পৌনে দুই লাখ হইতে দুই লাখ কবালা। কিন্তু ১৯৪৯ সনে রেজেস্ট্রী হইয়াছে ২,৪৫,৬৭৯। পক্ষান্তরে দখলী রেহান হ্রাস পাইয়া ৪,৬৫০ হইতে ৩৯৩-তে নামিয়াছে। দুর্ভিক্ষের অবসানে চাষী বুঝিল জমি বিক্রয় করা অপেক্ষা ঋণ করা ভাল। শস্যের দরবৃদ্ধিতে তাহার অনটনও কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। সুতরাং ১৯৪৩-এর বিরাট বিক্রয়সংখ্যা পাঁচ বৎসর পরে, ১৯৪৮ সনে, নামিয়া আসিল দুই লক্ষেরও নীচে। ১৯৪৬ সনে ঋণী চাষীর শতকরা হার ৫৩ ৭, ১৯৪৪ সন অপেক্ষা কম, কিন্তু ঋণ বাড়িয়া গিয়াছিল ১৯৪৪ সনের ৮২·১ টাকা হইতে ১৭৮·১ টাকায়।

১৯৪১ সন পর্যন্ত পেশাদার মহাজন, জমির মালিক বা জমিদার, সম্পন্ন কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সমবায় সমিতি চাষীকে ঋণ যোগাইত। ১৯৪৩ সনের পর হইতে মালিকচাষীর ঋণদাতা হিসাবে সম্পন্ন কৃষকের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সনে দেখা যায় যে ঋণের ১/৩ অংশই সে সরবরাহ করিয়াছে। কৃষির সহিত

লগ্নি কারবার যুক্ত করিয়া এই এক নূতন বিত্তবান কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব হইল।

চাষীর ঋণের টাকা কিরূপে ব্যয় হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, যে মজুর দ্বারা চাষ-আবাদ করায় তাহার ঋণের ৩৫ ৩৮ শতাংশ ও যে নিজের জমি নিজেই চাষ করে তাহার ঋণের ৪৪ ০১ শতাংশ খাদ্যদ্রব্য কিনিতেই খরচ হইয়া যায়। জীবনধারণের জন্য যে ব্যয় তাহাতে অর্থাগম হয় না যেমন হয় জমির উন্নতিবিধানের জন্য ব্যয় করিলে। সংক্ষেপে বলা চলে যে তাহার জমির উপার্জনে ব্যয় নির্বাহ হয় না বলিয়া চাষী ঋণ করে এবং উহা সম্পূর্ণ শোধের উপায় থাকে না বলিয়া তাহার ঋণভার বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

উৎসব ও মোকদ্দমার নেশা এবং অমিতব্যয়িতা চাষীকে ঋণে জড়িত করে, এই ভুল ধারণা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত সমিতি প্রদত্ত তথ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। তথ্যালোচনা করিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মোকদ্দমা ও উৎসব পল্লী-ঋণের অতি সামান্য অংশের জন্য দায়ী, চাষীর তথাকথিত অমিতব্যয়িতার মূলে রহিয়াছে তাহার দারিদ্র্য ; বর্তমানের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা উপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়।

কৃষিকার্য কিরূপে লাভজনক এবং এই ক্ষেত্রে নবাগতদের পক্ষে কৃষি লোভনীয় হইতে পারে কিনা তাহা মালিকচাষীর অবস্থার এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

ভাগচাষীর অবস্থা

অধিকাংশ ভাগচাষী বর্গা প্রথা অনুসারে অপরের জমির চাষ করিয়া থাকে। উৎপন্ন শস্য সাধারণত জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে আধাআধি ভাগ হইয়া থাকে। মালিকের অংশ খাজনা ও বর্গাদারের অংশ মজুরিরূপে গণ্য করা চলে। ১৯২৮ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে বর্গাদারদিগকে কৃষিমজুর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু ভূমিরাজস্ব কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৪০ সনে সম্ভবত ১/৫ অংশ ভাগচাষীর স্বকীয় জোত বা কোরফা জোত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুর অপেক্ষা বর্গাদারের মর্যাদা বেশি। অনেক বর্গাদারের নিজের জমি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যাইবার পর তাহারা সেই জমিতেই নূতন মালিকের ভাগচাষী হইয়াছে। আদিবাসী খণ্ডজাতীয় লোক, যেমন সাঁওতাল, পতিত ভূমি বা বনাঞ্চল আবাদ করিবার পর, জমির মালিক বা মহাজন উহা কিনিয়া নিয়া তাহাদিগকে ভূমিদাসে পরিণত করিয়াছে। অকৃষকেরা সাঁওতাল মালিক-চাষীদিগকে কি পরিমাণে ভাগচাষীতে পরিণত করিয়াছে তাহার বিবরণ ১৯৪৮ সনে মালদহে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, আইন ভঙ্গ করিয়া সাঁওতালদের জমি হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল ১৭৪ একর এবং বিচারালয়ের মাধ্যমে নিলাম করিয়া নেওয়া হইয়াছে ৮,৮৬৫ একর।

ভূমির স্বত্বের মধ্যে "দখলি" স্বত্বেরই মূল্য অধিক। অকৃষকেরা এই দখলিস্বত্ব লাভের চেষ্টায় মালিক চাষীদিগকে ভাগচাষীতে পরিণত করিয়াছে। ভাগচাষ ব্যবস্থার উপকারিতা না আছে এমন নয়। ইহা না থাকিলে বিধবা, নাবালক-নাবালিকা ও সাময়িকভাবে ক্ষেতের কাজে অক্ষম ব্যক্তিদের জমি পতিত পড়িয়া থাকিত। কিন্তু প্রকৃত চাষীকে নিরাপত্তা দান এবং অতিরিক্ত খাজনা হইতে রক্ষা করিবার একান্ত আবশ্যকীয় মূলনীতি বর্গা প্রথায় লঙ্ঘন করা হয়। খাজনার দিক হইতে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ অত্যন্ত বেশি। জমির উন্নতি সাধনে বর্গাদারের আগ্রহ থাকে না এই জন্য যে, তাহার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পূর্ণ ফল সে নিজে ভোগ করিতে পারে না। ভাল শস্য না জন্মিলে জমির মালিককে তাহার অংশ দিবার পর বাকি শস্যে তাহার চাষের খরচা উশুল হয় না। যাহার উপর কৃষিকার্য নির্ভর করিতেছে তাহার উৎসাহসঞ্চারের কোন ব্যবস্থাই যদি না থাকে তাহা হইলে কৃষির অবনতি ঘটিবে ইহা সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে বর্গাপ্রথাই উৎপাদন হ্রাস ও কৃষির অবনতির কারণ। ১৯০১ সন হইতে বর্গাদারের সংখ্যা ক্রমশ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা পরবর্তী এক অধ্যায়ে দেখান হইবে।

নিজের জমি না থাকায় ভাগচাষীর ঋণ সংগ্রহ করা কঠিন। এই জন্যে ১৯৪৬ সনের খাতকদের মধ্যে মাত্র ৬·১৯ শতাংশ ছিল ভাগচাষী। ভাগচাষী ঋণের ৫৫·৯৮ অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করিয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের অংশ যে তাহার অন্ন যোগাইতে পারে না, ঋণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয় তাহার প্রমাণ। জীবনধারণোপযোগী আয় অপেক্ষা কম উপার্জন তাহার চিরদিনের সমস্যা; জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা ভাবিবার তাহার অবসর কোথায় ?

কৃষিমজুরের অবস্থা

ভূমিহীন কৃষিমজুরের আর্থিক দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ঋণের অর্থব্যয়ের হিসাব হইতে। ১৯৪৬-৪৭ সনে ঋণের ৭১·৭০ অংশ ব্যয়িত হইয়াছিল খাদ্যের জন্য।

১৯৩৯-৪০ সনে ফসল কাটার সময়ে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আড়াই আনা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা এবং অন্য সময়ে দুই আনা আট প্যাই হইতে চার আনা পর্যন্ত ছিল। মজুরির গড় ছিল সওয়া তিন আনা হইতে সওয়া চার আনা। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বাড়িয়া গিয়াছিল পাঁচ গুণ। ১৯৪৭ ৫০ সন মধ্যে মজুরি তিন টাকার মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে।

কৃষিমজুর দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকেরা দিন-মজুর, নগদ টাকায় অথবা খাদ্য ও টাকায় দিনের হিসাবে তাহাদের মজুরি দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম কিষাণ; ইহাদিগকে স্থায়ী শ্রমিক বলা যায়। ইহারা চাষীর বাড়িতে বাস করিতে পারে অথবা নাও পারে। বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক হারে ইহাদের মজুরি দেওয়া হয়। যেসকল সম্পন্ন মালিক চাষীগণ মজুরের সাহায্যে জমি চাষ করায়, সাধারণত তাহারা কিষাণদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু অবস্থাপন্ন মালিক চাষীরাই কৃষাণদিগকে নিযুক্ত করে বেশি।

১৯৪৬-৪৭ সনের তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে, কৃষিমজুর বৎসরে গড়ে প্রায় চার মাস মজুরি খাটে না। যে আট মাস সে কাজ করে তাহার অর্ধেকের বেশি সময় করে অকৃষি কাজ। মজুরি না খাটিবার হেতু কাজের অভাব, নিজের গৃহস্থালী ও পর্বাদি, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিজ জমি চাষ ও বিবিধ। বৎসরে এক মাস সে কাজ পায় না। কৃষিকার্যের মজুরি ১৯৪৬ সনের নভেম্বরে এক টাকা দুই আনা চার পাইতে উঠিয়াছিল এবং ১৯৪৭ সনের মার্চের শেষার্ধে উহা তের আনা নয় পাইতে

নামিয়াছিল। অকৃষিকার্যের মজুরি সর্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছিল ১৯৪৭ সনের প্রথমার্ধে, এক টাকা পাঁচ আনা তিন পাই, এবং সর্বনিম্ন মজুরি দশ আনা ছয় পাই ১৯৪৬ সনের অগাস্টের দ্বিতীয়ার্ধে হইয়াছিল।

কিষাণেরা কৃষিকার্য ছাড়া ভৃত্যের মত মনিবের অনেক কিছু করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে মাসিক হারে বেতন দেওয়া হয়। মনিবের বাড়িতে বাস করে মাত্র শতকরা ২৮ জন। ভাগচাষীরাও কিষাণদের এক বড় অংশকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহা কেমন অদ্ভুত মনে হয়।

অধিকাংশ কৃষিমজুর পরিবারের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি মজুরি হইতে আসে। কিন্তু বেশি আয়ের স্তরে নিজেদের জমির শস্যাদি হইতে আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষিমজুরদের আয়ব্যয়ের হিসাব ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে বৎসরের শেষে অল্প কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত দুই একটি জেলায় সীমাবদ্ধ নহে, যেসকল জেলায় অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেক জেলাতেই উহা দেখা যায়। আয়ের অনুপাতে উদ্বৃত্তের হার সকল জেলায় মোটামুটি একরূপ।

কলকারখানার শ্রমিক অপেক্ষা ক্ষেতমজুরেরা বেশি মিতব্যয়ী ; গ্রাম্য পরিবেশে খরচ করিবার ক্ষেত্রও তাহার সংকীর্ণ। খাদ্যের জন্য সে ব্যয় বেশি করে এবং অন্যদিকে তাহার জীবনযাত্রার মান মিল মজুরদের অপেক্ষা নিম্ন।

ভূস্বামী, কৃষিক্ষেত্রের খাজনা প্রাপক ও জমির অ-চাষী মালিকদের অবস্থা, ১৯৩১-৫০

কৃষিবর্গের মধ্যে ভূমির মালিকদের ঋণ সর্বাপেক্ষা কম। ১৯৪৬ ৪৭ সনে দেখা গিয়াছে তাহাদের ঋণ গ্রামাঞ্চলের মোট ঋণের মাত্র ২ ৪৫ শতাংশ। প্রতি পরিবারের সুদী ঋণের পরিমাণ গড়ে প্রায় ৭২০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীবাসীদের অধিকাংশই কৃষিবর্গের চারি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পল্লী-ঋণের নির্ধারিত পরিমাণ ইহাদের পক্ষেই বেশি প্রযোজ্য। ১৯৪৬ ৪৭ সনের তদন্তের ফলে জানা যায় যে, ১৯৭৬ সনে বঙ্গের শতকরা পঞ্চাশটি গ্রাম্য পরিবার ঋণগ্রস্ত ছিল কিন্তু পর বৎসর উহা হ্রাস পাইয়া হইয়াছিল ৩১ শতাংশ। শস্যাদির দর বৃদ্ধির জন্য বহু পরিবার ঋণমুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৯৩৫-৪৭ সন মধ্যে ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ উভয়ই হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় অনেকে তাহাদের জমি মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। দরিদ্রেরা ঋণপরিশোধে অক্ষম হইয়া জমি সাফ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।

ধান ও পাট কৃষকশ্রেণীর হাতে অর্থ আনিয়া দেয়। চালের দর উঠানামা করে। ১৯৫১ সনের জানুয়ারির প্রথম ভাগে কোন জেলায় ১৬ টাকা কোথাও বা ৩২ টাকায় উঠিয়াছিল। শস্যের মধ্যে পাটের পরিমাণ সর্বাধিক এবং ইহাতে বেশ মোটা টাকা আসে। পাটের দর কৃষিশ্রেণীর আর্থিক অবস্থার পরিচায়ক।

ভারতীয় কলে ব্যবহারের জন্য বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট পাটের প্রয়োজন (এক গাঁট- ৪০০ পাউন্ড)। সাধারণত ২০ হইতে ২৫ লক্ষ গাঁট পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের সময় প্রতি মণ মধ্যম পাটের দর ১৭ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাঁচা পাট রপ্তানি দিন দিন দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫০-৫১ সনে উহার পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। ভারতীয় চটকল দেশী পাটের উপর বহুলপরিমাণে নির্ভর করায়, বিদেশে রপ্তানির জন্য অল্পই উদ্বৃত্ত থাকে। ১৯৪৮ সনে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ের ½ অংশ এবং ডলারের শতকরা ৬৬ ভাগ পাট হইতে প্রাপ্ত। ভারতীয় শিল্পের মধ্যে পাটের স্থান সর্বাগ্রে। সুতরাং ভারত গভর্নমেন্ট পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য চেষ্টিত। পাটের জমি ১৯৪৯ সনের ৮,৩৪,০০০ একর হইতে ১৯৫১ সনে ১৪,৪৯,০০০ একরে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রতি একরে ২ ৩৩ হইতে ৩ ১৫ গাঁট পর্যন্ত পাট জন্মে। ভারতে ৩০-৩৫ লক্ষ গাঁট জন্মিবার পরও ভারতের চটকলের জন্য প্রয়োজনীয় বাকি পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি করা আবশ্যক। পাটের দর কম রাখিবার জন্য সরকার এবং মিল মালিকগণের চেষ্টা সত্ত্বেও আরও কিছুকাল পাটের দর শক্তই থাকিবে মনে হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৫০ সন পর্যন্ত পাটের দরে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কৃষিবর্গের লোকদিগের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ধারণা করা যায়। বিশ বৎসর নানা বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সম্বল লইয়া কিরূপে ইহারা এই সকল বিপদের সম্মুখীন হইল তাহা দেখা গেল। জনসংখ্যার তুলনায় জীবিকার ব্যবস্থা অতি সংকীর্ণ, কোন কোন সময় তাহা সংকটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভিক্ষ কমিশন দেশের আর্থিক স্তর নিম্ন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন; এই বিবরণ তাহারই সমর্থন করিতেছে। কৃষির উপরের চাপ শিল্পপ্রসারের দ্বারা হ্রাস করা হয় নাই, জনসংখ্যার এক বিপুল অংশের জীবিকার প্রান্ত সীমায় থাকিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখে তাহারা আর টিকিয়া থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। জীবনযাত্রার মান নিম্ন; কি স্বাস্থ্য, কি বিত্ত, কোনটাতেই বিপদে রক্ষা পাইবার মত সঙ্গতির অভাব।

এখন অ-কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থার পরিচয় দিয়া জনগণের আর্থিক চিত্রাভিত্তি পূর্ণ করা হইবে।

অ-কৃষিজীবীদিগকেও চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে উপজীবিকার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী বলা হইয়া থাকে। অ কৃষি উৎপাদন পঞ্চম শ্রেণী। প্রাথমিক, মৌলিক (Basic) ও গৌণ (Secondary) শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই শ্রেণীর এক প্রান্তে গোচারণ এবং অপর প্রান্তে উচ্চাঙ্গের শিল্পায়িত কর্মশালা, মিল ও কারখানা। বংশবৃদ্ধির জন্য গবাদি পশুপালন, হাঁস মুরগি প্রভৃতি পালন, ফলের বাগান, সবজি বাগান, চা বাগান, পানের বরজ প্রভৃতি, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ, কাঠকাটা, পশু পাখি ও মৎস্য শিকার প্রভৃতি কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক উপজীবিকা হিসাবে অনুসরণ করা হয়। এই সকল কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কৃষি-মজুরদের মজুরির সমতুল্য। সুতরাং এই বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে চা, খনি ও শিল্পের সুসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থার আলোচনা করা হইবে।

শিল্প-শ্রমিকঃ ১৯৩১-৫০, এই বিশ বৎসর ব্যাপিয়া নিজেদের চাকরির শর্তাদির সর্বপ্রকার উন্নতিবিধানের নিমিত্ত শ্রমিকেরা ধর্মঘট পালন ও অন্যান্য অশান্তি ও আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া মালিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে।

১৯৩০ সন দারুণ আর্থিক সংকট নিয়া আরম্ভ হয়। ১৯৩১ সন হইতে ভারতের সকল শিল্পেই ইহার ফল প্রকাশ পায়। চা, কয়লা, পাট এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে মন্দা শুরু হয় ১৯৩১ সনে। ১৯৩৫ সন হইতে কয়লার বাজারে কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল অন্যান্য শিল্পের চরম দুঃসময় বুঝি কাটিয়া গিয়াছে। অন্যপক্ষে শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ গঠনের পর ১৯৩৯-৪০ সনে এখানে সেখানে ধর্মঘট চলিতে লাগিল। শ্রমিক সঙ্ঘের সংখ্যা পরবর্তী কাল হইতে অল্প হইলেও শিল্পের উপর তাহাদের প্রভাব ছিল বিস্তর। পাটের দর কমই রহিয়া গেল। পাটচাষী পাট বিক্রয় করিয়া সকল সময় উৎপাদনের ব্যয়ের উপর কোন লাভ পাইত না। নিম্নতম লাভের নিশ্চয়তা দানের জন্য পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। চায়ের বাজারে মন্দা ও ন্যায্য দর পর পর আসিতেছিল। অন্যান্য শিল্প কোন প্রকারে টিঁকিয়া রহিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে জাপানের যোগদানের পর ভারতের পূর্বাঞ্চল রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। ইহার ফলে শিল্পজগতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল ; অল্পকালের মধ্যে পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল এবং যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহের জন্য ছোট ছোট শিল্পের বিরাট ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিল। চা, কয়লা, পাট নবজীবন লাভ করিল। পাটচাষের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক অর্থকর শস্য উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইবার ফলে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের প্রতি কৃষক নজর দিল কম। ইহার শোচনীয় পরিণাম দেখা গেল পঞ্চাশের মন্বন্তরে। যুদ্ধের সময় মাঝারি পাটের দর প্রতি মণ ১৭ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত-পাক চুক্তির পর ১৯৫১ সনের এপ্রিলে পাটের দর মণ প্রতি ১০০ টাকার বেশি উঠিয়াছিল। চায়ের দরও কম চমকপ্রদ হয় নাই। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত চায়ের বাজার ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল।

কয়লা সাধারণভাবে শিল্পের গতিনির্দেশক। কয়লার উৎপাদন ১৯৩১ সনের ৫৮,১০,১৮৪ টন হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৯ সনে ৮৮,০৩,৮১৩ টন হইয়াছিল। শ্রমিকের সংখ্যা ৪৪,৬৪২ হইতে বাড়িয়া হইয়াছিল ৮৯,৫৭৬। উনিশ বৎসরে কয়লার উৎপাদন দেড়গুণের বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং শ্রমিক দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি ১৯৪৯ সন পর্যন্ত তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সেন্ট্রাল পে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাহাদের সুপারিশসহ ১৯৪৭ সনের মে মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। উহাতে ভারতের প্রত্যেক শ্রমের ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মজুরি ও বেতনের মান নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর হইতে অন্তত কমিশনের নির্দিষ্ট হারে মজুরি ও বেতন আদায় সকল শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য হইয়াছিল। এইরূপে কমিশনের সুপারিশ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের নিম্নতম দাবি হইয়া দাঁড়াইল। নিম্নতম মজুরি বিধি (The Minimum Wages Act, 1948) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য এই দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। ১৯৪৫-৪৭ সনের শ্রমিক আন্দোলন এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল। শ্রমিক-বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতিষ্ঠিত সালিসী সভার (Tribunal) সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি, বেতন, ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। যাহারা কায়িক শ্রম করে ট্রাইবিউন্যাল তাহাদের মজুরির হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই অনুপাতে অফিস কর্মচারীদের ব্যবস্থা হয় নাই। তাহাদের নিম্নতম মাসিক বেতন প্রতিক্ষেত্রে ৯০ টাকা হইতে ১১০ টাকা মাত্র।

নিরাপত্তা আইন, অর্ডিনান্স জারি এবং অধিকাংশ শ্রমিক নেতার কারাবাসের জন্য ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ সন মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন নির্জীব হইয়া পড়ে। তখন নেতৃত্ব ছিল সাময়িক ও আন্তরিকতাহীন ; সুতরাং ইহার বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ট্রাম কর্মিগণ এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্মিগণের ধর্মঘটে শ্রমিক আন্দোলনের বিরাম ভঙ্গ হয়। কর্মীদের আংশিক সাফল্য আন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। রেজিস্ট্রীকৃত সঙ্ঘের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। ১৯৩৯-৪০-এর ১৮৮, ১৯৪৪-৪৫-এ হইল ৩৮২ এবং পর বৎসর ইউনিয়নের সংখ্যা ৬০১ দাঁড়াইল। ১৯৪৯-৫০ সনে রেজিস্ট্রীকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১,১৫৭ এবং উহার ৫৪৫টি সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা ৪,৮৯,১৫৮ ছিল।

১৯৪৭ সাল হইতে শ্রমিক সঙ্ঘের সর্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ পরিবর্তন কয়েকটি যুক্ত সঙ্ঘের অভ্যুত্থান। বেশ কিছু সংঘ এখনও কোন দলভুক্ত নয় কিন্তু প্রধান যে কয়টি দলের সহিত শ্রমিক সংঘসমূহ যুক্ত হইয়াছে তাহা হইতেছে কংগ্রেস, সমাজ-তন্ত্রী দল, শ্রমিকদের ভারতীয় যুক্ত সংঘ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক শ্রমিক সংঘ কংগ্রেস, ভারতীয় কমিউনিস্ট দল প্রভৃতি। শ্রমিক সংঘ সম্মিলিত দাবি পেশ, মজুরি বৃদ্ধি, কর্মাবস্থার উন্নতিসাধন এবং কর্মের নিরাপত্তা বিধান ব্যতীত অপর কোন কল্যাণকর কার্য অতি অল্পই করিয়া থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন চা-বাগানে সম্প্রসারিত হইবার ফলে এক বৎসরের মধ্যে ৭২টি সংঘ গঠিত হয়। ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বরে রাজ্যপাল নিম্নতম মজুরি বিধির বলে দার্জিলিঙ, তরাই ও জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিক ও কেরানীদের নিম্নতম মজুরি ও বেতন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

দাবিপূরণের জন্য শ্রমিক সংঘ ধর্মঘটের অথবা বিরোধ-মীমাংসার জন্য গঠিত সালিসী সভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রমিক কল্যাণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা এইরূপ—

(১) **স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা:** প্রত্যেক চটকলের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারখানা রহিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতির যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। কয়েকটি কলে হয় নিজেদের ডাক্তারখানা আছে অথবা শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় কোন হাসপাতাল বা ডাক্তারখানার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে শ্রমিকদের জন্য কয়েকটি ডাক্তারখানা এবং অল্পসংখ্যক হাসপাতাল আছে। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থানীয় কোন হাসপাতাল, ডাক্তারখানা অথবা চিকিৎসকের সহিত শ্রমিকদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া রাখে।

(২) **শিক্ষাব্যবস্থা:** তেত্রিশটি চটকলে শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় চটকল সমিতি পরিচালিত পাঁচটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র ও পাঁচটি বিদ্যালয় আছে। বয়স্ক শ্রমিকদের হিতার্থে ঐ সকল কেন্দ্রে নৈশ বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে।

দুইটি কেন্দ্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সেলাই ও রান্না শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সময় সময় বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও করা হয়।

(৩) **খাবারঘর:** চটকল, কাপড়ের কল ও কলকব্জার কারখানায় অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কর্মীদের চা, জলখাবার ও পূর্ণ খাবারের ব্যবস্থা আছে। চটকল সমিতির অধীন ৬২টি চটকলে খাবারঘর রহিয়াছে। অপর বেশ কয়েকটি চট ও কাপড়ের কলে চা, জলখাবার ও রান্না খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কলকবজার কারখানায়ও খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে। অন্যান্য কলকারখানায় খাবারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৪) **বিশ্রাম ও অবসরবিনোদন:** কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের ব্যবস্থা আছে। ট্রাইবিউন্যালের নির্দেশ অনুসারে চট ও বস্ত্রশিল্পে যথোপযুক্ত বিশ্রামাগার নির্মাণ করিতে হইবে। কলকবজার কারখানায় বর্তমানে বিশ্রামঘরের কোন ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিশ্রামাগার, খেলাধূলা, নাট্যাভিনয় ও গ্রন্থাগারের যে সুবিধা আছে তাহা কেবলমাত্র পরিদর্শক কর্মচারী ও কেরানীগণ উপভোগ করিয়া থাকে।

ভারতীয় চটকল সমিতি পরিচালিত পাঁচটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে চটকলের শ্রমিকদের জন্য ঘরে ও বাহিরে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে। ঘরের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থার মধ্যে আছে বিতর্কসভা, আলোচনা, নাট্যাভিনয়, গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ প্রভৃতি। বাহিরের খেলাধূলার মধ্যে ফুটবল খেলা, দলবদ্ধ শরীরচর্চা, কুস্তি প্রভৃতি প্রধান। বিভিন্ন মিলের মধ্যে ফুটবল খেলা ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বাইশটি চটকলে খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের কেন্দ্র রহিয়াছে।

চটকল, কাপড়ের কল ও কলকবজার কারখানার জন্য প্রতিষ্ঠিত ট্রাইবিউন্যাল শ্রমিক কল্যাণের জন্য মালিকদিগকে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়াছেন। উহা কতদূর কার্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা হইতেছে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বিধিতে দুর্ঘটনার ফলে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু, স্থায়ী অঙ্গহানি, স্বাস্থ্যহানি, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি অথবা সাময়িক অক্ষমতা ঘটিলে তাহার জন্য মালিকের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সনে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে ৮, চা-বাগানে ১২, চটকলে ১৭ এবং খনিতে ৮২ জন শ্রমিকের কাজ করিবার সময় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহার জন্য বিচারালয়ের নির্দেশে মালিকদিগকে যথাক্রমে ১৭,২৬৪ ; ৯,৬২০ , ৩৫,৬১৪ ও ১,২৫,৬৪৪ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারিত হয় শ্রমিকের মজুরি বা বেতনের হার অনুসারে। ইহাই চা-বাগানের ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইবার কারণ।

ব্যবসায়-বাণিজ্য, উপজীবিকার ষষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৩১-৫০

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে ১৯৩১-৪০-এর দশ বৎসর বিশেষ সুদিন বলা চলে না। ১৯৩১ সনের পরেই মন্দা শুরু হইয়া গেল। ১৯৩৬ সনের পরে একটু উন্নতি হইয়াছিল। এই দশক ভরিয়া একটা সর্বব্যাপী নিরুদ্যম ও মন্দার ভাব ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও ১৯৪১ সন পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিতে থাকে। ১৯৪২ সনে রণাঙ্গন নিকটবর্তী হইবার পর ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রচণ্ড বেগ সঞ্চারিত হয়। মাল ধরিয়া রাখিবার ও চোরা-কারবারের সুযোগ পাইয়া ক্রমশ বহুলোক এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় দোকান চালু রাখিবার প্রশ্ন আর রহিল না। প্রত্যেকটি ছোট দোকান ভাবী সোনার খনি হইয়া উঠিল। বড় কারবার ও পাইকারী ব্যবসায়ে সৃষ্ট নূতন ধনীর বড় এক সম্প্রদায় ছাড়াও ব্যবসায়ে খাটাইবার মত সামান্য অর্থও যাহার ছিল, সে-ই ব্যবসায়ে নামিয়া পড়িল। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই বানডাকা ১৯৪৮এর শেষ অবধি স্থায়ী হইল। ১৯৪৯ সনে ভাঁটা আসিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল কিন্তু ১৯৫০ সনে কোরিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যবসায়ে আবার জোর ধরিল। বাজার স্থির রাখিতে বঙ্গভঙ্গও সাহায্য করিয়াছে। এই দশকে ব্যবসায় কিরূপ লাভজনক হইয়াছিল ১৯৪৫ সনে মুদ্রামান হ্রাসের ব্যবস্থায়, আয়কর বিভাগের বিশেষ তদন্তের ফলে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় উপার্জিত গুপ্ত মুনাফার পরিমাণ স্বেচ্ছায় প্রকাশের দ্বারা তাহার সামান্যমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

দোকানকর্মচারী আইন পাস করিয়া এই দশকের প্রথম হইতেই কর্মচারীদিগকে সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন ১৯৪০ সন পর্যন্ত অতি কম ছিল। ১৯৪৫ সনের পরে উহা পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া যায়। ছোট খুচরা দোকানেও কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। সদাগরী অফিসে বেতন ভাতা প্রভৃতি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে দেশের বহু মাথাওয়ালা কর্মদক্ষ ব্যক্তি সরকারী কার্যে প্রবেশ না করিয়া সদাগরী অফিসের কাজ গ্রহণ করিতেছে। অর্থ নহে, চাকুরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, কেবলমাত্র এই দুই-এর জন্য এখনও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা সরকারী চাকরি পছন্দ করিয়া থাকে।

পরিবহন, উপজীবিকার সপ্তম শ্রেণী

পরিবহন দুইপ্রকার, যান্ত্রিক ও সাধারণ। যান্ত্রিক পরিবহনের অধিকাংশ মালিক হিসাবে গভর্নমেন্টের এবং কর্মী হিসাবে কয়েকটি শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের করায়ত্ত। যান্ত্রিক পরিবহন-ব্যবস্থার মধ্যে সরকারী রেলপথ, সমুদ্র ও নদীর জলপথ, জাহাজ কোম্পানি, বাস ও লরীর মালিক ও কর্মিগণের সংঘ, ট্রাম, বিমানপথ এবং সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা প্রধান। ব্যক্তিবিশেষের পরিবহনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, মোটর গাড়ির চালক ও ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানদিগকে গৃহ ভৃত্যরূপে উপজীবিকার অষ্টম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যন্ত্রচালনায় দক্ষতা আছে বলিয়া ইহারা দরকষাকষি করিয়া বেতন ঠিক করিতে পারে। ইহাদের নিম্নস্তরের বেতনও সরকারী বেয়ারা, দপ্তরী, দরোয়ান প্রভৃতি হইতে খারাপ নহে। ডাক ও তার বিভাগ সংবাদ বহন করিয়া থাকে বটে কিন্তু এই দুই বিভাগের কর্মচারী পরিবহনের অন্তর্ভুক্ত নহে, উপজীবিকার অষ্টম শ্রেণীভুক্ত। মোটামুটি বলা চলে ১৯৩১ ৪০ দশকে পরিবহনে নিম্নতম উপার্জন ছিল ১১ টাকা হইতে ১৩ টাকা এবং মধ্যশ্রেণীর কর্মচারীদের মাসিক বেতন ৩৫ টাকা হইতে ৮০ টাকা ছিল। প্রাইভেট মোটর-চালক ও কোচম্যানদিগকে ২২ টাকা ও ২৫ টাকার মধ্যে দেওয়া হইত।

মূল বেতনের সহিত যৎসামান্য খাদ্যশস্যের ভাতা যোগ করিয়া বেতনের এই হার ১৯৪২ সন পর্যন্ত চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের আয় ১৯৩৯ সনের আয়ের প্রায় পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যবিত্ত কর্মীদের নিম্নতম মাসিক বেতন প্রায় ১০০ টাকা হইয়াছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও তাহাদের কর্মীদের বেতনাদি বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। বিশেষ ট্রাইবুন্যালের রায় অনুসারে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানির সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মীর নিম্নতম উপার্জন ৬৭৷৷০ টাকা এবং নিম্নতম কেরানীর সর্বনিম্ন বেতনাদি ৯০ টাকা হইতে ১০০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। বাস, লরী-চালক ও মোটর-পরিষ্কারকদের যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে অসামরিক কার্যে তাহাদের অভাব ঘটিল। সুতরাং অসামরিক ক্ষেত্রে তাহাদের বেতন বাড়িয়া গেল। ১৯৪৫ সনের পরে মোটর চালকের মাসিক ৯০ টাকার বেশি বেতনই নিয়ম হইল। পরিষ্কারকের বেতন ১৯৩৯ সনে ছিল ১০ টাকার কাছাকাছি, ১৯৪৫ সনে উহা ৪৫ টাকা হইল। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু কেবলমাত্র সুসংগঠিত সংস্থাতেই উহা জীবিকার ব্যয়ের অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের যান গরুর গাড়ি ও নৌকা। যুদ্ধের পূর্বে একটি গোটা গাড়ি ও নৌকার ভাড়া মাইল-প্রতি এক আনা ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় পর্যন্ত সেই হারই চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষে অনেক বলদের মৃত্যু হইয়াছিল ; মালিক অন্নাভাবে বলদ, গাড়ি ও নৌকা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে পরিবহনের ব্যয় হঠাৎ অনেক বাড়িয়া গেল। একটি গাড়ি বা নৌকার পরিবর্তে প্রতি মণ মাল এক মাইল বহনের ভাড়া এক আনা হইল। গ্রাম্য পরিবহন কৃষি বর্গের প্রথম তিন শ্রেণীর উপার্জনের অন্যতম প্রধান উপায়।

অন্যান্য চাকরি এবং উপার্জনের বিবিধ উপায়, উপজীবিকার ৮ম শ্রেণী

এই শ্রেণীতে সর্বপ্রকার আয়ের স্তর থাকিলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক"দের আয়ের স্তরই ইহাতে প্রধান। সুতরাং এই শ্রেণীর আয়ের আলোচনাই এখানে করা হইবে।

১৯৩৫ সনে এল্ এ চ্যাপম্যান বাঙলার গভর্নমেন্টের নিকট এক রিপোর্ট পেশ করিয়া বলেন যে, একজন পিয়নের বেতন ১৩ টাকা এবং একজন অধস্তন কেরানীর বেতন ৩৫ টাকা হইলেই তাহারা তাহাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম। গভর্নমেন্ট কালবিলম্ব না করিয়া এই সুপারিশ অনুসারে বেতনের হার বাঁধিয়া দিলেন। ১৯৪১ সনে এই বেতনের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যশস্যের ভাতা যুক্ত হয়। পরবর্তী কালে গভর্নমেন্ট কোন কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের জন্য কমমূল্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দোকান খুলিয়া দেন। ইহা ছাড়া বেতনের হার অনুসারে মাগ্গিভাতা দিবারও ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ১৯৪৬ সনে "ভদ্রলোক" কর্মচারীদের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের কর্মচারীদের আয়ব্যয়ের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। বাঙলার পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (Statistical Bureau) বাঙালী "ভদ্রলোক" কর্মচারীদের বিষয় অনুসন্ধান করিলেন।

কলিকাতা বাদে বঙ্গদেশ ও আসামের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসন্ধানের ফল এইরূপঃ

২৯ শতাংশ পরিবারের আয় ও ব্যয় প্রায় সমান ; ৬৬ শতাংশ পরিবারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি ; মাত্র ৫ শতাংশের আয় বেশি, ব্যয় কম। ২৭৬টি পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৭৭টি ঘাটতি ও ২৩টি বাড়তি বাজেট। ঘাটতি কেন হয়, অনাবশ্যক জিনিস কিনিবার ফলে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে খাদ্যের জন্যই সর্বাধিক ব্যয় হইয়া থাকে, গড়ে শতকরা ৪১·৬ ভাগ। আয় যাহাদের বেশি, খাদ্যের ব্যয়ও তাহাদের বেশি। অর্থাভাবে অধিকাংশ বাঙালীর উপযুক্ত পরিমাণে দুধ, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস ও ফল খাওয়া সম্ভব হয় না। দেহে থাকে চর্বি ও প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের জন্য চিরক্ষুধা। বেতন বাড়িবার পর প্রথম সুযোগেই এই ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করা হয়। কম আয়ের লোকের ভাত ও ডালের ব্যয় বেশি। ২৫০ টাকার অধিক যাহাদের আয় তাহাদের দুধ, ঘি ও মাছ মাংসের ব্যয় বেশি। চা, চিনি, মিঠাই প্রভৃতি খাদ্যের ব্যয় ১০০ টাকার কম আয়ের পরিবারে যাহা হয় ৩০০ টাকার অধিক আয়ের পরিবারসমূহের মোট ব্যয় তাহার পৌনে পাঁচ গুণ।

শতকরা ৭৪টি পরিবার ভাড়াটে বাড়িতে এবং ২৬টি নিজ বাড়ি অথবা বিনা ভাড়ার বাড়িতে বাস করিয়া থাকে। শতকরা ৫৪ ৮টি পরিবারের বাসকক্ষের সংখ্যা ২ ; ১৬·৭ শতাংশের ৩, ৯ ৫ শতাংশের ১ এবং অবশিষ্টের ৪ বা তদূর্ধ্ব বাসগৃহ ছিল। ৫৭ শতাংশ পরিবারের প্রতি বাসগৃহে দুই তিন জন করিয়া বয়স্ক পুরুষ এবং ৪৩ শতাংশ পরিবারের এক বা দুই জন বয়স্ক পুরুষ প্রতি গৃহে থাকে। এই অবস্থায় মধ্যশ্রেণীর "ভদ্র"-লোকদের চিরাভ্যস্ত শালীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শিশুদের পক্ষে ইহার ফল শুভ হইতে পারে না।

যেসকল পরিবারের অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫২·২ শতাংশ ছিল একান্নবর্তী পরিবার। প্রতি পরিবারে গড়ে ৬·৯ জন লোক থাকিত এবং পরিবার হইতে দূরে থাকিত ১·২ জন। সুতরাং পরিবারের মোট লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৮·১। প্রতি পরিবারের উপার্জক সংখ্যা গড়ে ১·১০। কোন পরিবারেই নারী উপার্জক ছিল না। প্রত্যেক উপার্জকের পোষ্যসংখ্যা নিম্নতম আয়ে ৪·৩ জন হইতে ১৫০-২০০ টাকা আয়ে ৭ ০ জন পর্যন্ত ছিল। আর্থিক চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা আয়ের পর্যায়ে। এই পর্যায়ে এক জনের উপার্জনের উপর নির্ভর করিত ৫·৪ জন বয়স্ক পুরুষের সমতুল্য পোষ্য। নিম্নতম আয়ের শ্রেণীতে একজন উপার্জকের উপর ৩·৫ জন বয়স্ক পুরুষের সমতুল্য পোষ্য নির্ভর করিত।

বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িক পত্র "ক্যাপিট্যাল"এ প্রকাশিত কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক অনুসারে ১৯৫১ সনের নভেম্বরে সর্বপ্রকারের মোট ব্যয় ১৯৩৯ সনের অগাস্টের ব্যয়ের প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খাদ্যের ব্যয় সাড়ে চার গুণের বেশি এবং কাপড়ের ব্যয় প্রায় পাঁচ গুণ বাড়িয়াছিল। ধাঁধার মত শোনালেও এ কথা সম্ভবত সত্য যে অন্যান্য শহরের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক প্রতিবারেই কলিকাতার সূচক অপেক্ষা বেশি ছিল। কলিকাতায় রেশনের জন্য নির্দিষ্ট দরে চাউল ও গম পাওয়া যায়। অন্য শহরে খোলা বাজারে উহা কিনিতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু কলিকাতায় সস্তা দরে পাওয়া যায়। ১৯৪৬-৪৮ সনের মধ্যে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তখন যে ব্যয়ের হার ছিল এখন তদপেক্ষা উহা বেশি। উপজীবিকার পঞ্চম শ্রেণীতে সুসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত কর্মিগণ ট্রাইবিউন্যালের সাহায্যে তাহাদের মজুরি ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়া নিয়াছে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেতনভোগিগণ ১৯৪৭-৪৮এর পরবর্তী ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে বেতনাদি বৃদ্ধি করিয়া নিতে পারে নাই। এজন্যই শিল্প ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের

অপেক্ষা কৃষিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এখন অসন্তোষ বেশি।

ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে উপজীবিকার আট শ্রেণীর মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৮ম শ্রেণী সর্বাপেক্ষা মন্থর। ১ম, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর আয় নড়াচড়া করে সবচেয়ে কম। ৮ম শ্রেণী দর কষাকষিতে অতিশয় অপটু ও অদ্ভুত। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণী ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করিয়াছে। মোটের উপর যে পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই পরিমাণে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয় নাই। টাকার হিসাবে সাধারণত উপার্জ্জন বাড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্তু ভোগ্য বস্তু অথবা সঞ্চিত সুবিধার দিক হইতে অবস্থার উন্নতি ঘটে নাই।

অপরাধ ও দেওয়ানী মামলা

জীবনসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়াতে যুদ্ধাবসানের পর হইতে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধান্তে নবসংগঠিত সৈন্য ও তাহাদের অনুগামীদের দল ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে গুন্ডা প্রকৃতির বহু লোক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পুলিস গ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা ১৯৪১ সনে ছিল ১,৫৩৮; ১৯৫০ সনে উহা ৩,৬৪৬ হইয়াছে।

টাকা দাবির মোকদ্দমা ১৯৪১ সনের ৩১,১৭৮ হইতে ১৯৫০ সনে ২৫,৬১০ এ নামিয়া আসিয়াছে। খাজনার মোকদ্দমা ১৯৪১ সনে সওয়া লক্ষের উপর ছিল। ১৯৫০ সনে উহার সংখ্যা নব্বই হাজারের কিছু বেশি। স্বত্বের মোকদ্দমার সংখ্যা ১৯৫০ সনে ২৪,২৬৬, ১৯৪১ সন হইতে ৭ হাজার বেশি।

প্রথম অধ্যায়

লোক-পরিচয়

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন রাজ্যের সহিত তুলনা

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার গতি ও প্রকৃতির আলোচনা করিবার পূর্বে ভারতীয় রাজ্যসমূহের এগারটির সহিত তুলনায় ইহার বিশিষ্টতা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইবে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ, এই নয়টি অঙ্গ রাজ্য ভারতীয় সংবিধান অনুসারে "ক" শ্রেণীর অন্তর্গত। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন "খ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্য ছয়টির অন্যতম। আয়তনে মহীশূর পশ্চিমবঙ্গ হইতে কিঞ্চিদধিক এক হাজার মাইল ছোট। ত্রিবাংকুর কোচিন বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার মিলিত আয়তনের প্রায় সমান। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল। "ক" শ্রেণীর রাজ্যসমূহের মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম। পঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৬,৬০৩ বর্গমাইল বড়। উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ; বিহার সওয়া দুই গুণ; আসাম প্রায় পৌনে তিন গুণ; বোম্বাই প্রদেশ পৌনে চার গুণের সামান্য কম; উত্তরপ্রদেশের আয়তন বোম্বাই-এর আয়তন অপেক্ষা ২,০৭৫ বর্গমাইল বেশি; পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজের এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা ছোট; মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের সওয়া চার গুণ।

আলোচ্য এগারটি রাজ্যের মধ্যে আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম হইলেও লোকসংখ্যায় (২,৪৮,১০,৩০৮) ইহার স্থান পঞ্চম। বসতির ঘনতায় (৮০৬), এই রাজ্যের স্থান কেবলমাত্র ত্রিবাংকুর কোচিনের (১,০১৫) নিম্নে। "ক" শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ঘনতা সর্বাধিক। আসামের প্রতি বর্গমাইলে যত লোক বাস করে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে বাস করে তাহার আট গুণ লোক। প্রতি বর্গমাইলে মধ্যপ্রদেশের পাঁচ গুণ লোক পশ্চিমবঙ্গে বাস করে। এই রাজ্যের ঘনতা উড়িষ্যার সওয়া তিন গুণ, বোম্বাই ও পঞ্জাবের আড়াই গুণের বেশি, মাদ্রাজের প্রায় দ্বিগুণ এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের প্রায় দেড় গুণ। জনবিরল সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুন্দরবনের ১,৬৩০ বর্গমাইল বাদ দিয়া হিসাব করিলে পশ্চিমবঙ্গের ঘনতা ৮৫১ হয়। নদীগর্ভ ও অন্যান্য জলভাগ না ধরিলে ঘনতা দাঁড়ায় ৮৭৫। ঘনবসতির জন্য সকল দেশের মধ্যে জাপানের স্থান প্রথম এবং ইংলন্ড ও ওয়েল্‌সের স্থান দ্বিতীয়। ঘনতায় পশ্চিমবঙ্গ ইংলন্ড ও ওয়েল্‌সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা-লঘিষ্ঠতা পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতি হাজার পুরুষে উড়িষ্যায় নারী ১,০২২, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ১,০০৮, মাদ্রাজে ১,০০৬, মধ্যপ্রদেশে ৯৯৩, বিহারে ৯৮৯, মহীশূরে ৯৪৯, বোম্বাই প্রদেশে ৯৩২, উত্তরপ্রদেশে ৯১০, আসামে ৮৭৯, পঞ্জাবে ৮৬৯ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ৮৫৯ পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্যের স্বাভাবিক জনগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস এবং জীবিকার অন্বেষণে শিল্পাঞ্চলে আগত অবাঙালী পুরুষের সংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি নারীর এই সংখ্যাল্পতার কারণ।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্য নারীর স্বল্পতারই পরিণাম। জনসংখ্যার ৩·১ শতাংশ অপারিবারিক জীবনযাপন করিয়া থাকে। দেশে স্ত্রী ও সন্তানাদি রাখিয়া যাহারা পশ্চিমবঙ্গে অর্থোপার্জন করিতে আসে তাহাদের অনেকের বাসস্থান মেস, বোর্ডিং, গাড়িবারান্দা বা ফুটপাথ। উদ্বাস্তু শিবির, ছাত্রাবাস, সেনানিবাস, পুলিস ব্যারাক প্রভৃতি অপারিবারিক জীবনযাত্রীদের সংখ্যা স্ফীত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পঞ্জাব ব্যতীত অন্য সকল রাজ্যে এই হার অতি অল্প।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যা গড়পড়তায় ৪·৯। কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার পরিবার ইহা অপেক্ষা অল্প ছোট। অন্যান্য রাজ্যে পাঁচ জনের অধিক লোক নিয়া পরিবার গঠিত। মাদ্রাজে প্রতি পরিবারের লোকের গড় ৬। আর্থিক দৈন্যের দরুন পরিবারে বাড়তি লোক রাখিবার আর উপায় নাই। ভৃত্যাদির সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের পরিবার ছোট হইবার প্রধান কারণ। আর্থিক সংকটের জন্য বাঙলার বহুবন্ধনবিশিষ্ট সমাজে ভাঙন ধরিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪১ সনের লোকের উপর ২৯,৭৩,০১৩ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সনের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২,৪৮,১০,৩০৮। দশ বৎসরে গড় বৃদ্ধির হার শতকরা ১২·৭। কিন্তু বাড়তি লোকের মধ্যে ২০,৯৯,০৭১ জন উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু দ্বারা লোকবৃদ্ধি স্বাভাবিক বৃদ্ধি নহে। উদ্বাস্তু বাদ দিয়া বৃদ্ধির সংখ্যা মাত্র ৮,৭৩,৯৪২। ইহার মধ্যেও ক্রমবর্ধমান বহিরাগত আগন্তুক আছে। এই শ্রেণীর বহিরাগত সহ দশ বৎসরে গড় বৃদ্ধির হার শতকরা মাত্র ৪ এবং বার্ষিক বৃদ্ধি ০·৪। আলোচ্য দশকে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ও মহীশূরে ২১·২, বোম্বাই প্রদেশে ২০·৮, আসামে ১৭·৪ এবং মাদ্রাজে ১৩·৪ শতাংশ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের বৃদ্ধি ১২·৭ হইতে কম। পঞ্জাবে বৃদ্ধি না হইয়া শতকরা ০·৫ জন লোক হ্রাস পাইয়াছে। দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের উপর দিয়া বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। দুই সীমান্তের এই দুইটি রাজ্যের লোক বৃদ্ধির স্বল্পতায় তাহারই ফল প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রতি হাজার লোকের ২৪৮ জন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ শহরবাসী। বোম্বাই প্রদেশে পৌরাঞ্চলের বাসিন্দা ইহা অপেক্ষা অধিক, হাজারে ৩১১। পশ্চিমবঙ্গের পৌরবাসিগণের হাজার-প্রতি ১৪৫ জন ৭টি নগরে এবং অবশিষ্ট ১০৩ জন ১০৭টি শহরে বাস করে। পক্ষান্তরে বোম্বাই রাজ্যের এই হার যথাক্রমে ১৪১ ও ১৭০। মহীশূরের পৌরাঞ্চলের অধিবাসী হাজারে ২৪০। অন্যান্য রাজ্যে ঐ সংখ্যা উড়িষ্যার ৪১ হইতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের ১৬০-এর মধ্যবর্তী।

পৌরাঞ্চলে পুরুষের অনুপাতে নারীর হার হইতে জনসমষ্টির প্রকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতি হাজার পুরুষে মাদ্রাজের শহরে নারী ৯৮৯, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৯৮১, মধ্যপ্রদেশে ৯২৫ এবং মহীশূরে ৯১৬। বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও পঞ্জাবে উহা আট শতের বেশি। প্রথম চারিটি রাজ্যের শহরবাসিগণ অধিকাংশই পারিবারিক জীবনযাপন করিয়া থাকে এবং ইহারা অনেকেই সম্ভবত স্থায়িভাবে শহরেই বাস করিবে। শেষের চার রাজ্যের একাংশ পল্লীর বাসস্থানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। উত্তরপ্রদেশের শহরে নারীর হার ৭৯৬। শিল্পাঞ্চলে যাহারা কাজ করে তাহাদের পরিবারবর্গ গ্রামাঞ্চলে রহিয়াছে। আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে নারীর হার যথাক্রমে ৬৮৩ ও ৬৫৭। আসামে পল্লীপ্রীতি এখনও বর্তমান। শহর পুরুষের কর্মক্ষেত্র মাত্র। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নারীর সংখ্যাল্পতার যে হেতু পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে পৌরাঞ্চলে তাহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ বহিরাগতদের প্রধান কর্মক্ষেত্র পৌরাঞ্চল। এই রাজ্যের নগরে প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৬০০ নারী বাস করে। নগরের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ অস্থায়ী বাসিন্দা। নারী ও পুরুষের এই বিপুল বৈষম্য নগরের নৈতিক জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর।

কোন্ রাজ্য কি পরিমাণ শিল্পায়িত হইয়াছে তাহার পরিচয় অ-কৃষি উপজীবিকার হার হইতে পাওয়া যায়। বাসস্থানপ্রধান শহর ও নগরের উন্নতি ঘটে না, শিল্প, বাণিজ্য ও তাহার আনুষঙ্গিক কাজকর্মের ক্ষেত্ররূপে নগর ও শহরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বাদে দশটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অকৃষিজীবীদের হার সর্বোচ্চ। এই রাজ্যের জনসংখ্যার শতকরা ৪২·৮ জন অকৃষিজীবী। বোম্বাই প্রদেশের ঐ হার ৩৮ ৫। পশ্চিমবঙ্গের পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের ৯৫·৮ শতাংশ অকৃষিজীবী। ইহাই রাজ্য কয়টির সর্বোচ্চ হার। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও বিবিধ বৃত্তিতে ইহার ৬২·৩ অংশ নিযুক্ত রহিয়াছে।

শিক্ষা দেশের প্রগতির অন্যতম সূচক। সাক্ষর লোকের হার ভারতের পক্ষে মোটেই গৌরবের নহে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার হারের সমতার অভাব। অধিকতর উদ্বেগের কথা এই যে, একই রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জেলার মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের তারতম্য দেখা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার বিরাট বৈষম্য আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের পরিচয় বহন করিতেছে।

সাক্ষরের হারে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সকল রাজ্যকেই বহু পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই রাজ্যের জনগণের ৪৫·৮ শতাংশ চিঠি লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের প্রায় অর্ধেক পথে আছে। এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪·৫। বোম্বাই প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সেখানে শিক্ষিতের হার ২৪·১। উত্তরপ্রদেশের ১০·৮ নিম্নতম হার। পৌরাঞ্চলে শিক্ষিতের হার ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৫১·৩, আসামে ৫০·৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৫·২। আসামে প্রতি হাজারে মাত্র ৪৬ জন শহরবাসী। এই অল্পসংখ্যক লোকের অর্ধাংশ সাক্ষর। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৪·৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১৭·৭ জন ও উত্তরপ্রদেশে ৭·৮ জন সাক্ষর। শিক্ষিতা নারীর শতকরা হার ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৪৫·৮, পশ্চিমবঙ্গে ১২·৭ এবং বোম্বাই প্রদেশে ১২·৬। উত্তরপ্রদেশে শতকরা ৯৬ ৭ জন নারী নিরক্ষর, বিহারের নারীর নিরক্ষরতা উত্তরপ্রদেশের সমান। পশ্চিমবঙ্গের এক-চতুর্থাংশ লোক সরল ভাষায় পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে পারে। কিন্তু নারীদের মাত্র আট ভাগের এক ভাগ লিখিতে পড়িতে সক্ষম। পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষর নারী শতকরা ৯৩ ৩ জন।

উদ্বাস্তু

দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল নরনারীর প্রবল প্রবাহ ভারত ও পাকিস্তান প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনার জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না। বাস্তুহারাগণ যেমন শক্তির উৎস তেমনই বিরাট সমস্যাও বটে। জনসমষ্টি মাত্রেরই মূল্য অপরিসীম। সেই দিক হইতে বিচার করিলে উদ্বাস্তুগণ শক্তির আধার। কিন্তু অকস্মাৎ বিরাট জনসমাগমে কোন কোন রাজ্যের ধনসম্পদের উপর প্রবল টান পড়িল। দেশবিভাগের পূর্বে এমন রাজ্য কমই ছিল যেখানে জনসংখ্যা ও জীবিকার সংস্থানের মধ্যে সমতার অনিশ্চয়তা ছিল না, অথবা যেখানে অবন্ধুর জীবনধারার ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনে ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কা ছিল না। এইরূপ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পড়িল। উদ্বাস্তুর ভার আনন্দময় সম্পদে পরিবর্তিত হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। জনগণনার সময় বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল এইরূপঃ পঞ্জাব ৩২,৩১,৯৮১; পশ্চিমবঙ্গ ২০,৯৯,০৭১, উত্তরপ্রদেশ ৪,৮০,২৭০, বোম্বাই প্রদেশ ৩ ৩৮,০৯৬, আসাম ২,৭৪,৪৫৫, মধ্যপ্রদেশ ১,৯২,৭৭১; বিহার ৭৭,৫৫২; উড়িষ্যা ২০,০৩৯ ও মাদ্রাজ ৮,৯২৯। এই হিসাব অন্যদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে কোন্ রাজ্য উদ্বাস্তুর চাপ কতটা সহ্য করিতেছে। অনুদ্বাস্তুর জনসংখ্যার সহিত উদ্বাস্তুর অনুপাত পঞ্জাবে ৩৪ ৩৫, পশ্চিমবঙ্গে ৯ ২৪; আসামে ৬·১৩; বোম্বাই প্রদেশে ০ ৯৫, উত্তরপ্রদেশে ০ ৭৭; মধ্যপ্রদেশে ০ ৫৩; বিহারে ০ ১৯; উড়িষ্যায় ০ ১৪ এবং মাদ্রাজে ০·০২। সংখ্যা ও অনুদ্বাস্তু জনগণের অনুপাতে উদ্বাস্তু পঞ্জাবে সর্বাধিক। কিন্তু বাস্তুহারার চাপ পশ্চিমবঙ্গের উপরই সর্বাপেক্ষা বেশি পড়িয়াছে। পাক পঞ্জাব ও ভারতীয় পঞ্জাবের মধ্যে লোকবিনিময় হইয়াছে বলা চলে। পাকিস্তানের হিসাবে পশ্চিম পঞ্জাবের মুহাজির সংখ্যা ৪৮ লক্ষের উপর। বেশি না হইলেও অন্ততঃ উদ্বাস্তুর সমসংখ্যক মুসলমান পূর্ব পঞ্জাব হইতে পশ্চিম পঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়। ১৯৪১ সন অপেক্ষা পঞ্জাবের লোকসংখ্যা শতকরা ০ ৫ হ্রাস পাইয়াছে। ইহা প্রধানত বাস্তুত্যাগের ফলে হওয়াই সম্ভব। মুসলমানদের পরিত্যক্ত ভূমি পঞ্জাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিশ্চয়ই অনেক সহজ করিয়া দিয়াছে। পঞ্জাব আয়তনেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বড়। পাকিস্তানের জনগণনার বিবরণ অনুসারে পূর্ববঙ্গের মুহাজির সংখ্যা ৭ লক্ষ মাত্র। ইহার অধিকাংশই অবাঙালী মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাকিস্তানে যাহারা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য না হইলেও অল্প; পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২১ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু আসিয়াছে। এই বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাব। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে যত লোক 'পঞ্চাশ বৎসরে' বৃদ্ধি পাইত পাঁচ বৎসরে উদ্বাস্তুর আগমনে সেই পরিমাণ লোক অকস্মাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে হাজার হাজার বাড়িয়াছে, কোথাও বা মাত্র কয়েক শত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্বাস্তুর জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ঘনতা প্রতি

বর্গমাইলে গড়ে ৬৮ বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ও মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম।

(২) লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের স্থান পঞ্চম ও আসামের স্থান নবম।

(৩) বসতির ঘনতা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক, আসামে সর্বাপেক্ষা কম।

(৪) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পতম, উড়িষ্যায় বৃহত্তম।

(৫) রাজ্যের জনসমষ্টির ৩ ১ শতাংশ পারিবারিক জীবন যাপন করে না।

(৬) পশ্চিমবঙ্গে পরিবারের লোকসংখ্যা গড়পড়তায় ৪·৯।

(৭) দশ বৎসরে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিম্নতম।

(৮) জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ শহরবাসী।

(৯) অকৃষিজীবীদের হার সর্বোচ্চ।

(১০) রাজ্যের এক চতুর্থাংশ লোক লিখিতে পড়িতে সক্ষম। ইহাই 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের সর্বোচ্চ হার।

(১১) পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর চাপ সর্বাধিক। প্রতি ১২ জন লোকের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সাধারণ জনবিন্যাস ও বসতির ঘনতা

সাধারণ জনবিন্যাস

জনগণনার একক

এই অনুচ্ছেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বে ইহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা আবশ্যক। জনগণনার একক Census house বা জনগণনার বাড়ি। ইংরেজী "হাউস' শব্দটি আমরা দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, এক বা একাধিক কক্ষসমন্বিত যে-কোন বস্তু দ্বারা যে-কোন উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহকে 'বাড়ি' বলি, যেমন কোঠাবাড়ি, বারবাড়ি ও গোলাবাড়ি। এইরূপ প্রয়োগের সময় লোকের কথা মনে পড়ে না, শুধু গৃহ বা তাহার ব্যবহারের কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। সাধারণত গৃহহীন পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা অথবা এক বা একাধিক গৃহ, আঙিনা ও হাতা সহ বাস্তুভিটাকে বাড়ি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে লোক ও বাসস্থানের ভাবই প্রধান। এইরূপ এক বাড়িতে একাধিক পরিবারও বাস করিতে পারে। নগরে বা শহরে একই গৃহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিবার বাস করে। কলিকাতায় একই ঘরে বা কক্ষেও একাধিক পরিবার বাস করিতে দেখা গিয়াছে। এক বাড়ি বা গৃহ যদি একাধিক পরিবারের বাসস্থান হয় তাহা হইলে জনগণনায় তাহাকে এক বাড়ি অথবা যত পরিবার আছে তত বাড়ি গণ্য করা হইবে, ইহা কিছুকাল পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় ছিল। এবারে গৃহের উপর জোর না দিয়া পরিবারের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। যত পরিবার তত গণনার বাড়ি। গ্রামে বলা হয়, যত উনান তত থানা। জনগণনায় একান্নভুক্ত পরিবারকেই একক ধরা হইয়াছে। "পরিবার" শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা ইংরেজী Family নহে, Household। পিতা, মাতা ও সাধারণত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান নিয়া সামাজিক একক ফ্যামিলি গঠিত। জনগণনার একক "হাউসহোল্ড" অধিকতর ব্যাপক। ইহা আত্মীয়স্বজন, চাকরবাকর, অনাত্মীয় ও অতিথি লইয়া গঠিত। ইহাতেও সকল সমস্যার সমাধান হইল না। কলিকাতা বা অন্য শহরের মেস, হোটেল, জেলখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে রান্না একত্র হইলেও ঐসকল প্রতিষ্ঠানকে একক ধরার অসুবিধা আছে। প্রথমত হাউসহোল্ড-এর বা পরিবারের প্রচলিত অর্থে উহাদিগকে হাউসহোল্ড বলিতে মন সায় দেয় না। দ্বিতীয়ত এখানে কর্তা ও পোষ্য এই সম্বন্ধ প্রায়ই থাকে না, প্রত্যেকেই স্বপ্রধান, আত্মনির্ভরশীল, এক রান্নায় আহার ব্যতীত পরস্পরের মধ্যে অন্য কোন বন্ধন থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি ব্যক্তিকে জনগণনার একক ধরা হইয়াছে। আবাসিক বিদ্যালয়ের গোটা আবাসভবনকে একটি এককরূপে গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং Census house বা "গণনার বাড়ি" অর্থে প্রধানত একান্নভুক্ত পরিবার বুঝিতে হইবে; প্রত্যেক দেশেই পরিবারের সংখ্যা অধিক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক এক ব্যক্তিকেও গণনার এককরূপে ধরা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ৫৩,৫৭,০৯৬টি Census house বা "জনগণনার বাড়ি"তে লোকগণনা করা হইয়াছিল। কলিকাতায় জনগণনার একক ৬,০৬,৯২৬ ছিল।

জনগণনার গ্রাম

সাধারণত মৌজা ও গ্রাম অভিন্ন। গ্রামের সীমা সর্বত্র সুনির্দিষ্ট থাকে না। কোন কোন গ্রাম আংশিক বা সম্পূর্ণ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন গ্রাম পরিত্যক্ত ও নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সময় সময় গ্রামের নামের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং গ্রাম অনুসারে সংগৃহীত তথ্য অন্যকালের তথ্যের সহিত তুলনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশব্যাপী গণনায় অখ্যাত গ্রাম বাদ পড়ার আশঙ্কাও থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত জরিপের মৌজাকে "জনগণনার গ্রাম" ধরা হইয়াছে। জরিপের একককে মৌজা বলা হয়। মৌজার আয়তন সাধারণত একার্ধ হইতে দেড় বর্গমাইল। প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মৌজায় বিভক্ত। মৌজার নাম, আয়তন ও থানা অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং গণনায় কোন মৌজা বাদ পড়িলে অনায়াসে উহা ধরা পড়ে। প্রতিটি মৌজার মুদ্রিত নকশা সহজলভ্য। একাধিক ছোট গ্রাম লইয়া একটি মৌজা হইতে পারে অথবা একটি বড় গ্রাম দুই মৌজার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। কোন কোন মৌজা জনহীন কৃষিক্ষেত্র বা পতিত ভূমি। যে মৌজায় লোকের বসতি আছে তাহাই জনগণনার গ্রাম। গণনার একক পরিবার; কতকগুলি পরিবারের বাসভূমির নাম মৌজা বা গ্রাম। জনগণনায় প্রাপ্ত কোন কোন তথ্যের শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ প্রতি মৌজার জন্য পৃথকভাবে সংকলিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট মৌজার সংখ্যা ৩৯,১৫১, তন্মধ্যে ৩৫,০৬৩টি মৌজায় লোকের বসতি আছে, ৩,৫৬৯টিতে লোক বাস করে না এবং ৫১৮টি মৌজা বিভিন্ন শহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

থানা

কয়েকটি মৌজা নিয়া থানা গঠিত হয়। শহরের থানায় মৌজার পরিবর্তে ওয়ার্ড থাকে। বিভিন্ন থানায় মৌজার

পশ্চিমবঙ্গ
১৯৫১

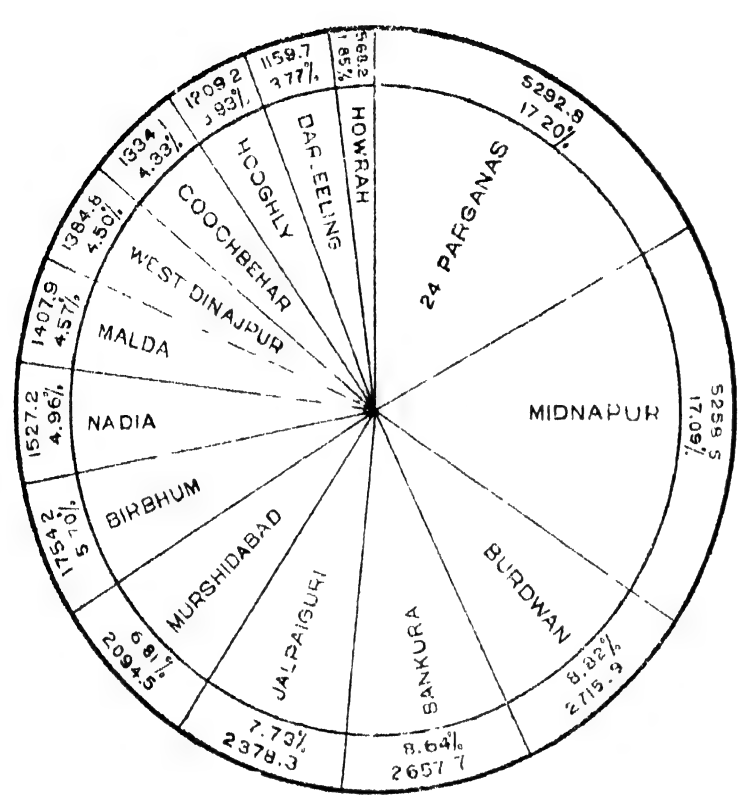

আয়তন
৩০,৭৭৫·৩ বর্গ মাইল
কলিকাতা
৩২·৩ বর্গ মাইল

জনসংখ্যা
২,৪৮,১০,৩০৮

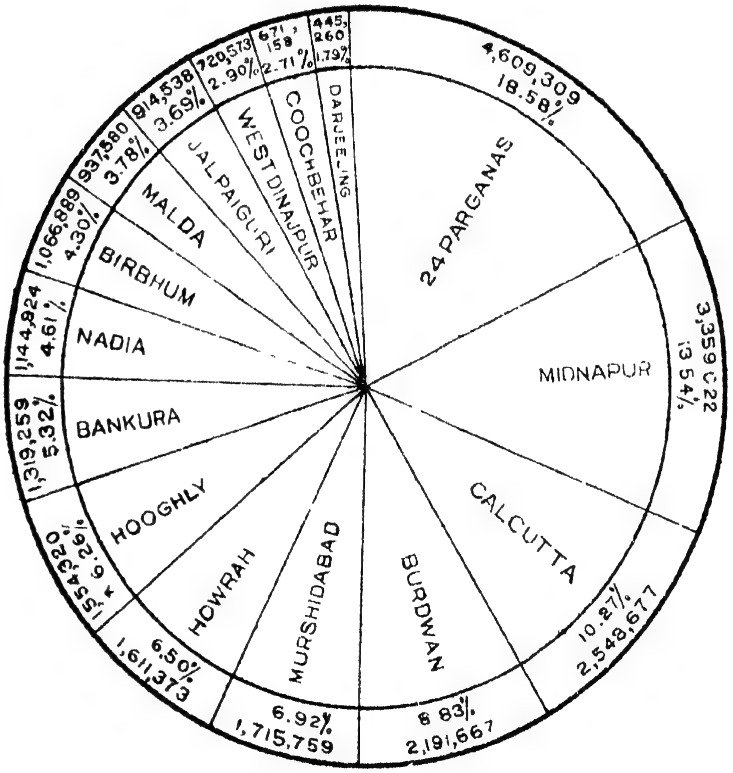

সংখ্যার অনেক প্রভেদ দেখা যায়। থানা শাসনের একক। জনগণনায় সারণী (Table) থানা অনুসারে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

শহর ও নগর

লোকসংখ্যা যাহাই হউক না কেন যেখানে পৌরপ্রতিষ্ঠান আছে তাহাকে শহর বলা হয়। যদি কোন স্থানে অন্তত ৫,০০০ লোক বাস করে, বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে কমপক্ষে ১,০০০, ব্যবসায়ে অথবা শাসনকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব থাকে, জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ লোক অকৃষিজীবী, সেখানে পৌরপ্রতিষ্ঠান না থাকিলেও সরকার যদি উহাকে জনগণনার জন্য শহর বলিয়া ঘোষণা করেন তবে উহা শহররূপে গণ্য হইবে। এইরূপ ঘোষিত ১১টি শহর সহ পশ্চিমবঙ্গে মোট শহরের সংখ্যা ১১৪, তন্মধ্যে ৮২টি শহরে পৌরসভা আছে, ৩১টিতে পৌরসভা নাই এবং একটি সেনানিবাস।

যে শহরে লক্ষাধিক লোকের বাস তাহার নাম নগর। পশ্চিমবঙ্গে ৭টি নগর আছে।

গণনার বিশুদ্ধতা

জনগণনার আদর্শ অতিশয় ব্যাপক। সদ্যোজাত শিশু হইতে মরণাপন্ন বৃদ্ধ, কুলবধূ হইতে ভবঘুরে ভিখারী, দীনের কুটির হইতে ধনীর প্রাসাদে যাহাদের বাস নগরের বাস্তুহারা বা দার্জিলিঙের বনাঞ্চলে ও পাহাড়ের ঢালে যাহাদের কুটির ফুটপাথে বা গঙ্গার বক্ষে যাহারা থাকে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা লোকগণনার লক্ষ্য ছিল। এইরূপ বহু ব্যাপকতাই বিশুদ্ধতার প্রধান পরিপন্থী। গণনার কাজে আটচল্লিশ হাজার অবৈতনিক কর্মী প্রায় তিন মাসকাল তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও অবসরের সময় নিয়োগ করিয়াছিলেন। জনগণনার পরিসংখ্যান তাঁহাদেরই পরিশ্রমের ফল। এই বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্তব্য পরায়ণতার তারতম্য গণনার পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হইয়াছে। রাজনৈতিক বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৯২১ ১৯৩১ ও ১৯৪১ সনের গণনায় ভ্রমপ্রমাদের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। ১৯৫১ সনের গণনা অসামান্য অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পর দেশসেবার এই সুযোগ গ্রহণের জন্য অনেকে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এরূপ অবস্থায়ও গণনা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইয়াছে এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। প্রতিমুহূর্তে জন্মমৃত্যু ঘটিতেছে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট দিনে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এককের অঙ্ক পর্যন্ত শুদ্ধতার আশা করা সঙ্গত হইবে না। দেখা গিয়াছে সকল গণনাতেই কমবেশি লোক বাদ পড়িয়া যায়। একমাত্র ১৯৪১ সনে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বাড়াইবার আগ্রহে একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার লেখানো হইয়াছে অথবা কাল্পনিক ব্যক্তিদের নামের শ্লিপ রচনা করা হইয়াছিল। নানাদিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ১৯৫১ সনের গণনার সংখ্যা প্রকৃত লোকসংখ্যা হইতে সামান্য কম হওয়া সম্ভব। এই অল্পতার মাত্রা গণনায় প্রাপ্ত জনসংখ্যার প্রতি হাজারে একের বেশি হওয়া সম্ভব নহে, এ কথা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

জনগণনার সংখ্যা এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গ্রহণ করা আবশ্যক। সংখ্যাবিজ্ঞানিগণ শতকরা ১০ অথবা তদপেক্ষা কম নমুনা হইতে যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে দেখা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গণনায় যদি পঁচিশ হাজার লোক বাদ পড়িয়া থাকে তাহাতে এই রাজ্যের অধিবাসিগণের প্রকৃতি, জীবনের ধারা সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিচয়লাভে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটিবে না। লোকের সঠিক সংখ্যা অপেক্ষা এই পরিচয়ের মূল্য অনেক বেশি। গণচিত্র পরিস্ফুট করিয়া তোলা জনগণনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কয়েক হাজার লোক বাদ পড়িলে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে বাধা হয় না।

অন্যান্য রাজ্যের জেলার সহিত পশ্চিমবঙ্গের জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনা

'ক' শ্রেণীর প্রত্যেক রাজ্যের বৃহত্তম জেলার সহিত তুলনায় চব্বিশপরগনার আয়তন ক্ষুদ্রতম অথচ চব্বিশপরগনার মত এত লোক ভারতের অন্য কোন জেলায় নাই। কলিকাতা ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতি অঞ্চল (প্রায় ৭৯,০০০ প্রতি বর্গমাইলে)। সর্বাপেক্ষা কম লোকের জেলার মধ্যে দার্জিলিঙের স্থান পঞ্চম। পশ্চিমবঙ্গের জেলার গড় আয়তন ২,০৫২ বর্গমাইল। ইহা সর্বনিম্ন পরিমাণ কিন্তু জেলার গড়পড়তা লোকসংখ্যার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। এই সকল তথ্য পশ্চিমবঙ্গের অতিজনতার ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের জেলার মধ্যে চব্বিশপরগনা আয়তনে বৃহত্তম এবং লোকের দিক হইতে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা।

পশ্চিমবঙ্গের জেলার আয়তন ও লোকবৃদ্ধি

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কলিকাতা ও চব্বিশপরগনার জনসংখ্যা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলপাইগুড়ি, মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর দার্জিলিঙ ও হাওড়ার লোক ঐ সময়ে দেড় গুণের বেশি বাড়িয়াছে। হুগলি, নদিয়া ও বর্ধমানের বৃদ্ধি অর্ধেকের কিছু কম। মুর্শিদাবাদের লোক পঞ্চাশ বৎসরে এক তৃতীয়াংশেরও কম বাড়িয়াছে। মেদিনীপুরে বৃদ্ধি এক পঞ্চমাংশ। বাঁকুড়া ও কোচবিহারের লোক এক-পঞ্চমাংশ অপেক্ষা কম বৃদ্ধি পাইয়াছে। বীরভূমের বৃদ্ধি সকল জেলা হইতে কম, মাত্র এক ষষ্ঠাংশ। আয়তনে কলিকাতার স্থান সর্বনিম্নে কিন্তু সেখানে ১৯০১ সনে যত লোক ছিল ১৯৫১ সনে তাহার পৌনে তিন গুণ হইয়াছে। হাওড়া জেলা মেদিনীপুরের ৯ ভাগের এক ভাগ কিন্তু হাওড়ায় লোক বাড়িয়াছে মেদিনীপুরের সাড়ে চার গুণ। বীরভূমের আয়তন হাওড়ার তিন গুণ হইলেও সেখানে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে হাওড়ার এক পঞ্চমাংশেরও কম। অন্যান্য জেলার পরস্পর তুলনায় ইহাও দেখা যায় যে, যেখানে জায়গা বেশি সেখানে লোক বাড়ে নাই।

জনবিন্যাসের ধারা

উদ্বাস্তুগণ বাস্তুভিটা খুঁজিয়া বেড়ায়, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও কোচবিহার বিরলবসতি জেলা, তথাপি এই সকল জেলা তাহারা প্রায় বর্জন করিয়াছে। “আহার জোটে যেখানে মানুষ ছুটে সেখানে,” রাজ্যের জনবিন্যাসের ধারায় এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে যাওয়া মাত্রই চাষের জমি জুটিবে এই আশায় উদ্বাস্তুগণ এই দুই জেলায় ভিড় জমাইয়াছে। চব্বিশপরগনা, বর্ধমান, ও জলপাইগুড়ির মত বড় জেলায় লোক বেশি বাড়িলেও সর্বত্র সমভাবে বাড়ে নাই, উহাদের বিশেষ বিশেষ

অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটামুটি চব্বিশপরগনার ৮০ বর্গমাইল, বর্ধমানের ৪০০ বর্গমাইল এবং জলপাইগুড়ির ১,২০০ বর্গমাইল মধ্যে ঘনবসতি সীমাবদ্ধ। এই সকল অঞ্চল বাদ দিয়া জেলার অবশিষ্টাংশে বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা একের খুব বেশি নহে।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও কোচবিহারে হয় উদ্বৃত্ত চাষের জমির অভাব অথবা জমি স্বাভাবিক বৃদ্ধির অনুকূলে বা বহিরাগতদের নিকট লোভনীয় নহে। যেসকল জেলায় বৃদ্ধির হার শতকরা একের অধিক সেখানেও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ততটা বাড়ে নাই, আগন্তুকদের আগমনের জন্য যত বাড়িয়াছে। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরে সকল জেলাতেই স্বাভাবিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা একের কম। বহিরাগতের আগমন স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রধান পরিপূরক, ইহাতেই বার্ষিক বৃদ্ধির হার একের উপরে উঠিয়াছে। চব্বিশপরগনা, কলিকাতা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, হাওড়া, বর্ধমান, নদিয়া ও হুগলি সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। নদিয়া ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি জেলায় শিল্পাঞ্চল ও চা বাগান আছে। বহিরাগতের বিরামহীন স্রোত কৃষিপ্রধান অঞ্চল তুচ্ছ করিয়া শিল্পাঞ্চল ও চা-বাগানের দিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র নদিয়া জেলায় থাকায় দৈবক্রমে নদিয়ার এই সাময়িক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। উদ্বাস্তু বাদ দিলে দেখা যাইবে নদিয়ায় লোকবৃদ্ধির পরিবর্তে লোক হ্রাস হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, জেলাসমূহের মধ্যে জনবিন্যাস সমভাবে ঘটে নাই, এমনকি কোন কোন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘনতার তারতম্য বিস্তর; কিন্তু এক বিষয়ে জনসমাবেশের উল্লেখযোগ্য ঐক্য লক্ষিত হয়; যেখানেই জীবিকা ও গ্রাসাচ্ছাদনের নূতন কোন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহা শিল্প অথবা কৃষি যাহাই হউক না কেন, সেই অঞ্চল অতি দ্রুত লোকে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যেখানে কোন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই, কৃষি স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কর্ষণাধীন জমির প্রান্তিক অনাবাদী ভূমি কর্ষণযোগ্য করিয়া তুলিবার ব্যয় ভাবী শস্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবার আশঙ্কা, সেই স্থানে লোকের বৃদ্ধি থমকিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা দেয়, কারণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়, বাহিরের লোকও আকৃষ্ট হয় না।

কলিকাতার অতিজনতা

জনগণনার সংজ্ঞায় গৃহ নয়, গৃহবাসীর উপর জোর দেওয়াতে বাসগৃহের জনতার পরিচয় লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু একান্নভুক্ত পরিবারের বিবরণ আর একদিকের প্রয়োজন সাধন করে। ১৮৭২ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত পরিবারের আকারের পরিবর্তন এবং একান্নবর্তী পরিবারের অবস্থা জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার (১৯৪৬) এবং রাজ্যসরকারের (১৯৪৮-৪৯) দুইটি সাম্প্রতিক তদন্তের বিবরণীতে কলিকাতা ও হাওড়ার অতিজনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনের তরঙ্গ পৌঁছিবার পর অতিজনতা উচ্চতার নূতন শিখর স্পর্শ করিয়াছিল। তদন্ত দুইটি তাহার পূর্বে পরিচালিত হওয়াতে ঐ বিবরণী এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং উহারা প্রকৃত অবস্থার লঘু পরিচয় দিতেছে। গত জনগণনার সময় অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার ২৫,৪৮,৬৭৭ জন অধিবাসীর জন্য ৭,১০,৫৭৯ খানা বাসকক্ষ আছে। সুতরাং গড়পড়তায় প্রতি কক্ষের বাসিন্দার সংখ্যা ৩·৬।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিবরণ অনুসারে যেসকল পরিবারের গৃহে কেবলমাত্র একটি কক্ষ তাহাদের অর্ধাংশের প্রতি পরিবারে লোকসংখ্যা ৪ বা ৫; অপর অর্ধাংশের প্রতি পরিবার ৬ বা ৭ জন লোক লইয়া গঠিত। যাহাদের দুইখানা ঘর তাহাদের মধ্যে ৫৮·৭, যাহাদের তিনখানা ঘর তাহাদের ৬৩·৬, যাহাদের চারখানা ঘর তাহাদের ৮৮·২ এবং যেসকল পরিবারের চারের বেশি ঘর তাহাদের ৭০·০ শতাংশ পরিবারের ৬ জন বা তদধিক লোক ছিল।

শতকরা প্রায় ৫০টি পরিবারে প্রতি ২-৩ জন লোকের জন্য মাত্র একখানা করিয়া ঘর ছিল। একশত পরিবারের ১৭টির বেশিতে প্রতি ঘরে ২-৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাস করিত। এই হিসাবে ছোট, বড় ও বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মীয়দের প্রয়োজন পৃথক করিয়া দেখা হয় নাই।

মাসিক ১০০ টাকা ও ৩০০ টাকার কম আয়ের পরিবারের ভাড়াটে বাড়িতে লোকপিছু মেঝের আয়তন ৪৩ হইতে ৫৫ বর্গফুট এবং ৩০০ টাকার অধিক আয়ের পরিবারের ঐ মান ৬৯ বর্গফুট ছিল।

রাজ্যসরকারের কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তি অঞ্চলে বাসের অবস্থা অনুসন্ধানের বিবরণীতে এই দুই নগরীর অতিজনতার তীব্রতাবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতার বস্তি

বস্তির বড় একটি গৃহকে বলা হয় বস্তিঘর (hut)। ১৯৪৮-৪৯ সনে কলিকাতায় ৩,১৭৯টি বস্তিঘরের তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছিল। উহাদের ছাদ পাকা হইতে পারিবে না। অধিকাংশ ঘরের মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে কাঁচা মাটির, অবশিষ্ট পাকা। বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা বেশির ভাগ ঘরেই নাই। প্রত্যেক বস্তিঘরে (hut) কয়েকটি বাসগৃহ থাকে। উহা বিভিন্ন লোকের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়াটিয়াদের ৩২ শতাংশ অবাঙালী। প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার ঘরের সংখ্যা গড়ে ১·১০। ৯৩·৩ শতাংশের ঘর মাত্র একখানা। কিন্তু পরিবারের লোকসংখ্যা গড়পড়তায় ৩·৪৮। এখন উহা প্রায় চার। মেঝের আয়তনের গড় ছিল ২৭·৮২ বর্গফুট। ১৯৫১ সনে উহা নিশ্চয় অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে।

কলিকাতার ১৫·৫ শতাংশ বস্তিঘরে পৃথক রান্নাঘর ছিল। ৯০ শতাংশ বস্তিঘরে স্বল্পপরিসর বারান্দায় রান্না করা হইত। ১০·৪ শতাংশ বস্তিঘরে শোবার ঘরেই রান্না চলিত। বস্তিতে দারুণ জলের অভাব। কেবলমাত্র ১,২১৬টি বস্তিঘরে জলের ব্যবস্থা ছিল। ১,২৪৬টি কল, ১০৬টি কুয়া এবং ১৫টি নলকূপ হইতে জল সরবরাহ করা হইত। বিভিন্ন এলাকার ৫৪৪টি বস্তিঘরের জন্য কোনপ্রকার জলের ব্যবস্থা ছিল না। মোট ৬১·৭ শতাংশ বস্তিঘরে জলের ব্যবস্থার অভাব। বাসিন্দাদের ৫৪·৬ শতাংশ এই সকল জলের ব্যবস্থাশূন্য গৃহে বাস করিত। বস্তির যেসকল ভাগ্যবানের জলের বন্দোবস্ত ছিল তাহাদের ২৫·৬ জনের জন্য কল মাত্র একটি। ট্যাংরা

অঞ্চলে ৯৮·৭ শতাংশ বস্তিঘরের জলের ব্যবস্থা ছিল না। উহাদের অধিবাসীদের রাস্তার কল অথবা পুকুরের উপর নির্ভর করিতে হইত।

বস্তিঘরের ১৪·৭ শতাংশে পায়খানা ছিল না। এইরূপ ঘরে ১০·১ শতাংশ লোক বাস করিত। মোট পায়খানার ৬৩·৫ শতাংশ খাটা পায়খানা, ৩·৭ শতাংশ স্যানিটারী ও ৩২·৮ শতাংশ ড্রেন পায়খানা। গড়ে ২৩ জন লোকের জন্য পায়খানা মাত্র একটি।

১৯৫১ সনে অতিজনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫১ সনে কলিকাতার ৩,৬১৫টি বস্তির ২১,৫৫৬টি বস্তিঘরে (huts) এবং ১,৫৫,৬২৪টি বাসকক্ষে ৬,১৭,৩৭৪ জন লোক বাস করিত। কলিকাতার প্রায় এক চতুর্থাংশ লোকই বস্তিবাসী। ইহাদের ১,১২,৫১৫ জন উদ্বাস্তু। কলিকাতার মোট উদ্বাস্তুর শতকরা ২৬ জন বস্তিতে বাস করে। বস্তির জনসংখ্যার ১৮·২ শতাংশ উদ্বাস্তু। বস্তির স্বল্পপরিসর বাসকক্ষে গড়ে প্রায় চার জন লোক বাস করিয়া থাকে। কলিকাতার অতিজনতার তীব্রতা ইহাতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নগরীর পত্তনের সময় হইতেই কলিকাতার বাসগৃহ ও পৌরাঞ্চলের সুখ সুবিধা আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। ১৯৪৭ সন হইতে উহার উপর আকস্মিক গুরুচাপ পড়িয়াছে। ১লা মার্চ ৬,০৬,৯২৬টি জনগণনার এককের জন্য ৭,১০,৫৭৯টি বাসকক্ষ ছিল। সুতরাং প্রতি এককে বাসকক্ষের গড় দাঁড়ায় ১·১৭। এই সকল ঘরে ২৫,৪৮,৬৭৭ জন লোক বাস করিত; জনগণনার প্রতি এককে ৪·২ জন লোক ছিল। তন্মধ্যে ৬,৮৫,১৪৬ জন পারিবারিক জীবনযাপন করিত না। অবশিষ্টেরা ৩,৫০,৯১৬টি পরিবারে বিভক্ত ছিল। গড়পড়তায় প্রতি বাসকক্ষে ৩·৬ জন লোক থাকিত। গড় সংখ্যা হইতে অতিজনতার উৎকট নিদর্শনগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। গণনাকালে ভিন্ন জাতের দুইটির অধিক পরিবার প্রায়ই এক কক্ষে বাস করিতে দেখা গিয়াছে। প্রতি পরিবারের লোকের গড় ৫·৩ ছিল। এই সংখ্যা বড় হইবার কারণ, অনেক পরিবারই এখন দূর আত্মীয় বা অনাত্মীয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়।

গণনার এককে লোকসংখ্যা এবং প্রতি বর্গমাইলে গণনার বাড়ির সংখ্যা

মালদহে জনগণনায় প্রতি “বাড়িতে” গড়ে ৫·১২ জন লোক ছিল। অন্য প্রত্যেক জেলায় লোক পাঁচের কম ও চারের বেশি। কলিকাতায় ছিল সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪·২১। কলিকাতার এই ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কারণ সুস্পষ্ট। এই নগরীতে মেস, বোর্ডিং, হোটেল, আশ্রম, জেলখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অধিবাসীকে গণনার একক ধরা হইয়াছে। ইহাতে জনগণনার “বাড়ি”র সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া লোকের গড় হ্রাস করিয়া দিয়াছে। বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ ও কোচবিহারে গ্রামের “বাড়ি” অপেক্ষা শহরের “বাড়িতে” লোক বেশি। আত্মীয় বা গ্রামবাসীদের কেহ কেহ পড়াশুনা বা অর্থোপার্জনের জন্য শহরে আসিয়া আশ্রয় নেয়। ইহাই শহরে গণনার এককে লোকবৃদ্ধির হেতু বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা ব্যতীত অবশিষ্ট চারটি জেলায় পৌরাঞ্চলবাসীদের পরিবারের একাংশ গ্রামের বাড়িতে থাকে। এই জন্য শহরের “এককের” লোক অপেক্ষা গ্রামের “এককে” লোক বেশি।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অপেক্ষা মেদিনীপুরের জনগণনার “বাড়ির” গড় লোকসংখ্যা বেশি। বর্ধমান বিভাগের অন্যান্য জেলায় “বাড়ি” প্রতি লোকসংখ্যা কলিকাতা ব্যতীত প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রত্যেক জেলা হইতে সামান্য কম। ইহার সম্ভাব্য কারণ দুইটি, বর্ধমান বিভাগে বিবাহের পরই পুত্র নূতন সংসার পাতিয়া থাকে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ অপেক্ষা বর্ধমান বিভাগে লোকবৃদ্ধির হার সামান্য কম। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিয়া দিবার দিকে ষাট বৎসর পূর্বেকার অপেক্ষা এখন বেশি ঝোঁক দেখা যায় না। লোকবৃদ্ধির হারের সহিত পরিবারের আকারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিদ্যমান। জেলায় জেলায় গণনার এককে লোকসংখ্যার তারতম্য প্রতি পরিবারের সন্তানসংখ্যার কমবেশির জন্য হইয়াছে, একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিয়া যাইবার জন্য নহে।

একান্নবর্তী পরিবার

একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা যে এই রাজ্যে হ্রাস পায় নাই তাহার প্রমাণ প্রতি পরিবারে ১৫ বা তদূর্ধ্ব বৎসরের বিবাহিতা নারীর সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। জনগণনার সময় কোন কোন জেলার প্রতি থানা হইতে কয়েকটি করিয়া পরিবারের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই নমুনা পরিবার বাছিয়া নেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা গিয়াছে উত্তরে, দক্ষিণ পশ্চিমে এমনকি রাজধানীর আশেপাশে চব্বিশপরগনার শিল্পাঞ্চলে পর্যন্ত একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এখনও বেশ শক্তিশালী, উহা বিলোপের লক্ষণ নাই।

পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার জন্য চিহ্নিত যেসকল “বাড়িতে” লোক বাস করিত তাহার ৯১·৪ শতাংশ পারিবারিক বাসস্থান এবং ৮·৬ শতাংশ বিবিধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধিবাসিগণ হয় একক অথবা বন্ধুবান্ধবের সহিত বাস করিত, স্ত্রী ও সন্তানাদি সহ পারিবারিক জীবনযাপন করিত না। যাহারা পারিবারিক জীবনযাপন করে না তাহাদের হার সাধারণত পৌরাঞ্চলেই বেশি। নদিয়া জেলায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যতিক্রমের কারণও আছে। উদ্বাস্তুদের কয়েকটি বড় বড় সাময়িক শিবির নদিয়ার গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। উহা আশ্রয় করিয়া কিছু লোক ছিল যাহাদের পরিবারবর্গ সঙ্গে থাকিত না। শিবিরের সকল উদ্বাস্তু সপরিবারে বাস করিত না। কলিকাতা যে প্রধানত শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র, বাসস্থান নহে, তাহার পরিচয় অপারিবারিক জীবনযাপনকারীদের উচ্চ হারের মধ্যে পাওয়া যায়। এই মহানগরীর ৪২·১ শতাংশ লোকগণনার “বাড়িতে” নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও মাত্র ৫৭:৯ শতাংশ “বাড়িতে” পারিবারিক বাসস্থান ছিল। মোটের উপর বর্ধমান বিভাগ অপেক্ষা প্রেসিডেন্সী বিভাগের পৌরাঞ্চলে অপারিবারিক প্রতিষ্ঠানের হার অধিক। প্রেসিডেন্সী বিভাগের শহর যে এখনও প্রধানত অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র, বাসস্থল নহে, উহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১১৪টি শহর আছে। অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে উহাদিগকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ম শ্রেণী—এক লক্ষাধিক লোকের শহর; ২য় শ্রেণী—৫০ হাজার হইতে এক লক্ষ লোক; ৩য় শ্রেণী—২০ হাজার হইতে ৫০ হাজার; ৪র্থ শ্রেণী—১০ হাজার হইতে ২০ হাজার; ৫ম শ্রেণী—৫ হাজার হইতে ১০ হাজার; এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী—৫ হাজারের কম।

১৯৪১ সনে তিনটি নগর ছিল। ভাটপাড়া ঐ বৎসরই প্রথম নগরের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৫১ সনে আরও চারটি অঞ্চলে এক লক্ষের অধিক লোক থাকায় উহারা নগরের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। টালিগঞ্জ, গার্ডেন রীচ, সাউথ সুবার্বস্ ও খড়্গপুর এই চারিটি নূতন নগর। সুতরাং এবারে নগরের সংখ্যা সাত দাড়াইয়াছে।

১৯৫১ সনে ১৭টি নূতন শহরের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ অনুসারে তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইলঃ

তৃতীয় শ্রেণীঃ আলিপুর দুয়ার (জলপাইগুড়ি)।

চতুর্থ শ্রেণীঃ বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর), চিত্তরঞ্জন (বর্ধমান), রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর), ইছাপুর ডিফেন্স এস্টেট (চব্বিশপরগনা), বাউরিয়া (হাওড়া), উলুবেড়িয়া (হাওড়া), কাঁচড়াপাড়া ডেভেলপমেন্ট এরিয়া রুর‍্যাল কলোনি (নদিয়া) ও নিয়ামতপুর (বর্ধমান)।

পঞ্চম শ্রেণীঃ ডায়মন্ডহারবার (চব্বিশপরগনা), ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর), দিশেরগড় (বর্ধমান), ক্যানিং (চব্বিশপরগনা), বাটানগর (চব্বিশপরগনা) ও মেমারী (বর্ধমান)।

ষষ্ঠ শ্রেণীঃ গড়বেতা (মেদিনীপুর) ও খাতরা (বাঁকুড়া)।

মিউনিসিপ্যালিটি-বিহীন শহরের সংখ্যা ৩১। কোচবিহারের মেকলীগঞ্জ সর্বাপেক্ষা ছোট শহর। উহার লোকসংখ্যা মাত্র ১,৩৫৬।

১৯৫১ সনে লোকসংখ্যা ৫,০০০ এর কম হওয়া সত্ত্বেও অপর লক্ষণ অনুসারে যে ১১টি অঞ্চলকে শহর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের নাম এই অন্ডাল, পাত্রসায়ার, খাতরা, গড়বেতা, ক্ষীরপাই, বীরনগর, পুরাতন মালদহ, মাথাভাঙ্গা, হলদিবাড়ি, তুফানগঞ্জ ও মেকলীগঞ্জ।

বসতির ঘনতা

ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫·৩ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপত্রের অধিকর্তার (Director of Land Records) মতে এই রাজ্যের আয়তন ৩১,০৪৪ ৩ বর্গমাইল। প্রথম পরিমাপ অনুযায়ী রাজ্যের প্রতি মাইলে গড় ঘনতা ৮০৬ দাঁড়ায়। আয়তনের দ্বিতীয় পরিমাণের হিসাবে ঘনতা হয় ৭৯৯। জেলায় জেলায় ঘনতার কমবেশি হইয়া থাকে। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগনা ও বর্ধমানের বসতির গড় ঘনতা রাজ্যের গড় ছাড়াইয়া গিয়াছে। অন্যান্য জেলার ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ অপেক্ষা কম। দার্জিলিঙের প্রতি বর্গমাইল স্থানে গড়ে ৩৭১ জন লোক বাস করে। জলপাইগুড়ির গড় ঘনতা ৩৮৫। কলিকাতার ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৭৮,৮৫৮; ইহাই সর্বোচ্চ হার। দার্জিলিঙের হার সর্বনিম্ন।

শহর

শহরের আশি বৎসরের বসতির ঘনতার বিবরণী হইতে দেখা যায়, শেষ বিশ বৎসরে শহরের লোক অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭২ হইতে ১৯৩১ সন পর্যন্ত পৌরাঞ্চলের লোকবৃদ্ধিতে অস্বাভাবিকতার পরিচয় নাই। ১৯০১ হইতে ১৯৩১ সন পর্যন্ত শহরে ঘনতা শতকরা পঞ্চাশেরও কম বড়িয়াছে। কিন্তু ১৯৫১ সনে ১৯৩১ সনের দ্বিগুণেরও অধিক লোকবৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় শহরে প্রচুর কর্মের সংস্থান হইয়াছিল। তাহারই আকর্ষণে পৌরাঞ্চলে লোকসমাগম হয়। শহরের জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবার পর অতি অল্প লোকই শহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সনেই পৌরাঞ্চলে অস্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি দেখা যায়। কলিকাতার বসতির ঘনতা ১৯৩১ সনের ৩৫,২৯৯ হইতে ১৯৪১ সনে ৬৫,২৫০-এ উঠিয়া যায়। ১৯৪১ ও ১৯৫১ সনের মধ্যে উদ্বাস্তুর আগমনে ঘনতা অস্বাভাবিক বাড়িয়া গিয়াছে। রাজ্যের পৌরাঞ্চলের ঘনতার গড় ১৯৩১ সনের ৬,২৬৬ হইতে ১৯৫১ সনে ১৩,৬৩২ হইয়াছে। প্রথম মনে হইতে পারে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে লোকবৃদ্ধির জন্য গড়ঘনতা দ্বিগুণের বেশি হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ জেলাতেই পৌরাঞ্চলের ঘনতা ১৯৩১ সনের পূর্বে ও পরে রাজ্যের গড়ঘনতার নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের ঘনতা ১৯৩১-৫১ সনের মধ্যে পূর্ববর্ণিত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলে নাই।

গ্রাম

গ্রামাঞ্চলের গড়ঘনতার বৃদ্ধি চমকপ্রদ না হইলেও ১৯০১ সনের ৪৫২ হইতে ১৯৫১ সনে ৬১০ হইয়াছে। শেষ ত্রিশ বৎসরে ঘনতা শতকরা ৫০ এর অধিক বাড়িয়াছে। ১৮৭২ ৮১ ও ১৯১১-২১ এই দুই দশক ব্যতীত রাজ্যের ঘনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম দশকে কুখ্যাত বর্ধমানের জ্বরের দরুন বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর ও হুগলির বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে যথাক্রমে ৩৪, ৩৪, ৬ ও ১২০ হ্রাস পাইয়াছিল। দ্বিতীয় দশকে, ১৯১১-২১, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পর পর শস্যহানি, দামোদরের বন্যা (১৯১৩), বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ (১৯১৫-১৬) এবং ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী কোন কোন জেলায় বিস্তর লোকক্ষয় করিয়াছিল। ইহার ফলে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও হুগলির গড়ঘনতা যথাক্রমে ৫৮, ৫০, ৪৫, ৪২, ৩৭, ২৯, ১৪, ৯ ও ৮ কমিয়াছিল। গ্রামাঞ্চলের ঘনতা ইহা অপেক্ষা বেশি হ্রাস পাইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ১৯১৫-১৬ সনের দুর্ভিক্ষ কোন কোন পৌরাঞ্চলকেও রেহাই দেয় নাই। মেদিনীপুর, নদিয়া, ও মালদহের পৌরাঞ্চলের ঘনতা যথাক্রমে ১০১, ৮ ও ২৮১ হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯১১-২১ দশকে অন্যান্য জেলার পৌরাঞ্চলের ঘনতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহামারীতে হাওড়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বহিরাগতদের জন্য বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে নাই।

যেখানে অন্ন জোটে মানুষ সেখানেই ছুটিয়া যায়। দুর্গম ডুয়ার্সে, দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে, আসানসোলের রুক্ষ পাথুরে স্থানে ও হুগলির তীরবর্তী সংকীর্ণ শিল্পাঞ্চলে এই জন্যই লোকের এত ভিড়। কৃষিতে যাহাদের ঠাঁই হয় না তাহারা জীবিকার সন্ধানে এই সকল বিশেষ বিশেষ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থের জন্য ইহারা নানাবিধ অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া থাকে। কলিকাতার ঘনতা ও বাসের অবস্থা হইতে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ঘনতা যেন উহার বৃদ্ধির জন্য ছোট ছোট অঞ্চলবিশেষ নির্বাচিত করিয়া নেয়।

হ্রাসবৃদ্ধির ধারা

প্রথমাবধি বর্ধমান বিভাগের লোকের চাপ এত অধিক যে, ১৮৭২ সন হইতে উহাতে এমন একটি থানাও ছিল না যাহার ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১৫০-এর নীচে।

পশ্চিমবঙ্গে যেসকল অঞ্চলের ঘনতা ৩০১ হইতে ৪৫০ পর্যন্ত তাহাদের পরিসর ১৮৭২ সন হইতে ১৯৫১ সন অবধি ক্রমাগত সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। ৪৫১ হইতে ৬০০ ঘনতার অঞ্চল ১৮৭২ হইতে ১৯৩১ সন পর্যন্ত ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার পরবর্তী দুই দশকে এই সকল অঞ্চল দুই ভাগ হইয়া বর্ধিত হইয়াছে। কতক অঞ্চল এই ঘনতার শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়াই বাড়িয়াছে আর খানিকটা ৬১০ হইতে ৭৫০ ঘনতার পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। ৭৫১ হইতে ৯০০ ঘনতার অঞ্চলের পরিমাণ ১৮৭২ সন হইতে প্রতি দশকেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯০১ হইতে ১,০৫০ ঘনতার শ্রেণীতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিদ্যমান। পরবর্তী স্তরের ঘনতার উচ্চতা সীমাহীন। ১৮৯১ ও ১৯৫১ সনের মধ্যে উহার আয়তন লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ের ১৮৭২ ও ১৮৮১ সনের অন্তে এই দশকে বর্ধমানের জ্বর ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ লোকক্ষয়ের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ধমান বিভাগে এই শ্রেণীর ঘনতার অঞ্চল ১,০৯১ বর্গমাইল হইতে ৩৬৫ বর্গমাইলে নামিয়া আসায় এবং এই পর্যায়ের মোট লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষে পরিণত হওয়ায় বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইতে হয়। গত ৮০ বৎসরে নিম্ন ঘনতার থানার পরিমাণ ও লোকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়াতে প্রমাণিত হয় যে, ক্রমবর্ধমান ঘনতার সংকীর্ণ অঞ্চলের দিকেই লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই প্রমাণ হইতে একমাত্র সিদ্ধান্ত এই, বাড়তি লোক কৃষি অঞ্চলের সর্বত্র সমভাবে বসতি স্থাপন না করিয়া বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে এমন ক্ষুদ্রাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র কৃষি এই জনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে অসমর্থ।

থানার ঘনতা

পশ্চিমবঙ্গে থানার মোট সংখ্যা ২৮০। উহার ২৮টি কলিকাতায় ও ৫টি হাওড়া নগরীতে অবস্থিত, রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ২৪৭টি থানায় বিভক্ত। এই ২৪৭টির ২৬টিতে একটিও শহর নাই, তথাপি তাহাদের ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১,০৫০-এর অধিক। অপর ৪৩টি সম্পূর্ণ গ্রাম্য থানার ঘনতা ৬১০ ও ১,০৫০র মধ্যে। ১০৮টি থানার ঘনতা ৬১০এর নীচে ; ইহার মধ্যে ২২টি থানায় একটি করিয়া শহর আছে। শহরের ঘনতা ১,০০০-এর উপর। এই ২২টি থানা এরূপ জনবিরল যে, হাজারের উপর ঘনতার অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের গড় ঘনতা ৬১০ অতিক্রম করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত ৪০টি থানা আছে যাহাদের অধিকাংশের অন্তত একটি করিয়া শহর আছে কিন্তু কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাই। ইহাদের প্রত্যেকের ঘনতা ৬১০-এর উপর হইলেও ২৩টির ঘনতা ১,০৫০-এর কম, অবশিষ্ট ১৭টির ঘনতা ১,০৫০-এর বেশি। এই ১৭টির গড় ঘনতা ১,৩৬৭ হইলেও নবদ্বীপ থানার ঘনতা ২,২৭৩-এ পৌঁছিয়াছে এবং ইহাই এই শ্রেণীর থানার ঘনতার সর্বোচ্চ হার। কলিকাতা ও হাওড়ার বাহিরে ৩০টি থানায় শিল্পালয় অথবা শিল্প-শহর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সালানপুর ও বড়বানীর ঘনতা যথাক্রমে ৯০৯ ও ৮৩৭ এবং জামুরিয়ার ঘনতা ১,২৩১। সালানপুরে নূতন শিল্প-শহর চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু বড়বানী ও জামুরিয়ায় একটিও শহর নাই। হুগলি জেলার চুঁচুড়া ও মগরা থানায় একটি করিয়া শিল্প-শহর আছে ; এই দুই থানার ঘনতা যথাক্রমে ৪,৮৬৯ ও ২,০৮৪। শিল্প-থানা রানীগঞ্জে একটি শহর আছে ; থানার ঘনতা ২,১৮০। এই শ্রেণীর অবশিষ্ট ২৪টি থানার ঘনতা সর্বাধিক ঘনবসতি পল্লী-থানার ঘনতা হইতে বেশি।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের গড় ঘনতা ৬১০ ; ইহাকে ঘনতার বিভাজিকা রেখারূপে ধরা যাইতে পারে। অপর সীমারেখা ১,০৫০ স্থির করিলে অন্যান্য দশকের ঘনতার সহিত তুলনার সুবিধা হইবে।

মোট থানার ২৬টি পল্লী-থানা, ১৭টি শিল্পবিহীন থানা এবং কলিকাতা ও হাওড়ার থানা সহ ৬১টি শিল্প-থানার ঘনতা ১,০৫০ এর বেশি। সালানপুর ও বড়বানী শিল্পাঞ্চল হইলেও তাহাদের জনসংখ্যার গড় ঘনতা ১,০৫০-এর কম। যেসকল থানার ঘনতা ১,০৫০-এর বেশি, তাহাদের সকল অংশই থানার আর্থিক জীবন উন্নয়নে সাহায্য করিয়া থাকে, এই ধারণা মনে আসতে পারে। শিল্প থানা সম্বন্ধে এই কথা খাটে। আসানসোল, হুগলি, হাওড়া ও চব্বিশপরগনার শিল্প শ্রমিকদের অনেকে আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু ১,০৫০ এর অধিক ঘনতার আসল অঞ্চলের আয়তন ঐ শ্রেণীর ঘনতাযুক্ত থানার মোট আয়তন অপেক্ষা কম।

রাজ্যের মোট আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গমাইলের মাত্র ৪,১২৬ বর্গমাইলের অর্থাৎ ১৩·৪ শতাংশের, ৬২টি নগর ও শহরযুক্ত ১০৪টি থানার, ঘনতা ১,০৫০-র অধিক। এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ১,০৫,৮৯,১৪৯ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২·৭ শতাংশ। আয়তনের ১৩·৪ শতাংশে জনসংখ্যার ৪২·৭ শতাংশ লোকের বাস। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট ৮৬·৬ শতাংশ ভূমিতে জনসংখ্যার ৫৭·৩ শতাংশ লোক বাস করে। এই অঞ্চলে ৫১টি শিল্পহীন শহর ও ১৭৬টি থানা আছে। ২৬টি পল্লী থানার আয়তন রাজ্যের ৬·৯ শতাংশ, জনসংখ্যার ১২·২ শতাংশের বাস এখানে। এই অঞ্চলের গড় ঘনতা ১,৪১৯। সাঁকরাইল ও জগাছার ঘনতা যথাক্রমে ৪,০০৭ ও ৪,৯০৪। ইহারা নামে পল্লী-থানা, কিন্তু এই দুই থানায় হাওড়া, বালী ও বাউরিয়া শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের উপনিবেশ আছে। এই দুইটি ছাড়া অন্য কোন পল্লী-থানায় ২,৬৯৮ এর বেশি ঘনতা নাই। সতরটি শিল্পহীন থানায় সতরটি শহর আছে তথাপি তাহাদের গড় ঘনতা ১,৩৬৭, পল্লী থানার গড় ঘনতা হইতে কম। তাহাদের মিলিত আয়তন ১,২৯৮ বর্গমাইল, রাজ্যের আয়তনের ৪·২ শতাংশ, এবং লোক মোট জনসংখ্যার ৭·২ শতাংশ। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জগাছা ও সাঁকরাইল ছাড়াও ২৪টি পল্লীর থানার গড় ঘনতা ১,৫০৫, শিল্পহীন থানার গড় ঘনতা অপেক্ষা বেশি। এই থানা কয়টি এত লোক কিরূপে পোষণ করে তাহা অনুধাবনযোগ্য। আশি বৎসরে যদি তাহাদের ঘনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে অথবা স্থির থাকিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই সকল থানার কৃষিসম্পদে এরূপ কিছু বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য আছে যাহার অন্যত্র অভাব এবং যাহার জন্য এত ঘন লোকবসতি সম্ভব। একষট্টিটি শিল্প-থানার মোট আয়তন ৬৯৪ বর্গমাইল বা রাজ্যের মাত্র ২·৩ শতাংশ, তথাপি এই অঞ্চলে লোকবসতি সর্বাধিক; মোট জনসংখ্যার ২৩·৩ শতাংশ। এই ৬১টি থানার ঘনতার গড় ৮,৩৪০ এবং এখানে ৪৫টি নগর ও শহর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র বজবজ (২,৬৭৫), হীরাপুর (২,৪৩৬), রানীগঞ্জ (২,১৮০), মগরা (২,০৮৪) জামুরিয়া (১,২৩১) ও অন্ডাল

(১,২০৫), এই ছয়টি থানার ঘনতা ৩,০০০-এর নীচে। ঘনতার এইরূপ অসমান বিন্যাস জীবিকার সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক জেলা যদি ৭৫০ ঘনতার সীমারেখা দ্বারা দুই অঞ্চলে ভাগ করা যায় তাহা হইলে আয়তন ও ঘনতার সম্বন্ধ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে দেখা যায়, যেসকল থানার ঘনতা ৭৫০ ও ১,০৫০-এর মধ্যে কেবলমাত্র সেখানেই আয়তন ও ঘনতার অতি নিকট ঐক্য রহিয়াছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, এই সকল থানার ঘনতা আয়তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ঘনতার এই মধ্য মান হইতে উভয় দিকে যত দূরে যাওয়া যায় আয়তন ও ঘনতার অসমানতা তত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক প্রান্তে রাজ্যের ৫·৮১ শতাংশ আয়তনে মাত্র ০ ০৮ শতাংশ লোক এবং অপর প্রান্তে ১ ৩৭ শতাংশ ভূমিতে জনসমষ্টির ২১ ৭৩ শতাংশ লোকের বসতি দেখা যায়। ঘনতা এক প্রান্তে ১০০ ও অপর প্রান্তে ১২,৭০০।

ছাব্বিশটি জনবহুল পল্লী-থানা

এখানে ২৬টি পল্লী-থানার ঘনতা বৃদ্ধির হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। পাশকুড়া, মহিষাদল ও ময়না থানা মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় এবং দাসপুর ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত। প্রথম তিনটি থানা পর পর সংলগ্ন হইয়া তমলুক থানাকে তিন দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পাশকুড়ার মধ্য দিয়া সেচখাল ও কাঁসাই নদী চলিয়া গিয়াছে। ভূমি উর্বরা ও সুসিঞ্চিত। ১৮৭২ সনে ইহার ঘনতা ছিল ১,০৬০। ১৮৮১ ও ১৯৩১ সন মধ্যে ঘনতা ৮৯০ হইতে ৯৩৪ এর মধ্যে নামিয়া যায়। ঘনতা হ্রাসের জন্য ম্যালেরিয়ার মড়কই দায়ী। সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্তী ময়না ও মহিষাদল থানা জলনিকাশ ও জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা সমন্বিত বিশেষ উর্বর ধান্য উৎপাদক অঞ্চল; কাঁসাই ও হলদি নদী ময়না থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ সীমান্তে কালিঘাই। মহিষাদলের পূর্ব সীমান্তে প্রবাহিত রূপনারায়ণের বাণিজ্যিক সুবিধা এই থানায় পাওয়া যায়। হিজলী জোয়ারের খাল মহিষাদল থানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। হলদি নদী ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় প্রবাহিত। ময়নার ঘনতা ১৮৭২ সনের ৪৫৬ হইতে দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে; কেবলমাত্র ১৯২১ সনে ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়কের দরুন উহা সামান্য হ্রাস পাইয়াছিল, মহিষাদলের ঘনতায় ১৮৭২ সনের ৫৭৭ হইতে নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ঘটিতেছে। সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভূমিযুক্ত দাসপুরের বাণিজ্যকেন্দ্র চিরদিনই জনবহুল। নদীর বাণিজ্যের জন্য খ্যাত রূপনারায়ণ ইহার পূর্ব প্রান্তে। শিলাই নদী ও কয়েকটি খাল ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ সনেই ইহার ঘনতা ১,০৬৬ ছিল। ১৯১১ ও ১৯৩১ সনের মধ্যবর্তী কালে ম্যালেরিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে লোকক্ষয়ের ফলে ১৯৩১ সনে ঘনতা ৯২৬ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। পাটি ও মাদুর এবং নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি প্রস্তুত ও তাঁতের কাজের মত উন্নতিশীল গৌণ উপজীবিকার সুবিধা ময়না ও পাঁশকুড়া থানায় আছে। মহিষাদলের জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন হয়, এখানে নারিকেল বাগান আছে এবং এই থানার লোক সুন্দরবনে যাইয়া সাময়িক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে।

১৮৭২ সনে হুগলি জেলার খানাকুল থানার ঘনতা ১,১৯২ ছিল; ইহা ১৯৫১ সনের ঘনতা হইতে বেশি। কিন্তু ১৮৯১ ও ১৯৩১ সনের মধ্যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে লোকক্ষয় ঘটে; ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর পর ১৯২১ সনে ঘনতা ৮০৯ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদীর বাণিজ্যের দ্বারা ইহা উপকৃত হয়। এই থানায় উত্তম চাষবাস হইয়া থাকে এবং অন্য অঞ্চলের সহিত তুলনায় কুটিরশিল্প এখনও উন্নতিশীল। দামোদর নদের পশ্চিমে খানাকুল পুরশুড়ার সহিত ভোগোলিক, কৃষির ও লোকপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সমতা এবং উচ্চ ঘনতার এক সংলগ্ন ব্লক গঠন করিয়াছে। সিঙ্গুর, তারকেশ্বর এবং হরিপাল ১৮৭২ সনে অতিশয় জনবহুল ছিল। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সনের মাঝখানে ইহাদের ঘনতার হার অনেক নীচে নামিয়া পড়ে। ১৮৮১ সনের ইডেন খাল ও ১৮৮৫ সালে শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেল লাইন খোলার ফলে এই দুই থানার কৃষিতে নূতন বেগ সঞ্চারিত হয় এবং লোকের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পায়। রেলপথে প্রতিদিন কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্প-শহরের কর্মকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি হওয়াতে অনেক লোক এই অঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই তিন থানা উচ্চ ঘনতার এক সংলগ্ন ব্লক সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রকৃতিও একই ধরনের।

খানাকুল, পুরশুড়া, তারকেশ্বর, হরিপাল ও সিঙ্গুর একত্রে জেলার মধ্যাঞ্চল গঠিত করিয়াছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণে হাওড়া জেলার সীমায় চণ্ডীতলা ও জঙ্গীপাড়া লইয়া অপর একটি অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চণ্ডীতলা রাজধানীর অধিকতর নিকটে থাকায় উহার ঘনতা জঙ্গীপাড়ার দ্বিগুণ। ১৮৭২ সন হইতে এই দুই থানার ঘনতার হার উচ্চ ছিল। কিন্তু জঙ্গীপাড়া ম্যালেরিয়াতে বেশি ভুগিয়াছে এবং তাহার ফলে ইহার ঘনতা ১৯৩১ সনে ৮৩৬-এ নামিয়াছিল। ডানকুনী ও রাজাপুর জলনিকাশ ব্যবস্থা, ইডেন খাল এবং কৌশিকির পুনর্খননের দ্বারা এই উভয় থানাই উপকৃত হইয়াছিল। হাওড়া-শিয়াখালা, চণ্ডীতলা-জনাই, এবং হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গার শহরতলি রেলপথ থানা দুইটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাদের কৃষিক্ষেত্র উত্তম ও উর্বর। বহুলোক সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ ও অল্পব্যয়ে সংসার চালাইবার উদ্দেশ্যে এখনও গ্রামে বাস করিয়া থাকে এবং রেলযোগে প্রতিদিন কলিকাতা যাতায়াত করিয়া জীবিকা অর্জন করে।

জগাছা ও সাঁকরাইলের বসতির ঘনতার হেতু পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদিগকে হাওড়া নগরীর পশ্চিম দিকের শহরতলি বলা যাইতে পারে। হাওড়া জেলার সর্বত্র মোটামুটি উর্বরা ধানের জমি ও সবজিবাগ আছে। গোটা জেলাটিই যেন কলিকাতা, বালী ও হাওড়া নগরীর শহরতলি। হাওড়া ও রাজাপুর জলনিকাশের ব্যবস্থায় এই জেলার বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা মাত্র ৫৬০ বর্গমাইলের জেলার ৩২০ বর্গমাইল ভূমি চাষ-আবাদের জন্য উদ্ধার করা হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ, হাওড়া-আমতা রেলপথ, হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ও হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথ ১৮৯৭-৯৮ সনে খোলা হয়। এইসকল রেলপথ শহরতলির যাতায়াত দ্রুত ও সহজ করিয়া দিয়াছে। রেলপথ প্রতিটি থানার ঘনতা রক্ষা ও ক্রমশ বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। এই জেলা হইতে বিস্তর লোক হাওড়া ও কলিকাতা নগরীতে প্রতিদিন যাতায়াত করে। রাজধানীতে উপার্জিত রোক টাকা নিশ্চয়ই চাষবাসের উন্নতির সাহায্য করিয়া থাকে।

চব্বিশপরগনার জনবহুল পল্লী-থানা

মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, কুল্‌পী ও ফলতা থানা হাওড়ার থানার অনুরূপ। ই আই আর বহুদিন পূর্বেই এই সকল থানায়

রেলপথের বিস্তার করিয়াছিল। মগরাহাট জলনিকাশ ব্যবস্থায় ২৯০ বর্গমাইল ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট জলাভূমি লাভজনক চাষের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ডায়মন্ডহারবারের নিকটে খালে কবাট দেওয়াতে ১০০ বর্গমাইল জলাভূমি ধানচাষের জন্য উদ্ধার করা হয়। এই সকল থানায় ব্যবসায়, বাণিজ্য, মাছ-ধরা প্রভৃতির বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। বিপুলসংখ্যক লোক সপরিবারে এই সকল থানায় বাস করে এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিদিন শহরতলি ও নগরে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহাই এই সকল থানার দ্রুত ও ক্রমাগত লোকবৃদ্ধির কারণ। এই চারিটি থানা কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে একটি সংলগ্ন ও সদৃশ অঞ্চল গঠন করিয়াছে। দ্রুতগামী রেলগাড়ি ইহাদিগকে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সহিত সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। বাজারহাট থানা কলিকাতার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। উত্তম মাছ ধরার জায়গা ও ফলের বাগান আছে। বারাসাত বসিরহাট রেলপথ ইহাকে কলিকাতার সহিত যুক্ত করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ

বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বোৎকৃষ্ট উর্বরা থানাসমূহের অন্যতম। কালান্তরের নিম্নাঞ্চলের কাদা জাতীয় মাটি এবং ভাগীরথীর পলি ইহার উর্বরতার হেতু। পূর্বে এখানে চিনির কল ছিল। উহা বন্ধ হইবার পরে নদিয়ার রামনগর চিনির কলে বিস্তর আখ যোগান দেওয়া হয়। এখানে বড় বড় ফলের বাগান সবজি বাগান ও তুঁতের ক্ষেত আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে ১৯২১ সনে এই থানার ঘনতা ৭৫৬ তে নামিয়াছিল। যদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নয় তথাপি ১৮৭২ সনের ৭৫৩ হইতে ঘনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সনে ১০৫৬ তে দাঁড়াইয়াছে।

মালদহ

মালদহ জেলার কালিয়াচক থানা গঙ্গার পলিগঠিত অঞ্চল প্রতি বৎসর উহাতে এক স্তর পলি পড়ে, অতি উর্বর, অধিকাংশ জমি তিন ফসলী। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ মুর্শিদাবাদ হইতে আগত শেরশাবাদিয়া মুসলমান। উহারা উদ্যমশীল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বহু সন্তানের জনক। রাজ্যের মধ্যে পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বেশি এবং অধিক লাভজনক কুটিরশিল্প রেশম উৎপাদন ও বয়ন, এই জেলায় প্রচলিত। কৃষিকর্মে যাহাদের সংস্থান হয় না তাহারা সকলেই এই লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রপীড়িত হওয়াতে ১৯২১ সনে বসতির ঘনতা হ্রাস পাইয়াছিল, ইহা ছাড়া এই থানার ঘনতা ক্রমাগত দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই ছাব্বিশটি পল্লী-থানার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, উহাদের প্রত্যেকটিই অতি উর্বর, জলনিকাশ ও জলসেচের সুব্যবস্থাযুক্ত, জল ও স্থলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম এবং কৃষিকর্ম ব্যতীত গৌণ উপজীবিকার সুযোগ বিদ্যমান। ঘনতা যতই নিম্ন সীমা ১,০৫০ এর নিকটবর্তী হয় ততই কৃষিনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই সংখ্যা হইতে ঘনতা যত বেশি হয় অকৃষি উপজীবিকার সুযোগসুবিধা ততই বাড়িতে থাকে এবং কৃষিকর্ম, অ-কৃষি ব্যবসায় ও চাকরিতে লোকের বণ্টন ততই সন্তোষজনক। পল্লী-থানার ১,৫০০ হইতে ২,৫০০ ঘনতার মধ্যে কৃষি ও তাহার পরিপূরক বৃত্তির অবস্থা সর্বোত্তম; উহারা পরস্পরের সমর্থক। থানা কয়টির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক থানাতেই সমজাতীয় লোকের বাস, সুতরাং বিভিন্ন গোত্রের লোক থাকিলে যেসকল বিশেষ সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হয় এই সকল থানায় তাহা নাই। চব্বিশপরগনা জেলার যে তিনটি জনবহুল থানায় বাহির হইতে লোক আসিয়াছে সেখানেও বহিরাগতেরা স্থানীয় অধিবাসীর মতই মাহিষ্য। মালদহের কালিয়াচকেও সেই অবস্থা। মুর্শিদাবাদ হইতে আগত শেরশাবাদিয়াগণ স্থানীয় অধিবাসীদের সমগোত্রীয়। এ কথা বলায় অতিরঞ্জন দোষ ঘটিবে না যে, কালিয়াচকের প্রায় সমস্ত জনসমষ্টি মুর্শিদাবাদ হইতে তুলিয়া আনিয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, যেসকল সুসংবদ্ধ অঞ্চলের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে কৃষি ও কৃষিপদ্ধতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি নৃতাত্ত্বিক ঐক্য রহিয়াছে। স্থানীয় জনসমাজে সংঘর্ষ ও বিরোধিতার ক্ষেত্র সংকীর্ণতম।

মেদিনীপুর হুগলি ও হাওড়া জেলার এই পর্যায়ের জনবহুল থানার ঘনতা অপেক্ষাকৃত স্থির রহিয়াছে বৃদ্ধি তুলনায় অতি সামান্য। ইহাতে বুঝা যায় এই সকল উচ্চ ঘনতার অঞ্চল ইতিমধ্যে লোকধারণক্ষমতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং জমি ও মানুষের জীবনের মধ্যে এমন একটা সমতা স্থাপিত হইয়াছে যে, কৃষিক্ষেত্র এখন অধিক লোক রাখিতে বাধা দান করিতেছে।

জনবহুল ২৬টি পল্লী থানার মেদিনীপুরে ৪ হুগলিতে ৭ ও হাওড়ায় ৮ মোট ১৯, চব্বিশপরগনায় ৫ মুর্শিদাবাদে ১ ও মালদহে ১। মেদিনীপুর হুগলি ও হাওড়ার ১৯টি থানা একই ভূখণ্ডের পরস্পর সংলগ্ন শাসনবিভাগমাত্র। ইহার দক্ষিণে মহিষাদল হইতে আরম্ভ করিয়া ময়না পাঁশকুড়া দাসপুর, খানাকুল, পুরশুরা, তারকেশ্বর হরিপাল সিঙ্গুর চণ্ডীতলা ডোমজুড়, জগাছা সাঁকরাইল ও শ্যামপুর এই ১৩টি থানা অবশিষ্ট ৬টিকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ১৯টি থানা ব্যতীত এই ভূখণ্ডে দুইটি শিল্পবিহীন থানা তমলুক ও উলুবেড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের ঘনতা যথাক্রমে ১৫১১ ও ২০৮৭। এই ভূখণ্ডের আয়তন ১৯৯৬ বর্গমাইল। ইহার অন্তর্ভুক্ত ২১টি থানার প্রত্যেকেরই ঘনতা ১০৫০ এর অধিক। এই ভূভাগের মধ্য দিয়া দামোদর ও রূপনারায়ণ প্রবাহিত হইয়া হুগলি নদীতে পতিত হইতেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সকল থানায় ভূমি উর্বর এবং এখানে জলনিকাশ ও জলসেচের এবং জলপথ ও স্থলপথে গমনাগমনের সুব্যবস্থা আছে। তমলুক ও উলুবেড়িয়া এই অঞ্চলের মাত্র দুইটি শহর।

শ্যামপুর ও মহিষাদল থানার বিপরীত দিকে, হুগলি নদীর পূর্ব তীরে চব্বিশপরগণার ৭টি জনবহুল পল্লী থানা, বিষ্ণুপুর, ফলতা মগরাহাট ও কুলপী অবস্থিত।

শিল্পবিহীন থানা ডায়মন্ডহারবার সহ পাঁচটি থানায় অপর একটি জনবহুল বক গঠিত হইয়াছে। এই খণ্ডের আয়তন ৩৭৫ বর্গমাইল। ডায়মন্ডহারবার উহার একমাত্র শহর। এই দুই খণ্ডের মোট আয়তন ২৩৭১ বর্গমাইল। হুগলি নদী এই দুই অঞ্চলকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ২৩টি সম্পূর্ণ পল্লী-থানা ও ৩টি শিল্পবিহীন থানা লইয়া গঠিত অঞ্চলে ৩০৩০৩২২ জন লোক বাস করে। ইহার ঘনতা গড়পড়তায় ১২৭৮। অপর তিনটি পল্লী-থানা, বাজারহাট, বেলডাঙ্গা ও কালিয়াচক চব্বিশপরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

শিল্পবিহীন থানা

শিল্পবিহীন ১৭টি থানার মধ্যে নবদ্বীপ (২২৭৩), উলুবেড়িয়া (২০৬৭) সমসেরগঞ্জ (১৭৪১) ডায়মন্ডহারবার (১৭০১) দার্জিলিঙ (১৫৬৮) তমলুক (১৫১১) জিয়াগঞ্জ (১৪৭৯) বসিরহাট (১৩৭৩) সোনারপুর (১৩৪২) রঘুনাথগঞ্জ (১৩০০) ও বারুইপুর (১২৭২), এই ১১টির ঘনতা ১১৫০ এর ঊর্ধ্বে। তমলুক ও উলুবেড়িয়ার অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। নানাবিধ সুবিধার জন্য ইহাদের ঘনতা ১৮৭২ সন হইতে অন্যান্য থানা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি ১৯৪১ সনে হঠাৎ নামিয়া গিয়াছিল। চব্বিশপরগনার বসিরহাটে ইছামতী নদীর জন্য জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঘনতার বৃদ্ধি মন্থর। বেশ কিছু উদ্বাস্তুর আগমনেও ১৯৫১ র পর ঘনতা বেশি বাড়ে নাই। সোনারপুর ও ডায়মন্ডহারবারের অবস্থাও তদ্রূপ। ধুবুলিয়ার বিশাল উদ্বাস্তু শিবির এবং শহরে উদ্বাস্তু উপনিবেশের জন্য কৃষ্ণনগর থানার লোকসংখ্যা সম্প্রতি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪১ সনে ইহার ঘনতা ছিল মাত্র ৬৬১। বহু উদ্বাস্তু থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের ঘনতা ১৯৪১ সন অপেক্ষা অনেক বাড়ে নাই। নবদ্বীপ শহরের মত এত অধিক উদ্বাস্তু ইহার সমকক্ষ অপর কোন শহরে সমবেত হয় নাই। ১৯৫১ সনের ১৩৪৮ হইতে নবদ্বীপ থানার ঘনতা ৯২৫ বাড়িয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের সমশেরগঞ্জ থানায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত শহর ধুলিয়ানে ব্যবসায় ও অকৃষি উৎপাদন হইয়া থাকে। এই থানার ভূমি উর্বর প্রচুর জল আছে চাষবাস ভাল চলে। জিয়াগঞ্জ এখন পাট ব্যবসায়ের উন্নতিশীল কেন্দ্র। নেপাল ও সিকিমের লোকের দ্বারা দার্জিলিঙের ঘনতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অকৃষি উপজীবিকার ব্যবস্থা থাকার জন্য কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত লোক শহরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শিল্পবিহীন ১৭টি থানায় লোকবৃদ্ধির সম্ভাবনাপূর্ণ শহর থাকা সত্ত্বেও তাহাদের গড় ঘনতা পল্লী থানার গড়ের নিম্নে রহিয়াছে। এই সকল থানা হইতে শহর বাদ দিলে বহরমপুর টাউন রঘুনাথগঞ্জ নবদ্বীপ ও শান্তিপুর থানার ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ এর বেশ কিছুটা নীচে নামিয়া যাইবে। বসিরহাট ডায়মন্ডহারবার বারাসত বারুইপুর বাদুড়িয়া এবং সোনারপুর থানা চব্বিশপরগনা জেলায়। কলিকাতার অনতিদূরের এই ছয়টি থানায় অনেকটা শহরতলির ভাব আছে। জীবিকা অর্জনের জন্য সহস্র সহস্র নরনারী এই সকল থানা হইতে কলিকাতা ও তাহার শিল্পসমৃদ্ধ উপনগরসমূহে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে কৃষি ব্যতীত ব্যবসায় বাণিজ্য মাছধরা, ফলের বাগিচা, সবজিবাগান হইতেও অর্থাগম হয়। হিলি ও জিয়াগঞ্জ থানা এত ছোট যে শহর ও তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল বাদ দিলে উহাদের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে না। দার্জিলিঙের বেলা এ কথা খাটে না। শহরের বাহিরে চা-বাগানে কর্মের সংস্থান হয়। দেখা যাইতেছে যে তমলুক উলুবেড়িয়া ও সমশেরগঞ্জ থানার শহর তিনটি না থাকিলেও ঘনতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিত না কারণ উহাদের কৃষিসম্পদই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ। অপর ১৪টি থানার জনসংখ্যা হইতে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা বাদ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই পরিমাণ লোক অকৃষি উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল। শহরই ইহাদের কর্মক্ষেত্র। এই সকল থানার ঘনতা বৃদ্ধির সাহায্য ইহারাই করিয়াছে।

দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার শিল্প-থানা

দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির চা বাগান সুসংগঠিত উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই দুই জেলায় মহানন্দার উত্তরের অংশে চা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চল চায়ের তালুক (Tea state) নামে বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক এস্টেটের একাংশ চা বাগান, অপর এক বিরাট অংশ বাগানের গৃহনির্মাণের কাঠ জ্বালানী কাঠ উলুখড় প্রভৃতির জন্য সংরক্ষিত থাকে। চা গাছের নার্শারি বাগানে রোপণের জন্য ছায়াবৃক্ষের নার্শারি ও ম্যালেরিয়া নিবারক বৃক্ষের নার্শারির জন্যও ভূমি পৃথক করিয়া রাখা হয়। বাগানের পুরাতন শ্রমিকদিগের মধ্যে ছোট ছোট খণ্ডে ধানের জমি বিলি করার রীতি আছে। কোন কোন শ্রমিক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর এস্টেটের সীমার বাহিরে বসতি স্থাপন করে এবং স্বাধীন শ্রমিকরূপে বাগানের কাজ করিতে থাকে। বাগানের শ্রমিক, কর্মচারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোক ব্যতীত অপর লোকের এই অঞ্চলে বাসের সুবিধা বেশি নাই। সুতরাং ইহা বিরলবসতি অঞ্চল। দার্জিলিঙের ৪৫১ বর্গমাইল এবং জলপাইগুড়ির ৫৬৯ বর্গমাইল স্থান সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সর্বপ্রকারের বন যথাক্রমে ৪৮৭ ও ৬৬২ বর্গমাইল। চায়ের তালুক ও বনাঞ্চলের অধিকৃত ভূমির বাহিরে যে জমি অবশিষ্ট আছে তাহার বৃহৎ অংশে পাট ও তামাক উৎপন্ন করা হয়। খাদ্যশস্যের জন্য নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। চা পাট ও তামাকের মত খাদ্যশস্য লাভজনকও নহে। এই সকল কারণে দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির বসতির ঘনতা কম। জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চলের ঘনতা ১৯৪১ সনে ছিল ৩৭৬ এবং ১৯৫১ সনে হইয়াছে ৩৫১। দার্জিলিঙে এই হার যথাক্রমে ২৬৮ ও ২৯৬। শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধির জন্যই প্রধানত চায়ের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য চা উৎপাদক দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চায়ের টিকিয়া থাকা কঠিন। সুতরাং চা বাগানের পক্ষে অধিক লোক পোষণের শক্তি হ্রাস হইয়াছে। কৃষি অঞ্চলের লোকধারণের ক্ষমতাও বোধ হয় শেষ সীমায় উপস্থিত। ঘনতা বৃদ্ধির হারের অল্পতার ইহাই কারণ। ঘনতা ১০৫০ হইতে কম থাকায় জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের থানা শিল্প থানা হইলেও উহাদিগকে জনবহুল শিল্প থানার শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই।

অন্যান্য শিল্প-থানা

দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ির বাহিরের ৬৩টি শিল্প থানার ৬২টি তিন অঞ্চলে এবং একটি অন্য অঞ্চলে অবস্থিত। সালানপুর কুলটি হীরাপুর আসানসোল বড়বানী রানীগঞ্জ জামুরিয়া ও অণ্ডাল এই আটটি থানার ৩৯৫ বর্গমাইল জুড়িয়া রহিয়াছে আসানসোল রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল। ইহার মধ্যে সালানপুর ও বড়বানীর ঘনতা ১০৫০ এর নীচে থাকায় উহাদিগকে জনবহুল শিল্প-থানার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অপ্রশস্ত ভূখণ্ডে, ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ২½ মাইল প্রশস্ত মোট ১২৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া হুগলি-হাওড়া শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। ইহা হুগলি জেলার মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর ভদ্রেশ্বর শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া (৯২ ৪ বর্গমাইল) এবং হাওড়া জেলার বালী, হাওড়া ব্যাঁটরা, গোলাবাড়ী, মালীপাঁচঘরা শিবপুর ও বাউড়িয়া থানা (৩৩ ৫ বর্গমাইল) লইয়া গঠিত। বারাকপুর কলিকাতা বজবজ শিল্পাঞ্চল হুগলি নদীর পূর্বতীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাও এক অপ্রশস্ত ভূখণ্ড, দৈর্ঘ্য

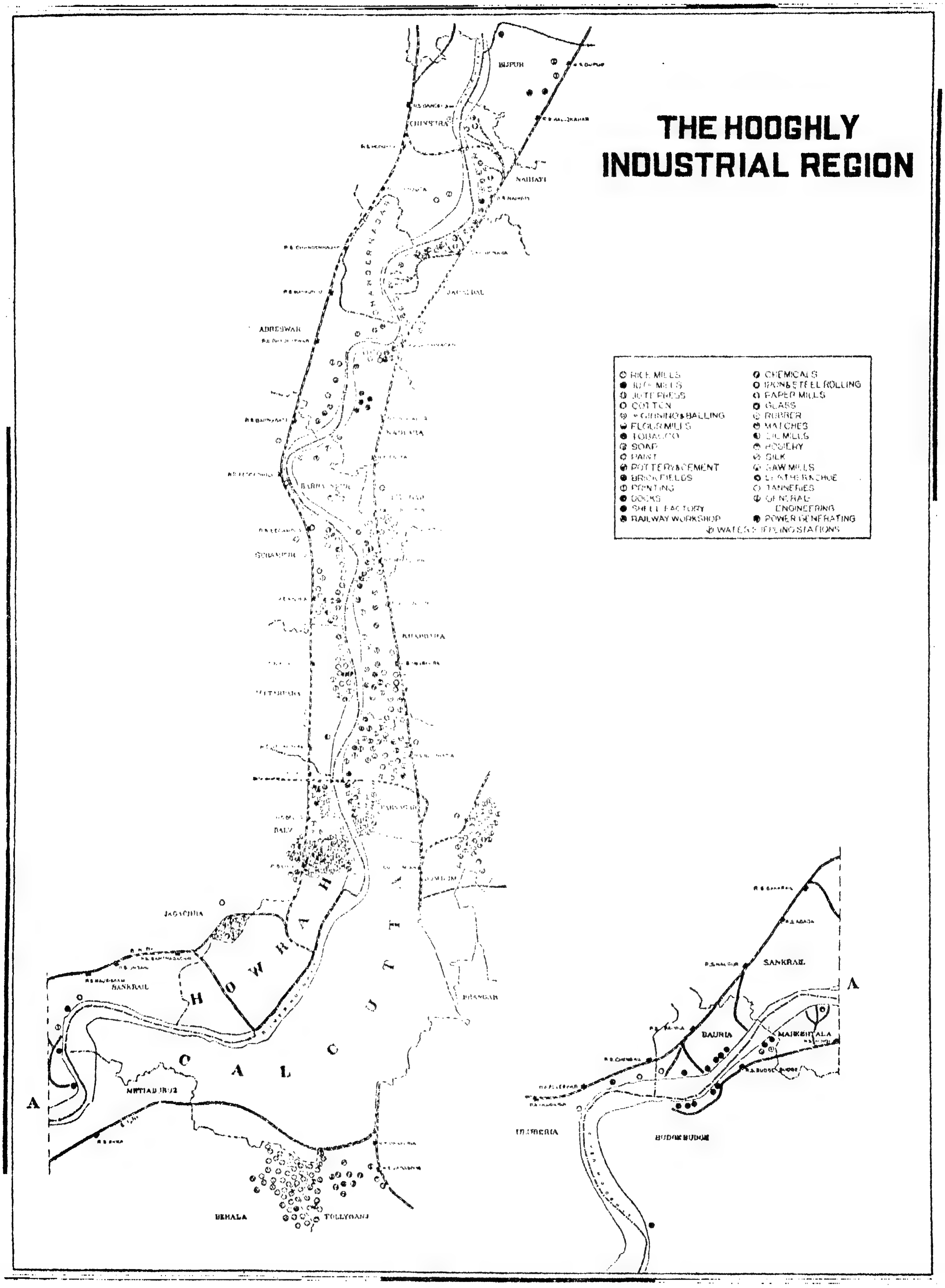

মোটামুটি ৫৫ মাইল এবং প্রস্থ ৫ মাইল, মোট আয়তন ২৭৬ বর্গমাইল। কলিকাতার ২৮টি থানা, টালিগঞ্জ, বরাহনগর, জগদ্দল, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, টিটাগড়, বেহালা, বিজপুর, দমদম, মহেশতলা, খড়দহ, নৈহাটি, নোয়াপাড়া ও বারাকপুর এই ৪২টি থানা লইয়া এই তৃতীয় অঞ্চল গঠিত। খড়্গপুর টাউন থানার আয়তন ১৩ বর্গমাইল। ইহা প্রধানত একটি রেলওয়ে নগর। ইহাতে রেলের কারখানা আছে। এখানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নলজির (Indian Institute of Technology) প্রতিষ্ঠায় নগরীর ভবিষ্যৎ প্রসারতার সূচনা দেখা যাইতেছে।

এক শিল্পাঞ্চলের থানাসমূহ সমধর্মী; সুতরাং প্রত্যেক থানার অবস্থা পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা না করিয়া প্রত্যেক শিল্পাঞ্চলের সকল থানার বিষয় একত্রে আলোচিত হইবে।

আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল

ইহা মূলত কয়লার খনি অঞ্চল; কয়লার খনি অবলম্বন করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তাপসহ ইট ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, অ্যালুমিনিয়াম, কাগজ, চলিষ্ণু ইঞ্জিন, সাইকেল, চীনামাটির দ্রব্য, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রভৃতির শিল্পালয় এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। উৎপাদনব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে কয়লার খনির সান্নিধ্যে এই সকল শিল্পালয়ের প্রতিষ্ঠা। মৌচাকের মত বহু খনি প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই অঞ্চলের শিল্পসম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত এবং উহার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। খনির ফাঁকে ফাঁকে স্থাপিত হইয়াছে বিভিন্ন শিল্পালয়। সমস্ত অঞ্চল জোড়া ভাল ভাল রাস্তা থাকায় মালবহনের ব্যয় হ্রাস পায়; উৎপাদনব্যয়ের একটি প্রধান অঙ্গ যন্ত্র পরিচালনার ইন্ধনব্যয়। এই অঞ্চলে ইন্ধন এক রকম শিল্পালয়ের দুয়ারেই পাওয়া যায়। এখানকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ এমনভাবে গড়া যে শ্রমিকদের কখনো কাজের অভাব ঘটে না এবং তাহাদের একই প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না। সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বাষ্প উৎপাদন যন্ত্র (Boiler), ধাতুনিষ্কাশন ও দ্রব্যোৎপাদনের ব্যবস্থা, চুল্লী (Oven), কর্মশালা, বিভিন্ন উৎপন্ন অংশের সংযোজনের ধারা (Assembly lines) প্রায় একই ধরনের। সুতরাং এক কারখানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আধা-যন্ত্রকুশলী শ্রমিক প্রয়োজন হইলে অন্য কারখানায় যন্ত্রপাতি চালানো অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে। যদি কোন কারণে কোন কারখানা উঠিয়া যায় অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে তাহা হইলে উহার শ্রমিকদিগকে কাজের অভাবে দেশে চলিয়া যাইতে হয় না, এই অঞ্চলেরই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাহাদের কর্মের সংস্থান হয়। এইরূপে আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চলে সকল শ্রেণীর শিল্প-শ্রমিকেরই বরাবর কাজে নিযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা অন্যান্য শিল্পাঞ্চল অপেক্ষা অধিক। শ্রমিকদের এই অঞ্চলে থাকিয়া যাইবার আগ্রহের কারণও উহাই। কয়লার খনি শ্রমিকদের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। তাহাদেরও কাজের অভাব ঘটে না। এক খনি বন্ধ হইয়া গেলে পাশের এক খনিতে তাহাদের স্থান হয়। কতকগুলি বিশেষ সুবিধার আকর্ষণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে, আশেপাশে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। যন্ত্রশিল্পের শক্তির মৌলিক উৎস কয়লা বলিতে গেলে শিল্পালয়ের দুয়ারেই পাওয়া যায়। সড়ক ও রেলপথে বহু অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। আসানসোল রেলের বৃহত্তম সংযোগস্থলসমূহের একটি। কলিকাতা বন্দর, বিবিধ খনি অঞ্চল, কাষ্ঠসংগ্রহের বনভূমি, এবং দেশের প্রধান প্রধান রাজ্য ও নগরের সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। খনির শূন্য স্থান পূরণ, তাপসহ দ্রব্য নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অফুরন্ত বালির ভান্ডার আছে দামোদরের বক্ষে: উহা সংগ্রহের ব্যয় অতি সামান্য। চীনামাটির দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং ধাতুনিষ্কাশনের কারখানায় একান্ত আবশ্যকীয় মৃৎ-পদার্থের (clay) যোগান অন্ডাল, ফরিদপুর ও বীরভূমে অনায়াসলভ্য। পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া, ময়ূরভঞ্জ, সিংহভূম, মানভূম ও সাঁওতালপরগনা প্রচুর সস্তা শ্রমিক সরবরাহ করিয়া থাকে। হাওয়া শুষ্ক ও খড়খড়ে; মৃত্তিকা সচ্ছিদ্র, বৃষ্টির জল উত্তমরূপে সরিয়া পড়ে; বাঙলার অন্য অঞ্চলের আর্দ্র বায়ুর ন্যায় আসানসোল মহকুমার জলবায়ু শ্রমিকদিগের কর্মশক্তি হ্রাস না করিয়া তাহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ক্রমাগত কাজ করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য অল্পব্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহনির্মাণের সুবিধা করিয়া দেয়। স্থানটি অন্য জায়গার তুলনায় স্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়াশূন্য, সুতরাং শ্রমিকগণ জীবনীশক্তি-হ্রাসকারী ব্যাধিমুক্ত। পূর্বে ও দক্ষিণে, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার, ধানের অঞ্চল খাদ্যশস্যের যোগান দিতেছে। এই সকল অনুকূল অবস্থা আসানসোল-রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই অঞ্চল হইতে দূরে সরিয়া গেলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আসানসোলের সুবিধালাভে বঞ্চিত হইবে। ইহাই এই শিল্পাঞ্চলের পরিসরবৃদ্ধির পথের বাধা। দামোদর পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ সস্তায় বিদ্যুৎসরবরাহের আশ্বাস দিয়াছেন: সস্তা বিদ্যুৎ এই শিল্পাঞ্চলকে বেশি দূরে বিস্তৃত করিতে উৎসাহিত করিবে কিনা সন্দেহ। জলবিদ্যুৎ, সস্তা কয়লা এবং বেসরকারী কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ হইতে এত অধিক সস্তা হইবে কিনা যাহার জন্য উল্লিখিত সুবিধাসমূহ উপেক্ষা করিয়া শিল্পাঞ্চল পূর্বদিকে নিম্ন ধানের জমি পর্যন্ত প্রসারিত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। অজয় ও দামোদরের বাধার জন্য এই অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। শিল্পাঞ্চলটির একমাত্র পশ্চিম দিকে বিহারে প্রসারিত হইবার পথ খোলা। সেদিকে ইহা অগ্রসরও হইয়াছে। কিন্তু শিল্পাঞ্চলের বিস্তৃতি এই অঞ্চলের শিল্পদ্রব্যের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের অবস্থার উপর বহুলপরিমাণে নির্ভরশীল। ১৯৩১ সনেও উপশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং লোকবৃদ্ধির গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম এই অঞ্চলের শিল্পে বেগ সঞ্চারিত করিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই জাপান বিপুলপরিমাণে কয়লা ক্রয় করার ফলে আসানসোল রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের জীবনের মেয়াদ আবার নূতন করিয়া বৃদ্ধি হইল। বসতির ঘনতা ১৯৪১ ও ১৯৫১ সনে লাফে লাফে বাড়িয়া গেল। যদি শিল্পের বর্তমান ধারা অব্যাহত, এবং প্রাচ্যের বাজারে ভারতের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে এই অঞ্চলে সমৃদ্ধি বাড়িতেই থাকিবে। এখানকার জনগণ শ্রমশিল্পের উপর নির্ভরশীল, আয়ের পরিপূরকরূপেও কৃষির উপর নির্ভর করে না, সুতরাং শিল্পাঞ্চলের খাদ্যশস্যের জমি অধিকারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বসতির ঘনতা কয়লা প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং উহা উত্তোলনের উপর নির্ভর করিবে। আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চলের সম্প্রসারণের জন্য ইহার পূর্ব দিকে অবস্থিত ফরিদপুর ও কাংসা থানার প্রায় সব, ২২৯ বর্গমাইল, স্থানের উন্নতিবিধান করা যাইতে পারে। এই দুই থানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পালয় কয়লার খনি হইতে অধিক দূরে থাকিবে না; দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎও ব্যবহার করা চলিতে পারিবে। থানা দুইটির বসতির স্বল্পতায় কৃষির দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা কৃষির প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না। এই থানাদ্বয় শিল্পেরই বিশেষ উপযোগী। এখানে অবাধে শিল্পের উন্নতি হইতে পারিবে। কয়লার খনি ও

অন্যান্য খনির পরস্পরের মধ্যে বেশ ব্যবধান আছে। শিল্পালয়সমূহ সম্প্রসারণের স্থান উহাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে। দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নৌ চালনযোগ্য দুর্গাপুর খালের খনন সম্পন্ন হইলে শিল্পের অধিকতর উন্নতি ঘটিবে এবং এই অঞ্চলের সহিত হুগলির শিল্পাঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হইবে।

হুগলি হাওড়া এবং বারাকপুর-কলিকাতা-বজবজ এই দুই শিল্পাঞ্চলও নিজ নিজ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের সীমাবদ্ধতার কারণ আসানসোল-রানীগঞ্জের সীমাবদ্ধতার কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হুগলির তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল সীমায়িত করিবার প্রধান হেতু কলিকাতা বন্দরের অবস্থান। মাল তুলিবার ও নামাইবার, গুদামজাত করিবার এবং স্থানান্তরিত করিবার খরচা উৎপাদনব্যয়ের এক প্রধান অংক। বিক্রয়মূল্য ইহার জন্য বাড়িয়া যায়। রাস্তাঘাট ও রেলপথের বর্তমান অবস্থায় এদেশে ঐ তিন বাবতেই খরচা বেশি। সুতরাং যে শিল্প কলিকাতা হইতে যত দূরে অবস্থিত তাহার উৎপাদনব্যয় তত অধিক। উপশিল্পে (Secondary Industries) প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতির মেরামত কলিকাতা ও হাওড়ার নিকটেই অল্প সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব। শিল্পালয় দূরে প্রতিষ্ঠিত হইলে যন্ত্রের মেরামত এবং উহার অংশাদি সংগ্রহের জন্য মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়া যায়। উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির দরুন বাজারে মালের কাটতি কমিবার আশংকা দেখা দেয় এবং শিল্পজাত দ্রব্য দীর্ঘকাল অবিক্রীত পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা ঘটে।

বন্দর হইতে দূরে অবস্থানের অসুবিধা চা-বাগানে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়। চা শিল্পের লোকজনেরা ভাবে সুন্দরবনে চা-বাগান স্থাপিত করিতে পারিলে তাহারা বাঁচিয়া যাইত।

হুগলি নদী পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী, পূর্ব তীরে মূলাজোড় ও কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত বার্জ ও উহা টানিবার ছোট স্টীমারের পক্ষে বার মাস নাব্য। শিল্পাঞ্চল উত্তর দিকে নদীর নাব্যতার সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে অগ্রসর হয় নাই, কারণ জলপথে পণ্যবহনের ব্যয় এখনও সর্বনিম্ন। পরিবহনব্যয়ের স্বল্পতা শিল্পের উৎপাদনব্যয়, সুতরাং বিক্রয়মূল্য, হ্রাস করিয়া দেয়। ত্রিবেণীর দক্ষিণে চড়া পড়ার ফলে নদী যদি কখনও তাহার নৌ-চালনযোগ্যতা হারায়, তাহা হইলে হয়তো চড়া-পড়া অংশের চটকলের কারবার গুটাইতে হইবে। হুগলি নদীর তীরে পাটশিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় প্রধান কারণ জলপথে কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্য বহনের সুবিধা। উভয় শিল্পাঞ্চলের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ কোম্পানি (Calcutta Electric Supply Corporation) হইতে সস্তাদরে বিদ্যুৎশক্তি পাইয়া থাকে। সংকীর্ণ স্থানে শিল্পালয় স্থাপনের বহুবিধ অসুবিধা স্বীকার করিয়াও সস্তা বিদ্যুৎলাভের সুযোগগ্রহণের জন্য এই দুই অঞ্চলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কলিকাতার সস্তা বিদ্যুৎশক্তি বিস্তৃত অঞ্চলে শিল্পসম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক। হুগলির তীরবর্তী বড় বড় কলকারখানার অধিকাংশই পোরপ্রতিষ্ঠানের এলাকায় অবস্থিত, সুতরাং এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও তাহাদের শ্রমিকগণ মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। নিজেদের চেষ্টা ব্যতিরেকেই ভাল রাস্তা, রোগজীবাণুবর্জিত পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ও ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা, পথের আলো এবং তাজা তরিতরকারি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য ভাল বাজার প্রভৃতির সুযোগ পাইতেছে। মিল ও কারখানা মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহের জন্য শ্রমিকদের অসুবিধা ও ব্যয় বৃদ্ধি হইত। ইহাতে হয়তো তাহারা অধিক মজুরি দাবি করিত। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, জল-সরবরাহ প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থার ভার ও ব্যয় পড়িত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর। রাজধানী, কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি ও আধা-শহরাঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত থাকার দরুন কারখানাসমূহে যখনই আবশ্যক তখনই শ্রমিক জোটে। এই অঞ্চল শ্রমিকদেরও মনঃপূত; কারণ এক কারখানা বন্ধ হইলে অন্য কারখানায় তাহাদের কর্মের সংস্থান করা কঠিন নহে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এক কাজ শেষ হইবার পর অপর কাজসংগ্রহের মধ্যবর্তী কর্মহীন অবসরকাল সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। কাজের জন্য প্রস্তুত বহু শ্রমিক নিকটে পাওয়া যাইবার ইহাই কারণ। কোন শিল্পালয় মালদহের মত দূরবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রমিকদের গৃহাদি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় আবশ্যক হইত; তাহাদিগকে সেখানে রাখিবার জন্য চা-বাগানের মত অন্য প্রলোভনের প্রয়োজন হইবে। শিল্পাঞ্চল দুইটি সুপ্রশস্ত ট্রাংক রোডের সুবিধা পাইয়া থাকে। এই সকল সড়ক নদীর উভয় তীরে প্রত্যেক অঞ্চলের উপর দিয়া সরাসরি চলিয়া গিয়াছে; সস্তা দ্রুতগামী বাস চলাচলের সুব্যবস্থা এবং শহরতলিতে রেলপথ আছে। এই সকল যোগাযোগ-ব্যবস্থার জন্য শ্রমিকগণ বহু বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বাস করিবার সুবিধা পায়। প্রতিদিন বহুলোক বাসস্থান হইতে কর্মস্থানে নানাবিধ যানবাহনের সাহায্যে যাতায়াত করিয়া থাকে।

উল্লিখিত সুযোগসুবিধা হুগলি তীরের শিল্পাঞ্চল দুইটিকে তাহাদের একশত বৎসরের পুরাতন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইতে দেয় নাই। হুগলি-হাওড়া শিল্পাঞ্চল জেলার অভ্যন্তরে সম্প্রসারণের চেষ্টা করিলে শিল্প ও কৃষির বিরোধ ঘটিবে। গ্রামাঞ্চলের স্বল্পব্যয়ে নির্মিত বাড়িঘর বিনষ্ট হইবে। গ্রামাঞ্চলের রাস্তার বিশেষ দুরবস্থা। শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত হইলে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই সকল রাস্তায় বহু অর্থব্যয় করিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মে নদীর পূর্বতীরস্থ শিল্পাঞ্চলের পূর্ব দিকে বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিল, মজা নদী ও খালের খাত ভরাট করিয়া পূর্বাঞ্চল গৃহনির্মাণের উপযোগী করা চলে না, কারণ এই অঞ্চলের ময়লা নিকাশের জন্য উহাদের থাকা আবশ্যক। এই অঞ্চলটি দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবারের দিকে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে বারাসত, বনগাঁ ও বসিরহাট পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ডায়মন্ডহারবারের দিকে শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত হইতেছে; এই দিকে হুগলি নদীর যেসকল সুবিধা তাহা পাওয়া যায়। বারাসত-বনগাঁ-বসিরহাট অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা শিল্প মালিকদিগকে আকৃষ্ট করিবার এক পরিকল্পনার রূপদান করা হইতেছে। কিন্তু এখানকার বড় সড়ক কয়টি এরূপ অপ্রশস্ত ও আঁকাবাঁকা যে শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় ভারী মালপত্র এই পথে দ্রুত বহন করা চলিতে পারে না। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে ৫২ মাইল দীর্ঘ বারাসত-বসিরহাট রেলপথটি নিতান্তই ছেলেখেলার ছোট রেলের মত লাইট রেলওয়ে। দমদম হইতে দত্তপুকুর ও গোবরডাঙ্গা হইয়া যে রেলপথ বনগাঁও গিয়াছে এবং বনগাঁও ও রাণাঘাট যুক্ত করিয়া চক্রপূর্ণ করিয়াছে তাহা ব্রডগজ লাইন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চক্রাকার রেলপথটি ৭০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইলেও এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই অঞ্চলে আদৌ কোন শিল্পতৎপরতা জাগ্রত হয় নাই। এখানে নিশ্চয়ই এরূপ কোন কিছু আছে যাহা

Industrial
CALCUTTA & HOWRAH

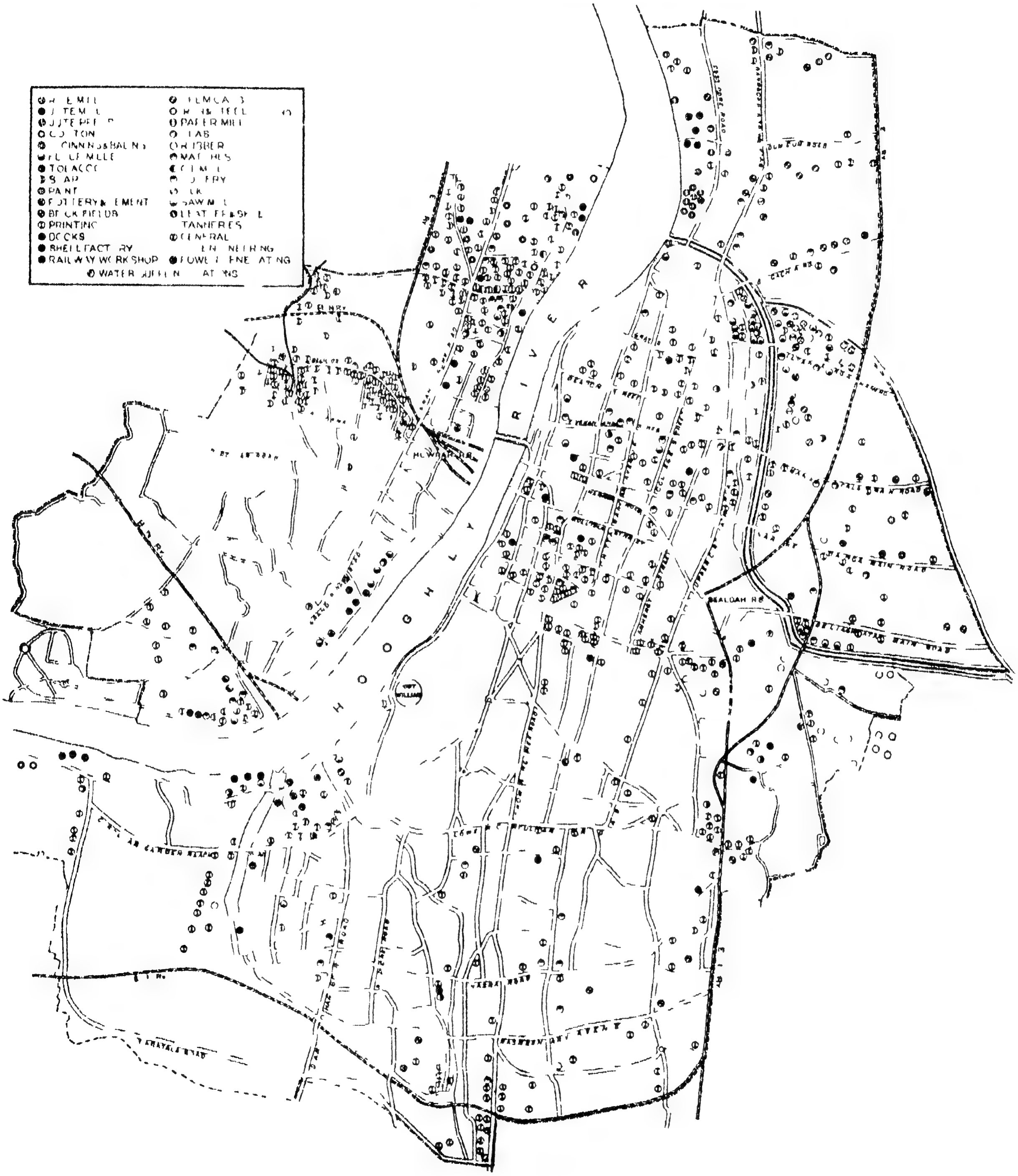
RICE MILL
JUTE MILL
JUTE PRESS
COTTON
GINNING & BALING
FLOUR MILLS
TOBACCO
SOAP
PAINT
POTTERY & CEMENT
BRICK FIELDS
PRINTING
DOCKS
SHELL FACTORY
RAILWAY WORKSHOP
CHEMICALS
IRON & STEEL
PAPER MILL
GLASS
RUBBER
MATCHES
OIL MILL
CUTLERY
SILK
SAW MILL
LEATHER & SHELL TANNERIES
GENERAL ENGINEERING
POWER GENERATING
WATER SUPPLY STATIONS
RIVER
HOOGHLY
HOWRAH
FORT WILLIAM
SEALDAH RD

শিল্পোন্নতির অন্তরায়। সম্ভবত জলপথ ও জলনিকাশের সুব্যবস্থার অভাব, এবং নিম্ন জলাভূমি, জলায় পরিণত নদীখাত ও বিশাল ধান্যক্ষেত্রকে শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া তুলিবার অত্যধিক ব্যয়, এই অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে খাদ্যশস্য ধান ও শিল্পের কাঁচামাল পাটের উৎপাদন এবং শিল্পপণ্য উৎপাদনে বিরোধ বাধিয়া যাইবে, অঞ্চলটি শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত না হইবার ইহাও অন্যতম কারণ।

শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কলিকাতার স্ফীতি নিবারণ, যুদ্ধবিগ্রহের সময় উহার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং প্রাণকেন্দ্রের অতি-সঞ্চয় অপসারিত করিয়া রাজ্যের প্রান্তিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্বাস্থ্য-সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা, এখন ক্রমশ উপলব্ধি করা হইতেছে। শিল্পপরিচালকগণের সংকল্প ও সহযোগিতায় জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের নায়কদের পক্ষে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত শিল্প স্বল্পব্যয়ে পরিচালনের জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। দেশের অভ্যন্তরে অতীতে প্রতিষ্ঠিত বহু ছোটখাট ও মাঝারি শিল্প টিকিতে পারে নাই। যেসকল অনুকূল অবস্থার জন্য হুগলিতীরে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের অভাবই দেশের অভ্যন্তরস্থিত শিল্পালয়ের ব্যর্থতার কারণ। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকের মধ্যে নিয়া যাইতে হইবে, এই পরামর্শ শুনিতে বেশ ভাল। কিন্তু অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের শ্রমিক দ্বারা কাজ করানো এক ঝকমারি কাণ্ড। শ্রমিককেন্দ্রে স্থাপিত মৌলিক শিল্প অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে চলিতে পারে। কিন্তু গৌণ শিল্পে (Derivative or Secondary Industries) অদক্ষ শ্রমিক লাভই বড় কথা নয়।

শিল্পমালিক ও কর্মিগণ একটু দূরে খোলামেলা জায়গায় গিয়া হাঁফ ছাড়িবার সুযোগ পাইতে না চাহে এমন নয় ; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদে হুগলিতীরের শিল্পালয়গুলি সংকীর্ণ স্থানে সীমায়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য।

এই দুই অঞ্চলের বসতির ঘনতার বৃদ্ধি আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের বৃদ্ধির রীতি অনুসরণ করিয়াছে। অঞ্চল দুইটির সামগ্রিক হিসাবে ১৯৩১ সন পর্যন্ত ঘনতার বৃদ্ধি মন্থর হইলেও অব্যাহত ছিল। হুগলি জেলার চুঁচুড়া ও মগরা থানার ঘনতা ১৮৭২ হইতে ১৯৩১ সনে হ্রাস পাইয়াছিল। শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের ঘনতা ১৯৩১ সন পর্যন্ত সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১ সনের পর হুগলি জেলার সকল শিল্প-থানার ঘনতাই লাফে লাফে বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সনের বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের প্রারম্ভে পাট ও বস্ত্রশিল্পের চাহিদা বৃদ্ধিই বোধহয় এই আকস্মিক ঘনতা বৃদ্ধির হেতু। কিন্তু ১৯৫১ সনের বৃদ্ধি ১৯৪১ সনের বৃদ্ধির মত চমকপ্রদ নহে। ইহা হইতে মনে হয় যে, দশকের শেষের দিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্মসংস্থানক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। মোটের উপর হাওড়া ও চব্বিশপরগনা অপেক্ষা হুগলি জেলার শিল্প-থানায় ঘনতা অধিকতর ধীরে ও সমভাবে বাড়িয়াছে। তথাপি আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের ন্যায় ১৯৩১ সন পর্যন্ত ঘনতা যেন উচ্চস্তরে স্থির হইয়াছিল মনে হয়। ১৯৩১ সনের পর বৃদ্ধি অতি দ্রুত। হাওড়া জেলার শিল্পাঞ্চলের লোকবৃদ্ধির ধারা হুগলির অনুরূপ।

বারাকপুর-কলিকাতা-বজবজ শিল্পাঞ্চলের ঘনতার বৃদ্ধি অপর দুইটি শিল্পাঞ্চলের ঘনতার ধারার অনুসরণ করিয়াছে। ১৯৩১ সন পর্যন্ত বারাকপুর ও বজবজ অঞ্চলে বারবার ঘনতা হ্রাস পাইয়াছিল। কলিকাতার লোকবৃদ্ধিতে কখনও ছেদ পড়ে নাই। কিন্তু ১৯৩১ সন পর্যন্ত বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হইয়াছে। ১৯১১-৩১ সন মধ্যে বারাকপুর, টিটাগড় ও বেহালার জনসংখ্যা প্রায় স্থির ছিল, দমদম, খড়দহ, নোয়াপাড়া, বরাহনগর ও টালিগঞ্জে লোক বাড়িয়াছে ধীরে ধীরে। ১৯৩১-৫১ মধ্যে ঘনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-৫১ অপেক্ষা ১৯৩১ ৪১ দশকে লোকসংখ্যা বেশি বাড়িয়াছিল।

চতুর্থ শিল্পাঞ্চল খড়্গপুর আয়তনে ছোট, রেলওয়ের কর্মশালা ব্যতীত অন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এখানে নাই। অন্য শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহার পরিসর বৃদ্ধি হইবে না এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা লোকধারণক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছিবে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নলজি (Indian Institute of Technology) প্রতিষ্ঠার ফলে খড়্গপুরের আবাসিক অঞ্চল পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি ছোট শিল্পাঞ্চল আছে। উহারা প্রকৃতপক্ষে আসানসোল রানীগঞ্জ অঞ্চলেরই সম্প্রসারিত অংশবিশেষ, উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল, স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য নাই। খয়রাসোল ও দুবরাজপুর থানা (২৪৪ বর্গমাইল) অজয়ের উত্তরে অবস্থিত। ছোট কয়লার খনি, আকরিক ও পাথর সংগ্রহের স্থান এখানে আছে। সালতোরা ও মেজিয়া থানা (১৮৪ বর্গমাইল) দামোদরের দক্ষিণে। এই চার থানাই নিম্ন ঘনতার শেষ সীমায় উপস্থিত। খয়রাসোলের ঘনতা ৫৮৩, দুবরাজপুরের ৫৪৯, সালতোরার ৪৮৮, এবং মেজিয়ার ৫৪২। ইহাদের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা অতি সামান্য। ঝাড়গ্রাম মহকুমার জাম্বনী ও বীনপুর থানা অপর একটি ছোট শিল্পাঞ্চল (৪৯১ বর্গমাইল)। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে এখানে মূল্যবান ধাতু ও আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গিদনী নামক স্থান এই অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। জাম্বনী ও বীনপুরের ঘনতা যথাক্রমে ৩৯৩ ও ৩৭৫। লোকসংখ্যায় শিল্পাঞ্চলের কোনই লক্ষণ বর্তমান নাই।

যেসকল থানায় এক বা একাধিক আবাসিক শহর আছে এবং ঘনতা ৬১০ এর কম অথবা ৬১০ ও ১,০৫০-এর মধ্যে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আলোচ্য থানাসমূহের জনবিরল, শিল্পবিহীন, মিউনিসি-প্যালিটির সুখসুবিধার স্বল্প আয়োজনবিশিষ্ট আধা পল্লী শহরগুলি সাধারণত লোকের অবজ্ঞাই লাভ করিয়া থাকে। তথাপি চটকদার শিল্প-শহর অপেক্ষা এই সাদাসিধা সিন্ডারিলার দল পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্রদের (natives) অধিকতর হিতসাধন করিয়া থাকে। প্রকৃত সত্য এই, যেসকল জেলায় শিল্পাঞ্চলের অবস্থান সেই সকল জেলার লোক অপেক্ষা শিল্পাঞ্চলগুলি বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ভাগ্যান্বেষীদের অন্নের সংস্থানই বেশি করিয়া থাকে। ভূমির উপর অতিচাপের ফলে অন্যান্য রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে যাহাদের ঠাঁই হয় নাই সেই কৃষকসম্প্রদায়ের বড় এক অংশ এই রাজ্যের শিল্পাঞ্চলে প্রতিপালিত হইতেছে। কিন্তু অনুরূপ অবস্থার চাপে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত কৃষককুলের আশ্রয় শিল্পাঞ্চলে অতি অল্পই মিলে। কর্ম-সংস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব এই রাজ্য অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে কম নয়। অন্যরূপে বলা যায় শিল্পাঞ্চলের চাকরি পশ্চিমবঙ্গের

অধিবাসীদের একারও নহে। কিন্তু আধা গেঁয়ো-শহরের অবস্থা অন্যরূপ। এই সকল শহর অতিজনতার চাপে কৃষিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত রাজ্যের উদ্বৃত্ত প্রায় সকল লোক আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের কর্মের সংস্থান করিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনদের প্রথম এই সকল শহরে কর্মের সংস্থানের পর যাহারা অবশিষ্ট থাকে শুধু তাহাদিগকেই শিল্পাঞ্চলে সরাইয়া দেওয়া হয়। দেশের আর্থিক কাঠামো এখন পর্যন্ত কৃষির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যের অর্থনীতিতে এই শহরগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারা গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত জনগণের বিভিন্ন কর্মের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। বিগত আশি বৎসর ধরিয়া এই সকল আধা পল্লী-শহরে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়া আসিতেছে। মুখ্যত জেলা বা মহকুমার শাসনকেন্দ্র, বিচারালয়, সরকারী অফিস এবং নিরাপত্তা বা শান্তিরক্ষাকেন্দ্র এখানে অবস্থিত। এই সকল শহর স্থানীয় লোকজন ও শাসনযন্ত্রের সংযোগস্থল। ইহারা স্ব স্ব অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। কাঁচা মাল ও বিবিধ পণ্যদ্রব্যের প্রধান স্থানীয় বাজার এই শহর। এইরূপে ইহারা স্থানীয় শিল্পের কারুকার্য ও উৎকর্ষতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সাহায্য করে এবং স্থানান্তরে রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। স্থানীয় কারুশিল্পীদের কর্মের সংস্থান করিয়া এই সকল শহর ছোটখাট শিল্পের উন্নতি সাধন করে। এই ক্ষুদ্র শিল্পই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করে। শিক্ষিত বেকারদের বিভিন্ন বৃত্তিতে স্থান করিয়া দিয়া শহরগুলি স্থানীয় সংস্কৃতিমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সাহায্য করিয়া থাকে। শহর শিক্ষা ও যান্ত্রিক জ্ঞানের কেন্দ্র। এই বিদ্যা ও জ্ঞান উচ্চাভিলাষী জনগণের আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। নগরে যাইয়া উচ্চ অর্জন করা অনেকের সামর্থ্যের বাহিরে। স্বগৃহ ও বহির্জগতের সহিত সংযোগরক্ষার পক্ষে এইরূপ শহরই উত্তম। ইহারা সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ধারা প্রচারের কেন্দ্রও বটে। প্রত্যেকটি শহর যেন কৃষিপণ্যের দর এবং উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ ও বিতরণের এক একটি স্টক এক্সচেঞ্জবিশেষ। পরিশেষে এই সকল শহর অনেক স্থানীয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে স্বীয় অঞ্চল ত্যাগ না করিয়া যে থানায় জন্ম সেখানে থাকিতে সাহায্য করে।

স্থানীয় শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসের সহিত শহরের ইতিহাস জড়িত ; এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখানে উহার সত্যতার পরীক্ষা করা হইবে।

বর্ধমান জেলার মেমারী থানা চিরদিনই কৃষিসমৃদ্ধ। থানার শহর মেমারীতে কয়েকটি চাউল ও তেলকল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা কৃষিজাত পণ্যের বড় বাজারও বটে। ইহার ঘনতা অল্প হইলেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। বর্ধমান শহর জেলার সদর, রেলের সীমান্ত ও সংযোগস্থল, বিভিন্ন দিকে প্রসারিত রাস্তার মিলনক্ষেত্র, দীর্ঘকাল যাবৎ শহরতলি কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির ও মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্বের উন্নতিশীল কোন শিল্পেরই অবনতি ঘটে নাই, এবং কোন নূতন শিল্পও অসাধারণ দ্রুততার সহিত বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং এই শহরের ঘনতা ক্রমাগত কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়িয়াছে। বর্ধমান প্রধানত কারুশিল্পী জনগণের আবাসস্থল। মহামারীর প্রভাব যথানিয়মে বসতির ঘনতায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৮১ ও ১৯২১ সনে উহা মহামারীর জন্য হ্রাস পাইয়াছিল। বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়াতে ১৯১১ সনে বর্ধমানের ঘনতার সামান্য হ্রাস ঘটে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে কালনা ও কাটোয়া যেন কুখ্যাত বর্ধমান জ্বরের কেন্দ্র ছিল। এই তিন শহরের ঘনতার পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিতে দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছিল। নীলের চাষ বন্ধের ফলে ১৮৮১ সনের পর ঘনতা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু বর্ধমান কাটোয়া ও আহামদপুর-কাটোয়া রেলপথ খোলাতে এই অঞ্চলের ঘনতার দ্রুত হ্রাস বন্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র ১৯৪১ ও ১৯৫১ সনের ঘনতা ইহাদের ১৮৭২ সনের ঘনতা অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা ভাগীরথীর তীরে ছোট বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরভূম জেলার সদর সিউড়ির ঘনতা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। লাভপুরে অজয়-সাঁইথিয়া ও সাঁইথিয়া-তিনপাহাড় রেলের সংযোগস্থলরূপে সাঁইথিয়া প্রথম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ১৯০৬ সনে অন্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথও এখানে আসিয়া মিলিত হয়। কয়েকটি চাউল ও অন্য ছোট কল প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩১ সন হইতে ইহার ঘনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুবরাজপুর বরাবরই খনি ও পাথরসংগ্রহের কেন্দ্র। ইহার ঘনতা স্থির আছে। বোলপুর ১৮৭২ অব্দের বর্ধমান জ্বরের অঞ্চলের প্রান্তভাগে ছিল। কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে অন্য কারণে বোলপুরের জনসংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়। নীলের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ ও লাক্ষার ব্যবসায়ের অবনতি এই হ্রাসের কারণ। চাউল ও তেলের কল স্থাপন এবং শান্তিনিকেতনের পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ১৯৩১ সন হইতে লোক ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। রামপুরহাট ১৮৫৯-৬০ সন হইতে রেলের বড় একটি কেন্দ্র। অন্য কোন শিল্প না থাকায় ইহার ঘনতা স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে বাড়িতেছে।

একটি বড় কৃষিকেন্দ্র এবং চাউলের কলের স্থানরূপে শাসনের দিক হইতে বাঁকুড়ার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু প্রধানত আবাসিক শহর বলিয়া ইহার জনসংখ্যা ধীরে কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়াছে। খাতরার বৃদ্ধির ধারাও বাঁকুড়ার অনুরূপ। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে বিষ্ণুপুরের রেশম, কাঁসা, শাঁখ ও হাতীর দাঁতের শিল্প এবং তামাকের ব্যবসায়ে ক্রমাগত অবনতি ঘটায় ইহার ঘনতা এখন ১৮৭২ সনের ঘনতা অপেক্ষা প্রতি বর্গমাইলে ২৮ জন কম। একই কারণে সোনামুখী ও পাত্রসায়রের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই শহর খাদ্যশস্য, রেশম, তামাক, নীল ও তুলার ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। ব্যবসায়ের অবনতির সহিত ঘনতার অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৭২ সনের ৪৪১ হইতে সোনামুখীর ঘনতা ১৯৫১ সনে ৪১৮-তে নামিয়াছে। পাত্রসায়রের ঘনতা ১৮৭২ সনে ছিল ৫৫৭; ১৯৫১ সনে উহা দাঁড়াইয়াছে ৪৯১।

শাসনকেন্দ্ররূপে মেদিনীপুরের গুরুত্ব চিরকালই ছিল। উহার ঘনতা বেশি না হইলেও স্থির। গড়বেতা এক সময়ে নীল ও এণ্ডি কাপড় ও দেশীয় দলপতিদের ঘাঁটির জন্য বিখ্যাত। ইহার কিছুই আর নাই। ঘনতা ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া ১৮৭২ সনের ৩৫৬, ১৯৩১ সনে ২৯৯-তে নামিয়াছিল। ১৯৫১ সনেও ৩৬৮-র বেশি বাড়ে নাই। কাঁথি থানার একমাত্র শহর কাঁথি ঘনবসতিপূর্ণ সমতল কৃষি-অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ঘনতা পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের ঘনতার মত ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। ঘাটাল থানায় দুইটি ঘাটাল ও খরার, এবং চন্দ্রকোণা থানায় তিনটি, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই, শহর আছে। ১৮৭৭ সালের পূর্বে এই পাঁচটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। দুই থানার ঘনতার উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিয়াছিল। ঘাটালের ঘনতা ১৮৭২ সনের ১,১৪৪ হইতে

১৯২১ সনে ৭৯৩-এর পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সনে ৯৪৩ পর্যন্ত উঠিয়াছে। চন্দ্রকোণার ঘনতা ১৮৭২ সনের ৭০৬ হইতে ১৯৩১ সনে ৫২৫-এ নামিয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে বাড়িয়া উহা ১৯৫১ সনে ৫৭৩-এ দাঁড়াইয়াছে। সূতী ও তসরের বস্ত্র উৎপাদন এবং কাঁসার ও মাটির বাসনাদি নির্মাণের জন্য ঘাটালের প্রসিদ্ধি ছিল। উৎপাদন শিল্পের জন্য ইহার গুরুত্ব এত ছিল যে ওলন্দাজগণ ঘাটাল শহরে এক কুঠিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল। তাহাদের পরিত্যক্ত কুঠি এখন মহকুমা শহরের বিচারালয়। বৃটিশ অধিকারের প্রথম যুগে স্থানীয় ব্যবসায়ের তদারক করিবার নিমিত্ত এই অঞ্চলে তিন জন বাণিজ্য কর্মচারী রাখা হইত। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই সূতার বস্ত্রবয়ন এবং পিতল ও কাঁসার পাত্র প্রস্তুতের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাহাদের গৌরবের যুগে শহর কয়টিতে বহু বাজার ছিল। বাজারের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে প্রায় ৬৪ হইবে। শর্করাশিল্প ও বস্ত্রবয়নকেন্দ্ররূপে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চন্দ্রকোণা থানার উন্নতি ঘটে। হাতে কাটা সূতা এরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে উহার আড়াই তোলার মূল্য ১ টাকা হইত। মিহি কাপড়ের কেন্দ্ররূপে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। ক্ষীরপাইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক প্রধান কুঠি স্থাপনের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বয়ন-শিল্পের আরও উন্নতি ঘটে। বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে কোম্পানি সরিয়া পড়ায় এবং বাঙলার বাজারে বিলাতী কাপড় আমদানির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা প্রায় একই সময়ে ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছিল। সর্বস্বান্ত বেকার জনগণের পক্ষে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী জ্বর ও কলেরা বিশেষ মারাত্মক হইয়াছিল।

রেলপথ স্থাপনের পূর্বে হুগলি জেলার আরামবাগ বড় বড় রাস্তার একটি প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল। সেখানে নীলের কুঠিও ছিল। নীলের ব্যবসায়ের অবসান এবং পণ্য চলাচলের পথ পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায় ও স্বাস্থ্য উভয়েরই অবনতি ঘটিল। সঙ্গে সঙ্গে বসতির ঘনতাও নিম্নগামী হইল। ১৮৭২ সনের ৭১৮, ১৯২১ সনে ৫৯৮-তে নামিয়া গিয়াছিল। উহা পুনরায় ঊর্ধ্বগামী হইয়াছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের শিল্প-শ্রমিকদের প্রয়োজনে আরামবাগের কৃষিতে কিঞ্চিৎ বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

চব্বিশপরগনা জেলার জয়নগর, হাসনাবাদ, হাবরা ও বনগাঁ থানার শহর যথাক্রমে জয়নগর-মজিলপুর, টাকী, গোবরডাঙ্গা ও বনগাঁ শহরগুলির ধর্মবিশিষ্ট, সুতরাং তাহাদের বৈশিষ্ট্যবিহীন ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে।

নীলের চাষ লোপ এবং কৃষির মন্থরতা নদিয়া জেলার রানাঘাট, চাকদহ ও শান্তিপুরের অবনতির কারণ। কিন্তু ১৯৫১ সনে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর সমাগমে উহাদের ঘনতা অস্বাভাবিক-রূপে বাড়িয়া গিয়াছে।

নবাবীর অবসানের পর হইতে মুর্শিদাবাদ শহরের জীবন গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে; উহার ঘনতাও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ঐ জেলারই কান্দীর কৃষিসমৃদ্ধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে।

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার ক্রমবর্ধমান উন্নতিশীল শহর। জেলার সদর এখানে অবস্থিত। ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে পুরাতন মালদহ থানার আর উন্নতি হইতেছে না।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শাসনকেন্দ্র বালুরঘাটে অবস্থিত। বালুরঘাট ছোট শহর। বালুরঘাট ও মহকুমা শহর রায়গঞ্জ দেশ-বিভাগের পর হইতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের মহকুমার শহরের উন্নতি চা-শিল্পোন্নতির সাক্ষাৎ ফল। যুদ্ধের সময় আলিপুরদুয়ারের উন্নতি সাধিত হয়। আসাম লিঙ্ক রেলপথ খুলিবার পর রেল স্টেশনরূপে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কালিম্পঙ সিকিম ও তিব্বতের পথের প্রবেশদ্বার। কোচবিহারের শহর কয়টিতে ধরাবাঁধা জীবনধারা মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য অথবা প্রাধান্য এই সকল শহরের নাই। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে ২৬টি বিশেষ সুবিধাভোগী পল্লী থানা, মাঝারি আকারের শহরসমন্বিত ১৭টি শিল্পবিহীন থানা, অথবা উচ্চ ঘনতাবিশিষ্ট ৬১টি শিল্প থানা অপেক্ষা নিম্ন ঘনতার থানা ও আবাসিক অনাড়ম্বর শহরসমূহ একাধিক উপায়ে পশ্চিম বঙ্গের জনগণের ভাগ্যের অধিক পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। শিল্প থানাগুলির জনসমষ্টি বহুবিচিত্র নরনারীর সমবায়ে গঠিত; সুতরাং রাজ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আপনার করিয়া নিতে এই সকল থানা অসমর্থ। দুর্ভিক্ষ, সামান্য মন্দা, অথবা পল্লী-শিল্পের বিপর্যয় ইহাতে প্রতিফলিত হয় না; কৃষিজীবিকায় অতিজনতার দরুন কত লোক অন্য উপজীবিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে শিল্প থানায় তাহার হিসাবও পাওয়া যায় না। আলোচ্য থানাগুলির ঘনতা শহরবিহীন পল্লী-থানার (উচ্চ ঘনতার ২৬টি বাদে) ঘনতার সমতুল্য। সুতরাং ইহারা রাজ্যের কর্ষণযোগ্য ভূমির শক্তির পরিচয় দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ এখন এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কোন পল্লী-অঞ্চলের ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ অপেক্ষা অল্প বেশি হইলেই উহা সময় সময় হ্রাস পায় অথবা স্থির থাকে, অধিক বাড়ে না। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত ব্যতীত ভূমির উর্বরতা সর্বত্র প্রায় সমান। জলবায়ুর অবস্থাও প্রায় একরূপ। পূর্ববঙ্গের কোন কোন গ্রামাঞ্চলের ঘনতা ১,০০০-এর অধিক হইলেও উহা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু উহার অর্ধেকের কম ঘনতা হইলেই তাহা হ্রাস পাইতে থাকে অথবা বৃদ্ধি থামিয়া যায়। সম্ভবত অগ্রগতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদন-ক্ষমতার (উহা কৃষি বা শিল্প যাহাই হউক না কেন) সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পরিবর্তিত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনির্ভর জনগণের জীবনযাত্রার মান প্রতি বর্গমাইলে ৫০০-র অনধিক লোকের হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে মনে হয়। ইহার অতিরিক্ত লোক, হয় শিল্প-বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা অকালে ইহলীলা সাঙ্গ করে। ফলে কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার মান আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। ইহাই কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারদের কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত পুনর্বাসনের মূল অন্তরায়। উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকদের ক্ষুদ্র একাংশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মের সংস্থান হইয়া থাকে। ইহাতে রাজ্যের অবস্থার এই পরিচয় পাওয়া গেল যে, যাহারা কৃষি ব্যতীত অন্য কর্মে অভ্যস্ত নহে তাহাদের এক বিপুল জনসমষ্টির পূর্ণ কর্মসংস্থানের উপযোগী কর্ষণযোগ্য ভূমি পশ্চিমবঙ্গে অপ্রচুর। শিল্পেও তাহাদের সকলের ঠাঁই হয় না। অবস্থান্তর ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব হইবে, কারণ কৃষিজীবীদের অধিকাংশেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের জমিতে স্বত্ব আছে। চাষবাস ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বনের প্রশ্ন উঠিলে তাহারা সহজে উহাতে সায় দিবে না। মালিক-চাষী ছাড়া ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকদের এক এক বৃহৎ অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিক হইবার আকাঙ্ক্ষা

রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাহাদের পক্ষে ভিন্ন পথ অবলম্বনের সম্ভাবনা অল্প। ইউরোপের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিম্নতম মানই কৃষিবৃত্তিতে লোকবৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জীবনযাত্রার নিম্নতম মান বলিয়া কিছু নাই এবং বিকল্প কর্মেরও অভাব, এজন্য এখানকার অবস্থা অন্যরূপ।

দেখা যায় যে, বর্ধমান জেলায় যেসকল কৃষিপ্রধান থানার ঘনতা ৫০০ র উপরে উঠিয়াছিল, তাহাদের ঘনতার ক্রমোন্নতি না ঘটিয়া দশকে দশকে উঠানামা করিয়াছে। বীরভূম ও বাঁকুড়ার থানা সম্বন্ধে এই কথা খাটে। বিশেষত বাঁকুড়ার পল্লী অঞ্চলের ঘনতা গড়পড়তায় ৫০০ র উপরে কোন কালেই উঠে নাই। পল্লী-অঞ্চলে যে বসতির ঘনতার হ্রাসবৃদ্ধি ভূমির উৎপাদিকাশক্তির সমানুপাতে ঘটিয়া থাকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রে মেঘের বারিবর্ষণের সীমা যেরূপ সুনির্দিষ্ট রেখা দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ উর্বর পলি মৃত্তিকার অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করিয়া পাথুরে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় পৌঁছিবামাত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এক সীমারেখায় অতি উচ্চ ঘনতার অগ্রগতি হঠাৎ থামিয়া যায়। মেদিনীপুর সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার ঘনতা যথাক্রমে ৫২০ ও ৩৯০ অপেক্ষা কম, কিন্তু কাঁথি, তমলুক ও ঘাটালের ঘনতা ৮০০ র অধিক। রেলপথ খুলিবার ফলে পাণ্ডুয়া, ধনিয়াখালি ও পোলবা দ্রুত অবনতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মুর্শিদাবাদের পলি অঞ্চলের থানার ঘনতার ক্রমাগত বৃদ্ধি হইলেও অন্যান্য থানার লোকসংখ্যার দশকে দশকে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অন্যান্য জেলায়ও ঘনতা এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছে। মালদহের পলি মৃত্তিকার অঞ্চলে ঘনতা বেশি, কিন্তু মহানন্দার পূর্ব ও উত্তরে ঘনতা কোথাও ৫০০ অতিক্রম করে নাই। পশ্চিম দিনাজপুরে বহু উদ্বাস্তুর আগমন সত্ত্বেও হিলি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ ব্যতীত অপর কোন থানার ঘনতাই ৫০০-র ঊর্ধ্বে উঠে নাই। জেলার পল্লী-অঞ্চলের গড় ঘনতা ৪৯২। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের ঘনতা ৫০০ র অনেক কম। কোচবিহারের গড় ঘনতা ৬৭১ হইলেও উহার অনেক উঠানামা হইয়াছে। মনে হয় কোচবিহারের ঘনতা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) কলিকাতা ভারতের সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল।

(২) ভারতের জেলাসমূহের মধ্যে চব্বিশপরগনার লোকসংখ্যা সর্বাধিক।

(৩) "ক" শ্রেণীর রাজ্যের বৃহত্তম জেলাগুলির সহিত তুলনায় আয়তনে চব্বিশপরগনার স্থান সর্বনিম্নে।

(৪) জেলার গড় আয়তনে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা কম কিন্তু জেলার গড় লোকসংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ।

(৫) পঞ্চাশ বৎসরে বীরভূম জেলায় লোক বাড়িয়াছে শতকরা ১৭ ৬, চব্বিশপরগনায় ১১৩·৮ এবং কলিকাতায় ১৭৬ ৭।

(৬) যেখানে আহার জোটে সেখানেই লোকের ভিড় জমে, সুতরাং বসতির ঘনতা রাজ্যের সর্বত্র সমভাবে বিন্যস্ত নহে।

(৭) কলিকাতার ৩,৬১৫টি বস্তিতে নগরীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক বাস করে; ইহার শতকরা ১৮·২ জন উদ্বাস্তু।

(৮) রাজ্যের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা এখনও অটুট রহিয়াছে।

(৯) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের গড় ঘনতা ৬১০; কিন্তু এই রাজ্য এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা ৫০০ অতিক্রম করিলেই উহা স্থির থাকিবার বা নিম্নগামী হইবার প্রবণতা দেখা দেয়।

(১০) মোট ২৮০টি থানার মধ্যে ১০৪টি থানার ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১,০৫০-এর অধিক।

(১১) রাজ্যের শিল্পাঞ্চল পাঁচটিঃ (ক) দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ি, (খ) আসানসোল-রানীগঞ্জ, (গ) হুগলি-হাওড়া অঞ্চল, (ঘ) বারাকপুর হইতে বজবজ, এবং (ঙ) খড়্গপুর টাউন।

(১২) উচ্চ ঘনতার শিল্প-থানা ও শহর অপেক্ষা নিম্ন ঘনতার থানা এবং তাহাদের অনাদৃত নিরাভরণ শহরে পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি অধিবাসীদের স্বরূপের অধিক প্রকাশ দেখা যায়। এই সকল শহর পল্লীর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করে নাই। ইহারা পল্লীর সমদুঃখভাগী এবং সমাজের নানা হিতসাধন করিয়া থাকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

লোকের বৃদ্ধি ও চলাচল

পূর্ব অনুচ্ছেদে ঘনতার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, রাজ্যের জনসংখ্যা সর্বত্র সমভাবে বর্ধিত না হইয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত আশি বৎসরে যেসকল অঞ্চলে দ্রুত ও সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। বৃহৎ কৃষি-অঞ্চল অপেক্ষা শিল্পাঞ্চলের লোকবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আলোচনা হইতে এই প্রচলিত ধারণার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। চাষবাসের বর্তমান অবস্থায় বড় বড় কৃষিপ্রধান জেলার লোকধারণের ক্ষমতা যেন নিঃশেষিত হইয়াছে এরূপ মনে হয়। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, কৃষিকর্মে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত জনগণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত এই সকল জেলায় আর অধিক লোকের ঠাঁই হইবে না। কৃষি-অঞ্চলে জনবিন্যাসের অসমতা ভূমির উৎপাদিকাশক্তির অধিকতর অসমতার অনুসরণ করিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, পল্লীর ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ অতিক্রম করিবার পর স্থির থাকে অথবা ওঠানামা করে। এই সকল সিদ্ধান্ত লোকবৃদ্ধি-সম্পর্কিত তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় কিনা, এই অনুচ্ছেদে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। প্রথম সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং তাহার পর প্রত্যেক জেলার তথ্যাদি আলোচনা করিয়া অতীত ও আধুনিক কালে রাজ্যের লোকবৃদ্ধি ও লোকচলাচলের ধারা নির্ধারণের চেষ্টাও করা হইবে।

জনসংখ্যার পূর্ব বিবরণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাঙলার জনসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত পন্থায় জনগণনার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরস্পর-বিরোধী গণনার ফল নির্ভরযোগ্য গণ্য হইতে পারে না। কোম্পানির কর্তৃত্বের অবসান ঘটিলে জনগণনার প্রয়োজনীয়তা নূতন করিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সপরিষদ বড়লাট ও ভারত-সচিব এ বিষয়ে একমত হন যে, সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ্য করিয়া দেশে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত

হয় নাই। এরূপ অবস্থায় সর্বভারতীয় সাধারণ জনগণনা আরম্ভ করিলে শাস্তিবিধান ও করবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গণনা করা হইতেছে বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ জন্মিবে। সুতরাং বহু বৎসর অতীত না হইলে জনগণনা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে না, এই সিদ্ধান্ত করা হয়। এদিকে সঠিক লোকসংখ্যা জানিতে না পারায় বোম্বাই ও কলিকাতার মত বৃদ্ধিশীল নগরে নগর পঞ্চায়েতের কার্যের অসুবিধা ঘটিতেছিল। ১৮৬৩ সনের আইনে নগর পঞ্চায়েতের এলাকায় জনগণনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তদনুসারে ১৮৬৪ সনে বোম্বাই ও ১৮৬৬ সনে কলিকাতার লোকগণনা করা হইয়াছিল। লোকের সন্দেহ নিরসনের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। লোকগণনা জনসাধারণের মধ্যে কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই দেখিয়া ছয় বৎসর পরে, ১৮৭২ সনে, প্রথম সর্বভারতীয় জনগণনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম সাধারণ গণনার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ১৮৭২ সনের লোকসংখ্যাই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথম গণনার ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, ১৭৭২ সনে, ওয়ারেন হেস্টিংস ক্লাইভের দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটাইয়া বাঙলায় কোম্পানির এক-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জনসংখ্যার সঠিক বিবরণ না জানিতে পারিলেও সরকারী কাগজপত্র হইতে এই একশত বৎসরের লোক বসতির প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তর ও মহামারীতে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানির হিসাবমতে কৃষিজীবীদের শতকরা ৫০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সরকারী কাগজে ১৭৭১ সনে কর্ষণাধীন ভূমির এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিত্যক্ত বলিয়া দেখান হইয়াছে। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে পরিত্যক্ত জমির পরিমাণ মোট কর্ষণাধীন জমির অর্ধেকেরও বেশি দাঁড়াইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে, দেশে লোকবসতি বিরল ছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের মতে বাঙলার তিন ভাগের এক ভাগ, কোলব্রুকের মতে তিন ভাগের দুই ভাগ, এবং গ্রান্টের মতে পাঁচ ভাগের চার ভাগ ভূমি অনাবাদী ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, জনসংখ্যা প্রাক্ দুর্ভিক্ষ অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহার পর হইতে ক্রমে জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অনাবাদী জমির চাষ আরম্ভ হইল। আবাদবৃদ্ধিতে ছিল জমিদারের লাভ; কারণ রায়তের নিকট জমিদার বেশি খাজনা পাইলেও তাহাকে রাজস্ব বেশি দিতে হইত না। এজন্য জমিদার আগ্রহ করিয়া প্রজার নিকট জমি বিলি করিতে চাহিত। প্রজা যত জমি ইচ্ছা পাইতে পারিত। তখন রায়ত এক পরগনা হইতে অন্য পরগনায় চলিয়া যাইত। জানা ছিল যেখানেই সে যায় জমি পাইবেই। ১৮৫০ হইতে ১৮৭০ সনের মধ্যবর্তী কালে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই ধানের চাষ বিস্তর বাড়িয়া গেল। অরণ্যাচ্ছাদিত অঞ্চল অরণ্যমুক্ত করিয়া ধানের জমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। ক্রমে অনাবাদী ভূমি আর বেশি রহিল না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শত্রু ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব অধুনাকালে ঘটে প্রথম রেলপথ নির্মাণের সাত বৎসর পরে, ১৮৬২ সনে। তখন ইহা বর্ধমানের জ্বর নামে পরিচিত ছিল। রেলের বাঁধের দরুন জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়া জলাসৃষ্টি এবং তাহার ফলে আর্দ্রতাবৃদ্ধি বর্ধমান জ্বরের প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়। ১৮৬২ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত এই জ্বর বিভিন্ন জেলায় লোক ক্ষয় করিয়া চলিয়াছিল। দুর্ভিক্ষের লোকক্ষয় সাময়িক, ম্যালেরিয়ার বীজ দেহে একবার প্রবেশ করিলে উহা প্রায়ই স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া বসে এবং দিন দিন জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। এই নূতন ব্যাধির ধ্বংসলীলার পরিচয় নদিয়ার সহকারী জেলা-শাসকের ১৮৬৭ সনের একখানা চিঠিতে পাওয়া যায়। "খাদ্যাভাবক্লিষ্ট জনগণের একাংশ মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট লোক আতঙ্কে, জলাভাবে ও জমিদারের অত্যাচারে বাড়িঘর ছাড়িয়া গিয়াছে। জমিদারের ব্যবহার ভাল হইলে তাহারা হয়তো জঙ্গলাকীর্ণ, ম্যালেরিয়া দুষ্ট, জলহীন পিতৃপুরুষের ভিটায় থাকিয়া যাইত।"

১৭৭২ সন হইতে ১৮৭২ সন পর্যন্ত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখা গেল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোকক্ষয়ের জের নিয়া যুগ আরম্ভ হয়। ক্ষয় পূরণ করিতে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর অর্ধশতাব্দী কাল লোকবৃদ্ধি ও চাষবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শতকের শেষ দশকে আবার লোকক্ষয় আরম্ভ হইল। দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে দেখা দিত। ম্যালেরিয়া দেশে ও জনগণের দেহে স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া বসিল। বাজের অনাবাদী জমি ইতিমধ্যে কর্ষণাধীনে আনয়ন করা হইয়া গিয়াছে। নূতন লোকের জন্য আর নূতন জমি পাওয়া যাইত না। কৃষকপরিবারের অভাব বাড়িয়া গেল। ঋণের দায়ে মালিক-চাষী ভাগ-চাষীতে পরিণত হইতে লাগিল। জমির অভাবের জন্য জমি খণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিল। ভূমির অভাব বলিয়া লোক গতিহীন হইয়া পড়িল। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য বাঙালীর চিরসাথী হইতে চলিল। দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি জনবৃদ্ধির কিরূপ বাধা সৃষ্টি করে তাহা বুঝা গেল। জীবনীশক্তির ক্ষীণতার জন্য বাঙালী যে কোন সংক্রামক ব্যাধির শিকারে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল।

১৮৭২-১৯৫১, আশি বৎসর

১৮৭২ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত আশি বৎসরে নয় বার জনগণনা হইয়াছে। গণনার ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে ১৯২১ সনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এই দশকে লোক বৃদ্ধি না হইয়া ১৯১১ সন হইতে প্রায় চার লক্ষ হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধির হার অনিশ্চিত। ১৮৮১ সনে যে দশক শেষ হইয়াছিল তাহার বৃদ্ধি মাত্র ১·৭ শতাংশ। পরবর্তী দশকের বৃদ্ধি ৫·৯ শতাংশ। তৃতীয় দশকে বৃদ্ধির হার বাড়িয়া ৮·১ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১১ সনে উহা ৬·১ শতাংশে নামিয়া গেল। ১৯২১ সনে যে দশক শেষ হইল তাহাতে বৃদ্ধির পরিবর্তে লোক হ্রাস হইল। পাঁচ দশকের প্রথম তিন দশকে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ দুই দশকে আবার উহার অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৩১ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত লোক শুধু বাড়িয়াই চলে নাই, বৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। এজন্য ১৯২১ সনকে লোকবৃদ্ধির ধারার বিভাজিকা বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ সন, এই পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধির প্রকৃতি ১৯২১ হইতে ১৯৫১, এই ত্রিশ বৎসরের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ১৯২১ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের মোট বৃদ্ধি ২০·৫ শতাংশ কিন্তু ১৯২১ হইতে ১৯৫১ সন, এই ত্রিশ বৎসরের বৃদ্ধি ৫১·৩ শতাংশ। ১৯০১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধি ৫৬·৭ শতাংশ। ত্রিশ ও পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধির অনৈক্য খুব বেশি নহে।

উভয় যুগের বৈষম্যের কারণ

অনুসন্ধানের শ্রমস্বীকারে যাহারা বিমুখ তাহাদের মতে গণনার ভুলভ্রান্তি এই অনিয়মের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃত সত্য অন্যরূপ। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, জলপ্লাবন, ঝড় ও ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগ বাঙলার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করিয়া থাকে। অজন্মা না হইলেও মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার শক্তি

অনেকের থাকে না। অর্ধাহার, অনাহার, অর্থাভাবের ফল। পুষ্টির অভাবে ক্ষীণ দেহ সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি হারাইয়া ফেলে। ঠুনকো শরীর সামান্য বিপর্যয়ের মুখে পড়িলেই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এজন্যই প্রত্যেক সাময়িক ঘটনা জনবৃদ্ধির হারের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। ১৯১৮ ১৯ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রভাব ১৯২১ সনের গণনার ফলে প্রকাশ পাইয়াছে। বড় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্থানীয় সংক্রামক ব্যাধি ও অন্নাভাব লোকের চক্ষু এড়াইয়া লোকক্ষয় করিয়া যায়। দশকের শেষে জনগণনার সংখ্যায় এইরূপ ক্ষয় ধরা পড়ে। কোন কোন লোকক্ষয় বহুদিন জের টানিয়া চলিতে থাকে। যে বয়সের লোকের অধিক মৃত্যু ঘটে, সেই গ্রুপ ক্রমে বয়সে বড় হইলেও তাহাদের সংখ্যাল্পতায় লোকক্ষয়ের পরিচয় বহন করিয়া চলে। লোকবৃদ্ধিতেও পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অন্যান্য দেশে লোকবৃদ্ধি বলিতে লোকের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বুঝায়। জনসমষ্টির সহিত নবজাতদের সংখ্যা যুক্ত হয় এবং উভয়ের মৃতের সংখ্যা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নূতন লোকসংখ্যা। পূর্ব দশকের লোকসংখ্যা এবং নূতন সংখ্যার অন্তর বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিচয় দেয়। বহিরাগতের আগমন ও নির্গমনও এই রাজ্যের স্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধির হারের পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে। ১৯২১ সনে জনসংখ্যার ৭ শতাংশ ছিল ভারতীয় বহিরাগত। ১৯৫১ সনে উহা জনসংখ্যার ৬ ৩ শতাংশ। হারে কম হইলেও সংখ্যায় ১৯৫১ সনে সাড়ে পাঁচ লক্ষ বহিরাগত বাড়িয়া গিয়াছে। অভারতীয় বহিরাগতের সংখ্যা প্রায় সওয়া সাতাশ লক্ষ। পক্ষান্তরে প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য সময় সময় বহিরাগতগণ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়াও গিয়াছে। ১৯২১ সনের পর হইতে গভর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে সফলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। ম্যালেরিয়া দমন করা হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিলে স্বল্পকালের মধ্যে উহার বিস্তৃতিতে বাধা দিয়া বহু লোকক্ষয়ের পূর্বেই উহাকে নির্মূল করা হইয়া থাকে। এক কথায় বলা যায় লোকক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণগুলি নিয়ন্ত্রণের শক্তি গভর্নমেন্ট অর্জন করিয়াছেন। উহার ফলে শেষ ত্রিশ বৎসরে লোক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪১ সনের অতিবৃদ্ধি সাম্প্রদায়িক রেষারেষির ফল, উহা জনসংখ্যার প্রকৃত পরিচয় দেয় না। প্রাকৃতিক কারণ সমূহ আয়ত্তে আনিলেও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের নাই। পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আসিয়া চার বৎসরে যত লোক বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই পরিমাণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পঞ্চাশ বৎসর দরকার হইত।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে জনগণের গমনাগমন বৃদ্ধি পায় এবং দুরধিগম্য অঞ্চলে লোকের বসতি বাড়ে। রেলপথ ও বড় সড়কের ধারে নূতন বসতি স্থাপিত হয়। পথের ধারের বাজার, গঞ্জ প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহারা জনবহুল হইয়া উঠে। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে রেল সম্প্রসারণের ফলে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ঘটে, কৃষি শ্রমিকগণ কর্মের সন্ধানে নূতন নূতন ক্ষেত্রে দ্রুত উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবনে সাক্ষাৎভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। নূতন পথের সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে গমনে তাহারা অনিচ্ছুক। অনাবাদী জমির অভাবই এই অনিচ্ছার হেতু।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স ব্যতীত ১৯২১ সন পর্যন্ত অন্যত্র রাস্তার যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা অকিঞ্চিৎকর। সাম্প্রতিক কালে সকল জেলা বোর্ডই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছে। রেলপথ রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত হইয়াছে। পথের উভয়পার্শ্বে ঘনবসতি স্থাপিত হইয়াছে। যে অঞ্চলের ঘনতা এখনও শেষ সীমায় পৌঁছে নাই সড়ক নির্মিত হইলে আগামী দশ বৎসরে তাহা জনপূর্ণ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে। ১৮৭২ হইতে ১৯২১, এই পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব হইতে হ্রাসবৃদ্ধির কোন নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একদিকে হুগলির জনসংখ্যা শতকরা ৬·৭ হ্রাস পাইয়াছিল পক্ষান্তরে জলপাইগুড়ির লোক ১৮৭২ সনের লোকের উপর শতকরা ২৪৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছিল। অপর তিনটি কৃষিপ্রধান জেলা, বর্ধমান, বীরভূম ও নদিয়ার লোক যথাক্রমে শতকরা ৩·৩, ০·২ এবং ৪·৭ হ্রাস পাইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিল্পাঞ্চলের অবস্থান এবং ১৮৮১ সন হইতে বহিরাগতের সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও হুগলি জেলা ১৮৭২-৮১ সনের ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষ এবং ১৯১৮-১৯ সনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার লোকক্ষয় পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বরং ১৮৭২ সনের লোক হইতে শতকরা ৬·৭ জন কম রহিয়া গিয়াছিল। বর্ধমান জ্বরের প্রকোপের তীব্রতা ও লোকক্ষয়ের পরিমাণ কত বেশি ছিল তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যখন দেখা যায় যে, হুগলি জেলায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল ১৮৬১-৬৩ সনে; দশ বৎসর পরে, ১৮৭২ অব্দে, জনগণনা হয়; সুতরাং ১৮৭২ সনের সংখ্যা দশ বৎসর পূর্বে ম্যালেরিয়া মহামারীতে ধ্বংসাবশিষ্ট জনগণের সংখ্যা। পঞ্চাশ বৎসর পরেও হুগলি জেলার জনসংখ্যা জ্বরের পর যাহারা জীবিত ছিল তাহাদের সংখ্যার সমান হইতে পারে নাই। জেলার অধিবাসীদের জীবনীশক্তির এই শোচনীয় ক্ষীণতায় বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। নদিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৯২১ সনে ইহার লোকসংখ্যা ১৮৭২ সনের সংখ্যা হইতে শতকরা ৮ ৭ শতাংশ হ্রাস হইয়াছিল। ১৮৭২-১৯২১ সন মধ্যে মাত্র একবার, ১৮৯১-১৯০১ দশকে, বর্ধমানের লোকবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বৃদ্ধিতে বহিরাগতগণ কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল তাহা কিছু পরেই দেখা যাইবে। ১৮৭২-৮১ দশকে বর্ধমান জ্বরের জন্য এবং ১৯১১ ২১ দশকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জন্য বর্ধমানের লোকসংখ্যা শতকরা ৬-এর অধিক হ্রাস পাইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমের প্রকৃতিও বর্ধমানের অনুরূপ। কিন্তু ১৮৮১-১৯১১ সনের মধ্যে বীরভূমের ক্ষয়পূরণে একটু অধিকতর শক্তির বিকাশ দেখা যায়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ পঞ্চাশ বৎসরের শেষে কোনপ্রকারে মাথা উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল, লোকসংখ্যা হ্রাস পায় নাই। অর্ধশতাব্দীতে ইহাদের বৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা মাত্র ২·৩, ৫ ৩ ও ৪·৬। এই সময়ে চব্বিশপরগনার বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৫৫ ৬। বহিরাগতেরা যে চব্বিশপরগনার বৃদ্ধির হার স্ফীত করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষিপ্রধান জেলার মধ্যে একমাত্র মালদহের বৃদ্ধি ১৯১১ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ফলে ১৯১১-২১ দশকে লোক হ্রাস পায়। পঞ্চাশ বৎসরে মালদহের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় শতকরা একের সামান্য বেশি। পশ্চিম দিনাজপুরে বৃদ্ধির ধারা মালদহের অনুরূপ কিন্তু বৃদ্ধির হার সামান্য কম। পাঁচ দশকের মধ্যে তিন দশকেই কোচবিহারে লোকের হ্রাস দেখা যায়। পঞ্চাশ বৎসরে মোট বৃদ্ধি মাত্র ১১ ৩ শতাংশ। ১৮৭২-১৯২১ সনের মধ্যে হাওড়া, চব্বিশপরগনা, কলিকাতা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের বৃদ্ধিতে কখনও ছেদ পড়ে নাই। এই পাঁচটি জেলাই শিল্পাঞ্চল সুতরাং প্রধানত বহিরাগতগণ উহাদের লোকবৃদ্ধিতে এবং তাহা অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ১৯২১ সনের পরবর্তী কালে লোকবৃদ্ধির ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্বের অনিশ্চয়তা

আর নাই ; ১৯৫১ সন পর্যন্ত রাজ্যের সর্বত্র বৃদ্ধি দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন। ১৯২১ ৫১ সনের বৃদ্ধির হার ১৯০১-৫১ সনের হার হইতে সামান্য কম। অন্যভাবে বলা যায় যে, ত্রিশ বৎসরের বৃদ্ধি পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধির অতি নিকটে পৌঁছিয়াছে। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত মোট বৃদ্ধি শতকরা মাত্র ২০·৫ ছিল। ১৯২১ সনের সংখ্যা হইতে ১৯৫১ সনে শতকরা ৫১·৩ বাড়িয়াছে। ১৮৭২-১৯২১ সনে বার্ষিক বৃদ্ধির গড় ৪১, পক্ষান্তরে ১৯২১-৫১ সনে ঐ গড় ১·৭১। তুলনায় সমগ্র বর্ধমান বিভাগের এবং হুগলি ও হাওড়া এই দুইটি শিল্পপ্রধান জেলা ব্যতীত অপর চারটি জেলার প্রত্যেকটির লোক ১৯০১-৫১ অপেক্ষা ১৯২১-৫১ সনে অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধিতে বহিরাগতদের দান কতখানি তাহা পরে বিচার করা হইবে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের অবস্থা অন্যরূপ। উহার শিল্পাঞ্চল ও চা-বাগান ১৯২১ সনের পূর্বেই জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বিভাগের কৃষিপ্রধান জেলা নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের লোক বর্ধমান বিভাগের কৃষিপ্রধান জেলার ন্যায় দ্রুত বাড়িয়াছে। অতীতের যে-কোন ত্রিশ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব কাল অপেক্ষা ১৯২১-৫১ এই ত্রিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের লোক ক্রমাগত সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। রেলপথের সম্প্রসারণ ও সড়ক নির্মাণের ফলে দুরধিগম্য বহু অঞ্চল কৃষির জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের ফলে গভর্নমেন্টের পক্ষে সংক্রামক ব্যাধি ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় শক্তিক্ষয়কারী ব্যাধির বিরুদ্ধে সুচারু ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিকতর সহজ হইয়াছে। রেলপথ ও রাস্তার উন্নতির জন্যই সরকার এখন যে-কোন অঞ্চলের খাদ্যাভাব অল্প সময় মধ্যে বিদূরিত করিয়া উহা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থার বিপর্যয় ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের অসমতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে এবং কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রেতা ছিল কেবলমাত্র স্থানীয় হাটবাজারের ব্যবসায়ী। তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী দর নিয়ন্ত্রিত হইত। যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন কৃষিপণ্যের বাজার আর গ্রামে সীমাবদ্ধ নহে, উহার সীমারেখা রাজ্যের সীমারেখার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দূরবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে ক্রেতার কর্মচারী কৃষি অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় পণ্যের দর বাড়িয়া যায়। এই বর্ধিত মূল্যের ফলভোগ করে উৎপাদক। দুই বিশ্বসংগ্রামই কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রথম যুদ্ধের পর হইতে ১৯৩১ সন পর্যন্ত দর বেশি ছিল। দ্বিতীয় সংগ্রামের সময়ের বর্ধিত মূল্য ১৯৪৩ সনের পরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখন কোন কোন মালিক-চাষীর হাতে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। কৃষকের ঋণ হ্রাস পাইয়াছে। অভাবের তাড়নায় ক্রেতার দরে তাহার উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে সে আর বাধ্য নহে, কৃষিপণ্য ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে। এই আর্থিক উন্নতিতে তাহার জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ও সমবণ্টন কৃষিজীবীর জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। চিনি, গম, চাউল, এবং মিহি কাপড় তাহার ভাগেও পড়িয়া থাকে। ভুট্টা, বজরা, জোয়ার অথবা মারুয়া আহারে কৃষকের অরুচি ধরিয়াছে। এখন চাউল ও গম তাহার খাদ্য। ঐ সকল শস্যের পরিবর্তে ধানের চাষ করা হইয়া থাকে। আহারে এই রুচির পরিবর্তন রাজ্যের খাদ্যসমস্যার তীব্রতা অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। কৃষিজীবীর এই অবস্থান্তরে খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য বেশি ব্যয় করা হইয়া থাকে, ফলে তাহাদের দেহ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষিপণ্যের উচ্চ মূল্যের সুফল ভোগ হইতে কৃষিজীবীগণের এক বিরাট অংশই বঞ্চিত, কারণ তাহাদের জমির পরিমাণ অতি অল্প।

ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকের জীবনীশক্তি যে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের প্রতিকারে গভর্নমেন্টের অধিকতর সাফল্য এই উন্নতির প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে খাদ্যাবস্থার অবনতি ঘটিলে গভর্নমেন্ট অবিলম্বে তথায় খাদ্যশস্য প্রেরণ করিয়া অবস্থার অধিকতর অবনতি প্রতিরোধ করেন এবং অতি দ্রুত বণ্টনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্যের অংশ গ্রহণের সুবিধা করিয়া দেন। সরকারের এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছাড়াও লোকের যে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক জনগণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর পরে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৬ সনের বিপর্যয়ের পরে তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। এখন সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে, দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত উহা নিবারিত হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ লোকের আয়বৃদ্ধির ফলে যদি অধিক ব্যয়ের ক্ষমতা জন্মিত তাহা হইলে সরকারের এই সকল প্রচেষ্টা তাহাদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করিত।

নির্দিষ্ট হারে যাহারা বেতন পায় তাহাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটিয়াছে। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত কর্মীর আয়ের সামঞ্জস্য বিধান সম্বন্ধে মালিক সচেতন হইয়াছে। সংগঠন ও সংহতি এই শ্রেণীর কর্মীদের অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। দর কষাকষি না করিলে বেতন বৃদ্ধি হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্যয় ও বেতন প্রায় সমান এবং মোটা বেতনের কর্মচারী ব্যতীত অন্যের হাতে আবশ্যকীয় ব্যয়ের পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভাগচাষীর মতই স্বল্পবেতনভোগীদের টিকিয়া থাকিবার শক্তি কম।

ভূমিহীন শ্রমিকেরা পূর্বে সর্বাধিক দুঃস্থ ছিল। কিন্তু ইদানীং তাহাদের দুর্গতি অপরের অপেক্ষা অধিক হয় নাই। ঘর ছাড়িয়া যাইতে যাহারা ইচ্ছুক, তাহারা কয়লার খনি, কল-কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কাজ জুটাইতে পারে। সেখানে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় পারিশ্রমিক ঢের বেশি। যেসকল জেলায় কৃষিমজুরের মজুরি বাড়ে নাই সেখানে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্যের দরুন শ্রমিকেরা দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল জেলায় কিন্তু মজুরদিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া আংশিক সাহায্য করা হইয়া থাকে। যে জেলায় কৃষি মজুরকে কেবলমাত্র অর্থ দ্বারা মজুরি দিবার রীতি প্রচলিত, সেখানে মজুরি কিছু না কিছু বাড়িয়াছে। কয়েকটি জেলায় স্থানীয় শ্রমিকের দ্বারা সকল কাজ সংকুলান হয় না বলিয়া শস্য রোপণ, আগাছা উৎপাটন ও ফসল কাটার সময় বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বহু শ্রমিক আসিয়া থাকে। এখানে শ্রমিকের চাহিদা বেশি, সুতরাং চাহিদাই মজুরির নিয়ামক। সামাজিক সংস্কারের শিথিলতা গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। পূর্বকালে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যুবরণ শ্রেয় মনে করা হইত। এখন সামাজিক বাধা অপসারিত হইয়াছে। যে-কেহ যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। শ্রমিকেরা এখন আর নিজ গ্রামের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। জাতি ও বৃত্তির বেড়া

ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহার চলার পথের অন্তরায় দূর হইয়াছে। সেখানে যে কাজ জোটে তাহাই সে করে। দুর্মূল্যতার দরুন খাদ্যাভাব অনুভব করিলেই সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং দূরে অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য "দেশে" টাকা পাঠায়। এইরূপ বাড়ি-ছাড়াদের সংখ্যা নির্ভর করে শস্যের অবস্থার উপর। শস্য ভাল হইলে জেলা ছাড়িয়া যায় কম লোক; শস্যের অবস্থা খারাপ হইলে শ্রমিকেরা অধিক সংখ্যায় দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের "ভদ্রলোকেরা" ১৯৪৫ সন পর্যন্ত নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের মর্যাদারক্ষার ব্যয় যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর স্কুল কলেজ হইতে বাহির হওয়া লোকের দ্বারা যখন তাহাদের সংখ্যা স্ফীত এবং প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিল, তখন যেসকল কাজের নামে পূর্বে ইহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিত সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইহারা বাধ্য হইল। ছোট ব্যবসায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কায়িক শ্রম, জুতার কারখানায় শ্রমিকের কাজ, তাঁত চালানো, লঞ্চ ও মোটর গাড়ির ড্রাইভারি, ফিরি প্রভৃতি কিছুই আর এখন নিম্নবিত্ত "ভদ্রলোকের" অকরণীয় নহে। কাল্পনিক মর্যাদা নিয়া মরা অপেক্ষা জাতিভ্রষ্ট হইয়া বাঁচা ভাল, এই কথার সত্যতা তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে। এজন্য "ভদ্রলোক" এখন শ্রমিকের ব্যারাক এবং পূতিগন্ধময় কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তিতে দেখা যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে জাত ও সমাজের বাধা অতিক্রম করিয়া কায়িক শ্রম এখন নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

গত ত্রিশ বৎসরে খাদ্যশস্য ও পাটের জমি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধানের চাষ যেখানে অজ্ঞাত ছিল সেখানে এখন ধান উৎপন্ন হয়। চাষী পূর্বে ধান, তিল, সরিষা, মুগ, কলাই প্রভৃতিতে তাহার অর্থ ও শক্তি সমভাবে বিনিয়োগ করিত। ধান ও পাটে অর্থাগম বেশি হয় বলিয়া এখন এই দুই শস্যের জন্যই সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বাজরা ও ভুট্টার ক্ষেতে প্রথম ধান উৎপন্ন করা হইত। পাটের দর বেশি বলিয়া এরূপ ধানের জমিতে এখন পাট জন্মান হয়। ধান অপেক্ষা পাটের দিকেই চাষীর ঝোঁক বেশি। ইহা একপ্রকার ভাল। জলসিঞ্চন ব্যতীত উচ্চ ভূমিতে ধান ভাল জন্মে না। পাটের পর জমিতে ধানের চাস করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। পাটের ফলন অনিশ্চিত, কিন্তু দর প্রায় চড়া-ই থাকে। খাদ্যশস্য প্রতিদিনের অন্ন জোটায়; তাহার চাষ ছাড়িয়া বেশি লাভের আশায় পাট বোনা অনেকটা ফাটকা খেলার মত অনিশ্চিত ব্যাপার।

পরিসংখ্যান বিবরণী হইতে তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ১৯১৮-১৯ সনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী জনসমাজের এক বৃহৎ অংশের মৃত্যু ঘটাইয়া লোকবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহার ফল হইয়াছিল দীর্ঘস্থায়ী; বিপুল-সংখ্যক বহিরাগতের আগমনে প্রকৃত অবস্থা যে জেলায় চাপা পড়ে নাই সেখানে, ১৮৮১ সনের বর্ধমানের জ্বরের ন্যায়, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার লোকক্ষয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এই মড়কে ০-৩, ২৮-৩৮, ৪৮-৫৮, এবং ৫৮ ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকেরই বেশি প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। অন্যরূপে বলা যায় দুগ্ধপোষ্য শিশু, পরিপূর্ণ শক্তিমান তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ জনগণের উপর এই কালব্যাধির মৃত্যুদণ্ড অধিক উদ্যত হইয়াছিল। ১৯২১ সনে ০-৫ বৎসরের শিশুর অতিমৃত্যুর ছাপ ১৯৩১ সনে ১০-১৫ এবং ১৯৪১ সনে ২০-৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। ১৯২১ সনে যাহাদের বয়স ০-৫ ছিল, ১৯৩১ সনে তাহাদের বয়স ১০-১৫ এবং ১৯৪১ সনে ২০-২৫ হইয়াছিল। অন্যান্য দশক অপেক্ষা ১৯৩১ সনের ১০-১৫ বৎসর বয়সের গ্রুপে এবং ১৯৪১ সনের ২০-৩০ বয়সের গ্রুপে লোকসংখ্যার আনুপাতিক হ্রাসের কারণ ১৯১৮-১৯ সনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অতিমৃত্যু।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ন্যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরও বিশেষ বিশেষ বয়সের লোক আক্রমণ করিয়াছিল। এই বয়স ০-৩, ২৩-৩৩ ও ৪৩-৫৩। কয়েকটি জেলায় ৫৩ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়সের লোকেরও কিছু মৃত্যু ঘটিয়াছে। ১৯৫১ সনের গণনার আট বৎসর পূর্বে দুর্ভিক্ষ এবং সাত বৎসর পূর্বে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী মড়ক ঘটিয়াছিল। সুতরাং ১৯৫১ সনে ৫-১০, ৩০-৪০ ও ৫০-৬০ বয়সের গ্রুপে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অতিমৃত্যুর পরিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত এই যে, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ জেলার চা-বাগানে বহিরাগত শ্রমিকনিযোগ প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত। চায়ের নিয়ন্ত্রণ ও বাজার মন্দার জন্য নূতন বাগান স্থাপন অথবা পুরাতন বাগান বৃদ্ধি রহিত হইয়াছে। বহিরাগতের আগমনের ফলে এই দুই জেলার লোকবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম, এখন হইতে স্বাভাবিক বৃদ্ধির যুগ আরম্ভ হইবে। আসাম রেল লিংক খোলার জন্য শিলিগুড়ি, আলিপুর দুয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু লোক বাহির হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। কয়েকটি নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪১-৫১ দশকে হুগলি জেলায় শিল্প শ্রমিক আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। উদ্বাস্তুগণ পল্লী-অঞ্চলে লোকবৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। শিল্প শ্রমিক বৃদ্ধির জন্য চব্বিশপরগনা ও কলিকাতার লোক তত বাড়ে নাই যত উদ্বাস্তু আগমনের জন্য বাড়িয়াছে। হাওড়া সিটি, বালী ও বাউড়িয়ায় নানাবিধ কলকবজার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হাওড়া জেলার শিল্প শ্রমিক প্রচুর-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল তথ্যালোচনায় এই কথাটিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, চা বাগানের জেলা দুইটি ও পুরাতন শিল্পাঞ্চলের লোকধারণ-ক্ষমতা দ্রুত নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। তাহাদের লোকবৃদ্ধির গতি যে মন্থর হইতেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একমাত্র আসানসোল মহকুমায় শিল্পপ্রসারের দ্রুতগতির সমতালে লোকবৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৩১-৪১ দশকে অনেক জেলার লোকবৃদ্ধি অন্যান্য দশকের বৃদ্ধির হার হইতে ঢের বেশি। এই অতিবৃদ্ধি প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

পরিসংখ্যান বিবরণীতে ১৯০১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত প্রতি দশকে পৌরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বৃদ্ধির হার পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চল ও পৌরাঞ্চলের বৃদ্ধির হারের বৈষম্য যেমন অধিক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সহ পল্লীর জনসংখ্যা পঞ্চাশ বৎসরে মাত্র ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে; পক্ষান্তরে পৌর জনগণের বৃদ্ধি হইয়াছে ২০৫·৬ শতাংশ। উদ্বাস্তু বাদে পল্লী ও পৌরাঞ্চলের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৭·৪ ও ১৫৩·৫। খুব কম জেলাতেই গ্রামাঞ্চলের বার্ষিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি শতকরা ২-এর অধিক। কৃষিপ্রধান জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে এই হার শতকরা অর্ধেকের অনেক কম। পক্ষান্তরে ঐ সকল জেলার কোন শহরেই ১৯০১ সনের জনসংখ্যা প্রতি বৎসরে শতকরা একের কম বাড়ে নাই। ১৯৫১ সনে মেদিনীপুর, হুগলি,

হাওড়া ও কোচবিহার জেলার পৌরাঞ্চলের লোক ১৯০১ সনের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ধমান, বীরভূম, চব্বিশপরগনা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের পৌরাঞ্চলে ১৯০১ সনের জনসমষ্টির কয়েক গুণ লোক বাড়িয়াছে।

কলিকাতার বৃদ্ধির হারে বিস্ময়ের সৃষ্টি না করিয়া পারে না। ১৯৪১ সনে কলিকাতায় ১৯৩১ সনের জনসমষ্টির ৮৪ ৯ শতাংশ লোক বাড়িয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকে উদ্বাস্তু বাদ দিয়া বৃদ্ধির হার মাত্র ০·৩ শতাংশ। যুদ্ধের সময় কলিকাতায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। ১৯৪১ সনের জনগণনা যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে করা হয়। সুতরাং বৃদ্ধির একাংশ এই আগন্তুকদের দান। ১৯৪৬ সন হইতে কলিকাতার মুসলমান অধিবাসীদের অনেকে এই নগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৯৫১ সনের বৃদ্ধির উপর ইহার কিঞ্চিৎ প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ের লোকবৃদ্ধি ও ১৯৪৬ সন হইতে লোক হ্রাসই এরূপ বিরাট বৈষম্যের কারণ কিনা তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

এখন প্রত্যেক জেলার লোকবৃদ্ধির বিষয় আলোচিত হইবে।

বর্ধমান

পরিসংখ্যান বিবরণীতে বর্ধমান জেলার মহকুমা ও থানার বৃদ্ধির শতকরা হার প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৯২১ সনের পূর্বে ও পরে বৃদ্ধির প্রকৃতি যে ভিন্ন তাহা এই বিবরণীতে পরিষ্কার বুঝা যায়। ১৮৭২ ও ১৯২১ সনের মধ্যে সদর ও কালনা মহকুমার প্রতিটি থানা এবং কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানা দারুণ দুঃখভোগ করিয়াছিল; সুতরাং ১৯২১ সনের লোকসংখ্যা ১৮৭২ সনের সংখ্যার ই হইতে ১/১০ অংশ কম হইয়াছিল। কাটোয়া ও মঙ্গলকোট থানা একই ব্যাধিতে প্রপীড়িত হইলেও সেখানে ১৮৭২-১৯২১-এর মধ্যে অল্প বৃদ্ধি দেখা যায়। কালনা মহকুমার তিন থানাই খুব ভুগিয়াছিল। খণ্ডঘোষ, জামালপুর ও আউসগ্রামে ব্যাধির প্রকোপ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বর্ধমান জ্বরের প্রাদুর্ভাবের সময়, ১৮৬২ সনে, লোকক্ষয়ের সূচনা হয়, ১৮৭৮ সন পর্যন্ত জ্বরে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং জন্মের হারেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। সমগ্র অঞ্চলে ১৯২১ সন পর্যন্ত ম্যালেরিয়া বহু লোকক্ষয় করিতেছিল। ১৯০১ ও ১৯১১ সনের মধ্যে কলেরা বারবার সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে, ইহার মধ্যে ১৯০৭ ও ১৯০৮ সনের আক্রমণ ছিল বিশেষ মারাত্মক। ম্যালেরিয়ার লোকক্ষয়েরও বিরাম ছিল না। ১৯১১ ও ১৯২১ সনের মধ্যে আসানসোল মহকুমা ব্যতীত জেলার সর্বত্র লোক হ্রাস পাইয়াছিল। সদর মহকুমার বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন অংশে হ্রাস পাইয়াছিল খুব বেশি, মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বাংশে হ্রাসের মাত্রা কম। ১৯৩১ সনে দামোদর, অজয়, খারী, কুমার ও ভাগীরথীর প্লাবনে অন্য তিন মহকুমার ক্ষতি হইয়াছিল সর্বাধিক। কয়েক মাস জলমগ্ন থাকায় এই সকল মহকুমায় ম্যালেরিয়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণেও উহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৯১৬ হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত বন্যা হইয়াছিল চারবার। দশকের শেষের দিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাসের লক্ষণ দেখা গেল। কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং কৃষকের আর্থিক উন্নতির ফলে লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রধানত ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল-সরবরাহ, বিনামূল্যে কুইনিন বিতরণ, টিকা, কলেরা-প্রতিষেধক ইন্‌জেকসন, মফস্বলে ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাস্থ্যোন্নতির সাহায্য করিয়াছে। ১৯৪৭ সন হইতে কালনা, কাটোয়া ও সদর মহকুমায় উদ্বাস্তুর আগমন, ১৯৫১ সনের গণনায় জেলার লোকবৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল কারণে ১৯২১ সন হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমা ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

আসানসোল মহকুমার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেখানে ১৮৭২ সন হইতে ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। আসানসোলের লোকবৃদ্ধি সত্যই বিস্ময়কর। ১৯২১ সন পর্যন্ত ১৮৭২ সনের জনসংখ্যার ৬৯·৭ শতাংশ, বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। সালানপুর, কুলটি, হিরাপুর, আসানসোল ও বরাবানী থানায় ঐ হার ১৭১ ৩ শতাংশ কিন্তু জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, অন্ডাল ও ফরিদপুর থানার বৃদ্ধি ৯৩ ৩ শতাংশ। একমাত্র সদর মহকুমার সংলগ্ন কাংসা থানায় ১৯২১ সনে লোক হ্রাস হইয়াছিল। ১৮৭২ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত কেবলমাত্র কয়লার খনির কাজ হইতেছিল। ১৯২১ সনের পরে কয়লার খনি-অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সনে এই জন্যই ১৯২১ সনের লোকের শতকরা ৯০·৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যরূপে বলা যায় যে, এই মহকুমার লোক পঞ্চাশ বৎসরে (১৯০১-৫১) দ্বিগুণের অধিক বাড়িয়াছে।

বর্ধমান জেলায় বাহিরাগতের সংখ্যা ৩,৪৬,০৮৭, তন্মধ্যে ৯৬,১০৫ জন উদ্বাস্তু।

বীরভূম

পরিসংখ্যান বিবরণীতে বীরভূম জেলার লোকের হ্রাস বৃদ্ধি থানা হিসাবে দেখান হইয়াছে। এই জেলাতেও বৃদ্ধির ধারা বর্ধমানের অনুরূপ। পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯২১ সনে, সদর মহকুমায় ১৮৭২ সনের লোক হইতে এক-দশমাংশ লোক হ্রাস পাইয়াছিল। রামপুরহাট মহকুমায় ঐ সময়ে ১৬·৬ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা যায়, ১৯২১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত বৃদ্ধি ২৫ ৩ শতাংশ। দুই মহকুমার মধ্যে রামপুরহাট অধিকতর স্বাস্থ্যকর। সদর মহকুমায় ১৮৭২-৮১ সনে বর্ধমান জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরবর্তী দশকেও উহা চলিয়াছিল। ইহার ফলে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। ১৮৯১ সনের পর জনসাধারণের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়; সংক্রামক ব্যাধি আর রহিল না। শস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকের আর্থিক উন্নতি ঘটিল। ভূমিহীন কৃষিমজুরগণ আসানসোলের খনিতে লাভজনক কাজ পাইত। বীরভূম সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকেরও বৃদ্ধি ঘটে। ১৯০৬-১৯০৮ সনের মধ্যে রামপুরহাট মহকুমার জ্বর ও কলেরায় বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় বীরভূম জেলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সংক্রামক ব্যাধিতে আদিম অধিবাসিগণই বেশি ভুগিয়া থাকে। ১৯২১ ও ১৯৩১ সনের মধ্যে সাঁওতাল, কোরা ও অন্যান্য খণ্ডজাতির লোক বিহার হইতে আসিয়া

রামপুরহাট ও নলহাটি থানায় বসতি স্থাপন করে। শিল্পোন্নতি এবং রামপুরহাটে রেলওয়ে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যও লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সাঁইথিয়া ও আহমদপুর ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে কয়েকটি চাউলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত দশকটিতে স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল গিয়াছিল। সাধারণভাবে পরবর্তী দশকেও উল্লিখিত কল্যাণকর অবস্থা অব্যাহত ছিল। এই সকল কারণে প্রায় ১৯২১-৩১ দশকের ন্যায় ১৯৩১-৪১ দশকেও লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯৪১-৫১ দশকের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। ১৯৪৩ এর মন্বন্তর এবং ১৯৪৪-এর মহামারী বিপুল জনক্ষয় করিয়া লোকের জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর হারকে ডিঙাইয়া যাইতে জন্মের হারের চার বৎসর লাগিয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজের জন্য সদর মহকুমার বহু শ্রমিকের আমদানি হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সনের লোকক্ষয়ের পরিচয় এজন্যই আংশিক ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। জেলার কৃষির অবস্থা অতি হীন, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। সুতরাং প্রতি বর্গমাইলে ৩০০ হইতে ৪০০-র অধিক লোকধারণের ক্ষমতা ইহার নাই। এই গড়ের সামান্য বেশি লোক হইলেই সাময়িক ব্যাধির কবলে পড়িয়া বাড়তি লোক বিনষ্ট হইয়া থাকে। রামপুরহাট ও নলহাটী থানা কৃষিসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সেখানেও যে-কোন বিশ বৎসরে বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা একের নীচে। লোকের শক্তিসামর্থ্যের সঞ্চয় যেন কিছুমাত্র নাই। পার্শ্ববর্তী জেলা বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের অধিবাসী অপেক্ষা বীরভূমের জনগণ অধিকতর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

১৯৩২ সনে জনৈক সরকারী কর্মচারী লিখিয়াছিলেন: "জীবিকার উপায়ের সহিত যদি লোকবৃদ্ধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে তবে লোকের ৩০ বৎসরের হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বীরভূম জেলায় ভূমি আর অধিক লোকের চাপ সহিতে অক্ষম। আবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্র বেশি অবশিষ্ট নাই, কিন্তু চাষবাস বৃদ্ধি করিলেও লোকবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প।"

শিল্পের দিক হইতে বীরভূমের বিশেষ গুরুত্ব নাই। রামপুরহাটের রেলের বসতিও থাকিবে কিনা সন্দেহ, কারণ রেলের প্রধান অফিসটি স্থানান্তরিত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ফলে একটি বড় উন্নতিশীল শহরতলি গড়িয়া উঠায় সিউড়ি নবজীবন লাভ করিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনের মধ্যে ছয় লক্ষ একর জমিতে ময়ূরাক্ষীর জল পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ১৯৫০ সন হইতে এক লক্ষ একর ভূমি এই সেচব্যবস্থার আওতায় আসিয়াছে এবং একর-প্রতি ফলন বেশ বাড়িয়াছে। আহমদপুর, মহম্মদবাজার ও নলহাটী সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হইয়াছে। আশা করা যায় এই দুই পরিকল্পনা জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন শক্তিসঞ্চারের দ্বারা উহার স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কল্যাণকর লোকযাত্রার প্রেরণা যোগাইবে। বীরভূমের গ্রামগুলি যেন এক একটি বন্ধ পেটরা। অতি অল্প লোকেই গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হয়। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের ক্রমাবনতি ঘটা সত্ত্বেও ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি আঁকড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত। প্রস্তাবিত উন্নতি সাধিত হইলে ফলন বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকের দুর্গতি মোচন হইবে। ১৯৪৭ সন হইতে জেলায় জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ইহার সহিত খাদ্যাবস্থার উন্নতি যুক্ত হইলেই মৃত্যুর হার হ্রাস পাইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ফলে লোকপোষণের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে।

বীরভূমের লোক রাজ্যের বাহিরের যায় খুব কম, বীরভূমে ভিন্ন রাজ্য হইতেও লোক আসে অল্প। ভূমির উর্বরতার স্বল্পতা, ব্যবসায়বাণিজ্য ও আবাদযোগ্য ভূমির অভাবের জন্য এই জেলায় অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু আগমন করে নাই। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে ১৯৫১ সনের জনগণনার সময় বীরভূমের মাত্র ৫,০২০ জন পুরুষ ও ২,৬৮৮ জন নারী ছিল।

বাঁকুড়া

১৮৭২-১৯২১, এই অর্ধ-শতাব্দীতে বাঁকুড়া জেলার লোক শতকরা মাত্র ৫·৩ জন বাড়িয়াছে; কিন্তু ১৯২১ হইতে ১৯৫১, এই ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৯ ৩। বাঁকুড়া কৃষিপ্রধান জেলা; সেখানে কৃষকের দুর্গতি নানা কারণে ঘটিয়াছে। ১৮৫০ সন হইতে সত্তর বৎসরের মধ্যে জেলার অনেক বনাঞ্চল অরণ্যমুক্ত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। ইহাতে কর্ষণাধীন ভূমি বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে কিন্তু ১৯২১ সন পর্যন্ত ভূমির অনুপাতে লোকবৃদ্ধি হয় নাই। সদর মহকুমায় পঞ্চাশ বৎসরে ২৪·৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইলেও বিষ্ণুপুর মহকুমার ২০ ৬ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছিল।

মহাজনের কবলে পড়িয়া কৃষকদের অনেকে তাহাদের জমি হারাইয়াছে। ১৯২৬ সনে কর্ষণাধীন ভূমির মাত্র ৪৬·৫ শতাংশ রায়ত ও কোর্ফা রায়তের দখলে ছিল। ৫৩ ৫ শতাংশ ভূমির মালিকগণ কৃষিজীবীদের নিকট সাঁজা জমা, ভাগ, শস্য ও নগদ টাকা অথবা শুধু নগদ টাকায় ভূমিপত্তন করিত। জমিতে ফসল হউক বা না হউক সাঁজা প্রথা অনুসারে মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দিতেই হয়। প্রায়ই সাধারণ বৎসরে উৎপন্ন শস্যের ১/৩ অংশ সাঁজা নির্ধারিত হইয়া থাকে। ভাগ প্রথায় সচরাচর উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ দিতে হয়। ১৯২৬ সনে রায়তের নিকট পত্তন করা জমির এক চতুর্থাংশের এইরূপ সাঁজা, ভাগ অথবা শস্য ও টাকায় মালিকদের খাজনা দিতে হইত। কৃষকের যখন রায়তি স্বত্ব ছিল তখন সে নগদ টাকায় যে খাজনা দিত সাঁজা, ভাগ ইত্যাদিতে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক খাজনা দিতে হয়। এজন্য কৃষকের ঋণ ও অভাবমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। চাষে তাহার উৎসাহ থাকে না বলিয়া উৎপাদন হ্রাস পায়। কৃষকের আর্থিক দৈন্য ইহার অনিবার্য ফল। সংখ্যালঘু জমির মালিকগণ কৃষকদের ভাগ্যবিধাতা। তাহারা কোন কৃষিজীবীকে জমিপত্তনে অনিচ্ছুক হইলে সেই ভাগচাষীর বিপদ উপস্থিত হয়। এই অবস্থা কৃষিজীবীদিগকে আত্মমর্যাদাহীন ও জমির মালিকদের অনুগ্রহাধীন করিয়া ফেলিয়াছে। লোকবৃদ্ধির উপর ইহার প্রভাব বিস্তর।

নদীর দুরবস্থা কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ। ই আই রেলপথ খোলার পূর্ব পর্যন্ত দামোদর মেজিয়া পর্যন্ত নাব্য ছিল। রানীগঞ্জের কয়লা নদীপথে চালান হইত। ১৮৮০ সন পর্যন্ত দ্বারকেশ্বরের জলপথে বাঁকুড়া শহর পর্যন্ত নৌকা যাতায়াত করিত। বনধ্বংস ও দামোদরের বাঁধ নদীর অবনতির কারণ। এখন আর বাঁকুড়া জেলায় নৌকা দেখা যায় না। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে জমি বাড়িয়াছে কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। উৎপাদন হ্রাসের জন্যই ১৯২৬ সনে সদর মহকুমায় মাত্র ৪৫ শতাংশ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৫২ শতাংশ ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুর মহকুমা ও ওন্দা থানা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চল। সদর মহকুমার অধিকাংশ স্থান ম্যালেরিয়া মুক্ত। প্রধানত এইজন্যই সদর মহকুমায় লোকবৃদ্ধি ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় লোকহ্রাস হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইত। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব বাঁকুড়ায় বহুবার ঘটিয়াছে। বাঁকুড়ার লোকদিগকে আসামের চা-বাগানে যাইবার জন্য উৎসাহিত করা হইত। ১৯১৬ সনে ৪,৫০০ জন আসামে গিয়াছিল।

১৯২১-১৯৫১ সনের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের ফলে ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সনে বিস্তৃত অঞ্চলে ডি-ডি-টি'র প্রয়োগ দ্বারা উহাকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা হইয়াছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তাহার অনুগামী মহামারী ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটী, মেজিয়া, সালতোরা, জয়পুর, সোনামুখী ও পাত্রসায়র মহকুমার লোকহ্রাসের কারণ।

সুবৎসরে বাঁকুড়ায় প্রচুর ধান জন্মে। কিন্তু খরায় শস্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা সর্বদা বর্তমান থাকে। সদর মহকুমার উচ্চ ভূমির জল উত্তমভাবে নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমায় জল বদ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে।

পরিসংখ্যান বিবরণীতে লোকের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা, যে কোন দুর্বিপাক প্রতিরোধের অক্ষমতা, গড় বয়সের নিম্নতা এবং প্রতি দশকের শেষে একপাল শিশুর জন্মের পরিচয় পাওয়া যায়। উহা কর্মক্ষম ব্যক্তিদের উপর পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণের সাক্ষ্য দিতেছে। দুর্ভিক্ষের পর বহু সন্তান জন্মের জন্য ১৯৫১ সনের গণনায় লোকক্ষয় পূরণ হইয়া গিয়াছে। জেলায় ৯,২৯৪ জন উদ্বাস্তু আসিয়াছিল। বর্ধমানে বাহির হইতে লোক আসে, বীরভূমে লোক আসেও না যায়ও না, বাঁকুড়ার অনেক লোক জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ঘনতা কম সত্ত্বেও বাঁকুড়ার ভূমির আর লোকপোষণের ক্ষমতা নাই; সুতরাং আহারের অন্বেষণে জেলার বাড়তি লোক বিদেশে পাঠাইতে হয়। যাহারা এইরূপে জেলা ছাড়িয়া যায় তাহারা কৃষিকর্ম করিতেই ভালবাসে। চা বাগানে অথবা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলির গ্রামাঞ্চলে ইহারা শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

মেদিনীপুর

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বাঁধ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমের বৃক্ষচ্ছেদ মেদিনীপুরে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। বন্যার দুর্গতি নিবারণ এবং নোনা জল বাধা দিয়া হিজলীর শত শত বর্গমাইল ভূমি চাষের জন্য উদ্ধার, বাঁধনির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল। বাঁধ বন্যা নিবারণ করিল বটে কিন্তু উহারা জলনিকাশের পথও অবরোধ করিল। বন্যার জলরোধের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে পলি বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। বদ্ধ জল ম্যালেরিয়া বাহক মশকের জন্মভূমিতে পরিণত হইল। এক কালে স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া খ্যাত মেদিনীপুর এখন রাজ্যের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জেলাসমূহের অন্যতম। যে-অঞ্চলে বাঁধ বেশি, ম্যালেরিয়া সেই অঞ্চলেই বেশি। ১৯১৮ সনের মেদিনীপুরের এক বিবরণ এইরূপঃ 'জেলা যেন প্রাণহীন, লোক ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, পূর্বের অনেক কর্ষিত ভূমি এখন জঙ্গলাকীর্ণ; গ্রামে দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব সমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিতেছে; রেশম ও বস্ত্রশিল্প লুপ্তপ্রায়, কাঁসারীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, সাধারণ লোকের মুখে উদাসীন নির্বিকার ভাবের ছাপ, এমনকি শিশুদের মধ্যে পর্যন্ত শিশুসুলভ চাঞ্চল্য ও কলরবের অভাব পরিলক্ষিত হয়।'

বাঁধ ও বৃক্ষচ্ছেদ, এই দুই মিলিয়া মেদিনীপুরের বহু ক্ষতি সাধন করিয়াছে। ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়াছে, লোকবৃদ্ধির উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

জ্বর, কলেরা, বসন্ত, বন্যা, ঝড় ও দুর্ভিক্ষ মেদিনীপুরের অভিশাপ। এ সকল কাটাইয়া উঠিয়া ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের উপর শতকরা ৪·৮ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯২১-৫১, এই ত্রিশ বৎসরে, বৃদ্ধি ১৯২১ সনের লোকের ২৬ শতাংশ। কাথি ও তমলুক মহকুমার মৃত্তিকা অতি উর্বর, জলনিকাশ ও জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা আছে, সুতরাং এই দুই মহকুমায় লোকবৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা বর্তমান এবং ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি হইয়াছে। উচ্চভূমিতে অবস্থিত প্রস্তরময় ঝাড়গ্রাম মহকুমা স্বাস্থ্যকর অঞ্চল। ১৯১১-২১ দশকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জন্য লোকহ্রাস ব্যতীত সেখানে সকল দশকেই লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

১৯৩১-৪১ দশকে খড়্গপুরের রেলের কর্মশালার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল।

পরিসংখ্যান বিবরণীতে দেখা যায়, বয়স্ক লোকের হার বর্ধমান অপেক্ষা কম এবং বীরভূম ও বাঁকুড়া হইতে বেশি। মনে হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অপ্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে অধিক মারাত্মক হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৬ সনের ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। বয়স্কদের বেলা ফল হইয়াছে বিপরীত; পুরুষ অপেক্ষা নারীর মৃত্যু বেশি।

মেদিনীপুর জেলায় বহিরাগতের আগমন বেশি দেখা যায়। খড়্গপুরের রেলকেন্দ্র বাহির হইতে লোক আকর্ষণ করে। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল সাড়ে তেইশ হাজার। জেলার লোক বাহিরে গিয়াছে প্রায় ৬২ হাজার, বহিরাগতের অর্ধেক। মাহিষ্যগণ সুন্দরবনের বন আবাদ করিয়া তাহা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে পটু। মেদিনীপুরের লোক শিল্পকর্মেও নিপুণ। কৃষিপ্রধান জেলাসমূহের মধ্যে মেদিনীপুরের লোকেরাই উদ্যমশীল এবং বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

হুগলি

পরিসংখ্যান বিবরণীতে হুগলি জেলার লোকের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। হুগলি ও বর্ধমানের ধারা একইরূপ, কেবলমাত্র ১৮৭২ ১৯২১, এই পঞ্চাশ বৎসরে হুগলির লোকহ্রাসের হার বর্ধমানের হারের দ্বিগুণ। ১৯২১-৫১, এই ত্রিশ বৎসরে হুগলি অপেক্ষা বর্ধমানের বৃদ্ধি অধিক। ইহা হইতে দুইটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্ধমানের জ্বরে হুগলির বেশি ক্ষতি করিয়াছিল এবং হুগলির শিল্পাঞ্চল আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসানসোলের বৃদ্ধি হইয়াছে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। ১৮৫৪ ৫৫ সনে হাওড়া-রানীগঞ্জ রেল লাইন স্থাপনের পর বহু বিস্তৃত

অঞ্চলের জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। দামোদরের বাঁধ উঁচু করাতেও [illegible] পথ বন্ধ হইল। বদ্ধ জলের অঞ্চলে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এ জন্যই পঞ্চাশ বৎসরের শেষে মাত্র ছয়টি থানায় পোলবা শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলায় লোক বৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের অতিবৃদ্ধির কারণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বাহির হইতে শিল্প শ্রমিক আনদানি। ১৮৭২-৮১ সনে জ্বরের জন্য ধনিয়াখালী তারকেশ্বর হরিপাল, সিঙ্গুর, ও চণ্ডীতলা থানায় বিপুল লোকক্ষয় হইয়াছিল। ইডেন খাল খননের ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে এবং ১৮৯১ অব্দে এইসকল থানা জ্বরের জন্য ক্ষয় পূরণ করিয়া উঠে। রেলপথ খোলায় পোলবা, ধনিয়াখালী সিঙ্গুর হরিপাল, তারকেশ্বর চণ্ডীতলা ও জঙ্গীপাড়া উপকৃত হইয়াছিল।

শিল্পাঞ্চলের বহির্ভূত স্থানের লোকের বৃদ্ধি বা হ্রাস নির্ভর করে নদীর অবস্থার উপর। জলনিকাশের পথে সামান্য বাধার সৃষ্টি হইলেই জ্বরের প্রকোপ ঘটে।

১৮৯১ ১৯০১ দশকে ভাল ফলনের জন্য কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছিল। কলকারখানায় লোকবৃদ্ধি হইতেছিল। ১৯০১ ১১ দশকেও বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯১১ ২১ দশকে ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। ১৯২১ ৩১ দশকে স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়াতে কোন কোন থানার লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল। মগরা ও পাণ্ডুয়াতে চাউলের কল বৃদ্ধির ফলে সাওতাল, বাউড়ী ও অন্যান্য খণ্ডজাতীয় লোক আসিয়া পড়ে। উত্তরপাড়ায় কয়েকটি ইটখোলা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উইলিংডন সেতু নির্মাণের পর হইতে উত্তরপাড়া কলিকাতার শহরতলিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় শিল্পাঞ্চলে বহুলোক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর হুগলীর ক্ষতি না করিলেও পরবর্তী বৎসরের মহামারী এ জেলাকেও রেহাই দেয় নাই।

এই জেলার ৫১ ১৫৩ জন উদ্বাস্তুর সংখ্যা মোট বহিরাগতের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুসারে ৫,৩০০ মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

হাওড়া

পরিসংখ্যান বিবরণীতে হাওড়ার লোকবৃদ্ধির প্রকৃতি দেখান হইয়াছে। হাওড়াই বর্ধমান বিভাগের একমাত্র জেলা যেখানে ১৮৮১ সন হইতে প্রায় সকল থানায় ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৪১ ৫১ দশকে শিবপুর, ডোমজুড় জগদ্বল্লভপুর ও বাউড়িয়ার লোকহ্রাসের কারণ তিনটি। এই চার থানার প্রত্যেকটিতেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস। ১৯৪১ সনে রেষারেষি করিয়া প্রতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৫১ সনের বৃদ্ধির হার অল্প মনে হয়। ১৯৫০ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহু মুসলমান এই সকল থানা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের লোক যেখানে বেশি সেখানে চলিয়া গিয়াছে। অপর রাজ্যের মুসলমান শিল্প-শ্রমিক দাঙ্গার পর স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও পরবর্তী মহামারীতে ডোমজুর ও জগদ্বল্লভপুর থানার বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

জেলার উন্নতিসাধনের জন্য সরকার প্রথম হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। হাওড়া ও রাজপুর পরিকল্পনার ফলে যথাক্রমে ৫০ ও ২৭০ বর্গমাইল জলাভূমি কর্ষণযোগ্য হইয়াছে। বানকুন জলনিকাশ ব্যবস্থায় ডোমজুড় থানার উত্তরাংশ উপকৃত হইয়াছে। জলাভূমি উদ্ধারের দ্বারা ডোমজুড় ও জগদ্বল্লভপুরের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। জেলার দক্ষিণের নিম্নভূমি ভাগীরথীর মোহনার জলে প্লাবিত হইয়া থাকে। জলনিকাশের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমতা পূর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এই জেলাতেই সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। ক্রমশ জেলার সকল অঞ্চলই উন্মুক্ত হইয়াছে। কারিগর, হস্তশিল্পী ও কেরানী প্রভৃতি এখানে প্রচুর। ইহারা হাওড়া ও কলিকাতায় কাজ করে। হাওড়ার শিল্প হুগলির পরে আরম্ভ হইলেও ১৯০১ সনেই এখানে বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩১ ৪১ দশকে হাওড়া সিটি, বালী, লিলুয়া, বাটরা, গোলাবাড়ী, মালীপাঁচঘরা ও বেলুড়ে কলকবজা ও ঢালাই এর কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হাওড়া আয়তনে ক্ষুদ্র। শিল্পাঞ্চলে স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অন্যান্য স্থানেও রেলওয়ে ও জলনিকাশের ব্যবস্থার জন্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মোটের উপর বিভাগের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এখানে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ কম। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তুলনায় ভাল। মোট বয়স্ক পুরুষের এক-সপ্তমাংশ বৃহৎ-শিল্পে নিযুক্ত আছে।

শিল্পাঞ্চলে যেমন হইয়া থাকে তেমনই হাওড়ায় বালক বালিকাদের হার তুলনায় কম। নারী অপেক্ষা পুরুষ অনেক বেশি। উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৬১,০৯৬। ১৯৫১ সনে উদ্বাস্তু ব্যতীত অন্যান্য বহিরাগতের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ এখনও অনিশ্চিত।

চব্বিশপরগনা

পরিসংখ্যান বিবরণীতে দেখা যায় বনগাঁ ও ডায়মন্ড হারবার ব্যতীত চব্বিশপরগনার অন্যান্য মহকুমায় ১৮৭২ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত প্রায় সমভাবে লোকবৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বনগাঁয়ে বিস্তর লোকক্ষয় ঘটিয়াছিল। সুন্দরবনে বাহিরের লোকের বসতি স্থাপনের জন্য ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের শতকরা ৮১ ২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২১ ৫১, এই ত্রিশ বৎসরে বারাকপুর ব্যতীত অপরাপর মহকুমায় সমভাবে লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে। বারাকপুর মহকুমায় এই সময়ে শতকরা ১৫৩ ১ বাড়িয়াছে। জেলার উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫ ২৭ ২৬২। সরকারী হিসাব অনুসারে ৫১ ৯৫০ জন মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে ২৩ ৮৫০ ফিরিয়া আসিয়াছে।

জেলায় বড় বড় কয়েকটি সড়ক ও রেলপথ থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম বলা যায়। বাঁধনির্মাণ ও জলনিকাশের ব্যবস্থার ফলে কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধানচাষের উপযোগী হইয়াছে। সুন্দরবনে কৃষিক্ষেত্র অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। জেলার সর্বত্র জলাভূমির জলনিকাশ করিয়া চাষের জমি বাড়ানো হইতেছে। কৃষি ও শিল্পোন্নতির জন্য জেলার লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

কলিকাতা

কলিকাতার মোট লোকসংখ্যা ২৫,৪৮,৬৭৭ , তন্মধ্যে ৪৩৩ ২২৮ জন উদ্বাস্তু। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের জন্মস্থান কলিকাতা প্রায় ১২ শতাংশের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ২৬ ৫ শতাংশের জন্মস্থান ভারতের অন্যান্য রাজ্য, তন্মধ্যে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে জন্ম প্রায় ১৭ শতাংশের ,

২৭ শতাংশের জন্ম হইয়াছিল পাকিস্তানে, ইহাদের ১৭ শতাংশ কলিকাতার উদ্বাস্তু। ইহা ছাড়া ভারতের বাহিরের লোকও আছে। নগরীর জনসমষ্টির জটিলতা উপরের হিসাব হইতে বুঝা যায়।

কলিকাতার জনসংখ্যা প্রকাশের পর ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন এই সংখ্যা নগরীর মর্যাদাহানি করিয়াছে। তাহাদের ধারণা কলিকাতার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের কম হইতে পারে না। এই ধারণার সমর্থনে প্রধানত দুইটি যুক্তি উপস্থিত করা হয়। প্রথম যুক্তি এই যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যানবাহন, রাস্তা ও পার্ক, স্কুল কলেজ এবং বাজার ও মেলা প্রভৃতি স্থানে ভিড় বহুগুণে বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় যুক্তি এই, ১৯৪১ সনে লোকসংখ্যা ছিল ২১,০৮,৮৯১, সুতরাং দশ বৎসরে বৃদ্ধি (২৫,৪৮,৬৭৭–২১,০৮,৮৯১) ৪,৩৯,৭৮৬ দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধি হইতে উদ্বাস্তু বাদ দিলে অবশিষ্ট ৬,৫৫৮ হয় দশ বৎসরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। ইহাকে বৃদ্ধি বলা চলে না। একুশ লক্ষ লোক দশ বৎসরে বাড়ে নাই এ কথা অবিশ্বাস্য। এখানে এই সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টা করা হইবে।

কলিকাতার লোক বলিতে কর্পোরেশনের এলাকার, ফোর্ট উইলিয়ম ও ময়দানের, কলিকাতা বন্দরের, নদীর ও খালের লোক বুঝায়। টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল গণনার সময় কলিকাতার বাহিরের শহরতলি মাত্র ছিল। এই সকল শহরতলি, হাওড়া, হুগলি এমন কি বর্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও বহুলোক প্রতিদিন আসিয়া কলিকাতার ভিড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। চব্বিশপরগনা ও হাওড়ার উদ্বাস্তুর মোটসংখ্যা ছয় লক্ষ। ইহাদের এক বৃহৎ অংশ যে জীবিকা-অর্জনের জন্য কলিকাতায় যাতায়াত করে তাহা নিঃসন্দেহ। গণনার নিয়ম অনুসারে কলিকাতার এই সকল দিনের বেলার অতিথিদিগকে কলিকাতায় গণনা করা হয় নাই। ইহারা নগরীর ভিড় সৃষ্টি করিলেও কলিকাতার জনসংখ্যা স্ফীত করে নাই। সুতরাং যানবাহনে ভিড়বৃদ্ধি নগরীর স্থায়ী লোকবৃদ্ধির পরিচায়ক নহে।

১৯৪১ সনের লোকসংখ্যা অভ্রান্ত ধরিয়া লইয়া দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ১৯৪১ সনের গণনা ত্রুটিপূর্ণ। প্রত্যেক দশকের জনগণনা উপলক্ষে তিনমাস অন্তর দুই দল বিভিন্ন লোক দ্বারা গণনা করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। ১৯৪১ সনের প্রথমবারের গণনায় নগরীর লোক ১৭,৩০,০৭৪ হইয়াছিল। কয়েক মাস পর অন্য দলের গণনায় লোক দাঁড়াইল ২১,০৮,৮৯১। তিন চার মাসে বৃদ্ধি হইল ৩,৭৮,৮১৭। ১৯৫১ সনের প্রথম গণনায় ২৫,৪০,৩৫৭ পাওয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয় গণনায় উহা হইয়াছে ২৫,৪৮,৬৭৭ অর্থাৎ মাত্র ৮,৩২০ বেশি। ১৯৪১ সনের প্রথম গণনা হইতে দ্বিতীয় গণনায় পৌনে চার লক্ষ লোকবৃদ্ধির যেসব হেতু সেই বৎসরের কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার একটি ছাড়া অপরগুলি বিচারসহ নহে। রাজনৈতিক কারণে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোক বেশি করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, ইহা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রকৃত সংখ্যা স্ফীত হইয়াছে। পৌনে চার লক্ষ বৃদ্ধি উহারই ফল। নানা দিক হইতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, ১৯৪১ সনে কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রথম গণনার সংখ্যা অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল।

১৯২১ সনে কলিকাতার জনসংখ্যা ১৯১১ সনের লোকের ৩·৪ শতাংশ বাড়িয়াছিল। ১৯২১ সনের লোকের ১০·৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৯৩১ সনে। ১৯৪১ সনের লোক ১৭,৩০,০৭৪ স্বীকার করিলে উহা ১৯৩১ সনের লোকের উপর ৫১ ৬ শতাংশ বাড়িয়া যায়। উহা যদি ২১,০৮,৮৯১ বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৮৪ ৯ শতাংশ। ৫১ ৬ শতাংশ বৃদ্ধিই অতিরিক্ত। ৮৪ ৯ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ম বহির্ভূত ও অবিশ্বাস্য। উদ্বাস্তু বাদে ১৯৫১ সনের লোকসংখ্যা ২১,১৫,৪৪৯। ১৯৪১ সনের সংখ্যা ১৭,৩০,০৭৪ ধরিয়া ১৯৫১ সনে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ২২ ৩ অর্থাৎ প্রায় এক চতুর্থাংশ দাঁড়ায়। উদ্বাস্তু সহ হিসাব করিলে মোট বৃদ্ধির হার ৪৭ ৩ হয়। অন্যরূপে বলা যায় যে কলিকাতায় ১৯৫১ সনে ১৯৪১ সনের প্রাথমিক গণনার প্রায় দেড় গুণ লোক গণনা করা হইয়াছে। সীমাবদ্ধ স্থানে সওয়া সতর লক্ষ লোকের উপর যদি ৮ লক্ষ বাড়ে তবে যে জনতার চাপ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুভূত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

বিষয়টি অন্য দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কলিকাতার মোট আয়তন ৩২ ৩২ বর্গমাইল। আসল নগরীর আয়তন ১৮,১৩৬ একর বা ২৮ ৩৪ বর্গমাইল। এই স্বল্পায়তন অঞ্চলে ২৫,৪৮,৬৭৭ লোকের বাস কম কথা নয়। বাসস্থানের ঘনতা দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলে ৮৯,৯৩২। রাস্তা ও পতিত স্থান বাদে হিসাব করিলে একরপ্রতি লোক হয় ৩৫০। লোক যদি ৪০ লক্ষ হইত ২৮ ৩৪ বর্গমাইলের ঘনতা মাইলপ্রতি ১,৪১,১৪৩ অথবা প্রতি একরে ৬৫০ দাড়াইত। বৃহত্তর বোম্বাইর ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৩,৪৬৩ ও প্রতি একরে ২১ জন। দিল্লীর ঐ হার যথাক্রমে ৩০,১৩৯ ও ৪৭ জন। ১৯৫০ সনে কলিকাতায় পাকা বাড়ি ৭৮,০০৫ এবং বস্তিঘর (huts) ৪,৩০৮ ছিল। প্রতি মিউনিসিপ্যাল ভবনের গড় লোক ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ (প্রাথমিক সংখ্যা) ও ১৯৫১ সনে যথাক্রমে ২০ ৬, ১৬ ৮ ২২·৬ ও ৩১·০। কিন্তু নগরীর লোক ৪০ লক্ষ হইলে প্রতি ভবনে বাসিন্দার গড় দাঁড়াইত ৪৮·৬৪। ইহা এক অসম্ভব বড় সংখ্যা। ১৯৫০ সনে কলিকাতার বাসকক্ষের সংখ্যা ৭,১০,৫৭৯ গণনা করা হইয়াছিল। প্রতি কক্ষে গড়ে ৩ ৬ জন লোক বাস করিত। লোক যদি ৪০ লক্ষ হইত প্রতি কক্ষে গড়ে ৫ ৬ জনের বাস না করিয়া উপায় ছিল না। কলিকাতার বস্তির ও পাকাবাড়ির অধিকাংশ ঘরের আয়তন যেরূপ ক্ষুদ্র তাহাতে প্রায় ৬ জন করিয়া লোক প্রতি কক্ষে বাস করা অসম্ভব।

১৯৫১ সনের গণনার অব্যবহিত পরে কলিকাতার চালু রেশন কার্ডের সংখ্যা ২৮,৭৯,৬৩৮ ছিল। ভুয়া রেশন কার্ডের সংখ্যা চালু কার্ডের এক দশমাংশ বলিয়া রেশন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন। এই দশমাংশ বাদে প্রকৃত কার্ডের সংখ্যা ২৫,৯১ ৬৭৫ হয়। ইহা জনগণনার সংখ্যা হইতে মাত্র ৪৩ হাজার বেশি, কিন্তু ৪০ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষ কম। লোক ৪০ হইলে এই ১৪ লক্ষ লোকের খাবার ব্যবস্থা কিরূপে হয়?

কলিকাতার জলসরবরাহের যে অবস্থা বর্তমান আছে লোক ৪০ লক্ষ হইলে অধিকাংশ লোক পানীয় জল অথবা অবিশুদ্ধ জল পাইত না এবং ময়লানিকাশের ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িত।

বহিরাগত লোকের দ্বারা কলিকাতা স্ফীত হইয়াছে। জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য ইহারই ফল। অন্য জেলায় (০-১৫ বৎসর বয়সের) বালকবালিকার হার মোট জনসংখ্যার ৩৫ হইতে ৩৭; কলিকাতায় উহা মাত্র ২৩। মোট পুরুষের সংখ্যার সহিত তুলনায় (০-১৫ বৎসর বয়সের) বালকদের হার মাত্র শতকরা ১৯। নারীদের মধ্যে বালিকার হার অপেক্ষাকৃত অধিক।

নদিয়া

পরিসংখ্যান বিবরণীতে নদিয়া জেলার গণপ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭২ হইতে ১৯২১, এই পঞ্চাশ বৎসরের লোক হ্রাস বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ থানা ব্যতীত অপর প্রত্যেক থানাতেই লোক হ্রাস ঘটিয়াছিল। ১৯৩১ সন পর্যন্ত এই ক্ষয় অব্যাহত ছিল। ভুয়া লোকের গণনা, অন্য জেলা ও রাজ্য হইতে লোকের আগমন এবং কয়েকটি ছোট সেচ-পরিকল্পনার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি, ১৯৪১ সনে লোকবৃদ্ধির হেতু। ১৯৫১ সনের বৃদ্ধি যে উদ্বাস্তু আগমনের জন্য হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তেহাট্টা ও করিমপুর থানা অস্বাস্থ্যকর এবং বহু মুসলমান এখান হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, এইজন্য এই দুই থানার লোক কম দেখা যায়। সরকারী হিসাব অনুসারে প্রায় সওয়া দুই লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, উহাদের সওয়া লক্ষ ফিরিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন জেলায় এত অধিক মুসলমান স্থান পরিত্যাগ করে নাই। ১৯০১ হইতে ১৯৫১ র মধ্যে জেলার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ, রানাঘাট, চাকদহ ও শান্তিপুরে বহিরাগত ও উদ্বাস্তুর আগমনই লোকবৃদ্ধির কারণ। এই সকল বহিরাগত বাদ দিলে দেখা যাইবে প্রতি দশকেই লোকের হ্রাস ঘটিয়াছিল। স্বাস্থ্য ও কৃষির অবস্থাই লোকক্ষয়ের মূল কারণ। ১৮৬০ ও ১৮৭২ সনের মধ্যে বর্ধমানের জ্বর নদিয়া জেলাকে ছারখার করিয়া দেয়। ১৮৬৭ সনের বিবরণে দেখা যায় যে জ্বরে পানীয় জলের অভাবে এবং জঙ্গল বৃদ্ধির জন্য গ্রামের লোকেরা ভিটামাটি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জনৈক পাদ্রি অভিযোগ করিয়াছেন যে সরকারের অবহেলায় এবং আত্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জন্য নদিয়া জেলার সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে।

উটবন্দী নামে এক প্রকার জমি বিলির ব্যবস্থা কৃষকের দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা বৃদ্ধি করে। মালিকের মৌখিক অনুমতি পাইয়া কৃষক জমি চাষ করে। শস্য জন্মিবার পর জমির খাজনা নির্ধারিত করা হয়। উদবন্দী খাজনা সাধারণ জমার দ্বিগুণ হইয়া থাকে। ভূমিতে কৃষকের কোন স্বত্ব নাই।

জ্বর জঙ্গল কলেরা অজন্মা প্রভৃতি ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সন পর্যন্ত লোকবৃদ্ধির প্রতিকূলতা করিয়াছে।

ললিতাকুরি বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে বৎসর ভাগীরথীর জল কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালী থানা প্লাবিত করিয়া দিয়াছে সেই বৎসরই সেখানে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে। যে যে বৎসর প্লাবনে ঐ অঞ্চলের আবর্জনা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, সেই বৎসরই লোকক্ষয় হইয়াছে।

১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত অতি প্রতিকূল অবস্থা চলিয়াছে। শুধু যে জ্বরের প্রকোপই ছিল তাহা নহে, সাত বৎসর কলেরার ব্যাপক আক্রমণও ঘটিয়াছে।

১৯০৭ সনে প্রতি হাজারে ৭ জন এবং অন্যান্য বৎসরে ৪ জন কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদুপরি ১৯০৮ সনে দুর্ভিক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯০৫ সনে জেলার মোট বারিপাত বার্ষিক গড় অপেক্ষা অধিক হইলেও সর্বত্র সমভাবে বর্ষণ হয় নাই, পরবর্তী বৎসরে বর্ষণ কম ও অসমান ছিল। ১৯০৭ সনের ভাদ্র ও আশ্বিনে বৃষ্টি একেবারেই হয় নাই। ইহার ফলে ১৯০৮ সনে যে দুর্গতি দেখা দিয়াছিল তাহা জেলার উত্তর পূর্বাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৮ ১৯ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের জীবননাশ ঘটে। ১৯২১-৩১ দশকে কৃষ্ণনগরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। তদবধি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে। তীর্থস্থান বলিয়া নবদ্বীপে লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ মায়াপুর গ্রামে এক বড় বসতি স্থাপিত হইল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও একান্ন সনের মহামারী বহু লোকক্ষয় করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের পরে উভয় বঙ্গের মধ্যে বিপুলসংখ্যক লোকবিনিময় হইয়াছে বলা চলে। শেষ দশকে নদিয়ার বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু ব্যতীত অপর বহিরাগতের সংখ্যা ৩৭৫৫৫, ইহা ১৯৪১ সনের বহিরাগতের সাড়ে তিন গুণ।

নদিয়ার তথ্যাদির আলোচনার পর এই কথাই মনে সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যায় যে, ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট জনগণের হাতে পড়িয়া শস্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল এবং উৎপাদন হ্রাসের অনিবার্য ফল দুঃখ ও দুর্ভিক্ষ এড়াইবার জন্য বহু কৃষিজীবী অন্য জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ

১৮৭২ সন হইতে ১৯২১, এই পঞ্চাশ বৎসরে মুর্শিদাবাদের বৃদ্ধি ১৮৭২ সনের লোকের মাত্র ০ ৮ শতাংশ। ১৯০১ ১৯৫১ এই পঞ্চাশ বৎসরে বৃদ্ধির হার ২৯ ৭। ১৯২১ ৫১, ত্রিশ বৎসরে ১৯২১ সনের লোকের ৪০ ২ শতাংশ বাড়িয়াছে।

গঙ্গা ও ভাগীরথীর পশ্চিমের অংশ স্বাস্থ্যকর এবং উহার পূর্বদিকের অংশ অস্বাস্থ্যকর। দ্বারকা মোর প্রভৃতি সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ে উৎপন্ন ভাগীরথীর উপনদী উত্তমরূপে পশ্চিম ভাগের জলনিকাশ করিয়া থাকে। গোবরানালা, ভৈরব শিয়ালমারী ও জলঙ্গীর সৃষ্ট জলা ও ভিজামাটি পূর্বভাগের অস্বাস্থ্যের কারণ। জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের কালান্তর বিল বহুবিস্তৃত জলাভূমি। ইহার মৃত্তিকা আর্দ্র ও উর্বর। গোবরানালা, ভৈরব ও শিয়ালমারী বৎসরের অধিকাংশ সময় জঞ্জাল ও জলজ উদ্ভিদে প্রায় বন্ধ থাকে। প্রবল বর্ষার সময় উহাতে ধীরমন্থর প্রবাহের সৃষ্টি হয়। গোবরনালা এক সময়ে ভাগীরথীর জলধারা জলঙ্গী পর্যন্ত বহনের পথ ছিল। এই পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ জলপথটি পূর্বভাগের জলনিকাশের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে জিয়াগঞ্জ হইতে ভগবানগোলা পর্যন্ত ললিতাকুরী বাঁধ নির্মাণের দ্বারা প্রকৃতির কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গোবরানালাকে ভাগীরথী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। ভাগীরথীর জল আর উহাতে প্রবেশ করে না, গোবরানালা এখন বাঁধের দক্ষিণাঞ্চলের নিষ্কাশিত ময়লা জলের আধার হইয়াছে। ইহার দক্ষিণাংশ ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

১৯০৬-০৭ সনে ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর টাউন, হরিহরপাড়া, ডোমকল ও জলঙ্গী সর্বাধিক ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত থানা এবং কান্দী মহকুমা, ফরাক্কা, সমসেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানা সর্বাপেক্ষা কম ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ললিতাকুরী বাঁধ ভাঙিয়া জেলার ভিতরে অবাধে ভাগীরথীর জলপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিবার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। জলপ্লাবন বন্ধের জন্যই যে মুর্শিদাবাদ জেলা অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।

নদিয়ার ন্যায় এখানেও উদ্‌বন্দী বা ফসলী জমা প্রথা প্রচলিত। কিষাণী প্রথায় সাঁওতালদিগকে নগদ টাকায় মজুব দিয়া জমির চাষবাস করানো হইয়া থাকে। ফসল কাটিবার সময় তাহাদিগকে শস্যের এক অংশ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বর্গা প্রথাও আছে।

১৮৭২-১৯২১. এই পঞ্চাশ বৎসরে জেলার বৃদ্ধি ভাল হয় নাই। উপরে লিখিত স্বাস্থ্যকর থানায় সাধারণত লোক বাড়িয়াছে এবং অন্যত্র হ্রাস পাইয়াছিল।

১৯০১-৫১, এই পঞ্চাশ বৎসরে ভালোমন্দ দুইই ঘটিয়াছে। ১৯০৫ সনের কলেরায় ৮,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯০৭ সনে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছিল। তিনটি রেলপথ নির্মাণের জন্য মজুরদেব চাহিদা বাড়িয়াছিল। রেলপথ খোলার পর শ্রমিকেরা ক্রমশ চলিয়া গেল। ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য ১৯১১-২১ দশকে বহু লোকক্ষয় ঘটিয়াছিল। ১৯২১-৩১ দশকের বৃদ্ধি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ক্ষয় পূরণের জন্য প্রকৃতির চেষ্টার ফল। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া ডোমকল ও জলঙ্গী থানার লোক বাড়িয়াছিল। রেলপথ নির্মাণ ও ইটখোলার কাজের জন্য বাহিব হইতে আগত শ্রমিকগণ বেলডাঙ্গার লোকবৃদ্ধি করিয়াছিল। ১৯৩১-৪১ দশকে স্বাস্থ্যেব উন্নতি হইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও পর বৎসরের মহামারীতে মুর্শিদাবাদ জেলায় ক্ষতি হয় নাই।

এই জেলার উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫৮,৭২৯ এবং অন্যান্য বহিরাগতেব সংখ্যা ১৯,৫০৮। গঙ্গার জল বিতবণকারী নদীসমূহের পথরোধেব ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নামিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে উদ্ভূত সর্বপ্রকারের অসুবিধা নদিয়ার ন্যায় মুর্শিদাবাদেও বিদ্যমান। এজন্যই মুর্শিদাবাদ হইতে বহুসংখ্যক লোক জীবিকাব সন্ধানে, রাজমিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজে, আসানসোল মহকুমায় গিয়া থাকে।

মালদহ

পবিসংখ্যান বিববণীতে মালদহের লোকবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১-২১ দশক ব্যতীত অন্যান্য দশকে জেলার লোক ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ সনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মড়ক ও ব্যাপক ম্যালেরিয়া ১৯১১-২১ দশকের লোকক্ষয়ের হেতু। ১৮৭২-৮১ দশকে কয়েকটি থানায় লোকহ্রাসের কারণ ম্যালেরিয়া। কিন্তু পরবর্তী দশকে অনেক লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল। সাঁওতালেরা বারিন্দের উন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করিলে গাজল ও পুরাতন মালদহ থানায় অনেক লোকবৃদ্ধি হয়। মুর্শিদাবাদ হইতে শেরশাবাদিয়া মুসলমানগণ আসিয়া কালিয়াচক, মানিকচক ও রতুয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। কয়েক বৎসর কলেরার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। ১৯০০ সনে ইংরেজবাজারে কলেরা বহু ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। ১৯০৯ সনে স্থাপিত কাটিহার গোদাগাড়ী রেলপথ জেলার আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। প্রতি স্টেশনে বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষিপণ্যের জন্য নানাস্থান হইতে ক্রেতার সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের দর হাঁকাহাঁকিতে উৎপাদক লাভবান হয়। মালদহের আমের ক্রেতা এখন বহু-দূরবর্তী বাজারেও আছে সুতরাং দর বেশি পাওয়া যায়। রেলপথ জেলার বিরলবসতি অঞ্চলে বহিরাগতের আগমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। বহিরাগতদের মধ্যে সাঁওতালেরা বারিন্দের অনাবাদী ভূমি কর্ষণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেরশাবাদিয়া মুসলমানগণ দিয়াড়ার নবগঠিত পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলে চাষবাস করিয়া থাকে। বিহার হইতে লোক আসিয়া হরিশ্চন্দ্রপুর, রাতুয়া ও মানিকচকে বসতি স্থাপন করিয়াছে। ১৯২১-৩১ সনে রেশমশিল্পের অবনতির জন্য কালিয়াচক থানায় বৃদ্ধির হার অল্প। লাক্ষার উৎপাদন হ্রাসের জন্য রাতুয়া ও মানিকচক থানায় যে লোক হ্রাস হইয়াছিল তাহা গঙ্গার নূতন চরে মুর্শিদাবাদের লোক আগমনের জন্য ধরা পড়ে নাই। বারিন্দের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাবনতির জন্য সাঁওতালদের আগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর অপেক্ষা তাহার পরবর্তী মহামারীতে মালদহ জেলার অধিক ক্ষতি হইয়াছিল।

মালদহের উদ্বাস্তুর সংখ্যা ষাট হাজার। পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ভারতেব অন্য রাজ্য হইতে আগত লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৯৫১ সনে ২২,৩০৯ হইয়াছে। বহিরাগতের সংখ্যা হ্রাস এবং জেলা পরিত্যাগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রমাণিত হয় যে মালদহের ভূমির লোকধারণ ক্ষমতা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় পনর হাজার মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল এবং তন্মধ্যে চার হাজার ফিরিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিম দিনাজপুর

এই জেলার জনপ্রগতির পরিচয় পরিসংখ্যান বিবরণীতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসরে (১৮৭২-১৯২১) জেলাব লোক ১৮৭২ সনের লোকের শতকরা ২১·৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শেষ ত্রিশ বৎসরে (১৯২১-৫১) বৃদ্ধির হাব ৪৬·৯। ১৯০১-৫১, এই পঞ্চাশ বৎসরে ১৯০১ সনের লোকের উপর শতকরা ৫৭·৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর দরুন ১৯১১-২১ দশকে লোকের হ্রাস হইয়াছিল। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ ও ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ, এই দুই থানার লোকহ্রাস হইয়াছিল। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৫১ সন মধ্যে ১,১৫,৫১০ জন উদ্বাস্তুর আগমনে জেলার লোকবৃদ্ধির হার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম দিনাজপুর অস্বাস্থ্যকর জেলা ; অধিবাসিগণ কর্মবিমুখ। ১৯১৮-১৯ সনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এখানে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। খণ্ডজাতীয় লোকদের মধ্যে বেশি মৃত্যু ঘটিয়াছে। সাঁওতাল, শেরশাবাদিয়া মুসলমান এবং অন্যান্য বহিরাগতদের দ্বারা ১৯২১-৩১ সনে কয়েকটি থানার লোক বেশি বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯৩১-৪১ দশকে ধানচালের কেন্দ্ররূপে হিলি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও পরবর্তী মহামারীতে পশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সরকারী হিসাব অনুসারে চৌদ্দ হাজার মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়াছিল কিন্তু তাহাদের বার হাজার ফিরিয়া আসিয়াছে। উদ্বাস্তুর সংখ্যায় পশ্চিম দিনাজপুরের স্থান চব্বিশপরগনা, কলিকাতা ও নদিয়ার নীচেই। উদ্বাস্তু বাদে বহিরাগতের সংখ্যা ৩২,৭৪১। পূর্ববর্তী তিন দশক অপেক্ষা এই সংখ্যা অধিক। নূতন জেলায় নানাবিধ গঠনমূলক কার্যের জন্য বহিরাগতের আগমন এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

জলপাইগুড়ি

পরিসংখ্যান বিবরণীতে জলপাইগুড়ি জেলার লোকবৃদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ১৮৭২ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে এই জেলাব লোক ১৮৭২ সনের লোকেব শতকরা ২৪৪·২ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোন কোন থানার বৃদ্ধি এই হারকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কালচিনি, আলিপুর

দুয়ার ও কুমারগাঁও থানার বৃদ্ধি শতকরা ১,০৪২·৩ আজগবি ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। মধ্যবর্তী থানাসমূহের বৃদ্ধি শতকরা ৩০০ হইতে ৭০০। ১৯০১-৫১, এই পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধির হার ঐরূপ বিস্ময়কর না হইলেও, মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়। এই সময়ে কালচিনি থানায় শতকরা ২৯৮·৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র জেলার বৃদ্ধির হার ৬৭·৮ শতাংশ। ১৯২১ সন হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরে বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা একের সামান্য বেশি। ইহাতে বুঝা যায় যে, চা-বাগানে, বনাঞ্চলে ও কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক আমদানিতে ভাটা পড়িয়াছে। গত আশি বৎসরে জেলার জনগণের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন নয়। বহিরাগতদের মাতৃভাষার বৈচিত্র্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

জলপাইগুড়ি জেলা দুইটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত, তিস্তার পশ্চিমের অংশ রেগুলেশন অঞ্চল এবং উহার পূর্বের অংশের নাম পশ্চিম ডুয়ার্স। প্রথম অঞ্চলে বহুকাল পূর্ব হইতেই লোক বাস করিতেছিল এবং ঘনত্বও কম নয়। পূর্বাঞ্চল ছিল জনবিরল। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম চা-বাগান স্থাপিত হয়। ১৯০১ সনে চা-বাগানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৩৫ এবং ৭৬,৪০৩ একর ভূমিতে চা গাছ রোপিত হইয়াছিল। অন্য কৃষির জন্য অল্প খাজনায় ভূমি পত্তন করাতে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটিল। বাহিরের লোক আসিয়া শ্রমিকের অভাব পূরণ করিতে লাগিল। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের কর্মশালায় এক সহস্র শ্রমিক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জেলায় জ্বর বরাবরই ছিল। ১৯০১-১১ দশকে মধ্যভাগের থানাসমূহে লোকে ভর্তি হইয়া গেল। আলিপুর দুয়ার থানার সর্বত্র কৃষির বিস্তার ঘটিল। মৃত্তিকার উর্বরতা ও নিম্নহারের খাজনার জন্য এই থানায় বাহির হইতে বহু লোক আসিতেছিল। চা-বাগান ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যতীত অবশিষ্ট স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইল। ১৯২১-৩১ দশকে সদর, কুমারগ্রাম, মাদারিহাট ও কালচিনি থানায় নূতন চা-বাগান স্থাপিত হইয়াছিল। এই দশকে জনস্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। রেলপথ স্থাপনের জন্য আলিপুর দুয়ারে, ১৯৩১-৪১ দশকে বহিরাগতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। যুদ্ধোপলক্ষে ১৯৪২ সনে আলিপুর দুয়ারের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে এবং আসামের সহিত সংযোগস্থাপনের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। চা-বাগানের সংখ্যা ১৯০১ সনের ২৩৫ হইতে ১৯৫১ সনে ১৫৮-তে দাঁড়াইয়াছে। পরিচালনার সুবিধার জন্য একাধিক বাগান এক কোম্পানির তত্ত্বাবধানে আনয়নের ফলে বাগানের সংখ্যা কম দেখা যায়। বাগানের মোট আয়তন ও উৎপাদন বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সনের পর হইতে বাগানের রোপিত অংশের পরিমাণ সামান্যই বাড়িয়াছে। চা-বাগানে কর্মের সংস্থান বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা অল্প।

জেলার উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সরকারী হিসাবমতে পঞ্চাশ হাজার মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ফিরিয়া আসিয়াছে।

দার্জিলিঙ

জলপাইগুড়ির ন্যায় দার্জিলিঙের লোকের হ্রাসবৃদ্ধি বহুল-পরিমাণে চা-বাগানের উন্নতি ও অবনতির সহিত জড়িত। পরিসংখ্যান বিবরণীতে এই জেলার গণপ্রগতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে প্রথম চা-বাগান ১৮৫৬ সনে স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সনে বাগানের সংখ্যা ছিল ১৭৭। উহা ১৯৫১ সনে দাঁড়াইয়াছে ১৩৮। বাগানের সংযোগ সাধন করিয়া সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯৩১ সন হইতে জমির পরিমাণ প্রায় সমান আছে। কিন্তু ১৯৫১ সনেই উৎপাদন সর্বাধিক।

১৮৭২ সনের দার্জিলিঙের গণনা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। ১৮৯১ সনের গণনা সন্তোষজনক হইয়াছিল। ১৯০১-১১ দশকে বৃদ্ধির হারের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৭২-১৯২১, এই সময়ে বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। কিন্তু ১৯০১-৫১, এই পঞ্চাশ বৎসরে চা-বাগানের প্রসার কম ঘটিয়াছে, সুতরাং লোকবৃদ্ধির হারও কম। ১৯২১ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত বৃদ্ধি মন্দ হয় নাই। ১৯১১-২১ দশকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় বিস্তর লোকক্ষয় ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় চা, কৃষি, চাকরি প্রভৃতি প্রতিক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯৫০ সনের এক ধসে ১০২ জনের প্রাণহানি ঘটে।

জেলার উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৫,৭৩৮।

কোচবিহার

দেশীয় রাজ্য থাকা অবস্থাতেই ১৮৭২ সনে জনগণনা হইয়াছিল। পরিসংখ্যান বিবরণীতে আশি বৎসরের লোকের হ্রাসবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮১ সালে ১৮৭২ সন অপেক্ষা লোক অনেক বাড়িয়াছিল দেখা যায়। গণনার উৎকর্ষতা এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর কোচবিহারের মধ্যযুগীয় রূপ পরিবর্তন করিয়া উহাকে আধুনিক নব কলেবর প্রদান করেন। সদরের প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও স্কুল, হাসপাতাল, ধর্মশালা উভয় পার্শ্বে বৃক্ষসমন্বিত সুন্দর সরল রাস্তা, মহকুমা সদরের বিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি তাঁহারই কীর্তির পরিচায়ক। অনাবাদী জমি বিনা খাজনায় পত্তনের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার চেষ্টায় জয়ন্তী পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়। এই সকল উন্নতি, আধুনিক শাসনব্যবস্থা, সহজলভ্য ভূমি প্রভৃতির আকর্ষণে-বাহির হইতে বহু লোক কোচবিহারে আসিয়া বাস করিতে থাকে। অন্য জেলার বহিরাগতের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক ; কিন্তু কোচবিহারের আগতদের এক বৃহৎ অংশ মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী। কোচবিহারের লোকবৃদ্ধির মূল কারণ মহারাজার সুশাসন, বাঙালীর কোচবিহারে বাসে উৎসাহদান এবং ভূমির উর্বরতা। জ্বরের প্রকোপ ছিল বটে কিন্তু তদানীন্তন বাঙলার অনেক জেলা হইতে কম। অন্যত্র যেমন হয় তেমনই মধ্যে মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিত। লোকের হ্রাসবৃদ্ধিতে উহা প্রতিফলিত দেখা যায়। ১৯২৮-২৯ সনে কলেরা ও বসন্তে চার হাজারের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তাহার অনুগামী মহামারী কোচবিহারের বিশেষ ক্ষতি করে নাই।

১৯৫১ সনের মোট ১,৪৫,৯১৬ জন বহিরাগতের মধ্যে ৯৯,৯১৭ জন উদ্বাস্তু। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৩১,৪৮৪ জন মুসলমান পাকিস্তানে গিয়াছিল কিন্তু তন্মধ্যে ১৭,০২৬ জন প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) ১৮৭২ সনে বাঙলার প্রথম জনগণনা হয় ; তৎপূর্বে ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত পন্থায় বাঙলার আঞ্চলিক বা সামগ্রিক লোকসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা কয়েকবার করা হইয়াছিল; কিন্তু বিভিন্ন গণনার ফলের বিরাট বৈষম্য উহাদের সত্যতায় সন্দেহের উদ্রেক করে।

(২) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙলার মোট এক-তৃতীয়াংশ বা এক কোটির অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কৃষিজীবীদের অর্ধাংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়।। মন্বন্তরের ঠিক একশত বৎসর পরেও (১৮৭০) প্রতি জেলায় অকর্ষিত ভূমির প্রাচুর্য দেখা গিয়াছে। কিন্তু আশি বৎসর পরে (১৯৫০) লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি ব্যতীত পতিত জমি নাই বলা যাইতে পারে।

(৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জনবিন্যাসে সমতা ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গের ঘনতায় বিস্তর অসাম্য বিদ্যমান।

(৪) একশত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের প্রথম পত্তন হয়। রেলপথের বাঁধে জলনিকাশের স্বাভাবিক পথগুলি বন্ধ হইয়া যায়। উহার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই রাজ্যের অভিশাপ বদ্ধ জলের জ্বর ম্যালেরিয়া তাহার সংহার মূর্তিতে প্রথম বর্ধমানে দেখা যায়। ইহার পর ক্রমশ রেলপথের বিস্তার ও নদীর প্লাবন নিরোধের জন্য বাঁধ-বৃদ্ধির ফলে বদ্ধ জলের অঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটে। বর্ধমান বিভাগ ও ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চলে ম্যালেরিয়া স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া বসে।

(৫) ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট ক্ষীণশক্তি জনগণ কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

(৬) দৈহিক দুর্বলতা, অল্পে সন্তুষ্টি, কর্ষিত ভূমিতে চাষীর স্বত্বের অভাব এবং গলাটেপা খাজনার জন্য নিরুৎসাহ, ভূমির অনুর্বরতা জলাভাব এবং বৃষ্টির উপর নির্ভরশীলতা পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন হ্রাস ও তজ্জনিত খাদ্যাভাবের কারণ। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও বহু উদ্বাস্তু এবং বহিরাগতের অন্ন যোগাড়ের ভার এই রাজ্যের উপর পড়িয়াছে। ইহার ফলে দুর্মূল্যতা, খাদ্যাভাব অথবা দুর্ভিক্ষ এখানে প্রায় নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।

(৭) ব্যাধি ও আর্থিক দৈন্য এ রাজ্যের স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়।

(৮) বহিরাগতের আগমনে বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে।

(৯) ১৯২১ সন পশ্চিমবঙ্গের গণপ্রগতির ধারার বিভাজিকা। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসর কাল হ্রাসবৃদ্ধির কোন নিয়ম ছিল না। সমাজজীবনে সংঘটিত প্রত্যেক সাময়িক ঘটনা জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভাবিত করিত। ১৯২১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরে লোক দ্রুত ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(১০) শেষ ত্রিশ বৎসরে লোকবৃদ্ধির কারণঃ রেলপথ বিস্তারের ফলে দূরধিগম্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা হেতু সংক্রামক ব্যাধি ও খাদ্যাভাব নিরোধে গভর্নমেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি : কৃষিপণ্যের বাজারে প্রসারতায় কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আর্থিক উন্নতি ; ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের দ্রুত স্থানান্তরে গমন ও নূতন ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের সুবিধা ; জাতের ও জাতিগত বৃত্তির বন্ধন অতিক্রম করিয়া যে কোন বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা ; এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের শ্রমের মর্যাদাবোধ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

গমনাগমন

জীবনসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ও যানবাহনের উন্নতির ফলে সভ্য দেশের জনগণের একাংশ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে গমনাগমন এখন একটি সাধারণ ব্যাপারমাত্র। একই রাজ্যের অধিবাসীদিগকেও জেলা পরিবর্তন করিতে দেখা যায়। এই গমনাগমন সাধারণত আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে। স্বদেশে বা স্বরাজ্যে যাহাদের জীবিকা অর্জনের সুবিধার অভাব প্রধানত তাহারাই অর্থোপার্জনের নূতন ক্ষেত্র খুঁজিয়া নেয়। একই রাজ্যের কৃষিপ্রধান জেলা হইতে শিল্পপ্রধান জেলায় এবং পুরাতন ঘনবসতি কৃষি-অঞ্চল হইতে নূতন জনবিরল অনাবাদী অঞ্চলে গমন উদ্যমশীলের জীবনরক্ষার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু নহে। সামাজিক কারণে দূরাঞ্চলে গমনের দৃষ্টান্ত বিরল। বরকনের আদানপ্রদান সাধারণত পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। বিদ্যার্থীর পক্ষে এখন পৃথিবীর কোন প্রান্তই অগম্য বা অতিদূর নহে। বহু বিদ্যান্বেষী স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নের জন্য শহর ও নগরে যাইয়া বাস করে। নগরীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং উন্নত জীবনযাত্রা ব্যবস্থার আকর্ষণে বহু বিদ্বান, গুণবান ও বিত্তবান লোকের সমাগমে কলিকাতা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

কোন দেশে বা রাজ্যে অবস্থানের সময়, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিভেদে আগন্তুকদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ রাজ্যের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় স্বল্প কালের জন্য আত্মীয়ের বাসভবনে যাতায়াত; ব্যবসায়, কায়িক শ্রম প্রভৃতির সাময়িক প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন; শস্যসংগ্রহের সময় অথবা চটকল ও চা-বাগানের কর্মাভাবের সময় মরসুমী গমনাগমন; পরিবার বাড়িতে রাখিয়া অর্থোপার্জনের জন্য ভিন্ন স্থানে বাস এবং অবসরকালে স্বগৃহে গমন, এইরূপ অর্ধ-প্রবাসী, জন্মস্থানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভিন্ন জেলায়, রাজ্যে অথবা দেশে চিরকালের জন্য আগমন। জনগণনায় প্রথম শ্রেণীর সাময়িক অতিথিদিগকে বাদ দেওয়াই সাধারণ নিয়ম ছিল। কিন্তু পূর্বে গণনা করা হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি গণনার শেষ দিন উপস্থিত থাকিলে তাহাকে গণনায় ধরা হইয়াছে। ব্যবসায়, মেলা, তীর্থভ্রমণ অথবা সাময়িক অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে আগতদের বেলাও ঐ নিয়ম প্রয়োগ করা হইত। গণনাকালে মরসুমী গমনাগমনের ফলে কোন অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি এবং কোথাও বা সেই পরিমাণ লোকের হ্রাস ঘটিয়াছে। অর্ধ-প্রবাসী ও স্থায়ী বহিরাগতদের সংখ্যা, পূর্ব ও বর্তমান অবস্থান এবং জীবিকার উপায় প্রভৃতি এই অনুচ্ছেদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। রাজ্যের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় গমনকারীদের মধ্যেও অর্ধ-প্রবাসী এবং স্থায়ী বাসিন্দা রহিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ গমনাগমন

গঙ্গার দক্ষিণ ও হুগলি নদীর পূর্বে অবস্থিত রাজ্যের মধ্যাঞ্চল আভ্যন্তরীণ গমনাগমনের চক্রনাভি। এই অঞ্চলেই বর্ধমান বিভাগ ও গঙ্গার উত্তরের পাঁচটি জেলা হইতে সর্বাধিক লোকের আগমন হয়। বর্ধমান বিভাগ এবং গঙ্গার উত্তরের জেলা কয়টির মধ্যে লোকের গমনাগমন অতি অল্প। প্রধানত হুগলি নদীর পূর্ব ও পশ্চিমের অংশের মধ্যেই লোকের আদানপ্রদান সীমাবদ্ধ। গঙ্গার দক্ষিণস্থ প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে গঙ্গার উত্তরাঞ্চলে যত লোক যায় তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বিবাহের পর বর্ধমান বিভাগের

অনেক ক'নে এই বিভাগের মধ্যেই পিতার জেলা হইতে পতির জেলায় চলিয়া যায়। চব্বিশপরগনার মেয়েরা মেদিনীপুর, হাওড়া, কলিকাতা ও নদিয়ার বরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ক'নে মেদিনীপুর, হাওডা ও নদিয়ায় যায়। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ক'নের যাতায়াত ঘটে। মুর্শিদাবাদের ক'নে বর্ধমানে আসিয়া থাকে। বর্ধমান ও নদিয়ার মধ্যে মেয়ের আদানপ্রদান হয়। মালদহের মেয়ে মুর্শিদাবাদে আসে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে ক'নে বদল ঘটে। কোচবিহারের মেয়ে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে যায়।

বর্ধমান বিভাগের প্রত্যেক জেলার লোক জন্মস্থানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় বাস করিয়া থাকে। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর ব্যতীত প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্যান্য জেলার অর্ধ-প্রবাসী লোক কলিকাতায় দেখা যায়। মেদিনীপুরের অধিবাসীদের শিল্প ও কৃষি উভয় কর্মেই দক্ষতা আছে। রাজ্যে অন্য কোন জেলা অপেক্ষা এই জেলার লোক অধিকপরিমাণে হুগলির তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলে অর্থোপার্জনের জন্য আগমন করে। ১৯১১ সনের পর হইতে শিল্পাঞ্চলে মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। মেদিনীপুরের লোক কেবলমাত্র হুগলি ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলেই গমন করে না, গ্রামাঞ্চলেও বসতি স্থাপন করে। অতিরিক্ত সংখ্যা হ্রাস হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ঐ দুই জেলায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। চব্বিশপরগনার দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের দিকে বহিরাগতের প্রবাহ এখনও অব্যাহত আছে। কলিকাতা এখনও ক্রমবর্ধমান বহিরাগতের কর্মের সংস্থান করিয়া দেয়। বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে হাওড়া, চব্বিশপরগনা ও কলিকাতার লোক বাস করিয়া থাকে। নারী ও পুরুষের হারের সমতা দেখিয়া অনুমিত হয় আসানসোল অঞ্চলে এই আগমন স্থায়ী। মুর্শিদাবাদ হইতে হাওড়া, চব্বিশপরগনা, হুগলি ও মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুর হইতে মালদহে এবং জলপাইগুড়ি হইতে চব্বিশপরগনায় লোক আকৃষ্ট হয়।

জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাহারা স্থায়িভাবে অন্য জেলায় বসবাস করে তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে। সুন্দরবনে, মালদহের দিয়াড়া অঞ্চলে, ও বারিন্দেই প্রধানত এইরূপ লোক দেখা যায়।

বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশপরগনা ও কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের মধ্যে বহু লোকের গমনাগমন ঘটে। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাইয়া উহারা বসবাস করিতে থাকে। বর্ধমান ব্যতীত অপর চার জেলার মধ্যে লোকের আদানপ্রদান বিস্তর হ্রাস পাইয়াছে। নিজ বাড়ি হইতে কর্মস্থলে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য লোকের এখন বাড়ি পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কম।

তথ্যাদি আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের লোক তাহাদের গমনশীলতা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে অপেক্ষা এখন যে তাহারা কম সঞ্চরণশীল ইহাতে সন্দেহ নাই। লোকবৃদ্ধি ও যাতায়াতের সুবিধাবৃদ্ধি মানুষকে ভিটাছাড়া করে। এই দুই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের লোকের ঘরের কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রবণতা কেন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, হুগলি নদীর উভয় পার্শ্বের কয়েকটি অতি উর্বর থানা ব্যতীত অন্যান্য কৃষি-অঞ্চল প্রতি বর্গমাইলে ৫০০র অধিক ঘনতা প্রতিরোধ করিয়া থাকে। ঘনতার এই সীমারেখা অতিক্রান্ত হইবামাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা লোকাপসরণের দ্বারা জেলার সমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ ও কোচবিহারের ঘনতার সর্বোচ্চ সীমা ছয় শতের অনেক নীচে। ঘনতা চরমে পৌঁছিবার পূর্বে পর্যন্ত লোকচলাচল বেশি ছিল। ১৯১১ সনে উহা শেষ সীমায় পৌঁছিবার পর জনগণ যেন আড়ষ্ট ও গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক কারণ ব্যতীত রাজ্যে জেলাসমূহের মধ্যে গমনাগমন ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। ফসল কাটা প্রভৃতি সাময়িক প্রয়োজনে কৃষি-শ্রমিকের আমদানি ব্যতীত কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অর্থোপার্জনের আশায় লোকের আগমন প্রায় বন্ধ। বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগনার শিল্পাঞ্চলের দিকেই এখন লোকের ঝোঁক দেখা যায়। কৃষির অতিজনতার জন্য ছোট মালিক চাষী ও ভাগচাষী কৃষি-শ্রমিকের দলে ভিড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপে প্রতি জেলাতেই বাড়তি শ্রমিকের এক দল গড়িয়া উঠে। উহারাই বীজবপন, নিড়ান ও ফসল-কাটার সময় শ্রমিকের চাহিদা মিটায়; বাহির হইতে শ্রমিক আমদানির প্রয়োজন আর থাকে না। অনাবাদী পতিত জমি দিন দিন সংকুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যমশীল কৃষিজীবীর স্থানান্তরে গমনের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। এখন স্বীয় অঞ্চলের ভূমিখন্ড আঁকড়াইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর্থিক চাপ ও ভূমির উপর অতিজনতার চাপ যে অঞ্চলে চরমে উঠিয়াছে সেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যে ভূমির উপর চাপের হ্রাস ঘটানো হইয়াছে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। সমাজ যেন এক ঘণ্টাকৃতি কাঁচ পাত্রের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। বহির্গমন নিম্নতম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। স্থানাভাবে এই রাজ্যের অধিবাসীদের নড়াচড়া বন্ধ হইলেও পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে বেশ কিছু আগন্তুক প্রতি বৎসর এখানে প্রবেশ করিতেছে। উর্বর শস্যক্ষেত্রের আকর্ষণে তাহারা আসে না। অকৃষি উপজীবিকার নব নব ক্ষেত্রের আহ্বান তাহাদের কানে পৌঁছিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্রের লোকধারণের ক্ষমতা নিঃশেষিতপ্রায়। অকৃষি জীবিকার ক্ষেত্রের দ্বার এখনও উন্মুক্ত। কিন্তু বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগনাতেই সকল জেলার জনপ্রবাহ মিলিত হইয়াছে। কর্মের সন্ধানে এইসকল জেলাতেই শ্রমশিল্পী ঘোরাঘুরি করিতেছে। হুগলি ও হাওড়া অভিমুখী ধারার ক্ষীণতায় অনুমিত হয়, তথাকার চাহিদা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। একমাত্র বর্ধমান জেলায় এখনও শ্রমশিল্পীর কর্মের সংস্থান হইতে পারে। ১৯৫১ সনের জনগণনায় দেখা যায় যে, মেদিনীপুরের শ্রমিক হুগলি ও হাওড়া অপেক্ষা বর্ধমানে বেশি গিয়াছে। চা বাগান ও খড়্গপুরে অকৃষি উপজীবিকার ক্ষেত্র ও বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ। শিল্পাঞ্চলে উদ্বাস্তু ও অন্য রাজ্যের বহিরাগতগণ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার ফলে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য জেলায় গমন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। যে জেলায় যাহার জন্ম সমস্ত শক্তি সেই জেলাতেই নিয়োজিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় আগন্তুক

গণনার সংখ্যা প্রমাণ করে যে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, পাকিস্তান, নেপাল ও পৃথিবীর বহু দেশের লোকের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র; সত্যকার বাসভূমি নহে। উপার্জনক্ষম বয়সে, ১৫-৫৫, ইহাদের অধিকাংশের পশ্চিমবঙ্গে আগমন; বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থোপার্জন করিয়া ইহারা উদ্বৃত্ত অর্থ স্বদেশে বা স্বরাজ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে। বহিরাগতদের অর্থ পশ্চিমবঙ্গে ব্যয়িত হয় না, তাহাদের সঞ্চয় এ রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে না। স্পঞ্জের ন্যায় রাজ্যের সম্পদ শোষণ ইহাদের কাজ। আগমনের ক্রমবর্ধমান হার

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গমনাগমন, ১৯৫১

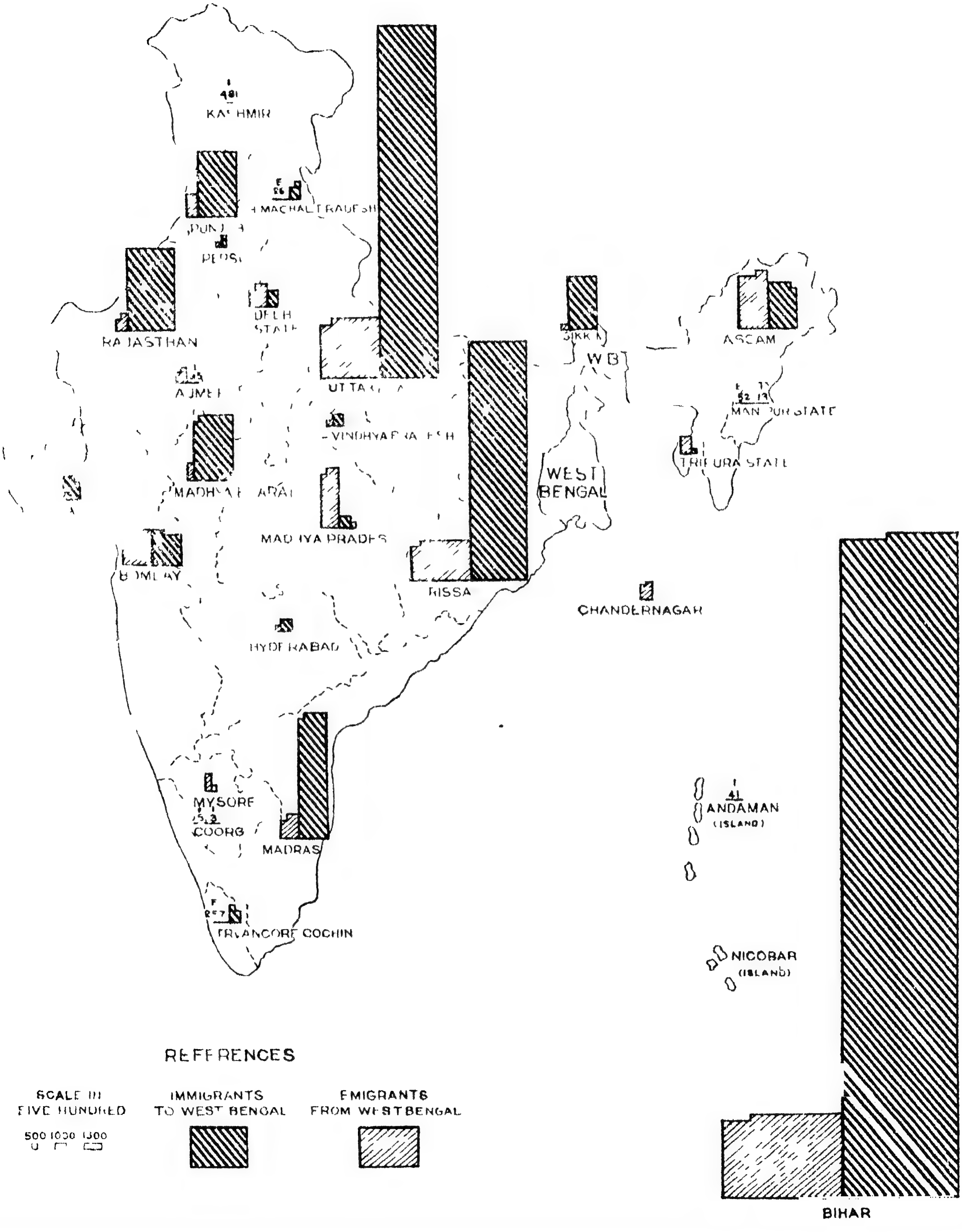

491
KASHMIR
PUNJAB
HIMACHAL PRADESH
PEPSU
RAJASTHAN
DELHI STATE
UTTAR PRADESH
AJMER
VINDHYA PRADESH
MADHYA BHARAT
MADHYA PRADESH
BOMBAY
HYDERABAD
ORISSA
SIKKIM
W.B.
WEST BENGAL
ASSAM
MANIPUR STATE
TRIPURA STATE
CHANDERNAGAR
MYSORE
COORG
MADRAS
TRAVANCORE COCHIN
41
ANDAMAN (ISLAND)
NICOBAR (ISLAND)
BIHAR
REFFRENCES
SCALE IN FIVE HUNDRED
500 1000 1500
IMMIGRANTS TO WEST BENGAL
EMIGRANTS FROM WEST BENGAL

হইতে বুঝা যায় বহিরাগতদের অর্থোপার্জনের উপায় এখানে এখনও বিদ্যমান, অথচ এই পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর অন্ন জোটা ভার।

ভারতীয় আগন্তুকদের মোট সংখ্যা ১৯৫১ সনে আঠার লক্ষ একাশি হাজার ছিল। ১৯২১ সনে উহা ছিল তের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার। ত্রিশ বৎসরে ভারতীয় বহিরাগতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসরে গড়ে সওয়া আঠার হাজার বা মাসে দেড় হাজার অবাঙালী ভারতীয় এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে কলিকাতায় ভারতীয় বহিরাগত দ্বিগুণের অধিক বর্ধিত হইয়া পৌনে সাত লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। প্রতিমাসে গড়পড়তায় এক হাজার অবাঙালী ভারতীয় জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছিল। আগতদের শতকরা ৬৬ জন কলিকাতাকেই তাহাদের উপার্জনের ক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়াছে। বর্ধমানের নূতন শিল্পাঞ্চল আসানসোলে উহাদের সংখ্যা ১৯২১ সনের সংখ্যার আড়াই গুণে উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট জন সংখ্যার ৬ ৩ শতাংশ ভারতের অন্য রাজ্যের লোক। প্রতি ১৬ জন লোকের একজন অবাঙালী ভারতীয়। কলিকাতার নাগরিকদের শতকরা সাড়ে ছাব্বিশ জন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত। মহানগরীর প্রতি চার জনের এক জনেরও বেশি ভারতীয় আগন্তুক।

জন্মস্থান অনুসারে এই সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে। যেসকল বাঙালীর জন্মস্থান বাঙলার বাহিরে তাহারাও বহিরাগতের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ বাঙালীর সংখ্যা এত নগণ্য যে উহা থাকা না থাকায় এই বিরাট অঙ্কের অনুভবযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে না। যেসকল অবাঙালী ভারতীয়ের জন্ম পশ্চিম বঙ্গে তাহারা এ হিসাবে ধরা পড়ে নাই। ভাষার হিসাব দ্বারা তাহাদের একটা মোটামুটি আন্দাজ করা যাইতে পারে মাত্র। এই রাজ্যে হিন্দীভাষী লোকের সংখ্যা ১৫৭৭৭৮৬ উড়িয়াভাষী ১৮২২৭১ তেলুগুভাষী ৫০ হাজারের কাছাকাছি পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী বলে প্রায় ৩৮ হাজার। ভাষার হিসাবে মোট অবাঙালী ভারতীয়ের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ। ভাষা ও জন্মস্থানের সংখ্যার অন্তর পশ্চিমবঙ্গে যাহাদের জন্ম এরূপ অবাঙালী ভারতীয়ের সংখ্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় আগন্তুকদের মধ্যে বিহারীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। জন্মস্থান বিহার এরূপ লোকের মোট সংখ্যা ১১ লক্ষ ৯ হাজার। পরিসংখ্যান বিবরণীতে বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগতদের সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বহিরাগতগণ কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া রাজ্যের খাদ্যোৎপাদনে সাহায্য করে না। শিল্প বাণিজ্য খনি, চা বাগান যান্ত্রিক যান বাহন পরিচালন প্রভৃতি অকৃষি কর্মক্ষেত্র হইতে ইহারা অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে আগত মজুর মুচি গোয়ালা, গাড়োয়ান মাঝি পাচক কনস্টেবল দারওয়ান পিওন প্রভৃতির প্রবাহ এখনও অব্যাহত রহিয়াছে মন্দার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আগন্তুকদের বৃত্তি ইহাদিগকে শিল্পাঞ্চল খনি অঞ্চল, চা-বাগান এবং বড় বড় শহর ও নগরে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখে। বহিরাগতদের বৃহৎ অংশই পৌরাঞ্চল আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পৌরাঞ্চলের সুখসুবিধার এক পঞ্চমাংশের অধিক ইহাদের ভোগে আসে। এজন্যই রাজ্যের স্বাভাবিক জনগণ অপেক্ষা বহিরাগতদের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর। আগন্তুকগণের শতকরা ৭১ ৪ জন নগরে ও শহরে এবং অবশিষ্ট গ্রামাঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। পুরুষের শতকরা ৭৪ ৮ এবং নারীদের শতকরা ৬৩ ৫ নগর ও শহরের অধিবাসী। পক্ষান্তরে স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা মাত্র ২১ জন পৌরাঞ্চলে বাস করে। বীরভূম, বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের পুরাতন পলি অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান হুগলি ও নদিয়ার ন্যায় মধ্যাঞ্চলের জেলাতেও তাহাদিগকে দেখা যায়। বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা তফসিলী খণ্ডজাতীয় লোকে পূর্ণ। ইহারা কোন এক সময়ে সাঁওতাল পরগনা হইতে আসিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ মুর্শিদাবাদেও বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সাঁওতাল মুণ্ডা মালপাহাড়ী প্রভৃতির জনস্রোত রাজমহলে গঙ্গা পার হইয়া উত্তর বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ ও মেদিনীপুরের উত্তর পশ্চিমাংশের ভূমি মানভূম ও সিংহভূমের অনুরূপ এখানে তথাকার কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়। এজন্য ঐ অঞ্চলের কৃষিজীবী বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে আকৃষ্ট হইয়াছে। মেদিনীপুরের সমস্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমা দাঁতন কেশিয়ারী ও নারায়ণগড় থানায় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর হইতে কৃষিজীবীগণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। বর্ধমান জেলার জামালপুর রায়না খণ্ডঘোষ থানা এবং হুগলি জেলার বলাগড় পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি থানায় খণ্ডজাতীয় রায়ত অপেক্ষা ভাগচাষীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী নবগ্রাম ও খাড়গ্রাম থানায় মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের বারিন্দে বহু খণ্ডজাতীয় রায়ত ও ভাগচাষী আছে। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা সুতী সমশেরগঞ্জ মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর খড়বা রাতুয়া ও মাণিকচক থানায় এবং পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদের পলি অঞ্চলে রায়ত ও ভাগচাষীদের বেশ কিছু অংশ বিহারের লোক। বিহার হইতে আগত খণ্ডজাতীয় এবং অখণ্ডজাতীয়দের সর্ববৃহৎ অংশ জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি মহকুমায় দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী খাসমহলে বসতি স্থাপন দ্বারা উহা কর্ষণাধীনে আনয়নের আবশ্যকতা অনুভব করিবার পর বাঙালী কৃষকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকার সময়াভাবে বহু অবাঙালী রায়ত আকৃষ্ট করিয়া উহাদের নিকট ভূমি পত্তন করা হইয়াছিল। চা বাগানের সস্তা শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করাও বহিরাগত আনয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নেপাল ও ভূটান হইতে আগত রায়ত দ্বারাই দার্জিলিঙ জেলা প্রায় পরিপূর্ণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতিজনতার চাপে যাহারা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে তাহারা স্বল্পসম্ভাবনাপূর্ণ জমি স্পর্শও করে না অধিকতর লাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করা তাহারা পছন্দ করিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে বহিরাগতদের বিরলতার হেতু দুইটি প্রথমত কৃষি অপেক্ষা সুনিশ্চিত ও অধিকতর লাভজনক অকৃষি বৃত্তির প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ দ্বিতীয়ত স্থানীয় রায়তদের ভূমি হস্তান্তরে অনিচ্ছা। কিন্তু অতিজনতার ভীষণ চাপ কৃষিক্ষেত্রে আগন্তুকের প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়া থাকে ইহাই মূল কারণ। ইহার সর্বাধিক শোচনীয় পরিণাম এই যে রাজ্যের বাণিজ্যিক শস্য অথবা খাদ্যশস্য উৎপাদনে বহিরাগতদের দান অতি নগণ্য। বহিরাগতদের রায়তি স্বত্ব অপেক্ষাকৃত কম প্রতি অঞ্চলেই জীবিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

ভূমির মালিক ও খাজনাভোগীর হার (৩ ২) অপর তিন শ্রেণীর কৃষিজীবীর হার অপেক্ষা অধিক। শিল্পাঞ্চলেই ধনবান বহিরাগতদের অধিক সমাবেশ ঘটে। তাহারা ঋণ রেহান অথবা সরাসরি ক্রয় দ্বারা ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া থাকে। শিল্পাঞ্চলে সর্বপ্রকারের জমি অতিশয় মূল্যবান। জমির ব্যবসায় অন্য ব্যবসায় অপেক্ষা কম লাভজনক নহে। অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্ররূপে

জমি নিরাপদ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে। বহু মূল্যবান ভূমির মালিকানা স্বত্ব বহিরাগতদের হস্তগত হইয়া যাইতেছে। বাঁকুড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি কৃষি অঞ্চলেও জমির মালিকানা স্বত্ব মহাজনদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। সঞ্জা, খুৎ-খামার, উদ্‌বন্দী, ফসলী জমা বা হাল-হাসিলা প্রথায় জমি পত্তন করিয়া মালিকগণ দরিদ্র চাষীর শ্রমার্জিত অর্থে লাভবান হইয়া থাকে। এইরূপ মালিকের একাংশ বহিরাগত। বহিরাগতগণ সাধারণত অনগ্রসর অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা ইহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি বেশি। অর্থোপার্জন ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া, ইহারা অধিকতর সঞ্চয়ী। অজ্ঞ লোকদের সহিত কারবারে শীঘ্রই ইহাদের আর্থিক উন্নতি ঘটে। ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে দুস্থ ক্রেতাদিগকে ধার দেওয়া চলিতে থাকে, ক্রমে দোকানের বাকি এবং ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়া কৃষকের কাঁধে যে বোঝা চাপে তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় তাহার থাকে না। প্রথম কয়েক বৎসর উৎপন্ন শস্যের এক বৃহৎ অংশ সুদ বাবদে আদায় করিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট শস্যে কৃষকের সংসার চলিতে পারে না। পুনরায় ঋণের জন্য তাহাকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। এইরূপে ঋণজালে জড়িত অনন্যোপায় চাষী তাহার জমির স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া ভূমিহীন হইয়া পড়ে এবং ভূমিহীন দোকানী-মহাজন হয় ভূম্যধিকারী। তখন সঞ্জা প্রভৃতি প্রথায় জমির পূর্ব মালিকের নিকট উহা পত্তন করা হয়। চাষী যে জমি অতি সামান্য খাজনার পরিবর্তে ভোগ করিত এখন সে সেই জমির চাষীশ্রমিকে পরিণত হইয়া গেল। কৃষকের পক্ষে কৃষি অলাভজনক হইলেও অকৃষিজীবী ভূম্যধিকারীর ইহাতে প্রচুর লাভ হয়। মহাজনী আইনের ফলে লগ্নি কারবারে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ভাগচাষী দ্বারা জমি চাষের লাভই বেশি। এজন্যই গ্রামাঞ্চলের মহাজন ও ব্যবসায়ীদের লুব্ধদৃষ্টি চাষীর জমির দিকে নিবদ্ধ থাকে। তাহার বিপদ হয় মহাজনের সুবর্ণ সুযোগ। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় কয়েকজন হিন্দুস্থানী জমিদার আছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে অবাঙালী জমিদারের সংখ্যা আরও বেশি। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে বেশ কিছুসংখ্যক রাজস্থানী জমিদার ও মালদহে বিহারী জমিদার আছে।

চা-বাগানের জেলা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের জমিদারির এক-পঞ্চমাংশের মালিক অবাঙালী। দার্জিলিঙে অনেক রাজস্থানী ভূম্যধিকারী আছে। বহিরাগতগণ জলপাইগুড়ির বড় বড় জমিদারির মালিক।

বহিরাগতগণ অকৃষিবৃত্তিই তাহাদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করে। অকৃষি উপজীবিকার মোট লোকের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ বহিরাগত। শিল্প ও চা-বাগান অঞ্চলে যত লোক অকৃষি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে তাহাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতীয় বহিরাগত। ঐ অঞ্চলে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় এগার জন পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আগত। পক্ষান্তরে কৃষি-অঞ্চলে ঐ হার মাত্র ০ ৬। শিল্পাঞ্চলের শহর ও নগরের অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশ অন্য রাজ্যের লোক। বাগানের জেলায় ঐ হার শতকরা ১৭। কৃষি অঞ্চলের শহরে বহিরাগতদের হার শতকরা ৯·০।

কৃষিপণ্য উৎপাদনে বহিরাগতদের সাহায্য সামান্য হইলেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে তাহাদের দান অপরিসীম। ইহাদের সাহায্যেই পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার চাকা ঘুরিতেছে। বহিরাগতগণই পূর্বাঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্যের অধিকাংশ এই রাজ্যে রাখিয়াছে। রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে বীজবপন ও শস্যসংগ্রহের কার্যে ইহারা আংশিক সাহায্য করিয়া থাকে। উৎপাদনশিল্পে নিযুক্ত লোকের এক পঞ্চমাংশের অধিক, ব্যবসায়ীর এক-ষষ্ঠাংশ এবং পরিবহন বৃত্তিতে নিযুক্তদের এক-তৃতীয়াংশ বহিরাগত। আজ যদি আগন্তুকেরা পশ্চিমবঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তবে উহাদের শূন্য স্থান পূরণের কি ব্যবস্থা হইবে তাহা ভাবাও কঠিন।

ব্যবসায়ী বহিরাগতদের অধিকাংশ রাজপুতানা ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে আগত। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত হইতে আগতদের চা-বাগানে কর্মের সংস্থান হয়। কলিকাতায় ব্যবসায়ে লিপ্ত জনগণের ২৬·৮ শতাংশ হিন্দুস্থানী। কলিকাতার বাহিরের ব্যবসায়েও ইহারা এক বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, হিন্দুস্থানীদের তুলনায় উড়িয়াদের স্থায়ী কাজের সংস্থান হয় কম। তাহারা অনেকে সাধারণ শ্রমিকের কাজ করে। কারখানা, জনস্বাস্থ্য, প্লাম্বিং ও বিদ্যুতের কাজ তাহাদের একচেটিয়া বলা যায়। অধিকাংশ বিহারীই কারখানার দক্ষ শ্রমিক। উত্তরপ্রদেশে শিল্পোন্নতির পর হইতে সেই রাজ্যের শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং বিহারের লোক বাড়িতেছে। অতিজনতার চাপে বিহারের কৃষিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত জনগণের প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। মাদ্রাজ হইতে আগতদের চটকলের কোন কোন কাজ এবং রেলওয়ে ও নৌ কারখানায় বিশেষ বিশেষ কাজে একাধিকার। ইহারা ক্রমশ বড় অফিসের ম্যানেজার, কেরানী, হিসাব রক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে অধিকসংখ্যায় নিযুক্ত হইতেছে।

মোট বহিরাগতদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বিহারের পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, মুঙ্গের, সারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের বলিয়া, গাজীপুর, বানারস, আজমগড় ও জৌনপুর, এবং উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর ও পুরী হইতে কলকারখানায় আসিয়া থাকে। নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলার লোক বেশি দেখা যায়।

বহিরাগতদের মধ্যে নারী ও পুরুষের বৈষম্য বিস্তর। পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণের প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯২০ জন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, হইতে আগত লোকদের প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৪২৬। অন্যান্য রাজ্য হইতে আগতদের মধ্যে নারীর হার কিছু বেশি, হাজারে ৪৫২। নারী ও পুরুষের বৈষম্য হইতে বুঝা যায় যে, বহিরাগতগণ স্থায়িভাবে বাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা স্বরাজ্যে রাখিয়া অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ইহাদের আগমন। পরিবারের সহিত মিলিত হইবার জন্য ইহারা ছুটিতে স্বগৃহে গমন করিয়া থাকে। বহিরাগতগণ বাল্যকাল ও বার্ধক্য স্বীয় রাজ্যে যাপন করে। বিহারে নারী ও পুরুষের হার প্রায় সমান। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিহারীদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নারী। তিন লক্ষাধিক বিহারী এখানে অপারিবারিক জীবনযাপন করিয়া থাকে। উড়িষ্যায় নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি। এই রাজ্যে উড়িয়া নারীর সংখ্যা উড়িয়া পুরুষের এক-তৃতীয়াংশের কম। দূরত্বের জন্য যেসকল রাজ্যে যাতায়াত ব্যয়সাধ্য সেই সকল অঞ্চলের আগতদের মধ্যে নারীর হার অপেক্ষাকৃত অধিক।

নারীপুরুষের বৈষম্য সমাজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বহিরাগতদের অধিকাংশ পৌরাঞ্চলবাসী। এই বৈষম্যও সেখানেই অধিক। সুতরাং নৈতিক কলুষও পৌরাঞ্চলে বেশি। এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার কুফল কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন কর্মীদের কাজে মন বসে না। তাহারা স্থির হইয়া কাজ করিতে অসমর্থ। ঘরের আহ্বানে কাজ ছাড়িয়া সময় সময় তাহারা স্বগৃহে চলিয়া যায়।

বহিরাগত কৃষিজীবীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের হার বিভিন্ন শ্রেণীর স্থায়িত্বের সুন্দর পরিচয় প্রদান করে। জমি ছাড়িয়া দূরে যাওয়া মালিকচাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাহারা এখানে সপরিবারে বাস করিয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে নারী ও পুরুষের হার সমান। ভাগচাষীর চাষের জমিতে কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকে। সে জমি পাইবে কিনা তাহা মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীতে নারীর হার সামান্য কম। কৃষি-শ্রমিক কেবলমাত্র বপন ও শস্যসংগ্রহের সময় এই রাজ্যে আসিয়া থাকে। নারী সঙ্গে না আনিবারই কথা। এই শ্রেণীতে নারীর হার অতি অল্প।

বহিরাগতদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য তাহাদের বয়স। রাজ্যের জনসমষ্টির ৫৭ ৪ শতাংশের বয়স ১৫ ৫৪ বৎসরের মধ্যে। কিন্তু ভারতীয় আগন্তুকদের শতকরা ৭৯ জন ১৫ হইতে ৫৪ বৎসর বয়স্ক লোক। গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭৫ জন ও পৌরাঞ্চলে শতকরা ৮৫ জন আগন্তুকের বয়স ১৫ হইতে ৫৪। কলিকাতায় বড়বাজারে ঐ বয়সের লোক শতকরা ৯৭ জন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে উপার্জনক্ষম বয়সে ইহারা পশ্চিমবঙ্গে আগমন করে এবং বৃদ্ধকালে নিজ রাজ্যে চলিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণ অপেক্ষা বহিরাগতদের মধ্যে কর্মক্ষম লোকের হার বেশি।

অভারতীয় আগন্তুক

অভারতীয় আগন্তুকদের মধ্যে পাকিস্তানী, নেপালী, চীনা ও বৃটিশের সংখ্যা সর্বাধিক। পাকিস্তান হইতে আগতদের তিন শ্রেণী : উদ্বাস্তু, অনুদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিক ও পাকিস্তানী নাগরিক। এই রাজ্যে গণনা করা হইয়াছে অথচ জন্ম পাকিস্তানে এরূপ লোকের সংখ্যা ২৬,১৮,৯৩৮। ইহাদের মধ্যে উদ্বাস্তু ২০,৯৯,০৭১। অনুদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিক ২,৫২,৭৫৭ ; অবশিষ্ট ২,৬৭,১১০ জন পাকিস্তানী নাগরিক। দেশবিভাগের পূর্ব হইতে পাকিস্তানের অন্তর্গত জেলাসমূহের যেসকল লোক এ রাজ্যে বাস করিতেছিল তাহাদিগকেই এখানে অনুদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিক বলা হইয়াছে। পাকিস্তানী নাগরিকদের অনেকে চটকল ও বাণিজ্যপোতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৫০ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এবং তাহার পরে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের পরনির্ভরশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চটকলে অদক্ষ শ্রমিকের অভাব পাকিস্তানীগণ আংশিক পূরণ করিয়া থাকে। বই বাঁধা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য ও ব্যবসায়ে পাকিস্তানী নাগরিকগণ লিপ্ত আছে। অনুদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিকদের একাংশ, নেপালী ও সিকিমী ব্যতীত অভারতীয় অন্য কোন বহিরাগত এই রাজ্যে কৃষিকর্ম গ্রহণ করে নাই বলা যাইতে পারে। উদ্বাস্তুগণের জীবিকার অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। মধ্য ও উত্তরের কৃষি-অঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে উদ্বাস্তু কৃষিজীবীর সংখ্যা কিছু বেশি ; ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীর সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। শহর ও পল্লীর সর্বত্র খুচরা দোকানীর ভিড়। নূতন স্থানে স্থায়িরূপে বসিবার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। এই অবস্থায় ছোট ছোট ব্যবসায়ীর বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি। বাজার দরের ওঠানামার আবর্তে পড়িয়া সর্বস্ব খোয়ানো অসম্ভব নহে। তাহা হইলে আবার ছন্নছাড়ার মত পথে দাঁড়াইতে হইবে।

মোট উদ্বাস্তুর এক চতুর্থাংশ কৃষিজীবী। ইহাদের পৌনে দুই লক্ষ মালিক-চাষী, দুই লক্ষাধিক বর্গাদার, এক লক্ষ তের হাজার কৃষি-শ্রমিক ও সাড়ে নয় হাজার জমির খাজনার উপর নির্ভরশীল। এই কৃষিবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে তাহাদের পাকিস্তানের ভূ-সম্পত্তির আয় ধরিয়া বৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকিবে। প্রায় ৫ লক্ষ লোকের কৃষিক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া জীবিকা অর্জনের উপযোগী ভূমির পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে অভাব। পনর লক্ষাধিক উদ্বাস্তু অকৃষি বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রায় অর্ধাংশ শিল্প ও ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া আছে। অবশিষ্ট সাড়ে সাত লক্ষ বিবিধ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-অর্জনে অভ্যস্ত। ইহাদের এক বৃহৎ অংশ অফিস ইত্যাদিতে চাকরি, শিক্ষকতা, ডাক্তারি ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহারা অর্থ উৎপাদন করে না, উৎপন্ন অর্থের অংশ গ্রহণ করে মাত্র। ইহাতে উদ্বাস্তু সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতীয় বহিরাগতদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক অতি অল্প।

মাতৃভাষা নেপালী এরূপ লোকের সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। ইহাদের মধ্যে এক লক্ষের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ। নেপালে জন্ম হইলেও ৫৮,৬৮৩ জন পশ্চিমবঙ্গকেই তাহাদের নূতন আবাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকের মধ্যে নেপালীর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে দেড় লক্ষের অধিক। নেপালের নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে ১৪,৬১৭ জন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির প্রতি ১২ জন লোকের একজন উদ্বাস্তু ; প্রতি ১৬ জনের একজন ভারতীয় বহিরাগত এবং প্রতি ৬ জনের একজন পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের লোক। বহিরাগতের সংখ্যা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায়,- ভারতীয় বহিরাগত প্রায় ২০ লক্ষ, উদ্বাস্তু প্রায় ২১ লক্ষ ; অভারতীয় নাগরিক ৩ লক্ষ।

পরিসংখ্যান বিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে লোক-গমনাগমনের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণের এক জেলা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জেলায় বসতি স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে।

(২) কৃষিক্ষেত্রের লোকধারণের ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। কৃষিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত জনগণ কর্মের সন্ধানে অন্য কৃষি-অঞ্চলে না গিয়া শিল্পাঞ্চলে গমন করিতেছে।

(৩) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কর্মীদের বাড়ি হইতে কর্মস্থলে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। নিজ জেলা পরিত্যাগ না করিবার ইহা অন্যতম কারণ।

(৪) ভারতীয় বহিরাগতগণের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী অধিবাসী। এই রাজ্য তাহাদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র। তাহাদের অর্জিত অর্থে তাহাদের নিজ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, পশ্চিমবঙ্গ লাভবান হয় না।

(৫) ভারতীয় বহিরাগতদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অর্ধেকেরও কম। আগন্তুকগণ ১৫-৫৪ বৎসর বয়সে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করে। তাহারা গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা পৌরাঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় বাস করিয়া থাকে। কৃষি অপেক্ষা অকৃষি বৃত্তিই তাহাদের অধিকতর প্রিয়।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য প্রধানত বহিরাগতদের সৃষ্টি এবং তাহারাই উহা চালু রাখিতেছে।

(৭) ভারতীয় ও অন্যান্য বহিরাগতগণ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা ধন উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ অর্থে পশ্চিমবঙ্গও আংশিক লাভবান হয়। উদ্বাস্তুগণ কৃষি-ক্ষেত্রে বা শিল্পে ধন-উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করে না। চাকরি প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিতে তাহারা অপরের সৃষ্ট অর্থের অংশ গ্রহণ করে মাত্র।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

জন্ম, মৃত্যু ও মৃতাবশেষ

লোকসংখ্যা, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, জনগণনার প্রধান আলোচ্য বিষয়। জন্ম, মৃত্যু, জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি বা অবনতি, আর্থিক অবস্থা, জীবনের মান, নাগরিক বা পল্লীজীবন যাপন প্রভৃতি লোকের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভাবিত করিয়া থাকে। কেবলমাত্র জন্মের হার বৃদ্ধিতেই লোকবৃদ্ধি ঘটে না। মৃত্যুর হার যদি বেশি হয় তবে জন্ম বেশি হইলেও লোকের বৃদ্ধি বেশি নাও হইতে পারে। আবার জন্মের হার না বাড়িয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে লোক দীর্ঘায়ু হইলে মোট লোকসংখ্যা বাড়িয়া যায়। জীবনের মান উন্নত হইলে ঐ মান রক্ষার জন্য সন্তানের সংখ্যা সীমায়িত করিবার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা, কর্মব্যস্ততা ও জীবনের উচ্চ মান বড় বড় শহরে জন্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। জন্মের হার পল্লীতেই অপেক্ষাকৃত অধিক। বহিরাগতদের আগমন যে লোকবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ তাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। এখানে কেবলমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর হারের বিষয় আলোচিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্মমৃত্যুর হিসাব বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। উহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে। জন্মমৃত্যুর হিসাব লিখাইবার দায়িত্ব সন্তানের জনকের উপর নহে, বেতনের নামে সামান্য বৃত্তিভোগী অজ্ঞ ও নিরক্ষর চৌকিদারের উপর ন্যস্ত। মৃত্যুর সম্বন্ধেও একই কথা। জনসংখ্যার তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসার ফলে লিপিবদ্ধ জন্মমৃত্যুর সংখ্যা, জনগণনায় প্রাপ্ত বয়স ও লোকের হিসাবাদি হইতে গণিতের জটিল নিয়মের সাহায্যে জন্মমৃত্যুর হার নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা নির্ভুল বলিয়া তাঁহারা দাবি করেন না। তবে এই হার সত্য হইতে বেশি দূরেও নহে। ১৯১১ সনে একল্যান্ডের মতে বাঙলার জনসমষ্টির প্রতি হাজারে জন্মের হার ৪৬ ৭। ১৯২১ সনে জনগণনার অধিকর্তা টমসন ঐ হার ৪৩ ৫ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। পোর্টারের মতে ১৯২১-৩০ দশকে জন্মের গড় হার ৪১ ৯৫ এবং মৃত্যুর হার ৩৪·৯৪ ছিল। বিভিন্ন দিক হইতে প্রশ্নটি সমাধানের চেষ্টার পর ১৯৪১-৫০ দশকেও যে পশ্চিমবঙ্গের জন্মের গড় হার ৪১ বা ৪২ এর কাছাকাছি ছিল তাহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসুর হিসাব হইতে প্রাপ্ত চারি বারের ফল ৪২ হইতে ৪৭ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং এ রাজ্যের জন্মের হার চল্লিশের কম নহে বলা যায়। এইরূপ হারকে জন্মের 'ক্রুড' বা অসংশোধিত হার বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 'ক্রুড' জন্মের হারের সহিত তুলনায় দেখা যায়, বাঙলার জন্মের হার অত্যন্ত অধিক। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের হার ৫৫ ছিল। ইহা জনসংখ্যার প্রতি হাজারের হার নহে, ১৬ হইতে ৪৪ বৎসর বয়স্কা নারীর হাজারের হার। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে ঐ হার অনেক কমিয়া যাইত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রদেশে ১৮৬৬-৭০ সালের মধ্যে জন্মের হার ছিল ৪৮ ৯। আধুনিককালে, ১৯৪৩-৪৫ সনের মধ্যে, প্যালেস্টাইনের আরবদের 'ক্রুড' জন্মের হার ৫৩·৪ ছিল। সেই সময়ে ঐ দেশেরই ইহুদিদের জন্মের হার ছিল ২৯·৮। ভারতের উত্তরপ্রদেশের জন্মের হার বাঙলার হারের প্রায় সমান। লিপিবদ্ধ জন্মের হার সাধারণত ৪৫-এর উপর প্রায়ই দেখা যায় না।

জন্মের 'ক্রুড' হার ও পরিশোধিত হারের মধ্যে প্রভেদের কারণ বয়স, নারীর সংখ্যা ও বিবাহ। যদিও বাঙলাদেশে ১৬ বৎসরের কম বয়সের মা আছে, তথাপি উহা সাধারণ নিয়ম নহে, নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৬ হইতে ৪৪ বৎসরের মধ্যে সাধারণত নারী সন্তানের জননী হয়। তন্মধ্যে ১৬ হইতে ২৫ বৎসর মধ্যেই মাতৃত্ব শক্তি সর্বাধিক থাকে। সকল দেশে বা সমাজে সন্তানের জননী হইবার যোগ্য বয়সের নারীর হার সমান নহে। সুতরাং 'ক্রুড' হার সমান হইলেও প্রকৃত জন্মের হার অসমান হইতে পারে। উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা যদি বাঙলায় ১৬-৪৪ বৎসর বয়সের নারীর হার বেশি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ রাজ্যের প্রকৃত জন্মের হার কম হইয়া যাইবে। বিবাহের বয়স বিলম্বিত হইলে জন্মের হার স্বভাবতই হ্রাস পায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি হইতেছে। পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বিবাহ বিরল নহে। এ বিষয়ে ভারত অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। গত জনগণনার হিসাবে দেখা যায় যে, পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালিকাদের ১৪·৫ শতাংশ বিবাহিতা। গ্রামাঞ্চলে এইরূপ বিবাহিতা বালিকার হার ১৫ ৭ শতাংশ। পূর্বভারত অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতির গ্রামাঞ্চলে বিবাহিতা বালিকার হার ১৭·৪ শতাংশ।

১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে সংগৃহীত এক হিসাবে দেখা গিয়াছে, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, চব্বিশপরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের মোট এক লক্ষাধিক গ্রাম্য নারীর ৬২ শতাংশের ১৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিবাহ হইয়াছিল। অনুসন্ধানের সময় যাহাদের বয়স ২০ বৎসরের নীচে ছিল, তাহাদের ঐ হার ৭৩ শতাংশ। ইহাতে বুঝা যায় মেয়েদের বিবাহের বয়স আধুনিককালে নিম্নগামী হইয়াছে। দার্জিলিঙের এগার হাজার মেয়ের হিসাব নেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের বাল্যবিবাহ কম। তের বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে ১০ শতাংশ, ১৫-১৯ বৎসর বয়সে ৪৮ শতাংশ এবং ২০-২৪ বৎসর মধ্যে ২৫ শতাংশের বিবাহ হইয়াছিল। শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। স্বাবলম্বী হইবার পূর্বে বিবাহ করিবার অনিচ্ছা যুবকদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিবাহের ভার অভিভাবকদের উপর ছাড়িয়া দিতে তাহারা আর রাজী নহে। বিবাহের সময় শিক্ষিতা ও নানা গুণালংকৃতা কন্যালাভের চেষ্টা করা হয়। এই অবস্থায় মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে রত থাকে। শিক্ষাসমাপ্তির পরে কোন কোন কুমারী অর্থোপার্জনও করে। এরূপ ব্যবস্থা এখনও পৌরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ধীরে হইলেও বিবাহের এই আদর্শ গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবে আশা করা যায়। জন্মহ্রাসের ইহা অন্যতম প্রধান উপায়।

পৌরাঞ্চলে নিম্নবিত্ত পরিবারে সন্তান অধিক জন্মে। পিতার জীবিকার্জনে কুশলতা ও প্রস্তুতি যত কম প্রয়োজন, তাহার সন্তান তত বেশি। যে নারীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা যত কম, তাহার সন্তান তত অধিক। শিক্ষা জন্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এখনও ঘটে নাই। জীবনের মান উন্নীত হইলে জন্মের হার হ্রাস পায়। পৃথিবীর বড় বড় নগরে জন্মের হার অতি নিম্ন। ১৯৩৭ সনে ভিয়েনা নগরীতে জন্মের হার ৫·৪ ছিল। ১৯৩৪ সনে উহা প্যারিসে ১২·৩ ও লন্ডনে ১৩·৪ ছিল। ১৯৩৮-৪০ সন মধ্যে স্যানফ্রান্সিসকোর জন্মের হার ছিল ১২·২ ও নিউইয়র্কে ১৩·৬।

সংক্রামক ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ এ রাজ্যের জনগণের বৃদ্ধিতে কিরূপ বাধা দান করিয়াছে তাহা পূর্বের এক অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে জন্মের হারের ন্যায় মৃত্যুর হারও নিশ্চিত করিয়া জানিবার উপায় নাই। পোর্টারের হিসাব অনুসারে ১৯৩১-৪০ দশকে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে প্রায় ৩৫ ছিল। ১৯৪১-৫০ সনে উহা কমিয়া হাজারে ২৮ বা ২৯ হইয়াছে মনে হয়।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব অসম্পূর্ণ।

(২) বিবিধ তথ্যের সাহায্যে প্রকৃত হিসাব বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের জন্মের হার অতি উচ্চ, জনসমষ্টির প্রতি হাজারে চল্লিশ জনের অধিক শিশু জন্মে। মৃত্যুর হার প্রায় ত্রিশ।

(৩) বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার নিম্নমান জন্মের হার বৃদ্ধির সহায়ক।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জনগণের জীবিকার পরিচয়

মানুষের অন্নসমস্যা মানুষের মতই পুরাতন। তথাপি বর্তমান যুগে ইহা যেমন অগ্রাধিকার দাবি করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন আর কোন যুগে হয় নাই। পূর্বকালে অন্নসমস্যাসমাধানের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তির; এখন সেই দায়িত্ব বহুলপরিমাণে রাষ্ট্রের। অখ্যাত পল্লীর নিভৃত কোণে কোন নাগরিকের অন্নাভাবে মৃত্যুর জন্য এখন রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগকে জবাবদিহি করিতে হয়। বেকারের দীর্ঘ তালিকা রাষ্ট্রপরিচালকদের অযোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং নাগরিকদের জীবিকা অর্জনের উপায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত লোকের সংখ্যা, স্বাবলম্বী ও পরোপজীবীর সংখ্যা, কৃষি ও শিল্পের লোকপোষণের ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রত্যেক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের নহে, এই তথ্য রাষ্ট্রসংঘেরও প্রয়োজন। অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের ক্ষুধা মিটাইবার উপর সর্বজনকাম্য বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে। আর্থিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক আদর্শ শিল্প শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পনা" (International Standard Industrial Classification Scheme) প্রণয়ন করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অথবা প্রয়োজনবোধে কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া নাগরিকগণের জীবিকার পরিচয় সংগ্রহের অনুরোধ জানান হইয়াছিল। ভারতের জনগণনায় সংশোধিত আকারে আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পনার অনুসরণ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অপরাপর দেশের তথ্যের সহিত তুলনা করিতে যেন বাধার সৃষ্টি না হয়, সংশোধনের সময় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল।

১৮৭২ সন হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত প্রতি গণনায় ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভারতের অধিবাসীদিগকে বিভক্ত করা হইত। ধর্মশাস্ত্রকারগণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ হিন্দুর জাতের পাতি দিতেছিলেন। এই উপলক্ষে বহু বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইত। অবশেষে মনে হইত হিন্দুর জাতিভেদের পরিচয় দেওয়াই বুঝি জনগণনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯২১ ও ১৯৩১ সনে মূল্যবান আর্থিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্ম ও জাতিভেদের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া উহা মানুষের মনে রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। বহুধাবিভক্ত জনগণের সামগ্রিক আর্থিক পরিচয়লাভের অসুবিধা ছিল। তখনকার সমাজও এইসকল তথ্যের যথাযথ মূল্য প্রদান করিবার উপযুক্ত ছিল না।

১৯৫১ সনে জনগণের আর্থিক পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সারণী খণ্ডের (Tables Volume) সোয়া পাঁচ শত পৃষ্ঠার তিন শত পৃষ্ঠা আর্থিক তথ্যে পরিপূর্ণ। মাত্র আট পৃষ্ঠায় ধর্ম ও জাতের বিবরণ শেষ করা হইয়াছে। গণনার নবম, দশম ও একাদশ প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক পরিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছিল। নবম প্রশ্নের ভাগদুইটির প্রথম ভাগের প্রশ্ন এই ছিল, আপনি স্বাবলম্বী, অনুপার্জক পরোপজীবী অথবা উপার্জক পরোপজীবী (Earning Dependant ; এই তিন শ্রেণীর কোন পর্যায়ভুক্ত? স্বীয় ভরণপোষণের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইলেই স্বাবলম্বী; স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিও নিজকে ভরণপোষণ করিতে পারিলে স্বাবলম্বী বলিয়া গণ্য। স্বাবলম্বী না হইলেই পরোপজীবী। নাগরিকদিগকে স্বাবলম্বী ও পরাশ্রয়ী এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার অসুবিধা কিছুই নাই। কিন্তু উপার্জক পরোপজীবী নির্ধারণ করা কঠিন। কোন্ উপার্জক স্বাবলম্বী এবং কোন্ উপার্জক পরোপজীবী তাহা তাহাদের অনুসৃত জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কেহ মাসিক ২৫ টাকা উপার্জন করিয়া স্বাবলম্বী, অপর একজন মাসিক ৬০ টাকা উপার্জন করিলেও তাহাকে আত্মীয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। পল্লী অঞ্চলে যে স্বাবলম্বী, সম-উপার্জনে সেই লোকই কলিকাতায় নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতে অক্ষম। সাধারণতঃ পরিবারের কর্তার নিকট হইতে পরিবারস্থ সকল লোক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তা বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন সিগারেট, সিনেমা, খেলার টিকিট ইত্যাদিতে ছেলের উপার্জন ব্যয় হইয়া যায়। তাহার টাকা তিনি কখনও হাতে পান নাই। গণনাকারীকে বলিয়া দিতেন 'ছেলে আমার কাঁধে চড়িয়া খায়'। এরূপ অসুবিধায় সংগৃহীত উপার্জক পরোপজীবীর হিসাব নির্ভরযোগ্য না হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাবলম্বী ও পরোপজীবীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮,১৬,৭৫০ ও ১,৬৯,৯৩,৫৫৮। পরোপজীবীদের ৭,৮৭,৩৯০ জন কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে। স্বাবলম্বীদের মধ্যে বহিরাগতদের অংক সঠিক জানিবার উপায় না থাকিলেও তাহা যে বেশ বড় ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অর্থোপার্জনের জন্যই ইহাদের আগমন। উহাদের শতকরা ৭৯ জন উপার্জনক্ষম বয়সের লোক। ভারতীয় বহিরাগতদের ১৪,৮৬,০০০ জন লোকের বয়স ১৫ হইতে ৫৪ বৎসরের মধ্যে। কর্মের জন্য ইহাদিগকে কর্মসংস্থানকেন্দ্রে নাম লিখাইয়া তিন বৎসর আত্মীয়ের উপর বসিয়া খাইতে হয় না। অর্থের সংস্থান না হইলে ইহারা স্বগৃহে ফিরিয়া যাইত। অভারতীয় বহিরাগতগণও কাজের জন্যই এই রাজ্যে আসিয়া থাকে। আমরা যদি ধরিয়া নেই যে, ৭৮ লক্ষ স্বাবলম্বীর অন্তত ১৫ লক্ষ বহিরাগত, তাহা হইলে এই অনুমান সত্য হইতে বেশি দূরে থাকিবে না। এই হিসাব অনুসারে স্বাভাবিক

জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বীর সংখ্যা ৬৩ লক্ষ দাঁড়ায়। স্বাবলম্বীদের ১ লক্ষ ১৩ হাজার অর্থ উৎপাদন করে না অথবা অর্থোৎপাদনে কোন সাহায্য করে না। ইহারা ভিক্ষাজীবী, সরকারের খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, কর্মাবসানে প্রাপ্ত বৃত্তিভোগী, সরকারী ঋণের সুদভোগী প্রভৃতি। মোট স্বাবলম্বীদের পৌনে আটষট্টি লক্ষ পুরুষ এবং দশ লক্ষাধিক নারী। কৃষিজীবী অপেক্ষা অকৃষিজীবীদের মধ্যে স্বাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। পূর্ববর্তী এক অনুচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে, বহিরাগতদের অধিকাংশ অকৃষি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জন করে। অকৃষি বৃত্তিতে তাহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই স্বাবলম্বীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে। নারী স্বাবলম্বীর মোট সংখ্যা ১০,৩৯,৮৬২।

কৃষিজীবীদের মোট সংখ্যা এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি পাঁচ লক্ষ পরনির্ভরশীল। অন্যরূপে বলা যায় কৃষির আয়ের উপর যাহাদের নির্ভর করিতে হয় তাহাদের প্রতি ১০০ জনের ৭৪ জন ভরণপোষণের জন্য পরমুখাপেক্ষী। অকৃষিজীবীদের শতকরা ৬১ জন পরাশ্রয়ী। সোয়া উনসত্তর লক্ষ কৃষিজীবী নারীর মাত্র সোয়া চার লক্ষ স্বাবলম্বী। কৃষিজীবী নারীদের শতকরা ৯৪ ও অকৃষিজীবী নারীর শতকরা ৮৭ জন পরনির্ভরশীল। এই রাজ্যের জনগণের শতকরা ৬৮ জন আর্থিক হিসাবে নিষ্ক্রিয়।

জনগণনার নবম প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগে অর্থোৎপাদক স্বাবলম্বী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সে মালিক (Employer), শ্রমিক বা কর্মচারী (Employee) অথবা স্বাধীন কর্মী (Independent Worker)- এই তিনের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত। মনিব শব্দ শুনিলে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিকের কথা মনে পড়ে। জনগণনায় অর্থোপার্জনের জন্য কেহ স্থায়িভাবে একজন লোক নিযুক্ত করিলেও তাহাকে মালিক বা মনিব (Employer) বলিয়া ধরা হইয়াছে। যে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিল সে মনিব, উকিলের মুহুরী থাকিলে সেই উকিল মনিব। ফেরিওয়ালা যদি মালবহনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করে তবে সেও মনিব। যাহার বাড়িতে সংসারের কাজের জন্য ঝি-চাকর থাকে অর্থনীতির ভাষায় সে মনিব নহে; কারণ ঝি চাকর অর্থোপার্জনে সাহায্য করে না। অপরের অর্থোপার্জনে সাহায্য করিয়া যে নিজের জীবিকা সংগ্রহ করে সেই ব্যক্তি শ্রমিক বা কর্মচারী। সরকারী অফিসের বড়কর্তা বহু লোক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে মনিব নহেন, কর্মচারী মাত্র। অর্থোপার্জনের জন্য যে অপরের চাকরি করে না অথবা নিজে কোন লোক নিযুক্ত করে না তাহাকে বলা হইয়াছে স্বাধীন কর্মী (Independent Worker)। অর্থোৎপাদক কর্মে নিযুক্ত ৪০,০৮,৩৪৪ জন অকৃষি স্বাবলম্বী ব্যক্তির ৯৮,৫২৬ জন মালিক বা মনিব, ২৫,২৪,৪৫২ জন শ্রমিক বা কর্মচারী এবং ১৩,৮৫,৩৬৬ জন স্বাধীন কর্মী।

উপরের আলোচনার ফল নিম্নলিখিতরূপে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারেঃ

(১)

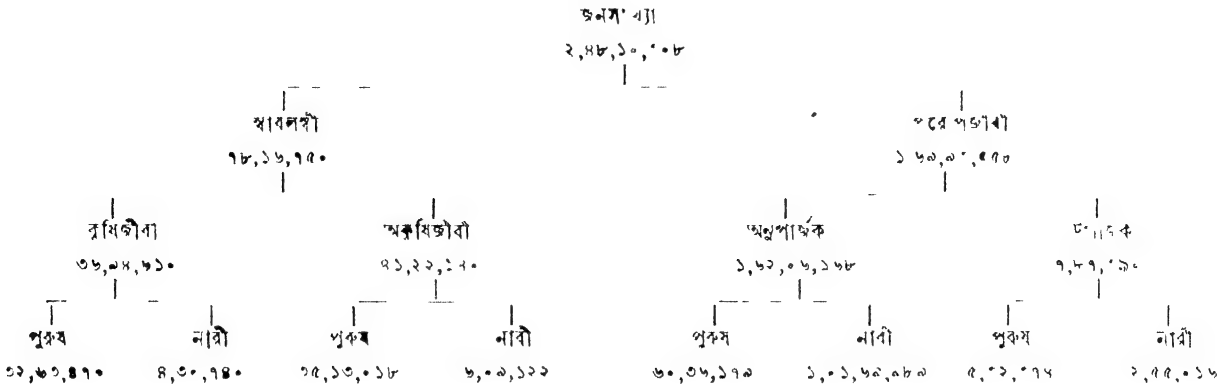
জনসংখ্যা
২,৪৮,১০,৩০৮
স্বাবলম্বী
৭৮,১৬,৭৫০
পরনির্ভরশীল
১,৬৯,৯৩,৫৫৮
কৃষিজীবী
৩৬,৯৪,৬১০
অকৃষিজীবী
৪১,২২,১৪০
অনুপার্জক
১,৬২,০৬,১৬৮
উপার্জক
৭,৮৭,৩৯০
পুরুষ
৩২,৬৩,৮৭০
নারী
৪,৩০,৭৪০
পুরুষ
৩৫,১৩,০১৮
নারী
৬,০৯,১২২
পুরুষ
৬০,৩৬,১৭৯
নারী
১,০১,৬৯,৯৮৯
পুরুষ
৫,৩২,৩৭৪
নারী
২,৫৫,০১৬

(২)

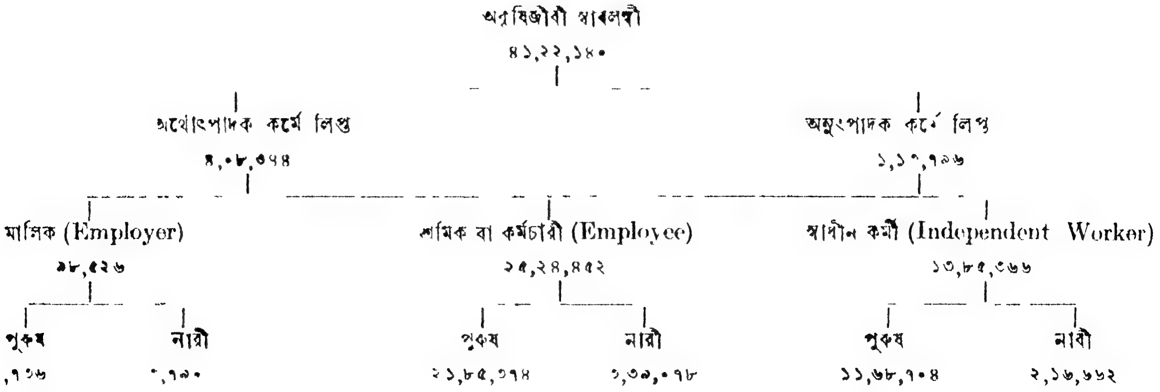
অকৃষিজীবী স্বাবলম্বী
৪১,২২,১৪০
অর্থোৎপাদক কর্মে লিপ্ত
৪০,০৮,৩৪৪
অনুৎপাদক কর্মে লিপ্ত
১,১৩,৭৯৬
মালিক (Employer)
৯৮,৫২৬
শ্রমিক বা কর্মচারী (Employee)
২৫,২৪,৪৫২
স্বাধীন কর্মী (Independent Worker)
১৩,৮৫,৩৬৬
পুরুষ
৯৪,৭৩৬
নারী
৩,৭৯০
পুরুষ
২১,৮৫,৩৭৪
নারী
৩,৩৯,০৭৮
পুরুষ
১১,৬৮,৭০৪
নারী
২,১৬,৬৬২

LIVELIHOOD
MAP OF
WEST BENGAL

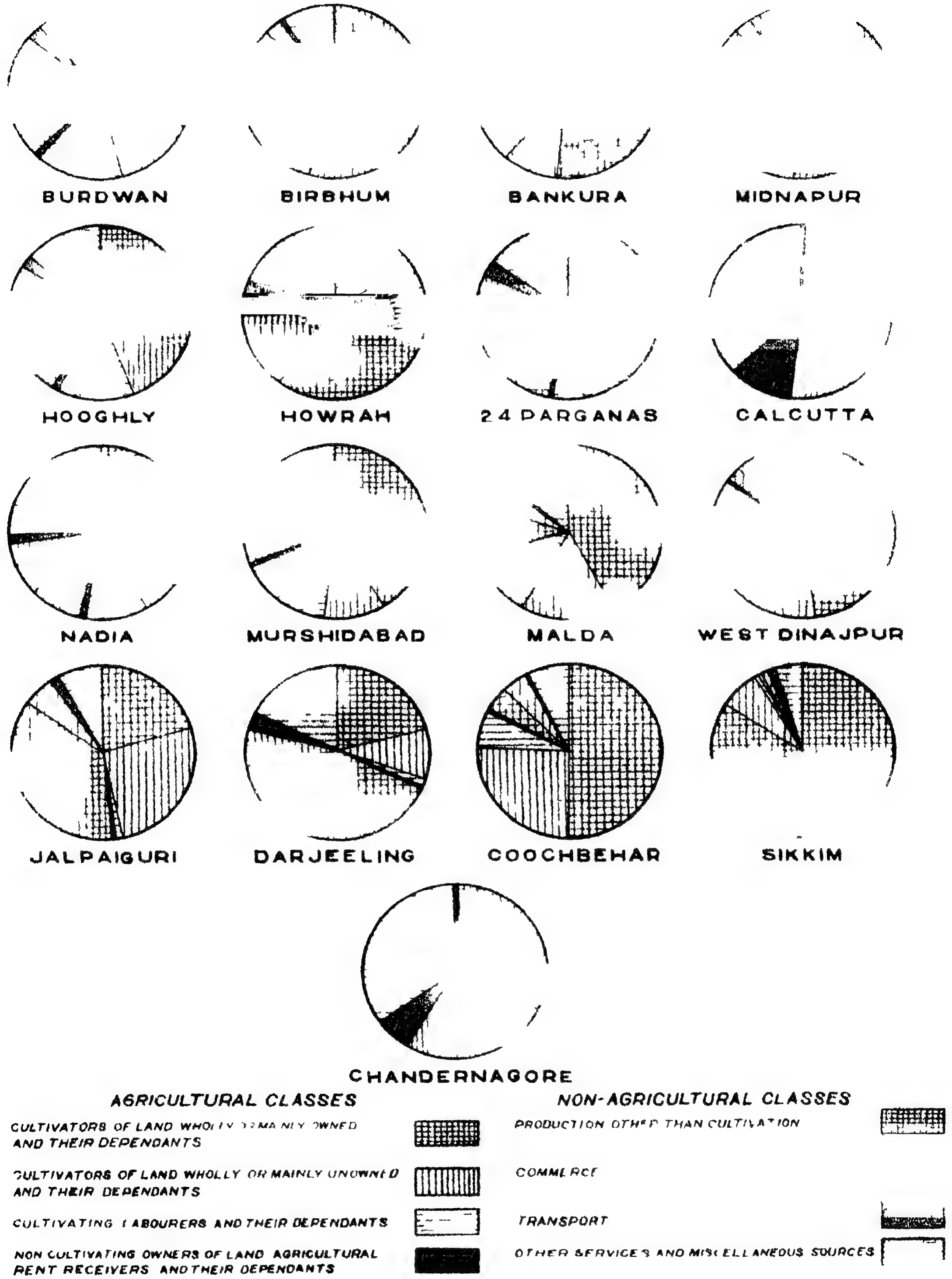

Reg. No. 2717 E 52 1525

Printed at the Survey of India Offices (P.L.O.)

দশম প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধান উপজীবিকার পরিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছিল। উপার্জনের একাধিক পন্থা থাকিলে যে উপায়ে সর্বাধিক অর্থাগম হয় তাহাই মুখ্য বা প্রধান উপজীবিকা। পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মধ্যে যাহাদের জমি আছে তাহাদের জমির আয় যদি শিক্ষকতার আয় অপেক্ষা বেশি হয় তবে কৃষি তাহার মুখ্য উপজীবিকা এবং জনগণনার নিয়মানুসারে তিনি কৃষিজীবী, বিদ্যাব্যবসায়ী নহেন। জীবিকার জন্য যাহার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহার উপজীবিকাই পরোপজীবীর উপজীবিকা। ডাক্তারের শিশুপুত্রের উপজীবিকা লেখা হইয়াছে 'ডাক্তারি'। এই নিয়ম কেমন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সুতার সরবরাহ যদি কোন কারণে বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁতী ও তাহাদের পোষ্যবর্গের দুর্গতি উপস্থিত হয়। উপজীবিকা লিখিবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় দুর্গতদের সংখ্যা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। স্বাবলম্বী ও পরোপজীবির সংখ্যা নবম প্রশ্নের উত্তরেই স্থির হইয়া গিয়াছে। দশম প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র জনসমষ্টিকে বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে বিভক্ত করা হইয়াছে। কোন্ বৃত্তি কত লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া থাকে তাহা এই প্রশ্নের উত্তর হইতে সংকলিত হইয়াছে। কোন বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি ঘটিলে উহাতে কত লোকের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় তাহা এরূপ বিভাগের ফলে জানা সম্ভব হইয়াছে।

জনগণের বৃত্তি প্রথমত কৃষি ও অকৃষি, এই দুই বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষিবর্গের চার ভাগ; মালিকচাষী, ভাগচাষী, কৃষি-শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের খাজনাভোগী। অকৃষি-বর্গেরও ভাগ চার; শিল্পাশ্রয়ী ব্যবসায়ী, পরিবহন-কর্মী এবং অন্যান্য বিবিধ বৃত্তি ও চাকরি। উপজীবিকার এই আট শ্রেণীকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী নামে অভিহিত করা হয়।

মোট জনসংখ্যার ১,৪১,৯৫,১৬১ জন বা ৫৭ ২ শতাংশ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল; অবশিষ্ট ১,০৬,১৫,১৪৭ জন বা ৪২·৮ শতাংশ অকৃষিজীবী। কৃষিজীবীদের ৩২·৩৪ শতাংশ মালিকচাষী; ১২·০১ শতাংশ ভাগচাষী; ১২·২৬ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক এবং ০·৬০ খাজনাভোগী। অকৃষিজীবীর ১৫·৩৬ শতাংশ শিল্পাশ্রয়ী; ৯ ৩২ শতাংশ ব্যবসায়ী; ৩ ০৫ শতাংশ পরিবহন-কর্মী; এবং ১৫·০৬ শতাংশ অন্যান্য বিবিধ বৃত্তি ও চাকরিজীবী।

ক শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে অকৃষিজীবীদের হার পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ হইলেও বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহারে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও মালদহে কৃষিজীবীর হার ৬৩ হইতে ৭১। হাওড়া ও কলিকাতা এবং দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি, কেবলমাত্র এই চার জেলাতেই কৃষিজীবী অপেক্ষা অকৃষিজীবী অধিক। এখানে বলা আবশ্যক যে, চা-বাগান, ফলের বাগান, পানের বরজ, সবজিবাগান প্রভৃতি অকৃষি-শিল্প পর্যায়ভুক্ত। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে অকৃষিজীবীর সংখ্যাধিক্যের ইহাই হেতু।

এই রাজ্যের কৃষির এক বড় অংশ তফসিলী সম্প্রদায়ের হাতে রহিয়াছে। কৃষিজীবীদের ৩২,৬৪,৯০০ জন তফসিলী হিন্দু এবং ৯,২১,২০০ জন খণ্ডজাতীয়। ইহারা মোট কৃষিজীবীর যথাক্রমে ২৩ ও ৬·৫ শতাংশ। সাতচল্লিশ লক্ষ তফসিলী হিন্দুর প্রায় পৌনে তেত্রিশ লক্ষ এবং প্রায় পৌনে বার লক্ষ খণ্ডজাতীয় লোকের মধ্যে সোয়া নয় লক্ষের উপজীবিকা কৃষি।

ভাগচাষীদের ৪০·৮ এবং ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের ৪৫·৮ শতাংশ তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয় লোক। ইহাদের জীবনযাত্রার মান অতিশয় নিম্ন; ভাগচাষী বা কৃষিমজুররূপে মাটি খুঁড়িয়া কোনপ্রকারে দুমুঠা অন্নের সংস্থান হইলেই চলিয়া যায়। ইহাদের ঊর্ধ্বস্পৃহা নাই। ফলে ইহাদের হাতে ন্যস্ত জমির চাষবাস ভাল হয় না, উৎপাদন হয় কম। এইরূপ অলাভজনক কৃষির পরিণাম অপরিসীম দারিদ্র্য, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য এবং জন্মমৃত্যুর উচ্চ হার। রাজ্যের খাদ্য ও বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের ভার ইহাদের উপর থাকায় উৎপাদনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ইহা রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

অন্যান্য রাজ্যের সহিত তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিসংকটের স্বরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নিজের জমি নিজে অথবা নিজ তত্ত্বাবধানে চাষবাস করিবার লোকের হার এ-রাজ্যেই সর্বাপেক্ষা কম। ভূমি ও উৎপাদনের অবনতি ইহার নিশ্চিত ফল। ভাগচাষীর হার আসাম ব্যতীত অপর সকল প্রদেশ হইতে এখানে বেশি। শুধু বেশি বলিলেই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। এ-রাজ্যের ভাগচাষীর হার মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় তিন গুণ; উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের প্রায় আড়াই গুণ, বিন্ধ্যপ্রদেশের দ্বিগুণ, বিহারের দেড় গুণ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের সওয়া গুণ। কৃষিমজুরের হারও তুলনায় অধিক।

১৯৩৭ সালে বীরভূম জেলার কয়েকটি গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক আয়ব্যয়ের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। মোট ৬৮০টি পরিবারের ৯০টি পরিবার নিজের জমি নিজেরাই চাষ করিত। নিজে চাষ করে না এরূপ জমির মালিক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৪৩; ভাগচাষী পরিবার ১৪৬, কৃষাণ ৭৫ ও কৃষিমজুর ১৩৮।

ভাগচাষীদের মত কৃষাণেরাও জমিহীন চাষী। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাগচাষী চাষের গরু, লাঙল, বীজ প্রভৃতি নিজেই যোগাড় করে। নিজের পরিশ্রম ও চাষের উপকরণের ব্যয় বাবত সে ফসলের অর্ধাংশ পায়। কৃষাণকে বীজ, গরু, লাঙল, সার প্রভৃতি জমির মালিক সরবরাহ করিয়া থাকে। শস্যোৎপাদনে তাহার দান শুধু শারীরিক পরিশ্রম। তাহার পরিশ্রমের বাবতে সে ফসলের মাত্র একতৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে।

নিজেরা চাষ করে না অথচ সুবিস্তীর্ণ চাষের জমির মালিক, এরূপ কৃষিজীবীরাই অবস্থাপন্ন। ভাগচাষী, কৃষাণ ও কৃষি মজুরের শ্রমে তাহারা লাভবান হয়। সামান্য কয়েক বিঘা জমির মালিক চাষীদের কোন প্রকারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় মাত্র। ভাগচাষী, কৃষাণ ও কৃষিমজুরদের জীবনধারণের উপযোগী উপার্জন কৃষি হইতে হয় না। জীবনযাত্রায় কোন মান তাহাদের নাই বলিলেই চলে।

জমির মালিক জমির ফলভোগ করে মাত্র, কৃষির উন্নতির চেষ্টা করে না। এই মালিক কাহারা? বীরভূম জেলার সিউড়ি, খয়রাসোল ও দুবরাজপুর থানায় ১৯৩২ সনে জনসংখ্যার ৬·৪৮ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারা ৭৫ ৭৭ শতাংশ জমির ভূম্যধিকারী, ৬৫·৫ শতাংশের মধ্যস্বত্বভোগী, ৪৮·৬৩ শতাংশের রায়তী স্বত্ব এবং ৭·৫ শতাংশের কোরফা

স্বত্বের অধিকারী। লোকের অনুপাতে ব্রাহ্মণেরা অনেক অধিক জমির মালিক। কায়স্থ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পক্ষান্তরে জাতচাষী বাউড়ি জনসমষ্টির ১১.৪২ শতাংশ হইলেও তাহারা মাত্র ০.১১ শতাংশ জমির মালিক ছিল। এইরূপ অন্যান্য কৃষিজীবী জাতিরও লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির মালিকানা নগণ্য। ইহারা উচ্চবর্ণের জমির স্বত্বহীন ভাগচাষী মাত্র। এ চাষীগণ কর্ষিত ভূমির বিরাট অংশের মালিক। ভাগচাষী উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ খাজনা বাবত মালিককে দিয়া উৎপাদন ব্যয় ও মজুরি বাবত বাকি অর্ধেক পাইয়া থাকে।

ভূমির উপর অতি জনতার চাপ, ভাগচাষীর সংখ্যাধিক্য, ভূমির মালিকের জমি ও কৃষির উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য এবং উচ্চাভিলাষহীন তফসিলী ও খণ্ডজাতীয় চাষীদের উপর চাষবাসের এক বৃহৎ অংশ ন্যস্ত থাকা পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবনতির প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিসমস্যা এজন্যই রাজ্যের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষির লোকপোষণের ক্ষমতা প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত। কৃষি ও অকৃষি উপজীবিকার লোক বণ্টনের দ্বারা উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান বর্তমান সময়ের জরুরী সমস্যা।

স্বল্পায়তন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বহু জনসমাবেশ ঘটিয়াছে। কৃষির বর্তমান অবস্থায় এত লোক পোষণের ক্ষমতা কৃষিক্ষেত্রের নাই। শিল্পের উন্নতি ব্যতীত আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। কিন্তু কৃষি বাদ দিয়া শিল্পোন্নতি অসম্ভব। উহারা পরস্পর নির্ভরশীল।

রাজ্যের কর্মসংস্থানের অবস্থার পরিচয় দিয়া এই অনুচ্ছেদের উপসংহার করা হইবে। পরিসংখ্যান বিবরণীতে কৃষি ও অকৃষি উপজীবিকার উপার্জকের হার দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণীর হিসাব আতঙ্কজনক। শতকরা ৫৭.৪ জন কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৩১.৫ জন উপার্জক। ইহা সাময়িক ব্যাপার নহে ১৯১১ সন হইতে ক্রমাবনতির ধারার পরিণতি। কৃষিজীবী উপার্জকের হার ১৯২১ সনের ২৩.৪ শতাংশ হইতে ১৯৫১ সনে ১৪.৯ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। কৃষিক্ষেত্র হইতে এই যে কর্মহীনের দল বাহির হইয়া আসিল অকৃষি উপজীবিকায়ও তাহাদের ঠাঁই হইল না। কারণ পঞ্চাশ বৎসরে অকৃষি উপজীবিকার হার স্থির রহিয়াছে, বৃদ্ধি পায় নাই। বহিরাগতদের শতকরা ৭৯ জন উপার্জনক্ষম বয়সের লোক। উপার্জকদের মধ্যে তাহাদের এক বৃহৎ অংশ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহাদের জন্ম তাহাদের মধ্যেই বেকারের হার অধিক। এই বিবরণী হইতে দুইটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলঃ কৃষিক্ষেত্র দিনের পর দিন পরাজিতের আসরে পরিণত হইতেছে অকৃষি উপজীবিকা রাজ্যের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনের অনুপাতে বৃদ্ধি না হইয়া স্থির রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার সময় বেকারের হিসাব সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু বেকারির তীব্রতা এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে যে সরকার উহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। কলিকাতার কর্মহীনতার প্রাথমিক বিবরণ সাধারণের কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে কর্মক্ষম প্রতি চার জন লোকের একজন বেকার। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রণালয় হইতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে যান্ত্রিক বিদ্যায় পারদর্শী অপেক্ষা কলাবিদ্যায় উপাধিপ্রাপ্তদের সংখ্যাই অনেক বেশি। ১৯৫২ সনের মে মাসের শেষে কর্মসংস্থানকেন্দ্রে ৩,৬৬,৫৯৫ জন বেকারের নাম ছিল। তন্মধ্যে ১৪,৮২৮ জন ডিগ্রীধারী ও ১,০১,০৩৮ জন ম্যাট্রিক। এসম্বন্ধে কলিকাতার সাপ্তাহিক 'ক্যাপিট্যাল (২২-৮-৫২), নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলঃ

> কর্মহীনতা ডিগ্রিধারী বা ম্যাট্রিকের যেমন, অন্যান্য লোকের পক্ষেও তেমনই দুঃসহ। বহু জনসমাবেশ যেখানে সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়সমন্বিত নগরেই শিক্ষিত বেকার অধিক সংখ্যায় সমবেত হয়। কলিকাতার বেকার ম্যাট্রিক ৯,০৭২, ডিগ্রিধারী বেকার ২,৮৮২ বোম্বাই শহরে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৫৭৫ ও ১,১৩১, দিল্লীতে উহা ৭,২৭০ ও ১,৯৮২, এবং মাদ্রাজে ১৩,১৯১ ও ৬১৪। বেকার ডিগ্রিধারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক এবং মাদ্রাজ ম্যাট্রিক বেকারের সংখ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সহস্র সহস্র বেকারের প্রত্যেকটি কেন্দ্র করিয়া উৎকণ্ঠা, আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব, বিফলতা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিক অবনতির এক একটি কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।
>
> 'প্রতি মাসে সরকারী চাকরির জন্য ২৫০০ শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বার্ষিক ৮৫,০০০ যুবককে ডিগ্রি প্রদান করিয়া থাকে। সরকারী চাকরির হিসাব স্বীকার করিয়া নিলেও ১৫,০০০ ডিগ্রিধারী অবশিষ্ট রহিয়া যায়। শিল্প বাণিজ্য ও বিবিধ বৃত্তিতে তাহাদের কর্মের সংস্থান করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া ক্রমবর্ধমান কর্মহীন ম্যাট্রিকের দল তো আছেই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী। ভারতের ছাপ্পান্নটি কর্মসংস্থানকেন্দ্রের মাসিক হিসাবে দেখা যায় ১৯৫২ সনের প্রথম পাঁচ মাসে শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে পক্ষান্তরে প্রতি মাসের শেষে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা পূর্বমাস অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ভারতের বেকারসমস্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র কর্মসংস্থানকেন্দ্রের পরিসংখ্যান হইতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু এই অসম্পূর্ণ বিবরণও সমস্যার প্রকৃতি বুঝিতে সাহায্য করে। ইহাতে একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। যাহারা অনুচ্চ পরীক্ষায় পাস করে কর্মসংগ্রহ ও উপযুক্ত বেতন লাভের দিক হইতে তাহাদের অবস্থা শ্রমিকদের অপেক্ষা অধিকতর সহজ নহে।'

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) কৃষিজীবীদের শতকরা ৭৫ জন ও অকৃষিজীবীদের ৬১ জন অন্নবস্ত্রের জন্য অপরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কৃষিজীবী নারীদের শতকরা ৯৪ জন এবং অকৃষিজীবী নারীর শতকরা ৮৭ জন পর নির্ভরশীল।

(২) পাঁচটি জেলায় শতকরা ৮০ জনের বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। হাওড়া, কলিকাতা দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়িতে কৃষিজীবী অপেক্ষা অকৃষিজীবীর হার অধিক।

(৩) অকৃষক জমির মালিক কর্তৃক ভাগচাষী দ্বারা চাষ করানোর ফলে উৎপাদন কম হয়।

(৪) ভূমির উপর চাপ অধিক, শিল্পও বৃদ্ধি হইতেছে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে জনসমষ্টির বিভিন্ন দিকের তথ্য পরিবেশনের পর আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছি। ভারতের কতিপয় রাজ্যের জনগণের সহিত তুলনায় এই রাজ্যের ঘনতা দশম বার্ষিক লোকবৃদ্ধি, নারীপুরুষের হার, কৃষি ও অকৃষি উপজীবিকার হার, লিখন পঠন যোগ্যতা ও উদ্বাস্তুর চাপ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। রাজ্যের ঘনতা ও জনবিন্যাসের ধারার আলোচনা অধ্যায়ের এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছে। লোকবৃদ্ধি ও লোকের স্বস্থান পরিত্যাগে অনিচ্ছার ফল বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোকের আগমন ও নির্গমন যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। জন্ম মৃত্যু এবং মৃত্যাবশিষ্টের হার যে কোন লোকপরিচয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জীবিকার সহিত জীবনের অপরিহার্য সম্বন্ধ। জনগণের জীবনধারণের উপায় জীবনযাত্রার মান, জীবনীশক্তির প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্য, জীবিকার শ্রেণী আর্থিক হিসাবে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় লোকের সংখ্যা ও হার প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। রাজ্যের স্বাভাবিক জনগণ বা ভূমিপুত্রদের সংখ্যা নির্ধারণ তাহাদের বৃদ্ধির হার ও ধারা বিভিন্ন দেশের সহিত উহার তুলনা লোকসমস্যা ও তাহা সমাধানের উপায় প্রভৃতি এই অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্রগণের নির্ভুল সংখ্যা নির্ধারণ করা সুসাধ্য নহে। দশকে দশকে উহাদের হ্রাসবৃদ্ধির হার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া আরও কঠিন। জনগণনায় জন্মস্থান বহিরাগতদের একমাত্র নির্ণায়ক রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী লোকেদের মধ্যে যাহাদের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লোকরূপে ইহারা থাকিয়াই যায়। এইরূপ যাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গবাসী বলিয়া অন্য রাজ্যে বর্ণিত হইয়াছে তাহারা হয়তো সেই রাজ্যেরই অধিবাসী, মাত্র জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ। দেশবিভাগের পূর্ববর্তী কালে প্রকাশিত বহিরাগতের সংখ্যায় বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে এই রাজ্যের লোক বলিয়া ধরা হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বাহির করিবার উপায় নাই। সুতরাং দশকে দশকে প্রাপ্ত সংখ্যার সহিত তুলনার ফল অনেক ছাটকাট করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে ২,৪৮ ১০,৩০৮ জন লোক গণনা করা হইয়াছিল। উহাদের ৪৬ ০০,৬৭২ জনের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে। এই রাজ্যে জন্ম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্য কোন রাজ্যে গণনা করা হইয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা ৩ ১১,১১৬। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনসংখ্যা (২ ৪৮ ১০ ৩০৮। ৩,১১,১১৬) ১৬,০০,৬৭২ বা ২,০৫,২০ ৭৫২ দাঁড়ায়। ইহা একটি স্থূল হিসাবমাত্র। কোন্ কোন্ দিক হইতে ইহাতে ভুল প্রবেশের সম্ভাবনা তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮৯১ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত প্রতি দশকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণের বৃদ্ধির হার কিরূপ তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই আছে। কিন্তু উহা চরিতার্থ করা কঠিন। স্বাভাবিক জনসংখ্যার অনিশ্চয়তা, বৃদ্ধির হারেও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯০১ সনে ১৮৯১ সনের লোকের ৫ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯০১ সনের বৃদ্ধি ৫ ২, কিন্তু ১৯২১ সনে পূর্ব দশক অপেক্ষা ৩ ২ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে। পরবর্তী দশ বৎসরের বৃদ্ধি ৪ ৮০ শতাংশ। ১৯৪১ সনের বৃদ্ধি ২২ ১ শতাংশ সকল সম্ভাবনার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ১৯৫১ সনে বৃদ্ধি মাত্র ২ ৯ শতাংশ। পঞ্চাশের মন্বন্তর পরবর্তী মহামারী এবং মুসলমানদের একাংশের পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে গমনের ফলে বৃদ্ধির হার ১৯৫১ সনে হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু ১৯৪১ সনের গণনায় সর্বজনস্বীকৃত লোকস্ফীতির জন্য ১৯৫১ সনের বৃদ্ধি অস্বাভাবিকরূপে কম দেখা যায়।

ভারতের ও অন্যান্য দেশের লোকবৃদ্ধি

চটকদার বিজ্ঞাপন বারবার দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞাপনদাতা ও তাহার পণ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে লিখিত কথা সত্য বলিয়া ধারণা জন্মিয়া যায়। ভারত সম্বন্ধে অভারতীয়দের উক্তি আমাদের মনে সেইরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেড়শত বৎসর ইংরাজের সুশাসনে থাকার ফলে অবাধে সর্বনাশা হারে অবিরাম লোকবৃদ্ধিই ভারতের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যাধি, অকালমৃত্যু ও বহুমৃত্যুর মূল কারণ, আমাদের ব্যাধির প্রকৃত নিদান বলিয়া এই উক্তি অনেকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা ভারতের লোকবৃদ্ধির দ্রুততা বাড়াইয়া দেয়। প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা বারবার এই সকল উক্তির অসত্যতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও এরূপ ধারণা এখনও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সত্যের চেয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ শ্রুতিমধুর ভাষার জোর বেশী।

১৯৪৫ সনে দুর্ভিক্ষ কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে ১৮৭২ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্যন্ত ৬০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৩০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল পক্ষান্তরে ঐ ৬০ বৎসরে ইংলন্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা শতকরা ৭৭ বাড়িয়াছে।

কিংসলি ডেভিস তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ সংশোধিত পরিসংখ্যান হইতে একথা কতকটা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে ১৮৭১ সন হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় প্রায় ০ ৬০। ১৮৫০ হইতে ১৯৫০ সন পর্যন্ত পৃথিবীর লোকবৃদ্ধির গড় ০ ৬৯ হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের বৃদ্ধি পৃথিবীর গড় বৃদ্ধি অপেক্ষা সামান্য কম, কিন্তু ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য অনেক দেশ হইতে ভারতের বৃদ্ধির হার বেশ কম। ১৮৭১ সন হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ৭০ বৎসরে ভারতের মোটবৃদ্ধি শতকরা ৫২, ঐ সময়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোক বাড়িয়াছে ৫৭ শতাংশ। ১৮২১-৯১, এই ৭০ বৎসরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোক ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৭০ বৎসরে (১৮৭০ ১৯৪০) জাপানে শতকরা প্রায় ১২০ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২৩০ জন বাড়িয়াছে।

শিল্পবিপ্লবে অগ্রগামী দেশসমূহের সহিত তুলনায় ভারতে যে দ্রুত লোকবৃদ্ধি হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ। অধিকাংশ আধুনিক সভ্য দেশ হইতে ভারতের লোক অধিকতর দ্রুতবৃদ্ধি পাইয়াছে এই প্রচলিত ধারণার অনুকূলে প্রমাণের অভাব। লোকসংখ্যার বিপুলতা, অতিঘনতা ও জনগণের দারিদ্র্য, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে।

১৮০১ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত প্রতি বিশ বৎসরে গ্রেট বৃটেনের লোকবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে ৩৪, ৩২, ২৫, ২৮ ২৫ ও

১৬। ভারতের পূর্বোল্লিখিত ৬০ ও ৭০ বৎসরের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা ইহা অনেক বেশি।

অন্যান্য পরিসংখ্যান হইতে জানা গিয়াছে যে দেড়শত বৎসরে (১৭৫০-১৯০০) অনুন্নত মহাদেশ আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার লোকবৃদ্ধির গতি ছিল অতি মন্থর। কৃষি শিল্প ও সাধারণ সমৃদ্ধিতে যে মহাদেশ যত অনগ্রসর তাহার লোকবৃদ্ধিও তত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে শিল্প বিপ্লবের (১৭৫০) সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে অসাধারণ লোকবৃদ্ধি হইতে থাকে। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই ঐ বৃদ্ধির চক্র পূর্ণ করিয়াছে। তাহাদের লোকসংখ্যা যেন পুনরায় অচলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে শিল্পবিপ্লবের মাত্র প্রাথমিক অবস্থা চলিতেছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। আর্থিক উন্নতি ঘটিলে অনাহার অর্ধাহার, ব্যাধি বিদূরিত হয় লোকের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা দীর্ঘায়ু হয়। এখন লোক অল্পায়ু। যাহাদের অকালমৃত্যু ঘটে তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে মোট লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইত। ভারতে কিছুকাল পর্যন্ত দ্রুত লোকবৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। পূর্বে এদেশে ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি হইত না, দ্রুত বৃদ্ধির পরবর্তী দশকে আসিত মন্দা। বৃদ্ধির গতি একবার দ্রুত একবার মন্থর হইত। ১৯২১ সন হইতে ক্রমাগত বৃদ্ধির পালা আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৭২ সন হইতে ১৯২০ সন পর্যন্ত ভারতের লোকবৃদ্ধি দশকে দশকে ওঠানামা করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের ধৈর্য যাঁহাদের নাই তাঁহারা জনগণনার পরিসংখ্যানের সত্যতা অস্বীকার করিয়া এই অসমান বৃদ্ধির সহজ সমাধান করিয়াছেন। লোকবিদ্যা বিশারদ বহু পণ্ডিত কিন্তু ভারতীয় জনগণনার সংখ্যা ভ্রমাত্মক বলেন নাই। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি লোকক্ষয়কারী প্রধান শক্তি। ইহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিই ভারতের শত্রু। মহামারী দুর্ভিক্ষের চিরসহচর। কোন কোন সময় উহা একাই দেখা দেয়। যে দশকে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি ভারতের বুকে ধ্বংসলীলার অভিনয় করিত সেই দশকে বৃদ্ধি হ্রাস পাইত। দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিমুক্ত দশকে লোকের অতিবৃদ্ধি দেখা যাইত। ১৯২১ হইতে ১৯৪১ সনের মধ্যে লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ বা ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে নাই। ইহারা লোকক্ষয় না করিলে ভারতের জনসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইত ইহাই বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

গ্রেটবৃটেন, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের লোকবৃদ্ধির তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ১৮৮১ হইতে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ৬০ বৎসরে গ্রেটবৃটেনে ৫৬ ৯ শতাংশ ভারতে (প্রকাশিত সংখ্যায়) ৫৫ ৫ শতাংশ (কিংসলি ডেভিসের হিসাবানুসারে ৫১ ১) এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ ৭ শতাংশ লোকবৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১ সন হইতে ভারতের লোকবৃদ্ধির বার্ষিক হার ১ ২ শতাংশ, পক্ষান্তরে ১৯২০ ৩০ দশকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক ১৬ শতাংশ বাড়িয়াছিল এত বৃদ্ধি ভারতে কখনও ঘটে নাই।

এই সকল স্বীকৃত তথ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিরুদ্ধে অতিবৃদ্ধির অভিযোগ কেন? বৃদ্ধির হার বেশিতে অতিবৃদ্ধি ঘটে নাই। ভারতের বিপুল জনসমষ্টির শতকরা অল্প বৃদ্ধিতেই বহুলোক বাড়িয়া যায়। ১৯২১ হইতে ১৯৪১, এই ২০ বৎসরে বার্ষিক মাত্র ১ ২ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ লোক অর্থাৎ জার্মানীর সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক ভারতের বিপুল জনগণের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

১৯২০ সনের পর হইতে ক্রমাগত লোক বাড়িয়া চলিয়াছে, পূর্বের অনিশ্চয়তা আর নাই। ১৯৩১ সনে যে দশক শেষ হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ১১ এবং ১৯৩১ ৪১ দশকের বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫। কিংসলি ডেভিসের মতে ১৯২১ ৪১, এই বিশ বৎসরের বৃদ্ধি বেশ স্বাভাবিক। ভারতের ইতিহাসে উপর্যুপরি দুই শতকে লোকবৃদ্ধি ইহাই প্রথম। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের লোকবৃদ্ধিতে যখন ভাটা পড়িয়া আসিতেছে, তখন ভারত তাহার অনেক বেশি লোক নিয়া দ্রুত ও বিপুলায়তন বৃদ্ধির পথে মাত্র পা বাড়াইল।

প্রশ্ন হইতে পারে ১৯২১ ৪১ সনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার ফলে ক্রমান্বয়ে দুই দশকেই ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চহারে লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল। কোন ঘটনার জন্য নহে, ঘটনা না ঘটিবার জন্যই লোক বাড়িয়াছিল। এই বিশ বৎসর কাল মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব হয় নাই।

ভারতের জনগণ তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং আর্থিক উন্নতি ও তাহার ফলে খাদ্যাবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে অকালমৃত্যু রোধ হইয়া লোক বৃদ্ধ হইবে। উহাতে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বয়সের গড় প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। উহার কোন উন্নতি ঘটে নাই। জন্ম ও বয়োবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক বয়সের গ্রুপে লোকবৃদ্ধি হয়, কিন্তু মৃত্যুর ফলে প্রায় সমসংখ্যক লোক হ্রাস পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে লোকের জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণ, ব্যাধি বা অনটন প্রতিরোধের ক্ষমতা ইহাদের অতি সামান্য। দেশের স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্পে এমন বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না যাহাতে জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে ভারতে জন্মের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার হ্রাসের যুগ উপস্থিত হইয়াছে।

১৯২০ সনের পর কৃষি ও শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি না ঘটিলেও সাধারণ মৃত্যু, ও শিশুমৃত্যুর হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটিয়াছে। জন্মের হার পূর্ববৎ উচ্চই রহিয়াছে। অবস্থার উন্নতি হইলে জন্মের হার আর বাড়িবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে লোকের হাজার প্রতি ৪৭ বা ৪৫ জন শিশুর জন্ম হয়। এই হারই খুব বেশি, ইহা আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুহ্রাসের জন্য লোকবৃদ্ধি হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর হার ৩৫ হইতে ২৭ বা ২৮-এ নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৮ সনে এক বৎসরের নিম্নবয়সের প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৩৬ ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ হার হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৫১ সনে ১০৯ ৫ হইয়াছে।

সাধারণ মৃত্যু ও মৃত্যুর হার হ্রাসের বিশেষ কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। কৃষি এখনও দৈবাধীনে। শিল্প প্রাথমিক স্তরে রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের যুগের এখনও অবসান ঘটে নাই। খাদ্যাভাব এখন বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। স্বাস্থ্যোন্নতির কার্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই। কিন্তু গত আশি বৎসরে কলেরা, বসন্ত প্লেগ ও ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে ঋণের বোঝা এবং জীবনযাত্রার নিম্ন মান এখনও রহিয়াছে। কৃষির অবস্থা পূর্ববৎ অনুন্নতই আছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের পর দেশত্যাগ সত্ত্বেও ১৯৫১ সনে লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিন্তু ১৮৭২-৮১ এবং ১৯১১ ২১ দশকে এরূপ অবস্থায় লোক হ্রাস পাইয়াছিল। ইহা হইতে যদি বলা যায় যে, লোকের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে

তবে ভুল করা হইবে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সকল জেলায় লোকক্ষয় হয় নাই ১৯৫১ সনের লোকবৃদ্ধিতে তাহাই প্রমাণিত হয়। বিগত ত্রিশ বৎসর মধ্যে সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

১৯২০ সন হইতে ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায় ঐ সময়ে আরম্ভ হয়। এই দুই ঘটনার সমসাময়িকতা কেবলমাত্র আকস্মিক ব্যাপার নাও হইতে পারে। জাতীয় আন্দোলনের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে এক আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং কলকারখানা বৃদ্ধি পায়। ভারত বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যের স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্বে অন্য দেশের সহিত কৃষি ও শিল্পপণ্যের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ইংলন্ডের মাধ্যমে করিতে হইত। ঐ সময় হইতে ভারতীয় বাণিজ্য বন্ধনমুক্ত হইয়া যায়।

এখানে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৃষকের কল্যাণকর বিধিসমূহ ১৯২০ সনের পর হইতে ফলপ্রসূ হইতে থাকে।

এতক্ষণ ভারতের বিষয় যাহা বলা হইল, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য। কিন্তু লোকবৃদ্ধির সর্বভারতীয় হার অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের হার অনেক কম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙলার ৩৫ শতাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মন্বন্তরের পরে পনর বৎসর পর্যন্ত লোকক্ষয় চলিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ১৮৭২ সালের লোকসংখ্যা ১৭৫০ সনের লোকসংখ্যা হইতে কম ছিল বলা যায়। দুইশত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাও ক্রমাগত বৃদ্ধি হয় নাই, অনিয়মে বাড়িয়াছে। দশকে দশকে বৃদ্ধির হার ওঠানামা করিত। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বয়সের গঠন অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অকালমৃত্যুর ধারা অব্যাহত আছে। অবস্থার উন্নতি ঘটিলে মৃত্যুহ্রাসের ফলে অবিলম্বে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলার উর্বরতা, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের পরিচয় বার্নিয়ারের ভ্রমণবিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। উহাতে বাঙলার বহুবিধ বাণিজ্যিক শস্য ও নানা প্রকার উৎপাদন শিল্পের উল্লেখ আছে। একশত বৎসর পরে বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে রাজদণ্ড আসিয়া পড়িল। বণিকবৃত্তি সে পরিত্যাগ করিল না। রাজদণ্ডের নির্মম আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙলার চাষী ও শিল্পীকে নিঃস্ব ও ভূলুণ্ঠিত করিয়া কি উপায়ে কোম্পানি স্ফীত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন কোলব্রুক। কিরূপে ও কত দ্রুত বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন হ্রাস এবং পরে বন্ধ হইল তাহা ঐ বিবরণীতে দেখা যায়। ইংরেজের বাণিজ্য ও উৎপাদন শিল্পের স্বার্থের নিকট বাঙলার বাণিজ্য ও উৎপাদন শিল্প কিরূপে বলি দেওয়া হইয়াছে তাহাও কোলব্রুক লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় রপ্তানিকারকগণ বাঙলার উৎপাদন শিল্পে প্রচণ্ড বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপুলপরিমাণ রৌপ্য অর্জনের ফলে বাঙলার আর্থিক অবস্থার দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনভার লাভের পর, অষ্টাদশ শাতব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৯২০ মন পর্যন্ত বাঙলার শিল্পের দ্রুত ধ্বংস সাধিত হইল এবং কৃষির দুরবস্থা উপস্থিত হইল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙলার শাসক হইবার পর অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণকে বাঙলার ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙলার পণ্যের একমাত্র ক্রেতা রহিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ইংলন্ডের কলে উৎপন্ন মাল বিক্রয়ে সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির উপর পর পর বহু নিষেধ আরোপিত হইল। বিলাতী কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য বাঙলার বাজার ছাইয়া গেল। এবার রূপা মুখ ফিরাইয়া বাঙলা হইতে ইংলন্ডে যাত্রা করিল।

বাঙলার এই ভাগ্যবিপর্যয়ের হেতু সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিয়াছেনঃ ভারতের রপ্তানিশুল্ক দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ইংলন্ডের অমানুষিক আত্মপরায়ণতা এবং সুপরিকল্পিত অবিচার ইহার জন্য দায়ী। ইংলন্ডের উৎপাদকদের অপরিমিত অর্থলালসা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট এমন সব আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে যাহার ফলে ইংলন্ডের শিল্পজাত পণ্য নামমাত্র শুল্ক দুই বা তিন শতাংশ প্রদান করিলেই ভারতে প্রবেশ করিতে পারে, পক্ষান্তরে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ইংলন্ডে প্রবেশের জন্য পণ্যমূল্যের শতকরা ত্রিশ ভাগ হইতে এক হাজার গুণ পর্যন্ত শুল্ক ধার্য হইয়াছিল।

এই উদ্ধৃতি হইতে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যের মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মালদহের কর্মমুখর শিল্পকেন্দ্রগুলি স্বদেশ ও বিদেশে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কুশলী শিল্পিগণ অন্নবস্ত্রের কাঙাল হইয়া পড়িল। কৃষির দুরবস্থাও একই কারণ হইতে উদ্ভূত। ইংরেজের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন বন্ধ হইয়া গেল। বহির্জগতের সহিত সংযোগের একমাত্র বাতায়ন ছিল ইংলন্ড। ইংরেজের জাহাজ ব্যতীত পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ হইল। ভারতীয় কৃষিজাত বা শিল্পজাত দ্রব্য সরাসরি অন্য দেশে বিক্রয় করা চলিত না লণ্ডনের ইংরেজ সদাগরের নিকট হইতে ভারতীয় মাল ক্রয় করিতে হইত। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ একমুখো রুদ্রাক্ষে পরিণত হইল।

এইরূপে বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাহার উত্তরাধিকারী ইংরেজরাজ বাঙলাকে কাঙাল করিয়াছে। যেসকল সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন ইংরেজের সুশাসনে থাকিবার ফলে দ্রুত ও অতিরিক্ত হারে লোকবৃদ্ধি ভারতের দারিদ্র্য মলিনতা স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু আনয়ন করিয়াছে, তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে। ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতির অপরিহার্য ফল দারিদ্র্য, অন্যান্য অকল্যাণ দারিদ্র্যেরই অনুচর।

১৯২০ সন লোকবৃদ্ধির ধারার বিভাজিকা কেন তাহার উত্তরও এখানেই পাওয়া যায়। ক্ষতিকর আইন ও শুল্ক নির্ধারণের দ্বারা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের সংকোচসাধন এবং ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধির তাণ্ডব, ১৯২০ সন পর্যন্ত ভারতের স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির অন্তরায় ছিল। ১৯২০ সনের পর, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের পর, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বাধা অপসারিত হইয়াছে। দারিদ্র্য যদিও পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রহিয়াছে, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত, তথাপি স্বাধীন ভারতের মুক্ত হাওয়ায় অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের লোকও দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। কল্যাণকামী সরকারের চেষ্টায় অন্নকষ্ট ও ব্যাধি দূরীভূত হইলেই লোকের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে।

পলাশির যুদ্ধের পূর্বে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ বেশি হইত, এই ভুল ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ১৭৬৫ হইতে ১৯১৯ সনের মধ্যে যত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়াছিল, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আর সেরূপ ঘটে নাই। স্বাধীনতালাভের পর হইতে পাঁচ বৎসর কাল পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক অন্নকষ্ট যেন বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। কোন কোন সময় উহা দুর্ভিক্ষের সীমা স্পর্শ করিবার মত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্যাপক অন্নাভাবেও অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নতম অথবা একেবারেই ছিল না। অন্নাভাবে জাতির স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে, তাহার কুফল কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু উহা দুর্ভিক্ষের ন্যায় আকস্মিক ও ব্যাপক লোকক্ষয়কারী নহে।

সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই বটে, কিন্তু পুরাতন সংক্রামক ব্যাধি কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে অতি দ্রুত তাহা দমন করা হইতেছে। কলেরা চিরতরে নির্বাসনের জন্য পানীয় জলের উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। বসন্ত নিবারণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে টিকা লইতে বাধ্য করা প্রয়োজন। সেই অবস্থায় পৌঁছিতে না পারিলেও উহাদের প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে। ১৯২০ সনের পর হইতে লোকবৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। কিন্তু জীবনযাত্রার নিম্নমান, পুষ্টির অভাব, পানীয় জলের ও জনস্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এখনও দ্রুত লোকবৃদ্ধির অনুকূল নহে। ম্যালেরিয়া হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু বন্ধ হয় নাই। ক্ষয়রোগ এখনও আয়ত্তের বাহিরে রহিয়াছে এবং ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে।

জনসমস্যা সমাধানের উপায়

দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির জন্য যে লোকক্ষয় ঘটে প্রকৃতি তাহা অতি দ্রুত পূরণ করিয়া দেয়। মৃত্যু বেশি হইলে জন্ম বেশি হইয়া থাকে। মৃত্যুর হার যে দেশে কম, সেখানে জন্মও কম। সুতরাং অধিকসংখ্যক লোক মরিতে দিয়া জনসমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে; তাহাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। মৃত্যু কম হইলে জন্মের হার প্রাকৃতিক নিয়মেই হ্রাস পায়। কিন্তু সেই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত লোকবৃদ্ধি হইতে থাকে, শিল্পবিপ্লবের পর ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন হইয়াছিল, অন্নের অভাব ঘুচিবার অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ লোকবৃদ্ধি হইবে। পশ্চিমবঙ্গে জন্মের হার এখনই অতি উচ্চ। উহা আর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। অকস্মাৎ যে জন্মের হার দ্রুত নামিয়া যাইবে তাহাও অসম্ভব।

প্রাকৃতিক নিয়মে লোকবৃদ্ধির হার হ্রাসের অপেক্ষায় থাকিবার মত অবস্থা ভারতের নয়। সুতরাং কেহ কেহ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী। কিন্তু সমস্যার সমাধান তত সহজসাধ্য নহে। জীবিকার উপায়ের মধ্যে সমস্যার মূল নিহিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি এখনও দৈবাধীন। বারিপাত, খরা ও বন্যা শস্যের নিয়ামক। জমির মালিক অনেক ক্ষেত্রেই চাষী নহে, সুতরাং চাষের উন্নতিসাধনের প্রেরণার অভাব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে খণ্ডিত ভূমির উন্নতিবিধান অসম্ভব। অথচ দেড় শত বৎসর পূর্বে কৃষির অবস্থা যাহা ছিল উহার বর্তমান অবস্থা তদপেক্ষা খারাপ।

অকৃষি জীবিকার ক্ষেত্রেও লোকবৃদ্ধির সমানুপাতে কর্মবৃদ্ধি হয় নাই। ১৯১১ সন হইতে নারী উপার্জকের সংখ্যা ভয়ঙ্কর দ্রুতবেগে হ্রাস পাইতেছে।

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে লোকবৃদ্ধি হইবে এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান লোকের জীবিকার সংস্থান করাই বর্তমান জনসমস্যা। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে অকস্মাৎ বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন, ক্ষুদ্রায়তন অঞ্চলে বহু জনসমাবেশ ও অনুন্নত ভূমিতে স্বল্প উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই জাতীয় সমস্যা ও নদী উপত্যকা পরিকল্পনার সাম্প্রতিক রূপায়ণের উপর সর্দার পানিকরের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁহার এক বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তাহার সার সংকলন করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা হইবে।

“জনসমস্যা যদিও মানুষের মৌলিক সমস্যা তথাপি উহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা মাত্র অল্পকাল পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের পরে ইংলন্ডের বিপুল লোকবৃদ্ধি এবং দৃশ্যত আবশ্যকীয় খাদ্যশস্যোৎপাদনে ভূমির অক্ষমতায় জনসমস্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিরাট তাৎপর্য হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত একজন ইংরেজ যাজকের মনে উদিত হয়। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ইংলন্ড খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী বিপুল লোকবৃদ্ধির ফলে এই ক্ষুদ্র দেশ আর তাহার জনগণের পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিতেছিল না। এই অবস্থাই ম্যালথাসের সম্মুখে সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। জনবৃদ্ধির কোন নির্ধারিত সীমা নাই, কিন্তু কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট। গত শতাব্দীতে নূতন নূতন অঞ্চল কর্ষণাধীনে আনয়ন, উৎপাদনবৃদ্ধি ও ভূমির ক্ষয়নিবারণের উদ্দেশ্যে কৃষিকর্মে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যে ভূমিতে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে তাহার অন্যরূপে ব্যবহার এবং নূতন উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা ম্যালথাসের আতঙ্ক ও নৈরাশ্য অমূলক প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মতবাদ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে কি? ইউরোপের জনবহুল জাতি জার্মান ও ইতালিয়ান এবং এশিয়ায় জাপানীদের নূতন ভূমির সন্ধান ও তজ্জনিত যুদ্ধবিগ্রহ এই ইঙ্গিত করিতেছে যে ম্যালথাসের সমস্যার দিকে চোখ বুজিয়া থাকিলে ভারত তাহার ভবিষ্যৎ বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

“জনসমস্যা ভারতে যে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র ইদানীং উপলব্ধি করা হইতেছে। এক শত বৎসরে ভারতের লোক বাড়িয়া দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে। ১৮৫১ সনে ভারতীয় উপমহাদেশের লোক ১৫ কোটি ছিল। ১৯৫১ সনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ লোক গণনা করা হইয়াছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে লোকের চাপ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়তনের অনুপাতে অনেক বেশি খাদ্যশস্যোৎপাদক ভূমি পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই ক্রমবর্ধমান জনগণের অন্নের সংস্থান করা বৎসরের পর বৎসর অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ অন্নসমস্যা ভারতীয়ের জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

“জনসমস্যা এখন সকল সমস্যা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য ও জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উপর উন্নতিশীল স্বাধীন জাতিরূপে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

“বলা হইয়া থাকে যে, খাদ্যাবস্থার তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা বহু পূর্বেই চরমে পৌঁছিয়াছে। সর্দার পানিকরের মতে খাদ্য ও লোকসংখ্যার অসাম্যের জন্য ভারতের জনবিন্যাস দায়ী। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ ব-দ্বীপীয় অংশে এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় অতিজনতার প্রচণ্ড চাপ, পক্ষান্তরে রাজপুতনা ও

মধ্যভারতের, এমনকি দাক্ষিণাত্যেরও বিরাট অঞ্চল অতিশয় জনবিরল। যদিও এখন খাদ্যোৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, তথাপি এ কথা সুবিদিত যে, ভারতে এখনও বহু লক্ষ একর জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে। খাদ্যবিশেষজ্ঞগণ পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছেন, চাষের ভারতীয় পদ্ধতি আদিম যুগোচিত এবং উৎপাদনের হার পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতের এখন এমন একটি গণনীতি গ্রহণ করা উচিত যাহা জনবিন্যাসে সমতা সাধন, পতিত জমি কর্ষণাধীনে আনয়ন এবং উন্নত ধরনের চাষ প্রবর্তনের দ্বারা ফলন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। অবস্থার চাপে পড়িয়া ভারত-সরকার জমি ও উৎপাদন সম্বন্ধে এক ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট জনসমস্যা সরকারের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

"বিরাট সেচ পরিকল্পনাগুলি যখন কার্যকরী হইবে জনবিন্যাসের প্রশ্ন সরকারের সম্মুখে তখন আসিয়া দাঁড়াইবে। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা না করিলে নূতন সেচের অঞ্চলে কর্মিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কৃষকের বসতি স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। বিকানীর রাজ্যে কোন কোন অঞ্চলে কৃষক পাইবার জন্য খালের জল বিতরণ আরম্ভ হইবার পর দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ভাক্রা, দামোদর ভ্যালি, হীরাকুদ ও চম্বল সেচ পরিকল্পনা কয়েক বৎসরের মধ্যেই জল-সরবরাহ আরম্ভ করিবে। কিন্তু জলবিতরণ আরম্ভ হইবারমাত্র কৃষকের দল ছুটিয়া আসিয়া জমি কিনিয়া বসতি স্থাপন করিবে এবং দেশের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য উৎপন্ন করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করা ভুল। এইসকল অঞ্চল যদৃচ্ছ পূর্ণ হইবার জন্য ফেলিয়া রাখা বাতুলতার সামিল হইবে। কারণ স্থানগুলি লোকের খোস খেয়াল মত পূর্ণ হইতে বহু বৎসর, এমনকি কয়েক দশকও, কাটিয়া যাইতে পারে। লোকবসতির জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, ভূমি অকৃষক ফটকাবাজদের হস্তগত হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ হইলে যেসকল পরিকল্পনার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, তাহাতে পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি নাও হইতে পারে।

"উপরের আলোচনা হইতে অবিলম্বে ভারতের গণনীতি নির্ধারণের আবশ্যকতা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। দেশের শিল্প ও কৃষির কর্মধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। ব্যয়নির্বাহের পর যেন দেশে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে এবং যেসকল অঞ্চলে প্রকৃতই অতিজনতার চাপ বেশি তথাকার চাপ হ্রাস করা হইবে গণনীতির উদ্দেশ্য। নীতি-নির্ধারণের সময় যেসকল মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমত আঞ্চলিক সম্পদের সহিত লোকসংখ্যার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিজীবীদের অঞ্চলত্যাগে অনিচ্ছার হেতু এবং যেসকল সামাজিক বন্ধন তাহাদিগকে ঐ অঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কৃষিজীবীদের মধ্যে চলাচলের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত ভূমির উপর চাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গণসমস্যার আলোচনা করিতে হইবে। লোকের খাদ্যের অভ্যাস এবং অন্যান্য বিষয়, যাহাতে ভারতে খাদ্য ও জনসংখ্যার সম্পর্কে একটা অনমনীয়তার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষের কর্মশক্তির উপর জলবায়ুর প্রভাবের কথা হইবে অধ্যয়নের তৃতীয় বিষয়। আবহতত্ত্ব গণবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়।

"প্রজনন (Fertility) ক্ষমতা ও মৃত্যু, অনগ্রসর জাতি লোকবৃদ্ধির উৎস, পল্লী ও পৌরাঞ্চলের লোকের প্রভেদ, কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি গণবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত। পরিজ্ঞাত তথ্যাদি হইতে জনগণের অভ্যাস, জীবনের ধারা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে কিনা এবং বাহিরের চেষ্টা ব্যতীত সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে উদ্বৃত্ত জনগণের কোন ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহাও অনুসন্ধানযোগ্য।"

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

(১) পশ্চিমবঙ্গে জন্মের হার এত উচ্চ যে, ইহা অপেক্ষা আর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আর্থিক উন্নতি ঘটিলে মৃত্যু হ্রাস হইবে এবং তাহার জন্য প্রথম লোক বাড়িতে থাকিবে। ১৯২১ সন হইতে ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি হইতেছে। দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এই বৃদ্ধির কারণ।

(২) অতি প্রজতা পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য আনয়ন করে নাই। দুই শত বৎসরে এ রাজ্যের জনসংখ্যা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক শত বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্যের শিল্পকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিল, বিলাতী পণ্য দ্বারা দেশের অর্থশোষণ করিয়াছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অকৃষককে কৃষিক্ষেত্রের মালিক করিয়া কৃষির অবনতি ঘটাইয়াছিল। বৃটিশরাজের শাসনকালেও অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয় নাই। বিদেশী শাসন পশ্চিমবঙ্গকে নিঃস্ব করিয়াছে।

(৩) কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন এবং ভারতের জন বিরল অঞ্চলে লোকাপসরণ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অতিজনতার চাপ হ্রাস করিয়া সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পল্লীবাসা

প্রথম অনুচ্ছেদ

পূর্বাভাষ

জরিপের এক মৌজাকেই জনগণনার গ্রাম ধরা হইয়াছে। এই প্রথা ১৯১১ সন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং উহার পরবর্তী চার দশকের গ্রামের সহিত তুলনামূলক আলোচনার সুবিধা নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক দ্বারা জরিপ সম্পাদনের ফলে মৌজার আয়তন সর্বত্র সমান নহে। দিনাজপুর মালদহ বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার বহু ছোট ছোট মৌজা দেখা যায়।

বলা হইয়া থাকে যে গ্রামাঞ্চলে সড়ক ও রেলপথ বিস্তারের পরিমাণ সরকারের পল্লীপ্রীতির মাপকাঠি। পশ্চিম বঙ্গে গ্রাম্য পথগুলি বৎসরের বহু মাস অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন গরুর গাড়ি ব্যতীত এসকল পথে চলা কঠিন। গাড়ির চাকা কর্দমাক্ত পথে গভীর দাগ কাটিয়া চলে। বর্ষার অবসানে দেখা যায় সমান্তরাল সরু সরু নালা ও তাহাদের ফাকে ফাকে গড়া ভূমিশিরায় পথ করোগেটেড হইয়া গিয়াছে। কঠিন ঢেউতোলা পথে পায়ে চলা যেমন শক্ত মোটর চালানো তেমনই কঠিন। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে জীপ গাড়ি এক মাইল একটানা চলিতে পারে এমন গ্রাম্য পথ এ রাজ্যে একটি পাওয়াও দুষ্কর। গ্রাম্য পথ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ শুষ্ক ঋতুতে জীপ চলার পথ, জীপ চলার অযোগ্য পথ এবং পায়ে চলার পথ। জীপের পথ প্রায় সবগুলিই জেলাবোর্ড নির্মিত। জেলাবোর্ডের রাস্তা রক্ষার কোন নির্দিষ্ট মান নাই। অনেক রাস্তাই কাচা মাটির অনুচ্চ বাঁধ মাত্র তাহাদের পৃষ্ঠ অসমতল। কেবলমাত্র গভর্নমেন্ট নির্মিত পথই রাস্তার আন্তর্জাতিক মানের সহিত তুলনীয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার উপযুক্ত বড় রাস্তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। জেলাবোর্ডের এবং গ্রাম্য রাস্তাও অপর্যাপ্ত। জনসংখ্যার প্রতি হাজারে রাস্তার পরিমাণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২২ ৭ মাইল, গ্রেট বৃটেনে ৩ ৯ মাইল ফ্রান্সে ১ ৯ মাইল ভারতে ০ ৭৫ মাইল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ০ ৫৬ মাইল। ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার হার নিম্নতম।

রাস্তার উন্নতির দিকে পূর্বে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। হুগলি নদীর উভয় তীরবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলে রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পায়তন কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিবার প্রধান কারণ ভাল রাস্তার অভাব। রাস্তার সুব্যবস্থা হইলে বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশপরগনা ও নদিয়ার শিল্পায়তনসমূহ অধিকতর সুবিন্যস্ত হইতে পারিত।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়া অপর প্রত্যেক রাজ্যই রাস্তার জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিত। বাঙলায় রাস্তানির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইত না এবং রাস্তার ব্যয়ের অগ্রাধিকার ছিল না। ১৯৪৭ সনের পর হইতে সরকারী সংগঠন পরিকল্পনায় রাস্তা নির্মাণ প্রধানস্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতা শিলিগুড়ি রেলপথের বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের পাচটি জেলায় যাতায়াতের জন্য বিহার রাজ্যের রেলপথ ব্যবহার করিতে হয়। মুর্শিদাবাদের সর্বোত্তরে অবস্থিত তিলডাঙা হইতে সোজা পথে মালদহের দূরত্ব মাত্র ২০ মাইল, কিন্তু বিহারের রেলপথে ১৫০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মালদহে পৌঁছিতে হয়। তিলডাঙার নিকটবর্তী ফরাক্কাতে গঙ্গার বাধনির্মাণের কথা উঠিয়াছে। উহার উপর দিয়া রাস্তা ও রেলপথ দুইই থাকিবে। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের সহিত কলিকাতার সংযোগপথ সংক্ষিপ্ত হইবে।

রাস্তানির্মাণ পরিকল্পনার কার্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের জনবিন্যাসে পরিবর্তন দেখা দিবে। বড় রাস্তার পাশে লোকের বসতি ও হাটবাজার গড়িয়া উঠিবে। বিরল বসতি অঞ্চলে লোক বাড়িবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাবকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গেল বিশাল নগরী বিত্তের ন্যায় বিদ্যা গুণ ও জ্ঞান আহরণ করিয়া স্বদেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। পল্লীর শ্রীহীনতা তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। রাস্তার অভাব অনুভব করিয়া উহা নির্মাণের ব্যবস্থা যাহারা করিত তাহারা এখন নগরবাসী। বর্তমানে এক পাপচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা ও আধুনিক জীবনযাত্রার অন্যান্য উপকরণের অভাবে গ্রামাঞ্চল শিক্ষিত ও সুসভ্য লোকের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত লোক পল্লীতে বাস না করিলে গ্রামাঞ্চল পুনরুজ্জীবিত ও আনন্দমুখর করিয়া তোলা অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৮ ৪৬ শতাংশ উদ্বাস্তু। ইহারা এখনও ভাসমান জনসমষ্টি। উদ্যমশীল, শিক্ষিত, পল্লীপ্রিয় দেশকর্মী, ইহাদের মধ্যে সংখ্যায় কম নহে। সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় ইহাদিগকে পল্লী অঞ্চলে পুনর্বাসনের সুযোগ প্রদান করিলে পল্লী উন্নয়নের সহায়তা হইতে পারে।

পরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণের ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অতিজনতার চাপ হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সাধারণ ও বিশেষ জনবিন্যাস

পল্লীর সাধারণ জনবিন্যাসের বিষয় প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাম বা মৌজায় জনবিন্যাসের ধারার পরিচয় দেওয়া হইবে। যেসকল গ্রামের ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৫০০র অধিক তাহার জনসংখ্যা দশকে দশকে ওঠানামা করিয়া থাকে। পাঁচ শতের কম ঘনত্ববিশিষ্ট গ্রামসমূহ দ্রুত জনপূর্ণ হইয়া উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রাপ্ত এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পরিসংখ্যান বিবরণীতে পাওয়া যায়। ১৯১১ সনে ৮১.৫ শতাংশ গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫০০র কম লোক বাস করিত। ক্রমশ লোকবৃদ্ধির ফলে ঐরূপ গ্রামের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৯৫১ সনে উহাদের মোট হার ৮১.৫ হইতে ৬৭.৩ শতাংশে নামিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লোকের গ্রাম ৫০০ হইতে ১,০০০-এর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় গ্রামের মোট হারের হ্রাস ঘটিয়াছে। ১৯১১ সনে ৫০০-১,০০০ পর্যায়ে মোট গ্রামের ১৪.২ শতাংশ ছিল, কিন্তু ১৯৫১ সনে ঐ হার ১৯.১ শতাংশ হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর গ্রামে লোক বাড়িবার ফলে তাহারা এই উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ১০০০ হইতে ২,০০০ লোকের গ্রাম সম্বন্ধেও এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে পল্লীর জনগণ গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। অতিজনতা, ভাগচাষীর ক্রমবর্ধমান হার, জীবনধারণোপযোগী অর্থোপার্জনে অক্ষম কৃষিমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাবনতি, পল্লীর প্রধান সমস্যা। কৃষি উন্নতির আশাহীন অলাভজনক উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিজীবিগণ অভ্যাসবশতঃ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যতীত ধনাগমের অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে [illegible] দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। আমাদের কৃষি এখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে উন্নত ধরনের বীজ-সরবরাহ, নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা, সামান্য মূল্যে সার বরাদ্দ অথবা কৃষিপণ্য বিক্রয়ব্যবস্থার কিছু উন্নতি সাধন প্রভৃতি উপশমক প্রয়োগে সাময়িকভাবে ক্লেশ নিবারণ হইতে পারে কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতিকার হইবে না। দু'মুঠো অন্নের সংস্থান এখন একমাত্র লক্ষ্য হইলে চলিবে না। [illegible] অভাব মিটাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা পল্লীর সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে। ইহাই হইবে নূতন শিল্পের মূলধন। বর্তমান ভূমিব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অথবা উহাতে একআধটু জোড়াতালি দিয়া কৃষির উৎপাদনের সম্ভাবনা আর নাই। পল্লীর জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিকর্মে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর নির্ভর করিতেছে। স্থির সংকল্প লইয়া এই সকল সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। [illegible] [illegible] ব্যাপক হারে [illegible] লোকক্ষয় নিবারণ এবং নারীর হার হ্রাস [illegible] অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে না। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে নূতন সমন্বয় সাধনই দুঃখদুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের উপায়। অতিজনতা, ভূমির উপর প্রচণ্ড চাপ, সংকীর্ণ অঞ্চলে শিল্পের সমাবর্তন এবং বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ও উদ্বাস্তুর সমাবেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা। পল্লীবাসীর পুরাতন সমাজব্যবস্থা ও জীবনধারায় ফিরিয়া যাইবার উপায় আর নাই। [illegible] প্রগতিশীলচিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতেও পারিতেছে না।

তৃতীয় অধ্যায়

পুরবাসী

প্রথম অনুচ্ছেদ

পূর্বাভাষ

প্রথম অধ্যায়ে ঘনতার আলোচনা প্রসঙ্গে নগর ও শহরের শ্রেণীবিভাগ এবং রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থায় তাহাদের অবদানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে পুরবাসীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির প্রায় এক চতুর্থাংশ পুরবাসী। প্রতি চার জন লোকের এক জন শহরে ও তিন জন গ্রামে বাস করে। ১৯২১ সনে জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ এবং ১৯৩১ সনে ১৬ শতাংশ ছিল শহরবাসী। শহরের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২১ সনে নগর ও শহরের মোট সংখ্যা ছিল ৮৫; ১৯৩১ সনে ৯০; ১৯৪১ সনে ৯৯; কিন্তু ১৯৫১ সনে উহা ১১৪-তে উঠিয়াছে। পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের মোট সংখ্যা ৬১,৫৩,০০০, ১৯৩১ সনের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। পুরবাসীর হারের দিক হইতে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। এই সকল তথ্য হইতে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে যে, এ রাজ্যের লোক গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাসের জন্য অতি দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে; পৌরাঞ্চলের বৃত্তি ও সুখসুবিধা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে এবং ভূমির চাপহ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আসল কথা কিন্তু অনারূপ। পুরবাসী ভারতীয় বহিরাগতদিগকে বাদ দিলে পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের হার ২৫ শতাংশ হইতে ২১ শতাংশে নামিয়া আসে। কলিকাতার জনসংখ্যার ৫৪ ৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের লোক। কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের ৩৫টি নগর ও শহরের মোট জনসংখ্যা ৪৫,৭৮,০০০। উহাদের ৭,৭৮,০০০ বা ছয় ভাগের এক ভাগেরও বেশি উদ্বাস্তু। যেসকল পুরবাসীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে তাহারা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩·৪ শতাংশ। দেখা যায় ১৯৫১ সনে পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের হার বহিরাগতদের দ্বারা স্ফীত হইয়াছে, রাজ্যের স্বাভাবিক জনগণের মধ্যে শহরে বাস করিবার আগ্রহ এখনও প্রবল হয় নাই। স্বাভাবিক অধিবাসীদের অতি বড় অংশই প্রধানত কৃষি আশ্রয় করিয়া গ্রামাঞ্চলেই রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যার অনুপাতে পুরবাসীর হার হইতে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় শহরবাসীদের মাত্র ২·১ শতাংশের জন্ম ঐ দুই জেলায়। মালদহের হারও প্রায় তদ্রূপ। কোচবিহারে ঐ হার ৩·৩। বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের যথাক্রমে মাত্র ৫·৪ ও ৫·৫ শতাংশের জন্ম ঐ দুই জেলায়। মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় ঐ হার যথাক্রমে ৬·৩ ও ৬·৫ শতাংশ। বর্ধমান ও নদিয়ার হার ৮·৬ ও ৯ ৫। রাজ্যের পনরটি জেলার দশটিতেই স্থানীয় লোকদের দশ শতাংশেরও কম সহরবাসী। পৌরাঞ্চলে বাসের হার অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের দুই-তৃতীয়াংশ জেলা উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের জেলার সমপর্যায়ভুক্ত। বস্তুত কলিকাতার শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোলের খনি ও শিল্পাঞ্চল যদি না থাকিত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অনেকটা উড়িষ্যার অনুরূপ হইয়া যাইত। উভয়ের মাত্র এই প্রভেদ থাকিত যে, উড়িষ্যা জনবিরল, পশ্চিমবঙ্গ জনবহুল, উড়িষ্যার আয়তন পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের দ্বিগুণ; উড়িষ্যার কর্ষণযোগ্য ভূমি পশ্চিমবঙ্গের কর্ষণযোগ্য ভূমি অপেক্ষা ঢের বেশি। এজনাই কৃষি অথবা পৌর-জীবিকার ক্ষুদ্রতম বিপর্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোক বিপন্ন হইয়া পড়ে। রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার দ্বৈততা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পল্লীর আর্থিক জীবন পৌরাঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থার সহিত অনেকটা সংস্রবহীন।

লোকের সংখ্যা অনুসারে শহর ছয় বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। লক্ষাধিক লোকের শহরকে বলা হয় নগর; নগরের সংখ্যা সাত এবং উহাদিগকে লইয়া প্রথম শ্রেণী গঠিত। সাতটি নগরের মোট জনসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ নয় হাজার। পুরবাসীদের ৫৮·৭ শতাংশ নগরের অধিবাসী। অবশিষ্ট ৪১ ৩ শতাংশ ১০৭টি শহরে বাস করিয়া থাকে। পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ লোকের বাস যেসকল শহরে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সংখ্যায় নগরের দ্বিগুণ। নয় লক্ষ সাত হাজার লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর চৌদ্দটি শহরের বাসিন্দা। এই চৌদ্দটি শহরের চারগুণ লোক সাতটি নগরে বাস করে। পুরবাসীদের কিঞ্চিদধিক এক-ষষ্ঠাংশ লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে থাকে।

তৃতীয় বর্গের শহরে বিশ হাজার হইতে এক কম পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস। এই শ্রেণীতে সাতাশটি শহর আছে: উহাদের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ। পুরবাসীদের প্রায় এক সপ্তমাংশের বাস তৃতীয় শ্রেণীর শহরে। দশ হাজার হইতে এক কম বিশ হাজার লোকের চল্লিশটি শহর লইয়া চতুর্থ শ্রেণী গঠিত। ইহাদের মোট লোক ছয় লক্ষের কাছাকাছি। পৌর জনগণের এক-দশমাংশের কম লোক চল্লিশটি শহরে বাস করে। পঞ্চম শ্রেণীতে পনরটি শহর। ইহাদের লোক পাঁচ হাজার হইতে একোন দশ হাজার। মোট জনসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। ষষ্ঠ বর্গের শহরে লোক পাঁচ হাজারের কম। এই শ্রেণীর এগারটি শহরের মোট লোক মাত্র একচল্লিশ হাজার সাত শত।

পৌরাঞ্চলের মোট আয়তন ৪৫১·৪ বর্গমাইল। তন্মধ্যে কলিকাতার শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোলের খনি ও শিল্পাঞ্চলের আয়তন ১৮১·১ বর্গমাইল। উহার লোকসংখ্যা ৪৭,৮০,৬২৫। অবশিষ্ট ২৭০·৩ বর্গমাইল স্থানে ১৩,৭২,৬৩৮ জন লোক বাস করে।

পাঁচটি নগর, কলিকাতা, হাওড়া, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ ও সাউথ সুবার্বান্‌, ফোর্ট উইলিয়ম, দুর্গের ছয় মাইলের মধ্যে অবস্থিত। কলিকাতা নগরী সম্প্রসারিত হইয়া অপর চারটি নগরের সৃষ্টি করিয়াছে। সাতটি নগরের দুইটি,

ভাটপাড়া ও খড়্গপুর, কলিকাতা হইতে বিচ্ছিন্ন। নিজ নিজ এলাকার শিল্পের আকর্ষণে লোক আকৃষ্ট করিয়া উহারা নগরীর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সকল নগরের মিলিত আয়তন মাত্র ৮৩ বর্গমাইল। পৌরাঞ্চলের এই ৯৮·৪ শতাংশ স্থানে ৫৮·৭ শতাংশ লোক বাস করিয়া থাকে। কলিকাতা, কলিকাতার সংলগ্ন নগর চারটি, বরাহনগর, দমদম, উত্তর ও দক্ষিণ দমদম এবং বালী, এই দশটি পরস্পর সংলগ্ন নগর ও শহরকে কলিকাতা অঞ্চল বলা যাইতে পারে। অঞ্চলটির আয়তন ৮৫·২ বর্গমাইল। রাজ্যের পুরবাসীদের ৫৮ ১ শতাংশের বাস এই অঞ্চলে। বৃহৎ কলিকাতা বা কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের আয়তন ১৬০ বর্গমাইল, উহার গড় ঘনত্ব ২৮,৬১৩। পক্ষান্তরে কলিকাতা ও আসানসোলের শিল্পাঞ্চল বাদে অবশিষ্ট পৌরাঞ্চলের ঘনত্ব মাত্র ৫,০৭৮। রাজ্যের অসমান জনবিন্যাসের বিষয় প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। উল্লিখিত তথ্য পৌরাঞ্চলের জনবিন্যাসের বিরাট বৈষম্যের পরিচয় দেয়। কলিকাতা অঞ্চল অথবা কলিকাতার শিল্পাঞ্চলেই বহু জনসমাবেশ ঘটিয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, এই জনমণ্ডলীতে ভারতীয় ও অভারতীয় বহিরাগত এবং উদ্বাস্তুর সংখ্যা বিপুল। বহিরাগতগণ পশ্চিমবঙ্গকে তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়াছে। প্রধানত আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ইহারা পণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু খাদ্য ও গৃহাদির উপকরণের জন্য ইহারা এই রাজ্যের পল্লী অঞ্চল শোষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের সহিত যাহাদের কেবলমাত্র অর্থের সম্বন্ধ, পৌরাঞ্চলের সুখসুবিধার এক বৃহৎ অংশ তাহাদেরই উপভোগ্য।

জনসংখ্যা অনুসারে শহর ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীও উহাদিগকে ছয় ভাগ করা যাইতে পারে। **আবাসিক শহর** সংখ্যায় ৬৭; তন্মধ্যে ৪০টি আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র। **শিল্প শহর** ৩৩টি। **খনির শহর** ৩; **রেলওয়ে শহর** ৫; **চাউলকলের শহর** ৪ এবং **ব্যবসায় ও নৌবাণিজ্যের শহর** ২।

পঁচিশটি আবাসিক শহরে লোকের সংখ্যাহ্রাস দেখিয়া ১৯২১ সনের জনগণনার অধিকর্তা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নাগরিক জীবন বাঙালীর অপ্রিয়। শহরের অবনতির যে কারণ তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নহে। গৃহশিল্প ও বাণিজ্যের জন্য এই সকল শহরের উন্নতি ঘটিয়াছিল। কোন কোনটি ছিল নদীতীরের বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের উন্নতি অব্যাহত ছিল। ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি হইবার পর বহির্বাণিজ্যের অতি দ্রুত অবনতি ঘটে। বিলাতী জিনিসে বাঙলার বাজার ছাইয়া গেলে দেশেও স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইল। বিপন্ন ব্যবসায়ী ও শ্রমশিল্পিগণ গ্রামে ফিরিয়া কৃষিকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ভূমির উপর চাপ বাড়িয়া গেল। ঘড়ির কাঁটা যেন পিছন দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। উদ্বৃত্ত কৃষিজীবিগণ অকৃষি উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া ভূমির চাপ হ্রাস করিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। এপথে বাঙলা দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে কেবলমাত্র অগ্রগতি বন্ধ হইল না, দেশ বহুদূর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। শিল্পবিপ্লবের মুখে পড়িয়া ইংলন্ডের গৃহশিল্পীও বিপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমশ তাহারা নব নব শিল্পকৌশলে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। বিদেশী প্রভু বাঙলার শ্রমশিল্পীদিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করে নাই। তাহারা বাঙলায় যেসকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিল তাহা ছিল বাঙালীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্যহীন। মসলিন ও রেশমবয়নে দক্ষতার চটকলে আদর ছিল না। মাথায় বোঝা বহনের ক্ষমতা তথাকার যোগ্যতার মাপকাঠি। ঘাটাল ও খরারের কাঁসারীর সুনিপুণ হস্ত অলস হইয়া রহিল। রেলপথের প্রতিযোগিতায় নদীপথের ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরবর্তী বন্দরের অবনতি ঘটিল। জীবিকার নূতন ক্ষেত্রের সন্ধানে বণিক ও শিল্পিগণ এইসকল শহর ছাড়িয়া গেলে তাহাদের অবনতি ঘটে। লোকক্ষয় করিয়া বর্ধমানের জ্বর কোন কোন শহর জনবিরল করিয়া তুলিয়াছিল। কয়েকটি সরকারী বিবরণীতে এই সকল কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

নদী যখন মাল ও যাত্রিবহনের প্রধান পথ ছিল, কালনা তখন ছিল বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রধান বন্দর। রেলপথ নদীপথের স্থান অধিকার করিবার পর এবং নদীতে চড়া পড়ায় শহরটির অবনতি ঘটিতে থাকে। কয়েক বৎসর ধরিয়া উহা ছিল ভীষণ বর্ধমান জ্বরের কেন্দ্র। পূর্বে কাটোয়াতে সারা বৎসর স্টীমার যাতায়াত করিত। রেলপথ এবং ভাগীরথীর চড়া তাহারও অবনতির কারণ। দাইনহাটে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত এবং বস্ত্র বয়ন করা হইত। লবণ, পাট, ধান ও চাউল, বিলাতী কাপড়, তুলা এবং তামাকের কারবারও চলিত। কালনা ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী এই শহরটি জেলার অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল। কিন্তু নদী ক্রমশ দূরে সরিয়া গিয়া উহার অবনতি ঘটাইয়াছে।

পালকি ও আসবাব নির্মাণের জন্য সিউড়ি প্রসিদ্ধ ছিল। শহর হইতে দুই মাইল দূরবর্তী আলুন্দায় টেবিলের ডোরাকাটা সুতীর আচ্ছাদন, বিছানার চাদর, তোয়ালে, টেবিলের জন্য সাদা আবরণী, মশারির কাপড় ও অন্যান্য মোটা কাপড় প্রস্তুত হইত। সিউড়ির এক মাইল পশ্চিমে, কালীপুর-কারিধা গ্রামে তসরের নলিভরা ও বয়ন এবং কার্পাস বস্ত্র বয়ন করা হইত। কারিধার বাপ্তা ভাগলপুরের বাপ্তা হইতে নিকৃষ্ট ছিল না।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি ছিল। সুতাকাটা ও বস্ত্র বয়নের জন্য কুঠিতে বহু লোক নিযুক্ত করা হইত। বিলাতী কাপড় আমদানির পর কোম্পানি সোনামুখী পরিত্যাগ করিল। বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কাপড় টিকিতে পারিল না। শহরে এক নীলকুঠিও ছিল। ১৯০৮ সনে রেশমী কাপড় বোনা, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও গালা প্রস্তুত করা ছিল সোনামুখীর প্রধান শিল্প। পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য পাত্রসায়র প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙালীর ঘরে ঘরে এখানে প্রস্তুত বাসনের তখন বিশেষ সমাদর। কলিকাতা ও দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে পাত্রসায়রের বিস্তর বাসন রপ্তানি হইত। এই শিল্প এখন সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে।

সুতী ও তসরের বস্ত্র বয়ন, কাঁসার বাসন প্রস্তুত ও মৃৎপাত্র নির্মাণ ছিল ঘাটালের প্রধান শিল্প। এখানে প্রস্তুত কাপড় সস্তা ও টেঁকসই ছিল। ওলন্দাজদের এক কুঠি ছিল এই শহরে। ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমার বন্দর তখন ঘাটাল। বৃটিশ অধিকারের প্রথম যুগে এখানে একজন রেসিডেন্ট রাখা হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রকোণা উন্নতিশীল স্থান

ছিল। খরার গ্রামে বিপুলপরিমাণে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত করা হইত। হাতুড়ির ঘায়ের শব্দে সমস্ত গ্রাম মুখরিত থাকিত। ঘাটাল, খরার, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা ও রামজীবনপুর পিতল ও কাঁসার বাটি, থালা, রান্নার হাঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঘাটাল ও খরারে এই শিল্প প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর সুসংগঠিত ছিল। মালিকেরা ছিল ধনী ও উদ্যমশীল। তাহারা স্ট্রেটস্ সেটলমেন্ট হইতে টিন ও জাপান হইতে তামা আনাইত; শ্রম বিভাগ করিয়া ঠিকা হারে শ্রমিকদিগকে মজুরি দিত। কোন কোন কারখানায় শতাধিক কর্মী নিযুক্ত থাকিত। কলিকাতার বড়বাজারে এই সকল মালের বিশেষ চাহিদা ছিল। খরারের নয় হাজার অধিবাসীর চার হাজার ছিল কাংসশিল্পী। রামজীবনপুরে কাঁসাপিতলের দ্রব্য ও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। রামজীবনপুরের হাট তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বস্ত্রবয়ন ছিল ক্ষিরপাইএর প্রধান শিল্প। অধিবাসীদের মধ্যে বহু তাঁতী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুতী ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য ক্ষিরপাইতে ইংরেজদের এক বড় কুঠি ছিল। কাপড় কিনিবার জন্য ওলন্দাজেরা লোক পাঠাইত। এখানে ফরাসীদেরও এক কুঠি ছিল।

বর্ধমান মেদিনীপুর বাদশাহী সড়কের পাশে অবস্থানের জন্য আরামবাগ বহুকাল পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখানে দুইটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। হুগলি-চুঁচুড়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্যক বন্দর ও শাসন-কেন্দ্র ছিল। কলিকাতার উন্নতিতে ইহার অবনতি ঘটিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবনিযুক্ত সৈনিক কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য বারাসতে একটি কলেজ ছিল। এজন্য বারাসতকে বাঙলার স্যান্ডার্স্ট বলা হইত। গোবরডাঙা পাট ও গুড়ের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

বীরনগর এক সময়ে বড় ও সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। ১৮৫৭ সালের ব্যাপক মালেরিয়ার আক্রমণের পর হইতে উহার অবনতি ঘটিতে থাকে। চাকদহ এক সময়ে প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। নদীর গতি পরিবর্তন উহার অবনতির কারণ। ম্যালেরিয়া ও শাসকরূপে স্থানীয় রাজার প্রাধান্য হ্রাসের জন্য কৃষ্ণনগরের লোক হ্রাস পাইয়াছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম যুগে শান্তিপুরে কোম্পানির বাণিজ্যের রেসিডেন্সী এবং বড় সরকারী বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র ছিল। শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্রের খ্যাতি তখন ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আটাশ বৎসর গভর্নমেন্ট গড়ে বার লক্ষ টাকার শান্তিপুরী বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিল। এসব কারখানার চিহ্নও এখন নাই। কুঠিরপাড়া নামটি শুধু পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করিতেছে। শান্তিপুরে নিযুক্ত কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যিক কর্মচারীর বার্ষিক বেতন ছিল ৪২,০০০ টাকা। লক্ষ টাকায় নির্মিত এক প্রাসাদ ছিল তাহার বাসভবন। বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০২ সনে এই প্রাসাদে দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কলের কাপড় শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্পকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়াছে। এই শহরে কোম্পানির চিনির কারখানা ছিল। তাহাও বস্ত্রশিল্পেরই অনুগমন করিয়াছে।

কাশিমবাজারের অবনতি বহরমপুরের অবনতির কারণ। নবাবের নাজিমির অবসানে মুর্শিদাবাদের অবনতি ঘটে। মুর্শিদাবাদের পতন আজিমগঞ্জের অর্থ লেনদেনের কারবারে অবনতি ঘটায়। উহার ফলে তথাকার লোক হ্রাস পায়। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে জঙ্গীপুর ছিল রেশম ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র। এখানে কোম্পানির বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট থাকিত। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ইহা কোম্পানির সর্ববৃহৎ রেশমকেন্দ্র ছিল। এখানে ৬০০ হাপর ছিল এবং ৮,০০০ লোক নিযুক্ত থাকিত। তখন রেশমের দর ছিল প্রতি সের সওয়া দশ টাকা। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের ব্যবসায়ে কোম্পানির একাধিকার রহিত হইয়া যায়। তখন এই প্রতিষ্ঠানের সাজসরঞ্জাম ৫১,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাতন মালদহ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। এখানে ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের কুঠি ছিল। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের কুঠি ইংরেজবাজারে স্থানান্তরিত করিবার পর পুরাতন মালদহের সমৃদ্ধির অবনতি আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া উহার ক্রমাবনতি চলিতে থাকে। ১৯১৮ সনেও ইহা বারিন্দের শিল্পজাত দ্রব্য বিতরণকেন্দ্র এবং ধান ও পাট রপ্তানিকেন্দ্র ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সাহাপুরের পথে ইংরেজবাজার হইতে রাত্রিতে পুরাতন মালদহ যাইবার সময় আলো সঙ্গে নিবার প্রয়োজন হইত না। পথের উভয় পার্শ্বের দোকানের আলোতেই রাস্তা আলোকিত থাকিত। সারাপথ পোদ্দারের দোকানে টাকা গণনার ঝনঝান শব্দ কানে প্রবেশ করিত।

আবাসিক শহরের অবনতি ঘটিলেও খনি ও শিল্পাঞ্চলে নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পুরাতন শহরের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। দোল খাইয়া উন্নতির দোলক যেন নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ হইতে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া হইতে আসানসোলে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই শিল্প-শহরের বৃদ্ধিতে কাহারা উপকৃত হইয়াছে? দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনের দ্বারা যাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল, এখানে তাহাদের ঠাঁই হয় নাই। ভারতীয় ও অভারতীয় বহিরাগতের সমাবেশে শিল্প-শহর জনবহুল। পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণ রাজ্যের নগর ও শহরের কর্মসংস্থান এবং নাগরিক জীবনের সুখসুবিধার সামান্য অংশই ভোগ করিয়া থাকে। শুধু শিল্প-শহর নহে, অন্যান্য শহরেও যে বহিরাগতদের সাংখ্যিক প্রাধান্য বিদ্যমান তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে।

শহরে নারী

প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত গৃহশিল্পে পরিবারের সকলেই অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বয়নশিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি যোগ্যতানুসারে সাহায্য করে। একখানা কাপড় শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবক ও প্রৌঢ়ের সম্মিলিত চেষ্টার ফল। সুদক্ষ তাঁতশিল্পীর উপর কেবলমাত্র বয়নের ভার। সুতার লাছি তৈরি করা বালক-বালিকাদের কাজ; গৃহকর্মের অবসরে "টানা হাঁটে" গৃহিণী; তাঁতের জন্য সুতা বিন্যস্ত করিয়া দিবার ভার যুবক ও বৃদ্ধের উপর। তাঁতে বসান সুতায় বস্ত্র বয়ন করে সুনিপুণ কারিগর। পরিবারস্থ লোকের মধ্যে কর্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া কুম্ভকারদেরও রীতি। শঙ্খ-শিল্পীদের কাজও পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হয়। কাঁসারী ও লোহারদের কাজে নারীর কোন স্থান নাই। বালকেরা হাপরে বাতাস দিয়া

থাকে। কারিগরদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া নারী পরোক্ষভাবে কাজের সাহায্য করে মাত্র। প্রায় সকল গৃহশিল্পজাত দ্রব্যই যৌথ প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং শহরের কারিগরদিগকে সপরিবারে বাস করিতে হইত।

আধুনিক বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম যুগে অবস্থা ছিল অন্যরূপ। কলকারখানায় কাজের জন্য মালিকের প্রয়োজন হইত শ্রমিকের। দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত বলিষ্ঠ শ্রমিকেরই আদর ছিল, মূল্যবিচারে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইত। মালিকের ভাষায় শ্রমিক hand বা হাতমাত্র, head বা মাথা নহে। কলকারখানায় শ্রমিকের মাথা খাটাইবার অবকাশ নাই, শুধু দরকার হাতের। মজুরি ছিল অতি অল্প। অল্প পারিশ্রমিকে নয় দশ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিবার লোক এরাজ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল। বাঙলার বাহিরে এরূপ শ্রমিক সহজে পাওয়া গেল। বাহির হইতে দলে দলে শ্রমিক আসিল। কিন্তু শ্রমিকের স্ত্রীপুত্র রহিয়া গেল তাহাদের স্বগ্রামে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে স্ত্রীপুত্রের প্রয়োজন ছিল না, শিল্পাঞ্চলে বাসস্থানের অভাব এবং ব্যয়বাহুল্যও পরিবার দেশে রাখিয়া আসিবার অন্যতম কারণ। কোন কোন শ্রমিকের স্বরাজ্যে জমি আছে। তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য পরিবার দেশে রাখা আবশ্যক ছিল। সেই ধারা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। শিল্পাঞ্চলে নারীর সংখ্যাল্পতার ইহাই হেতু।

যে পঁচিশটি আবাসিক শহরের জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ১৮৭২ হইতে ১৮৯১ সন পর্যন্ত তাহাদের প্রায় সকলেরই নারীর হার পুরুষের হার অপেক্ষা অধিক ছিল। কোন কোন শহরে ১৯১১ সন পর্যন্ত নারীর সংখ্যাধিক্য বজায় রহিয়াছে। সুতরাং নাগরিক জীবন অপ্রিয় বলিয়া বাঙালী সপরিবারে শহরে বাস করে না এরূপ সিদ্ধান্ত তথ্যবিরোধী। নাগরিক জীবন অপ্রিয় হইলে প্রথম যুগেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। ১৯১১ সনের পর হইতে অধিকাংশ শহরে নারীর হার হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসের কারণ দুইটিঃ প্রথমত আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য শহরে ব্যয় সংকুলান কঠিন বলিয়া স্থানীয় লোকদের পোষ্যপরিবারকে গ্রামের বাড়িতে রাখিতে হয় দ্বিতীয়ত বহিরাগতদের আগমন বৃদ্ধিতে পুরুষের হার বাড়িয়া গিয়াছে।

আবাসিক শিল্প ও রেলওয়ে শহরের নারীর হারে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫১ সনে আবাসিক শহরে প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৮৩৭, শিল্প শহরে ৫৯৬ এবং রেলওয়ে শহরে ৮৩৮ জন ছিল। ১৮৭২ সন হইতে আবাসিক শহরে নারীর হার ক্রমশ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে পক্ষান্তরে রেলওয়ে শহরে উহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। আবাসিক শহরে নারীর হার হ্রাসের কারণ পূর্বে নির্দেশ করা হইয়াছে। চাকরির স্থায়িত্ব বাসস্থানের সুব্যবস্থা অল্প ভাড়ায় অথবা বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ রেল কর্মীদিগকে সপরিবারে বাস করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া থাকে। এজন্যই রেলওয়ে শহরে নারী বেশি। শিল্প শহরে নারীর হার প্রথমাবধি ছয় শতের কম। এই নিম্ন হারের কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নারীর স্বল্পতা রাজ্যের শিল্প ও নীতির উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইংলন্ডের শ্রমিকের ন্যায় বাঙলার শ্রমশিল্পিগণ সর্বহারা শ্রমিকের দল নহে। ইহাদের অনেকেরই বাড়িঘর ও জমাজমি থাকে। জীবিকানির্বাহের জন্য জমির আয় অপর্যাপ্ত বলিয়া ইহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হয়। ইহাদের বাল্য ও বার্ধক্য কাটে স্বগ্রামে ও স্বরাজ্যে। অবকাশের সময় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকেরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। শিল্প ও কৃষি এই দ্বিবিধ উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। ব্যবসায়ে মন্দা অথবা অন্য কোন কারণে কর্মচ্যুত শ্রমিক একেবারে নিঃস্ব অথবা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে না। কিন্তু এই দোটানার জন্য শ্রমিকের কর্মকুশলতা পারিবারিক ঐতিহ্য হইয়া উঠিতে পারে না। কুশলী শ্রমিকের সন্তান শিল্পের পরিবর্তে কৃষি অবলম্বন করিতে পারে। শ্রমিক সরবরাহের এই অনিশ্চয়তা নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় পুঁজিপতির আগ্রহের অভাবের জন্য বহুলপরিমাণে দায়ী। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের দায়িত্বহীনতাও অনেকটা শ্রমিক সরবরাহের অনিশ্চয়তা হইতে উদ্ভূত। স্থায়ী শ্রমিকের [illegible] এবং শ্রমিকদের গৃহাদি নির্মাণ ও অন্যান্য সুখস[illegible] অথ[illegible] ফলে ক্ষুদ্র কলকারখানা [illegible] অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া যায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে [illegible] অর্থ ঢালিবার পরে সুফল দেখিবার প্রতীক্ষায় থাকার [illegible] আকস্মিক কিছু লাভের পর তাহা [illegible] যায়। শিল্পের অনিশ্চয়তা প্রধানত শ্রমিকের [illegible]। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষতায় আন্তর্জাতিক [illegible] অনিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পারিবারিক [illegible] না করায় শ্রমিকদের কর্মে দাম হ্রাস পায় এবং নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে।

ইংলন্ডের শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক বসতি গড়িয়া [illegible] শিল্পকেন্দ্র শ্রমিকের প্রবাসী জীবনের আশ্রয়ভূমি নহে উহা তাহাদের জন্মস্থান ও চিরকালের বাসভূমি। প্রধানত বহিরাগতরাই পশ্চিম বঙ্গের শ্রমশিল্পী এ রাজ্যে তাহারা আপন [illegible] করে নাই। স্বীয় পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া [illegible] ও পরিবেশ ছিন্ন করিয়া অর্থোপার্জনের জন্য তাহারা এখানে বাস করে। [illegible] আগ্রহে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইবার দিনের প্রতীক্ষায় তাহারা থাকে। জন্মস্থান পরিচিত পরিবেশ [illegible] বন্ধন ও পোষ্য পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপনের [illegible] ও তাহা [illegible] বৃহৎশিল্পের সৃষ্টি। বৃহৎশিল্পের প্রতি লোকের বিরুদ্ধ মনোভাবের ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ। পশ্চিম বঙ্গে এই সকল শিল্প পরগাছার মত হইয়া আছে। ইহারা পশ্চিম বঙ্গ শোষণ করে পোষণ করে না। কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত জনগণের অতি সামান্য অংশেরই শিল্পে কর্মের সংস্থান ঘটে। অন্যান্য রাজ্যে ও দেশে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে লোক চলাচল দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এখানে উৎপাদনের ক্ষেত্র দুইটি পরস্পর সম্পর্কহীন বলা যাইতে পারে। উভয়ের সংযোগস্থল অতি সংকীর্ণ।

শ্রমিকগণ যে শিল্পাঞ্চলের অস্থায়ী বাসিন্দা এবং তাহাদের সরবরাহ যে অনিশ্চিত, শহরের শ্রেণীভেদে তাহাদের বয়সের বিভিন্নতায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতা অঞ্চলের প্রতি ১০০ জন পুরুষের ৭৩ জনের বয়স ১৫ হইতে ৫৫ বৎসরের মধ্যে। ৫৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধের হার শতকরা মাত্র ৫, অবশিষ্ট ২২ জন শিশু ও কিশোর। অন্যান্য শিল্প শহরে এই হার যথাক্রমে ৬৪, ৭ ও ২৯। আবাসিক শহরে কর্মক্ষম ৬১ বৃদ্ধ ৮ এবং বালক ৩১। রেলওয়ে শহরে উহা ৫২ ৫ ও ৪৩। রেলওয়ে শহরে বালক ও বৃদ্ধের মোট সংখ্যা ৪৭ কর্মক্ষমদের সংখ্যার প্রায় সমান। নারীর হারও এখানেই সর্বাধিক। সপরিবারে কর্মস্থলে বাস করাই যে রেল কর্মীদের সাধারণ নিয়ম তাহা বুঝা যায়। কলিকাতা অঞ্চলে বালক ও বৃদ্ধের হার কর্মক্ষম

পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি। স্বাভাবিক নিয়মে উভয় সংখ্যা সমান হওয়া উচিত ছিল। এই বৈষম্য প্রমাণ করে যে, নারী, বালকবালিকা ও বৃদ্ধদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া অর্থোপার্জনের জন্য শ্রমিক শিল্পাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কাজ করিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় শ্রমিকের কার্য সাময়িক এবং তাহাদের সংখ্যা অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। ১৯২১ সনের পর হইতে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। শিল্পশ্রমিকদের মজুরি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের সময় হইতে অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শিল্প শহরে খাদ্যের মূল্য কম এবং উহার সরবরাহ সুনিশ্চিত। শ্রমিকদের বাসস্থানেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এইসকল সুযোগ গ্রহণের জন্য কর্মস্থলে সপরিবারে বাস করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িতেছে। সকল শহরেই পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

উপসংহার

গত একশত বৎসরের মধ্যে প্রাচীন পৌরাঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের যত দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুত গতিতে হইয়াছে নূতন নূতন শিল্প শহরের অভ্যুত্থান। কেবলমাত্র শিল্পকেন্দ্রের স্থানপরিবর্তন ইহা নহে, ইহা শিল্পের যুগান্তর। শিল্পজাত দ্রব্য এবং বাজারেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও অতি সুসংগঠিত শিল্প, নিপুণতা ও কারিগরির স্থান ভূরি উৎপাদনকারী শক্তিচালিত যন্ত্রশিল্প অধিকার করিয়াছে। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচা মাল রপ্তানি আরম্ভ করিয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া লোকের দৃষ্টি শিল্প হইতে কৃষির দিকে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বিনা প্রতিবাদে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন সম্ভব হইয়াছিল। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এই রাজ্য শোষণের পথ নিষ্কণ্টক হইয়া গেল।

শিল্প শহর কয়টি বিদেশী কারখানায় পরিণত হইল। সেখানে এই রাজ্যের জন্য নহে, বিদেশের জন্য মূলধন সৃষ্টি হইতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প দ্বারা এই রাজ্যের আর্থিক উন্নতি অথবা জনগণের জীবনধারার পরিবর্তন সাধিত হইল না। শিল্প হইতে ছিটেফোঁটা সাহায্য পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহাতে দেশ সমৃদ্ধ হয় নাই। বিদেশী মূলধন পৌরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে স্থায়ী ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লীর জনগণ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেছে অথচ শহরে উৎপাদিত বিপুল অর্থ রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে পাঁচটি বড় বড় শিল্পাঞ্চল থাকা সত্ত্বেও শহরগুলি রাজ্যের ধনবৃদ্ধি অথবা রাজ্যের লোকের কর্মের সংস্থান করিতে না পারিবার কারণ ইহাই।

সময় সময় বলা হইয়া থাকে যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর অর্থাগমের জন্য অন্য রাজ্যের লোকের মত বাঙালী কলকারখানার কাজ করিতে ইচ্ছুক নহে, বরং উহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকে। বাঙলার পূর্ব শিল্পসমৃদ্ধি হইতে প্রমাণিত হয়, বাঙালী স্বহস্তে হাপরে অথবা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত হইতে অনিচ্ছুক ছিল না। অন্য ক্ষেত্রে যাহা গুণ বলিয়া গণ্য হয়, বাঙালী শ্রমিকের তাহাই দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী শ্রমিক সুদক্ষ শিল্পী; ভূরি উৎপাদন অপেক্ষা স্বকীয় পরিকল্পনা রচনা এবং তাহা স্বাধীনভাবে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা তাহার অধিক। রাজ্যের বৃহৎশিল্পে বাঙালীর শক্তির পরিচয় দিবার ক্ষেত্র অপ্রচুর। যে কাজে সূক্ষ্ম কারিগরির প্রয়োজন সেখানে বাঙালী নিযুক্ত হইয়া থাকে।

যে কাজে দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতা আবশ্যক, সে কাজ হইতে শীর্ণদেহ ও ক্ষীণশক্তি বাঙালী সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে বাঙালীর জীবিকার শোচনীয় অবনতির কথা আসিয়া পড়ে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শিল্প শহরে জীবিকা নাগরিক জীবনের সহিত অনেকটা সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আবাসিক শহরে অকৃষি উপজীবিকা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। লোক তথাপি শহরের দিকে ছুটিতেছে কেন? কৃষিক্ষেত্রের অতিজনতার চাপ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় লোক শহরে যায়। অনেকেরই সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা থাকে না। শহরে যে কাজ জোটে তাহাই গ্রহণ করিবে, বাঁচার জন্য সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিবে; মনে এই সংকল্প নিয়া গ্রাম ছাড়ে। এইরূপ বহু লোকের ভিড় জমে শহরে। কর্মের সংস্থান হইলেও পরিবারসহ শহরে বাস করিবার পক্ষে উপার্জন যথেষ্ট হয় না। সুতরাং পরিবারের একাংশ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের বাড়িতে রাখিতে হয়। এইরূপে কৃষি ও অকৃষি, এই দুই উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া জনগণের একাংশ কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতেছে। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এজন্যই শহরে লোক দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে।

উপরের আলোচনার ফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ (১) শহরের বৃদ্ধির তুলনায় শিল্পাঞ্চলেও শিল্পায়ন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, (২) কৃষিক্ষেত্রে অতিজনতার চাপ শহরে দ্রুত লোকবৃদ্ধির কারণ। জীবনধারণের নিম্ন মান লোকবৃদ্ধির পরিণাম, (৩) কৃষির রিক্ততা হইতে মুক্তির সন্ধানে লোক শহরে আসিয়াছে। কিন্তু নাগরিকতা সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র; (৪) শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য অকৃষি বৃত্তি গ্রামত্যাগী জনগণের প্রকৃত সাহায্য অতি সামান্যই করিয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিবর্গ

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভূমিকা

এদেশে প্রত্যেক চাষী পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে। চাষ বীজবপন, ফসল কাটা শস্য গোলায় তোলা, বিক্রয় জমির বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছু ঐ পরিবারই করিয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক জনগণের সমৃদ্ধি ও প্রগতি ভূমি রাজস্ব ও খাজনা ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকের উন্নতি বা অবনতি উহার সহিত জড়িত। সুতরাং কৃষিজীবীদের অবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে উহার পটভূমিকাস্বরূপ ভূমিরাজস্ব বিধির আলোচনা আবশ্যক। বাঙলার ভূমিরাজস্বের বিষয় উল্লেখ করিলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা আসিয়া পড়ে। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাবিধি রাজ্যের অধিবাসীদের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক কথায় বলা যায় ইংরেজ আমলের বাঙলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। স্বাধীনতার যুগ এখনও তাহার জের টানিয়া চলিয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিবৃত্ত

শাসনকেন্দ্র দিল্লী বা আগ্রা হইতে বহুদূরে অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙলার মুসলমান শাসকগণ বহুবার বিদ্রোহী হইয়াছে। সুবাদারের ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আকবর বাদশা সুবে বাঙলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া সুবা শাসনের ভার নাজিমের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল দেওয়ান রাজস্ববিভাগের কর্তা ছিলেন। ঔরঙজীবের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইয়া বাঙলায় আসেন। ১৭০৩ ৪ অব্দে তিনি বাঙলার সুবাদার হন। নাজিমি ও দেওয়ানি এই দুই পদই তাঁহার হস্তগত হইল। অতি কঠোরতার সহিত মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজস্ব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ে অপারগ জমিদারদের জমিদারি কাড়িয়া নিয়া নূতন এক শ্রেণীর ইজারাদারের নিকট উহা পত্তন করা হইত। পরবর্তী নাজিম উৎপন্ন শস্যের রাজকীয় অংশের পরিমাণে ভূমিকর ধার্য না করিয়া জমিদার বা ভূঁইয়ার আর্থিক অবস্থা অনুসারে উহা নির্ধারিত করিতেন। ইহা ব্যতীত আবওয়াব বা অতিরিক্ত করও আদায় করা হইত। মীরকাসিম (১৭৬০ ৬৩) নাজিমের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূমিকর আরও বাড়াইয়া দিলেন। ১৬৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয় করিয়াছিল। এই জমিদারি হইতে কোম্পানি নানাভাবে লাভবান হইয়াছিল। জমিদারির লাভ কোম্পানিকে আরও জমিদারি অর্জনে প্রলুব্ধ করে। ১৭৫৭ সালে চব্বিশপরগনার জমিদারি কোম্পানির হস্তগত হয়। বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারি ১৭৬০ সনে মীরকাসিম কোম্পানিকে প্রদান করেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা ও বিহারের দেওয়ানি পদ লাভ করে। দেওয়ানি গ্রহণের ফলে দেশের শাসনব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াই কোম্পানি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া গেল। বাঙলার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট অর্থের জন্য কোম্পানির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। জনসাধারণ বুঝিতে পারিল না যে, নবাবী আমল শেষ হইয়া কোম্পানির আমল আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা মনে করিল কোম্পানি বাদশাহের দেওয়ান বা তহশিলদার মাত্র। ক্লাইভ এইরূপে গণবিদ্রোহের শংকা দূর করিয়াছিল। আকবর প্রতিষ্ঠিত দেওয়ান ও নাজিমের পদ একই সম্রাটের অধীনে শাসনব্যবস্থার কর্মবিভাগ মাত্র ছিল। সম্রাট শাহ আলমের দেওয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে দেওয়ান হইলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙলার রাজস্বের ইজারাদার ছিল। আকবরের দেওয়ানের সংগৃহীত অর্থ রাজকার্যে ব্যয়িত অথবা রাজকোষে সঞ্চিত হইত। শাহ আলমের দেওয়ান অক্ষম সম্রাট ও নাজিমের ভাতা প্রদানের পর উদ্বৃত্ত বিপুল অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিত। অর্থ ও ক্ষমতা গেল কোম্পানির হাতে, শাসনের দায়িত্ব রহিল নাজিমের। যত শীঘ্র যত অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যায় কোম্পানি সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। সর্বাধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে মীরকাসিমের ধার্য কর আদায়ের চেষ্টা চলিল। অর্থ আদায়ের জন্য প্রজানিগ্রহ আরম্ভ হইল। অসহায় নবাব কোম্পানির কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত না। এই অবস্থায় বাঙলার হতভাগ্য জনগণের এক তৃতীয়াংশের অধিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মন্বন্তরের পর বৎসর কর্ষণাধীন ভূমির এক তৃতীয়াংশ খিল পড়িয়াছিল। ছয় বৎসর পরে কর্ষণাধীন ভূমির অর্ধাংশ পতিত ছিল। মন্বন্তরের পর পনর বৎসর পর্যন্ত পরিত্যক্ত ভূমির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জনাকীর্ণ জনপদ শ্বাপদসংকুল অরণ্যে পরিণত হইলেও রাজকর আদায়ে কোম্পানির শিথিলতা ছিল না। ভূমিকর আদায়ের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস জমিদারি নিলামে চড়াইলেন। অনেক পুরাতন জমিদারের জমিদারি নূতন ইজারাদারের হস্তগত হইল। পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় ডাকের সময় জমিদারি হস্তচ্যুত হইবার আশংকায় জমিদার ও ইজারাদারগণ জোরজুলুম করিয়া যত অর্থ আদায় করা সম্ভব তাহা করিতে লাগিল। চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন ইজারাদার কোম্পানিকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। কোম্পানির রাজস্বের অনিশ্চয়তা দূর হইল না। এদিকে বাঙলার রায়তের দুর্দশার করুণ কাহিনী ফ্রান্সিস প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। হেস্টিংসের সভাসদরূপে সার ফিলিপ ফ্রান্সিসই সর্বপ্রথম জমিদারি নিলামে চড়াইয়া অতিরিক্ত ভূমিকর আদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সরকারী ব্যয়ের অতিরিক্ত কিছু আদায় করা অন্যায়। কারণ বাঙলা হইতে আদায়ী রাজস্ব বিজিতের দেয় কর ছিল না উহা ভূমিরাজস্ব মাত্র। তিনি ভূমিকর চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পিটের ইন্ডিয়া আইনে ভূমিকর চিরস্থায়ী করিবার ইঙ্গিত ছিল। এই আইনের মর্ম অনুসারে কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ অব্দে ভূমিরাজস্বের দশসালা বন্দোবস্ত করেন। বৃটিশ

মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই দশসালা বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করিবার অনুমতি দেন।

কোম্পানির দেওয়ানী লাভ বাঙলা তথা ভারতের পক্ষে একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার দাবীকৃত রাজস্বের পরিমাণ দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কেবলমাত্র ভূমিকরই দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। ইহা হইতে দেশরক্ষা খাতের তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া ভারত জয়ের জন্য ব্যয়িত হইত। ঐতিহাসিক মিলের মতে হিন্দুর দেশ মুসলমানের অধিকারে যাওয়া অপেক্ষা কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তি বৃহত্তর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। মুসলমান আমলে হিন্দু সামন্তগণের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ছিল। দেশের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাহারা শাসনকার্য নির্বাহ করিত। মুসলমানগণ এদেশকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বাহিরের আকর্ষণ তাহাদের ছিল না। তাহাদের সংগৃহীত রাজস্ব এদেশেই ব্যয় হইত। কোম্পানি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ বাঙলাকে নিঃস্ব করিয়া ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিসৌধ রচনা করিয়াছে। দেওয়ানী লাভের সাত বৎসর পর কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করিল। দেওয়ানীর অর্থে সেনাবাহিনী গঠনের দ্বারা শক্তিশালী হইবার পর পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সংশয় আর ছিল না। ক্রমে বাঙলার নিজস্ব শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিল। জনসাধারণের জীবনে নূতন শাসনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জনবহুল গ্রামাঞ্চল জনহীন বনাঞ্চলে পরিণত হইল। শিল্পসমৃদ্ধ শহরে লোক হ্রাস পাইতে লাগিল। ইংলন্ডের পণ্যে বাঙলার বাজার ছাইয়া গেল। বাঙলার শিল্পী ও বণিক বেকার হইয়া পড়িল। পলাশির প্রাঙ্গণে ক্লাইভ যুদ্ধজয় করিয়াছিল, আট বৎসর পরে এলাহাবাদে আর্থিক জয়ের ভিত্তি রচনা করিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি

১৭৬৩ সনে বাঙলা ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল। তখন দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ভূমিকর ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু উহা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। ভূমিরাজস্ব নিলামে তুলিবার পর হইতে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় করের পরিমাণ যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা হেস্টিংসের কাউন্সিলের সভায় স্বীকৃত হইয়াছে। হেস্টিংসের প্রথম পাঁচ বৎসরের ইজারার ইতিহাস বিরাট ঘাটতি, জমিদারের কর অনাদায়, ভূমি ছাড়িয়া রায়তের পলায়ন এবং পলাতক চাষীর ইতিহাস। মিডল্‌টন মনে করিতেন, অতিরিক্ত করধার্য এবং কৃষিক্ষেত্র প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটিয়াছিল। সকলের খাজনা মকুফের উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। মন্বন্তরের তের বৎসর পরেও কোন কোন জেলার কালেক্টর জনগণের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একজন লিখিয়াছিলেন, "কোম্পানির অত্যাচার ও লুটে শিহরিয়া উঠিতে হয়।" অপর একজন লিখিয়াছেন, "কোম্পানির অত্যাচার এরূপ উৎকট যে, উহার পূতিগন্ধে আকাশবাতাস কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে।" হান্টার লিখিয়াছেন, মন্বন্তরের পর পনর বৎসর পর্যন্ত জনশূন্যতা ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ষণাধীন ভূমির অর্ধেকের বেশি পরিত্যক্ত বলিয়া সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ আছে। অতিরিক্ত ভূমিকরের প্রতিবাদে হেস্টিংসের শাসনকালে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। জনগণের দুর্গতি ও কালেক্টরগণের আপত্তিতে কোম্পানির অর্থলালসা প্রশমিত হইল না। কোম্পানি আদেশ দিয়াছিল যে, "ভূমিকরের পরিমাণ এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে ব্যয়ের পর একটি উপযুক্ত রক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করা যায় এবং এতকাল কোম্পানি যে পরিমাণ অর্থ পাইয়া আসিতেছিল তাহা যেন পাইতে পারে।" এই নির্দেশ অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূমির উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হইল না, কোম্পানির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভূমিকরের পরিমাণ স্থির করা হইয়াছিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে মোট দুই কোটি ষাট লক্ষ টাকা কর আদায় হইয়াছিল। ১৭৬৫ অব্দে ধার্য করের পরিমাণ ছিল দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা। ইহা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। ১৭৬৫ সন হইতে ১৭৯৩ সনের মধ্যে বাঙলার উপর দিয়া কত বিপদ চলিয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল দুইবার। তহসিলদারের অত্যাচারে কত লোক জমাজমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কর্ষণাধীন ভূমির অর্ধেকের বেশি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এসব সত্ত্বেও ১৭৬৫ সনের ধার্য কর দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা ভূমিকর নির্ধারিত করা হইল। তখনকার অবস্থায় এত অধিক কর আদায় করা অসম্ভব ছিল। কৃষির উন্নতি ঘটিলে ও বনাঞ্চল কর্ষণাধীনে আনয়ন করিলে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি পাইবে এই সম্ভাবনার উপর ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। এজন্য বলা হইয়াছে, যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভবিষ্যতকে দায়াবদ্ধ করা হইল। অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ বন্ধকী তমসুক হইল। যে অঞ্চলে লোক ও কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বেশি ছিল সেখানে ভূমিরাজস্বের চাপ জমিদারের উৎকণ্ঠার কারণ হইল। মন্বন্তরের লোকক্ষয় ১৭৯৩ সালেও পূরণ হয় নাই, অধিকাংশ জেলাই ছিল জনবিরল। লোকাভাবে নূতন জমির চাহিদা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা বাড়িতে থাকে, তখন পতিত জমি ও বনভূমি ক্রমশ কর্ষণাধীনে আসিতে লাগিল। যেসকল জমিদারের এলাকায় অনাবাদী জমি বেশি ছিল তাহাদের লাভের আর সীমা রহিল না। চাষবাস বৃদ্ধির পর দেখা গেল আয়ের তুলনায় এই সকল জমিদারির রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প। এই লাভের প্রলোভন লোকদিগকে জমির দিকে আকৃষ্ট করিয়া নানা স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

কাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত

কর্নওয়ালিস জমিদারের সহিত ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঔরঙজীবের রাজত্বকাল পর্যন্ত সামন্ত নরপতিদিগকে বুঝাইতে "জমিদার" শব্দ ব্যবহৃত হইত। পুরাতন রাজবংশধরগণও এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। অর্থলোভে মুর্শিদকুলি খাঁ ইহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভূমিরাজস্ব আদায়কারী জমিদারের দল সৃষ্টি করেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের আশায় মীরকাসিম কোন কোন প্রাচীন জমিদার বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরাতন জমিদারের ন্যায় নূতন জমিদারগণও তাহাদের জমিদারিতে শাসক, বিচারক, শান্তিরক্ষক এবং জনহিতকর কার্য সম্পাদক ছিল। মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিলে সেই অরাজকতার যুগে জমিদারেরাই ছিল লোকের রক্ষক। জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী ও সাহিত্যিক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত। এক কথায়, জমিদারেরা ছিল প্রজার মা-বাপ। প্রজার উপর ইহারা অত্যাচার করিত না এমন নহে, কিন্তু সেই অত্যাচার ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচার। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব নীলামে চড়াইলে শাসক ও প্রতিপালক জমিদারের স্থান শোষক ইজারাদারগণ দখল করিল। দর হাঁকাহাঁকিতে রাজস্বের পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তৃতীয় বৎসরে ভূমিরাজস্বের

প্রথম নিলাম হয়। পশ্চিমবঙ্গ তখন শ্মশানে পরিণত। জমিদারদের অনেকে জমিদারি হইতে ডাকের পরিমাণ অর্থ আদায় করা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া ডাক হইতে সরিয়া পড়িল। ইজারাদারদের কেহ কেহ ছিল হেস্টিংস ও কোম্পানির অপর ইংরেজ কর্মচারীদের বেনামদার। ডাকের তিন বৎসর পরে প্রকাশ পাইল যে, বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ইংরেজ কর্মচারীর মুৎসুদ্দীগণের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে হেস্টিংসের মুৎসুদ্দীর ইজারার পরিমাণ ছিল বিপুল ও সর্বাধিক। অবশিষ্ট ইজারাদারগণ কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতে ভূমিরাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিরূপে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধনী হইয়াছিল। প্রজার সহিত ইহাদের 'মা-বাপ' সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অর্থোপার্জনের নূতন পন্থারূপে ইহারা জমিদারি ডাকিয়া নিয়াছিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে যত সম্ভব অর্থ সংগ্রহের সংকল্প লইয়া নূতন জমিদারেরা কার্যে প্রবৃত্ত হইল। প্রজা নিপীড়ন করিয়া লুট আরম্ভ হইল। এই লুট নিবারণের জন্যই ফ্রান্সিস রাজস্ব হ্রাস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। পনর বৎসরের পূর্বে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৭৭২ হইতে ১৭৯৩ সনের মধ্যে চারবার ভূমিরাজস্বের নিলাম হইয়াছিল। ইজারাদারদের রদবদল ঘটিল। ১৭৮৯ সনে যাহারা জমিদারি ডাকিয়া নিয়াছিল, সেই ইজারাদারদের সহিত ১৭৯৩ সনে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হইল। এক শত ষাট বৎসর পর, ১৯৫৩ সনে, এই বন্দোবস্ত রদ হইতে চলিয়াছে।

বন্দোবস্তের শর্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ইজারাদার বা জমিদার আইনত জমির মালিক হইলেন। স্থিরীকৃত ভূমিকর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারিলে জমিদারি নিলামে বিক্রয় করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইবে। জোর জুলুমে খাজনা আদায় না করিয়া আদালতের সাহায্যে রায়তের খাজনা আদায়ের কথা লিখিত হইল। কিন্তু এই শর্তটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইত। জমিদারিতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব আর জমিদারের উপর রহিল না। ভূমিরাজস্ব স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু পথকর, শিক্ষাকর প্রভৃতি কর আদায়ের পথ উন্মুক্ত রহিল।

বন্দোবস্তের সময় ভূমিরাজস্ব আদায় ছিল গভর্নমেন্টের লক্ষ্য। আদায়ের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট সর্বদা জমিদারদিগকে সাহায্য করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। গভর্নমেন্টের সৃষ্ট নূতন জমিদারগণ গভর্নমেন্টের সমর্থন করিত, গভর্নমেন্টও আপদে-বিপদে সাহায্য লাভের আশায় জমিদারের সাহায্য করিতেন।

রায়তের অবস্থা

ভারতে ভূমির মালিক কে ছিল, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। স্যার জন শোর ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একজন প্রধান কর্মকর্তা। তিনি বলিয়াছেন, গভর্নমেন্ট, জমিদার ও রায়তের পারস্পরিক সম্বন্ধ সুনির্দিষ্ট নহে। জমিদার গভর্নমেন্টের এবং রায়ত জমিদারের অনুগ্রহাধীন ভূমির অধিকারী নহে, আবার ইহারা পূর্ণ স্বত্ববিশিষ্ট ভূমির মালিকও নহে। এ যেন উভয়ের মিলনে সৃষ্ট এক নূতন ব্যাপার। এই মিশ্র সম্বন্ধ ভূম্যধিকারী ও রায়তের সম্বন্ধে পরিণত হওয়া সময়সাপেক্ষ। অথচ বাঙলার সমস্যা সমাধানে বিলম্ব করা চলে না। অস্পষ্টতা ও দ্রুততার অজুহাতে বাঙলার মূক জনগণের চিরকালের স্বত্বস্বামিত্ব কাড়িয়া নিয়া জমিদারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

বেডেন পাওয়েল মনুর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, এদেশে চাষীই ভূমি কর্ষণাধীনে আনয়ন করিয়াছিল। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে ভূমির মালিক চাষী। কিন্তু চাষী একা জমির উৎপন্ন শস্য ভোগ করিত না। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সে তাহার শ্রমলব্ধ শস্য হইতে রাজা, মোড়ল, গুরু, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিকে কিছু কিছু দিবার পর অবশিষ্টাংশ নিজে ভোগ করিত। এইরূপে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত স্বামিত্বের সহিত সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ অপরের আংশিক দাবির সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। রাজা ও মোড়ল বা জমিদারের স্বত্ব জমিতে ছিল না, জমিতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জমির প্রকৃত মালিক ছিল চাষী। রাজকর চালাইলে চাষীর জমিজমা কেহ কাড়িয়া নিতে পারিত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আইনের দ্বারা রায়ত ও জমিদারের সম্বন্ধের পরিবর্তন সাধিত হইল। ভূমির মালিক হইল জমিদার, আর রায়ত জমিতে উৎপন্ন শস্যের অধিকারী মাত্র। চাষী জমির মালিকের পরিবর্তে জমির ভাড়াটে হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তকগণ রায়তের চিরকালের স্বত্ব যে হরণ করিলেন, এ বিষয়ে তাঁহারা সচেতন ছিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, প্রয়োজনবোধে অসহায় রায়তদিগকে রক্ষা এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য গভর্নমেন্ট বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিবেন। কোম্পানির আমলে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। ভূমিরাজস্ব আদায়ের সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ও আদালত জমিদারের স্বার্থরক্ষা করিতে যাইয়া রায়তের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ১৮৫৯ সন পর্যন্ত ভূমি ও রায়তের উপর জমিদারের অধিকারই ক্রমশ সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে প্রজার স্বত্ব রক্ষার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল

রায়তের দুর্গতি: নূতন জমিদার ও রায়ত অনেকক্ষেত্রে পরস্পর অপরিচিত ছিল। জমিদারের বাসস্থান সাধারণত জমিদারি হইতে দূরে থাকিত। জমিদার ও রায়তের মধ্যে প্রজা-মনিব সম্বন্ধের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং অর্থ আদায়ে জমিদারের কোন দ্বিধাসংকোচ ছিল না। আসল জমা ও আবওয়াব বা বাজে জমার আনুমানিক পরিমাণের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। আসল জমা ছিল অতি সামান্য। আবওয়াব ধরিয়া রাজস্ব হিসাব করায় প্রকারান্তরে জমিদারদিগকে আবওয়াব আদায়ে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছিল। কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী কথা বলিয়া কোম্পানির দোষ ক্ষালনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার বলিয়াছেন, "প্রজাগণ উৎপীড়িত হউক, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা করেন না।" আবার বলেন, "চাষবাস বৃদ্ধির ফলে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হইত, তাহার অংশ গ্রহণ করিবার দেশীয় প্রথা ডিরেক্টরগণ অনুসরণ করিয়াছেন।" আবওয়াব সাধারণত আসল জমার টাকাপ্রতি এক আনা ধরা হইত। খাজনা দিবার সময় টাকাপ্রতি দুই আনা তহুরি আদায় করা হইত। জমিদার বা তাহার কোন আত্মীয় তহসিল কাছারিতে শুভাগমন করিলে 'নজর' দিবার নিয়ম ছিল। জমিদার বাড়ির অন্নারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যতপ্রকার অনুষ্ঠান হইত তাহাতে রায়তকে অর্থ অথবা জিনিসপত্র দিতে হইত। রায়তের চাঁদায় জমিদার বাড়ি বা কাছারিতে যাত্রা,

কবি, রামায়ণ প্রভৃতি গানের আসর জমিত। মনিব বাড়ি বা কাছারির দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির উপকরণ প্রজার বাড়ি হইতে আসিত। প্রজার অপরাধের বিচার করিয়া অর্থদন্ড করা হইত। মনিবকে 'রাজধুতি' না দিয়া রায়তের পুত্রকন্যার বিবাহ হইতে পারিত না। ভূমির মালিক জমিদার, সুতরাং উহার রূপান্তরের অধিকার প্রজার ছিল না। পুকুর বা কূপ-খননের অনুমতি লাভের জন্য টাকা দিতে হইত। ঘরের ভিটি পাকা করিবার বা কোঠা বাড়ি নির্মাণের অনুমতি অর্থের বিনিময়ে লাভ করিতে হইত। প্রজার স্বহস্তরোপিত ফলবান্ বৃক্ষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিতেন জমিদার। এইরূপ অসংখ্য প্রকারে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জমিদার বা তাহার কর্মচারীর বেগার খাটা রায়তের অবশ্য-কর্তব্য ছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা বা ভূমি জবরদখলের জন্য জমিদারের ডাকে লাঠিয়ালদের হাজির হইতে হইত।

পতিত জমি, জলাভূমি ও বনাঞ্চল কর্ষণাধীনে আনয়নের জন্য সাঁওতাল ও অন্যান্য লোকদের নিকট প্রথম উহা বিনা খাজনায় পত্তন করা হইত। দুই তিন বৎসর পর উৎপন্ন শস্যের অংশ আদায় এবং অবশেষে, বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে, তাহাদিগকে জমিচ্যুত করা হইত। যাহারা যথেষ্ট খাজনা দিতে প্রস্তুত, জমি তাহাদের হাতে যাইত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের ভূমি আবাদের ইহাই বৈচিত্র্যহীন ইতিহাস। চাষের জন্য ভূমি উদ্ধারের এই পদ্ধতি সুন্দরবনেও অনুসৃত হইয়াছে। এইরূপে জমিদারগণ প্রায় বিনা অর্থব্যয়ে আবাদ বৃদ্ধি করিয়াছে। সেচের জন্য পুকুর, খাল, জলনিকাশের প্রণালী, নদীর বাঁধ, পোল, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ ও বাজার-স্থাপনের অর্থও রায়তের নিকট হইতে আসিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়তের খাজনা বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছিল।

কৃষির বিস্তার ভূমির আয়তনের দ্বারা সীমায়িত। কর্ষণযোগ্য ভূমি কর্ষণাধীনে আনয়নের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মন্বন্তরের লোকক্ষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূরণ হইবার পর লোকবৃদ্ধি আরম্ভ হইল। এই সময়ে দেশীয় পণ্য রপ্তানির বাধা সৃষ্টি এবং বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির দ্বারা কোম্পানি বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল। বেকার শিল্পী ও ব্যবসায়ী আসিয়া ভূমির চাপ বৃদ্ধি করিল। জমির জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। এই সুযোগে মালিক নগদ টাকার পরিবর্তে জমিতে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ খাজনা দাবি করিল। নিরুপায় কৃষকগণ মালিকের শর্তে জমি গ্রহণে বাধ্য হইল। শস্যের ভাগ দাবিতে টাকার হিসাবে খাজনা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। ভূমির মালিক লাভবান হইল বটে, কিন্তু ভাগচাষী তাহারা প্রাপ্য অংশে সংসার চালাইতে পারিত না। এবার সুদখোর মহাজনের আবির্ভাব ঘটিল। ঋণগ্রস্ত চাষীর ঋণ ও সুদের বোঝা বাড়িতে থাকে, কিন্তু আয়বৃদ্ধির উপায় তাহার নাই। ক্রমশ দেনার দায়ে স্বীয় ভূমিখন্ড জমিদার, মহাজন বা অপর কাহারও হাতে চলিয়া যাইত। নূতন মালিক অকৃষিজীবী। সাধারণত জমি পূর্বে কৃষকের নিকটেই পত্তন করা হয়। এইরূপে মালিক-চাষী ভাগচাষী অথবা কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের ভূমির মালিকের এই শোচনীয় পরিণাম। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্য তাহার নিত্যসহচর।

মধ্যস্বত্বভোগীঃ রোদে না পুড়িয়া, জলে না ভিজিয়া, ধুলা কাদা না ঘাঁটিয়া, কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া উপার্জন করিবার পথ আবিষ্কৃত হইবার পর বহুলোক ভূমির মালিক হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। জমিদার ও মহাজন পূর্ব হইতেই কৃষকের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এবার অন্যান্য বিত্তবান এবং চতুর লোক জমির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কোম্পানির আমলে অর্থোপার্জনের অন্য উপায় অতি অল্পই ছিল। ভূমির মালিক হইলে অর্থের সঙ্গে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। এজন্য মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। জমিদার ও রায়তের মধ্যবর্তী স্থান ইহাদের। ইহারা জমিদারেরই সমধর্মী। রায়তের নিকট হইতে জমা ও আবওয়াব আদায় ইহাদের কাজ ছিল। যে জমিদারিতে মুনাফা বেশি সেখানে বহু শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রজাস্বত্ব আইনে আবওয়াব আদায় নিষিদ্ধ এবং রায়তের স্বত্ব বিস্তৃত হইবার পর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগিগণ কেবলমাত্র খাজনা আদায়কারীতে পরিণত হইয়াছে। তদবধি রায়তী স্বত্ব হস্তগত করিয়া ভাগচাষী অথবা কিষাণের দ্বারা চাষবাস করানো অধিকতর লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে বিনা আয়াসে অতি-মুনাফা লাভের ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এজন্যই অ-কৃষক জোতদারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। ভূমির সঙ্গে যোগশূন্য ভূম্যধিকারী এবং চাষের সহিত সম্পর্কহীন জোতদার পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই অবস্থার জন্য দায়ী।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীঃ মধ্যস্বত্বভোগীর ন্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বুদ্ধিজীবী ও মসিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে "বেঙ্গল হেরাল্ড" নামক একখানি দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিলঃ "ভূমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যবর্তী এক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে যাহা পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা এক নবযুগের সূচনা করিতেছে।" লোকবৃদ্ধির সঙ্গে ভূমির দর বৃদ্ধি এবং তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীগণের ধনবৃদ্ধি হয়। ভারতবর্ষ বৃটেনের সংস্পর্শে আসিবার পর কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল বৃত্তিজীবিগণও মধ্যবিত্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থাগম কৃষির উন্নতির ফল নহে। ভূমি বিলির সেলামি, গ্রামাঞ্চলে তেজারতি, অতিরিক্ত খাজনা, আবওয়াব এবং ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় ভাগচাষী ও কৃষিমজুর নিয়োগ হইতে মধ্যবিত্তের ধনবৃদ্ধি হইত। কৃষককে শোষণ করিয়া 'ভদ্রলোক' ধনশালী হইয়াছিল। জমিদার রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোন যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি।' মধ্যবিত্ত উপ-জমিদারের দল জমিদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গেল। কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিল। জমি হইতে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় নূতন আমদানি পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জনের সুযোগ তাহাদের ঘটিল। এই বিদ্যার জোরে ওকালতি, ডাক্তারি, চাকরি প্রভৃতি নূতন বৃত্তি তাহাদের আয়ত্তে আসিল। শহরবাসী 'ভদ্রলোক' ভূমি হইতে আরও আলগা হইয়া পড়িল। মধ্যবিত্তদের যাহারা জমির আয় অবলম্বন করিয়া গ্রামে রহিয়াছিল, তাহারা চাষীর অধিকার সম্প্রসারণের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিল। ভাগচাষী ও কৃষিমজুরদের অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ইহারা প্রবল বাধা দান করিত। দেশে শ্রমের মর্যাদা লোপ পাইল। এই আদর্শে সমাজের নিম্নস্তরেও 'ভদ্রলোক' সাজিবার নেশা সংক্রামিত হইল। এইরূপে শ্রমবিমুখ

খাজনাভোগী মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। শতাধিক বৎসরের নিষ্ক্রিয়তা ভদ্র বাঙালীকে শ্রমসাধ্য কাজের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কোমল হস্ত এখন কলম ছাড়া অন্য কিছু ধরিতে অশক্ত। যাহারা এখন কায়িক শ্রমের অযোগ্য বিবেচিত হয় তাহাদের পূর্বপুরুষেরা মোগল পাঠানের শক্তি প্রতিরোধ করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীর বাস্তব চিত্র চারুচন্দ্র দত্তের লেখায় পাওয়া যায়। “আমার মামার বাড়ি বায়না (বর্ধমান)। আমার মাতামহ মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলেই একটা রোমান্টিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসায় প্রাণ ভরে উঠত। আশপাশের যত পাইক, লেঠেল, ঠ্যাঙাড়ে তাঁকে যমের মত ভয় করত। অনেকেই লাঠি খেলায় তাঁর সাকরেদ ছিল। আর জানত যে নিজে লাঠি ধরলে দশ জন লোকের মওড়া নিতে পারেন। গুরুতর দাঙ্গার সময় আমার দাদামহাশয় Go on lads (বাছারা, এগিয়ে যাও) এর পরিবর্তে Come on, lads, (বাছারা, আমার সঙ্গে এস) বলতেই অভ্যস্ত ছিলেন।’ সেই বাঙালী এখন নির্বীর্য দৈহিক শক্তিতে হীন। বাহিরের লোক না আসিলে পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার চাকা আর ঘোরে না।

নবজাগরণঃ বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও অভ্যুদয়ের মধ্যে অনেকে মধ্যযুগীয় আচারের বন্ধন ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুভফল বলিয়া গণ্য করেন। প্রকৃত রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্পন্দন চিন্তা ও কর্মের অনেক ক্ষেত্রে অনুভূত হইয়া থাকে। এ যেন দারুণ শীতের অবসানে বসন্তের আগমন। বসন্তের আহ্বানে যেমন প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্র সাড়া পড়িয়া যায় রেনেসাঁসও মানুষের প্রতি কার্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া থাকে। যে কর্মের উপর জাতির সকল প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে, সেই কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের নূতন চিন্তাধারার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বাঙলার জনগণের বিরাট অংশ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রহিয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটিল। কৃষি ও শিল্পের অবনতির কারণ ও প্রকৃতির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। জ্ঞান ও নৈতিক অবনতি সাধারণত লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। পূর্বে বাঙলার জনসাধারণ নিরক্ষর ছিল, কিন্তু অজ্ঞ ছিল না। তখন বর্ণপরিচয় জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত না। কবি যাত্রা, কথকতা সামাজিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিতের শাস্ত্রবিচার মৌখিক উপদেশ প্রভৃতি ছিল জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের দেশীয় ব্যবস্থা। বৈষয়িক ব্যাপারে উপদেশ লাভের জন্য লোক হাতের কাছেই পাওয়া যাইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় দূরে থাকিয়া ভূমির আয় ভোগ করা যায়। সুতরাং জমিদার ও মধ্যবিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিল। জ্ঞানবিতরণের উপায়গুলি ক্রমশ বন্ধ হইতে লাগিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের অনতিকাল পরেই এদেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়। তখন আশা ছিল এই বিদ্যা মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মাধ্যমে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছিবে। সেই আশা ফলবতী হয় নাই। নূতন শিক্ষা জনগণের মধ্যে নূতন বিভেদ সৃষ্টি করিল। মধ্যবিত্তেরা চাষীকে অবজ্ঞা করিত, ‘শিক্ষিতেরা’ বিদ্যালয়ে যাহারা প্রবেশ করে নাই তাহাদের সকলকেই ‘অশিক্ষিত’ আখ্যা দিয়া অবজ্ঞা করিতে শিখিল। সুতরাং সমাজের বৃহৎ অংশ মধ্যযুগের জের টানিয়া চলিয়াছে। আলোর নীচে জমাট অন্ধকার রহিয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকেরা গ্রাম ছাড়ায় গ্রামবাসীর নৈতিক বল হ্রাস পাইয়াছে।

অর্থনৈতিক বিপ্লবঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে কোম্পানি বিনা বাধায় বাঙলার আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত রাজ্যের পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ধ্বংস করিয়া বাঙলাকে ইংলন্ডের শিল্পের কাঁচা মাল উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজারে রূপান্তরিত করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন ছিল না। কোম্পানির নূতন ব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিতরূপে ভূমির মালিক হইবার পর অর্থাগমের পথ সুগম হইয়াছে দেখিয়া ভূমিরাজস্বের ইজারাদারগণ খুশি হইয়াছিল। চিরনিগৃহীত রায়ত অদৃষ্টকে দোষী করিয়া পরিবর্তিত অবস্থা নীরবে স্বীকার করিয়া লইল। ব্যবসায়ী তাহার মূলধন ভূমিতে বিনিয়োগ করিল। নিরুপায় গৃহশিল্পী তাহার সুনিপুণ হস্তে লাঙল ধরিতে বাধ্য হইল। এইরূপে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের জীবিকার উপায় হইল কৃষিক্ষেত্র। ভূমির ক্রয়বিক্রয় ক্রমশ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইল। ঋণগ্রহণে ভূমি বাঁধা দেওয়া চলিত। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে লাভজনক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিবাদ তাহারা কখনও করে নাই। রাজস্বের পরিমাণ হ্রাসের আন্দোলন তাহারা সময় সময় করিয়াছে। শোষিতদের ব্যথার ভাষা দিবার শক্তি রায়তের ছিল না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের পর কোম্পানির কার্যের সমালোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৩৭ সালে জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জমিদার ও মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ছিল সভার প্রধান লক্ষ্য। প্রজার উপর ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হইত। নীলকরের অত্যাচার নিবারণের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। জমিদার ও মধ্যবিত্তের নিষ্ঠুরতার সামান্যই প্রতিবাদ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দাদা রায়তের দুর্দশার প্রতি জমিদার ও গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালীকে দীর্ঘকাল কৃষিনির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। ধনীর অর্থ বাঙালীশোষণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিল। জমিদার ও রায়তকে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণদান অপেক্ষা লাভজনক ব্যবসায় আর কিছু ছিল না। জমি বন্ধক রাখাতে টাকা নিরাপদ ছিল। শিল্পের আয় অনিশ্চিত। শিল্প প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি উদ্যম ও সাহসের প্রয়োজন। উহাতে বড় ঝুঁকি নিতে হয় এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রম আবশ্যক। বাঙালী ধনীরা শিল্পের দিক বর্জন করিয়া অনায়াসলব্ধ সুনিশ্চিত আয়ের পথ বাছিয়া নিয়াছিল। বাঙালী ধনীর ক্রম বিবর্তনের পথ বাঁধা ছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী মহাজন এবং অবশেষে জমিদার। জমিদারী ইহারা কিনিত না, বন্ধকী জমিদারি হাতে আসিয়া পড়িত। বহুদিনের অনভ্যাসে ব্যবসায়ে ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের সাহস তাহারা হারাইয়াছে। অনর্জিত অর্থে ভোগ ও বিলাসের অধিকার লাভ করিয়া তাহাদের মন হইয়াছে কর্মবিমুখ। বাঙালী ধনী দূরে সরিয়া থাকায় পশ্চিমবঙ্গ বহিরাগত পুঁজিপতিদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কৃষির অবস্থাঃ ১৭৯৩ সন হইতে জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী রায়ত ও ভাগচাষীর স্বত্বলোপ স্বত্বসাব্যস্ত খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি কেন্দ্র করিয়া বিবিধ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে আইনের সংশোধন হইয়াছে ও নিয়ম রচিত হইয়াছে। কিন্তু যাহার উপর জাতির শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে সেই কৃষি ও কৃষিক্ষেত্র বরাবর উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। চাষের উন্নতি ও কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করিবার লোক কেহই ছিল না। জমিদারের মুনাফা ও ভূসম্পত্তির নির্বিঘ্নতা দেশের ধনী

ও সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদিগকে কৃষিক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে কৃষি কেহই গ্রহণ করে নাই। সোনা চাহিত সকলেই, কিন্তু সোনার জন্য খনন করিতে কেহ ইচ্ছুক ছিল না। যাহাদের পূর্বপুরুষ লাঙল ধরিয়া চাষ করিয়াছে, চাষবাসের তদারক করা পর্যন্ত তাহাদের নিকট হেয় মনে হইত। বাঙলা ভাষায় 'চাষা' শব্দ অবজ্ঞা সূচক গালিতে পরিণত হইয়াছে। অল্পে সন্তুষ্ট অজ্ঞ, নিরন্ন সাঁওতাল প্রভৃতির উপর ধন সৃষ্টি ও রাজ্যের জনগণের অন্ন যোগাবার ভার ন্যস্ত হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান, বাঙলার নূতন সমাজব্যবস্থা, বাবিলন সাম্রাজ্যের চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজা স্বপ্নে এক বিরাট পুরুষকে দেখিলেন, তাহার মাথা সোনার, ধড় পিতলের, হাত লোহার, কিন্তু পা নরম কাঁচা মাটিতে গড়া। পরদিন সভাপণ্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন যে তিনি বাবিলন সাম্রাজ্যের আসল রূপটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সোনার মাথা তিনি নিজে; সাহসী ও কর্মক্ষম মন্ত্রিবর্গ পিতলের দেহ; বিপুল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী লোহার বাহু; অশিক্ষিত জনসাধারণ মাটির পা। সাম্রাজ্য বেশি দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গে জনসমাজের শীর্ষদেশে পরাশ্রয়ী বিলাসী জমিদার; বিদ্যাভিমানী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠন করিয়াছে দেহের মধ্য ভাগ; আর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ঊর্ধ্বস্পৃহাহীন চাষীর দল রহিয়াছে সমাজের পাদমূলে।

ভারত-সরকারের অভিমতঃ কোন কোন বিশিষ্ট বাঙালী অর্থনীতিবিদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণকীর্তন করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন ও তাহার পরিষদ বন্দোবস্তের শতাধিক বৎসর পরে উহার ফল বিচার করিয়া বন্দোবস্তের স্তুতিবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। সপরিষদ বড়লাট এই মন্তব্য করেনঃ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সর্বরোগহর ব্যবস্থা বলিয়া মানিতে পারি না। এই বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার কৃষক অন্যান্য প্রদেশের কৃষক অপেক্ষা অধিকতর সম্পন্ন, প্রয়োজনের সময় উপায় উদ্ভাবনে পটু এবং শস্যহানি ঘটিলে নিজেরাই তাহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম এ কথা স্বীকার করি না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান করিয়াছে, কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণে ও ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছে, সঞ্চিত অর্থ শিল্প, জনহিতকর কার্য ও নানা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছে, এসব কথাও মানিতে পারি না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন হেতু ভারত সরকার খুঁজিয়া পান না।

"গত শতাব্দীতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট-সৃষ্ট ভূম্যধিকারীদের প্রজা বাঙলার কৃষক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার প্রমাণ আরও কম। ইহা সত্য নহে বলিয়া এবং চাষীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন দূরে থাকুক, জমিদারগণ তাহাদিগকে নিপীড়ন করিয়া চড়া হারে খাজনা দিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিয়াই ভারত গভর্নমেন্ট চাষীদের রক্ষার জন্য ১৮৫৯ হইতে ১৮৮৫ সন মধ্যে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সকল আইনের জন্য কৃষক এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। প্রজাস্বত্ব আইন রায়তকে যে সুবিধাদান করিয়াছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহা দেয় নাই, দিতে পারিতও না। বলা হইয়াছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলা দেশে জনহিতকর কার্যে দানের উপায় করিয়া দিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এরূপ দাতার অভাব নাই। জমিদারিতে জমিদারের অনুপস্থিতি, হৃদয়হীন কর্মচারী দ্বারা জমিদারি পরিচালনা, জমিদার ও রায়তের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ অতিশয় সুস্পষ্ট। অন্য কোন সভ্য দেশে এরূপ ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে উহার পরীক্ষা হইয়াছে। এদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তকে ভূম্যধিকারীর সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন করিয়া দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে রায়ত তাহার মুক্তির সন্ধান পায় নাই, জমিদারকে সংযত এবং তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য যেসকল আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাই রায়তের রক্ষাকবচ।

"আইন অনুসারে জমিদারের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তিনি তাহা রায়তের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। কোন কোন জমিদারিতে বে-আইনী গ্রাম্য কর আদায় করা হইয়া থাকে। অনেকক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত বেআইনী কর, সরকারের ধার্য মোট কর অপেক্ষাও অধিক। ১৭৯৩ সালের বিধিতে এরূপ কর আদায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালেও ভারত-সরকার উহা অনুমোদন করেন নাই। তথাপি রায়তের বিরক্তিকর এবং কৃষির ক্ষতিকর এই সকল কর আদায় বন্ধ হয় নাই। কৃষিজীবিগণের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় শিক্ষিত জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত একমাত্র গভর্নমেন্টের চেষ্টায় উহা বন্ধ করা সম্ভব নহে।"

রায়তকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া সপরিষদ বড়লাট মন্তব্য করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, প্রথমত আইন না করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত টিকিয়া থাকিতে পারিত না। এই বন্দোবস্ত রক্ষা করা ছিল গভর্নমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত রায়তের জন্য প্রজাস্বত্ব আইন পরিকল্পিত হইলেও কার্যত উহা দ্বারা গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জোতদারই লাভবান হইয়াছে। জমিদারের নহে, চাষীর ক্ষতি করিয়া ইহারা উপকৃত হইয়াছে। জমিদারের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু তাহার ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়া চলিত। খাজনাবৃদ্ধি এবং প্রজাপীড়নের দ্বারা অর্থসংগ্রহ, ব্যয়বৃদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। নগরে বাস, বিলাসব্যসন, দেশভ্রমণ, মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ব্যয়, জমিদারির আয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। অন্য উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা অতি অল্পসংখ্যক জমিদারই করিয়াছেন। প্রথম ঋণ করিয়া ব্যয়ের মাত্রা ঠিক রাখা হইত। পরে জমিদারির মধ্যস্বত্ব বিক্রয়, জোতদারকে মৌরসী স্বত্বদান ইত্যাদি চলিত। এইরূপে মধ্যস্বত্বভোগী ও অকৃষক জোতদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ভাগচাষী ও কৃষিশ্রমিকের সাহায্যে ইহারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে। প্রজাস্বত্ব আইনের সুবিধা ভোগের আশায় ইহারা চাষীর জমি অধিকপরিমাণে হস্তগত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখা এতাবধি সরকারের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অজুহাতে সরকারের পক্ষে সেচব্যবস্থা প্রভৃতি পূর্তকার্যে নিতান্ত অবহেলা করা সম্ভব হইল। কারণ পূর্তকার্য হইল জমিদারের দায়িত্ব, সরকারের নহে। চতুর্থত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও তৎসহিত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যে এই ব্যবস্থা সহায়তা করিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কৃষিজীবীর হার

স্বাবলম্বী ও পরাশ্রয়ীঃ কৃষিজীবীর গৌণ উপজীবিকা

জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিবর্গের চার শ্রেণীতে মোট স্বাবলম্বীর হার ১৯০১ সন হইতে ক্রমাবনতির ফলে ১৯৫১

সনে ১৪·৯ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। ১৯০১ সনে আত্মনির্ভরশীল মালিকচাষীর হার মোট জনসংখ্যার ১৭·০ শতাংশ ছিল। ১৯৫১ সনে উহা ৭·৫ শতাংশ মাত্র। এই বিরাট বৈষম্যের এক কারণ এই যে, ১৯২১ সন পর্যন্ত বর্গাদারকে মালিকচাষী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত। ১৯২৮ সনের আইনে বর্গাদার রায়ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ইহার ফল প্রথম দেখা যায় ১৯৩১ সনে। ১৯২১ সনের ১৬·২ শতাংশ ১৯৩১ সনে ৮·২ শতাংশে নামিয়া যায়। ১৯৩১ ও ১৯৫১ সনের স্বাবলম্বী মালিকচাষীর হারের প্রভেদ খুব কম। ১৯০১ সনে মোট জনসংখ্যার ২·৪ শতাংশ ছিল আত্মনির্ভরশীল কৃষিমজুর। ১৯৫১ সনে উহা ৪·২ শতাংশে উঠিয়াছে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫০-৫১ সনে কৃষিমজুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জনগণনার ন্যায় ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্যানুসন্ধান করা হয় নাই। সর্বভারতীয় পল্লী অঞ্চলের মাত্র ১.১৫,০০০ পরিবারের খোঁজখবর লওয়া হইয়াছিল। সংখ্যাবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে পরিবারগুলি বাছিয়া নিয়া সংগৃহীত তথ্য হইতে সর্বভারতীয় তথ্য বাহির করা হইয়াছে। এই তদন্ত ও জনগণনার তথ্যের নিকট সাদৃশ্যে উভয় অনুসন্ধানের সত্যতায় প্রত্যয় জন্মে। জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীবাসীর শতকরা ৭৪ ৭ জন কৃষিজীবী এবং ২৫·৩ জন অকৃষিজীবী। পরিকল্পনা কমিশনের তদন্ত অনুযায়ী ঐ হার যথাক্রমে ৭০ ৩ ও ২৯·৭ বলিয়া জানা গিয়াছে। উভয় তদন্তের ফলের বৈষম্য সামান্য। অনুসন্ধান পদ্ধতির বিভিন্নতা এই প্রভেদের কারণ। বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজীবীর হার এরূপ সন্তোষজনক নহে। জনগণনা অনুসারে পল্লীবাসীদের ১৬·০ শতাংশ কৃষিমজুর, ৫৮·১ শতাংশ মালিকচাষী এবং ০·৬ শতাংশ খাজনাভোগী। কমিশনের তদন্তের ফলে ঐ হার যথাক্রমে ১৮ ০ ৫১·৭ ও ০·৬। খাজনাভোগীদের হার উভয় অনুসন্ধানেই একরূপ দাঁড়াইয়াছে। কৃষিমজুর ও মালিকচাষীর হারের অনৈক্যের জন্য তদন্ত পদ্ধতির বিভিন্নতাই দায়ী।

গৌণ উপজীবিকা

দশকের পর দশকে স্বাবলম্বী কৃষিজীবিগণের গৌণ উপজীবিকা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র পল্লীশিল্পের দ্রুত অবনতি তাহাদের গৌণ উপজীবিকার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর করিয়া দিতেছে। কৃষিবর্গের চার শ্রেণীতে পরস্পরের মধ্যে এখনও কিছু অদলবদল চলিতেছে। উহাতে গৌণ উপজীবিকা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। ক্ষুদ্রশিল্প অনেকে মুখ্য উপজীবিকারূপে পরিচালিত করিয়া থাকে। চাষবাস ইহাদের প্রধান উপজীবিকা নহে। সুতরাং কৃষিজীবিগণ গৌণ উপজীবিকারূপে এইসকল শিল্প অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতে পারে না। গ্রাম্য শিল্পের অবনতির জন্য অনেক অকৃষিজীবী উপার্জনের দ্বিতীয় পন্থারূপে কোন প্রকারের কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। দশ হাজার স্বাবলম্বী কৃষিজীবীর মাত্র ৩৫·৬ জনের গৌণ উপজীবিকা অকৃষি উৎপাদন শিল্প। কৃষিবর্গের চার শ্রেণীর মধ্যে লোকের আদানপ্রদানে বুঝিতে পারা যায় যে, অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও কৃষিজীবিগণ অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক। ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটি আশ্রয় করিয়াই তাহারা থাকিতে চাহে। জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগে আগ্রহের অভাব গৌণ উপজীবিকা অবলম্বনের এক অন্তরায়। অকৃষি বৃত্তির অবনতির দরুন অকৃষিজীবিগণ জমির দখলীস্বত্ব লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই স্বত্ব লাভের পর জমি ভাগচাষীর নিকট পত্তন করা হয়। ইহাতে বিনাব্যয়ে মোটা লাভ পাওয়া যায় এবং জমির তত্ত্বাবধানের কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং জোতদার স্থানান্তরে থাকিয়া স্বীয় বৃত্তি অনুসরণ করিয়া যাইতে পারে। এইরূপে শহরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা ঠিক কৃষিজীবী নহে, অকৃষি বৃত্তিতেও ইহাদের পটুতার অভাব। জমি ভাগচাষীর উপর ছাড়িয়া দিয়া ইহারা কৃষির বিস্তর ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক আবাসিক শহরের অধিবাসী ও স্বল্প উপার্জনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কর্ষিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের দ্রুত অবনতির জন্য ইহারাই দায়ী।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জোতের পরিমাণ

ফ্লাউড কমিশন বা ভূমিরাজস্ব কমিশন ১৯৪০ সনে বাঙলার ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং যেসকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহার সার সংকলন করিয়া এই অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা হইবে। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভূমিব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেনঃ

১। প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া বাঙলার ভূমিরাজস্ব অপরিবর্তিত রহিয়াছে। যে প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই এবং ভূমির উর্বরতা অপেক্ষাকৃত অল্প সেখানে গভর্নমেন্ট যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে, বাঙলার রাজস্ব তদপেক্ষা অনেক কম।

২। শস্য ও ভূমির মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং ভূমির বিবিধ উন্নতির ফল অল্পসংখ্যক লোক ভোগ করিয়া থাকে। খনিজদ্রব্য ও নদীর মাছের লাভের অংশও গভর্নমেন্ট পায় না।

৩। ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ না করার ফলে রাজস্বের হারে অসাম্য দেখা দিয়াছে।

৪। পল্লীর অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও জ্ঞানলাভের সুযোগ হইতে গভর্নমেন্ট বঞ্চিত হইয়াছে।

৫। ভূমিব্যবস্থার লোহার কাঠামো সর্বশ্রেণীর উদ্যম ও নূতন কর্মপ্রচেষ্টার পথরোধ করিয়া রাখিয়াছে। উহার ফলে কর্নওয়ালিসের আকাঙ্ক্ষিত মানব-প্রজার কল্যাণকর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে জমিদার হইতে দূরে অবস্থান এবং হৃদয়হীন নায়েব-গোমস্তা দ্বারা জমিদারি পরিচালনার জন্য জমিদার ও রায়তের মধ্যে এমন এক অপ্রীতিকর সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রায়তকে রক্ষার জন্য সরকারের বিবিধ আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

৬। এই ভূমিব্যবস্থাই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ। ইহারা জমিদারের সমগোত্রীয়। কৃষির উন্নতি না করিয়া খাজনা হইতে অর্থলাভ ইহাদের লক্ষ্য। কৃষির উন্নতির ফলভোগী গভর্নমেন্ট নহে, অন্য লোক। এজন্য গভর্নমেন্ট কৃষির উন্নতি-বিধানের কোন চেষ্টা করে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় কৃষির উৎকর্ষতা সাধন যেন জমিদার, তালুকদার বা গভর্নমেন্ট কাহারও কর্তব্য নহে।

৭। খাজনাভোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি এবং মালিকচাষীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। ভূমির স্বত্বহারা কৃষক বর্গাদার বা ভূমিহীন কৃষিমজুরে পরিণত হইতেছে।

৮। ভূমিব্যবস্থার জটিলতায় জমিদার ও রায়তের মধ্যে ব্যয়বহুল মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবওয়াব এখনও কৃষকের ভার বৃদ্ধি করে।

৯। অনাবৃষ্টি, বন্যা অথবা অপর কোন দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে খাজনা মাপ করা সম্ভব হয় না, কারণ খাজনার কর্তা জমিদার, গভর্নমেন্ট নহে।

১০। জমিদারি-প্রথা বর্তমান রাখিয়া খাজনার হারের সমতা বিধান করা কঠিন। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা জমিদারিপ্রথার বিলোপসাধনের পরামর্শ দিয়াছেন। ভূমির উপর সরকারের অধিকার স্থাপনের পর গভর্নমেন্ট জোত একত্রিত করা, জোতের আয়তন লাভজনক করা, গোচারণের মাঠ সংরক্ষণ করা এবং অকৃষকের নিকট জোত হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি সংস্কারে ব্রতী হইতে পারিবেন।

কমিশনের সংখ্যালঘু সদস্যগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে কৃষকের দুর্গতি রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার ফল নহে। ভূমির উপর অতিজনতার চাপ, উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ভূমিবিভাগ এবং কৃষকের আংশিক কর্মসংস্থান, এই অবস্থার জন্য দায়ী। রাজস্ব আদায়ের যে ব্যবস্থাই অবলম্বিত হউক না কেন এইসকল সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হইবে। জমিদারি ব্যবস্থায় বাঙলার কৃষক অন্য প্রদেশের কৃষক অপেক্ষা কম খাজনা দিয়া বেশি সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। মধ্যস্বত্বভোগী বৃদ্ধির জন্য কৃষির আয় বহুজনের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের ভূমির শুভাশুভের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। গভর্নমেন্ট ভূমি ক্রয় করিলে জমির সহিত মধ্যবিত্তের সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। জমিদারের সংখ্যা অল্প ; ছোট তালুকদার ও অন্যান্য স্বত্বভোগীর সংখ্যা বহু। তাহারা যে মূল্য পাইবে উহা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপর্যাপ্ত। ঐ টাকা উহারা হয় অপব্যয় করিবে অথবা দখলিস্বত্ব ক্রয় করিয়া পুনরায় উহা ভূমিতেই বিনিয়োগ করিবে। এইরূপে আবার নিম্নস্তরের এক ভূম্যধিকারীর দল সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্র ভূমির মালিক হইলে খাজনা নির্বাচনী প্রচারের বিষয় হইবার আশঙ্কা দেখা দিবে।

গভর্নমেন্টের মতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাধিক্য, ভূমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ, কৃষকের ভূমির অতিবিভাগ ও অসংবদ্ধতা এবং অবাধে হস্তান্তরের অধিকার, কৃষির প্রসারবৃদ্ধি ও চাষের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের প্রধান অন্তরায়।

চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী জমিদারি এবং সরকারী খাসমহল, এই তিন প্রকার ভূমিব্যবস্থাতেই উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান। নূতন বসতিস্থাপনে উৎসাহিত করিয়া খাসমহলের চাষবৃদ্ধির সহায়তা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য কোন বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। চাষীর শ্রমার্জিত ফলভোগের কোন বাধা খাসমহলে নাই।

রাজস্ব ও খাজনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ষণযোগ্য ভূমির প্রায় সমস্তই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বৎসর ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলেও ধান ও পাটের মধ্যে যাহার দর পূর্ব বৎসরে চড়া থাকিত তাহাই অধিক পরিমাণে বপনের রেওয়াজ হইয়া উঠিল। কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত না করিয়া নির্বাচিত শস্য বপনের দ্বারা আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। লোকবৃদ্ধির অনিশ্চয়তার দরুন ১৯২১ সন পর্যন্ত মোট বৃদ্ধি বেশি হয় নাই। ১৯২১ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত লোক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং বৃদ্ধির হারও পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু কৃষির সম্প্রসারণ ১৯৪২ সন পর্যন্ত অতি ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাজনার চাপ বেশি মনে হয় নাই। ১৯৪১-৫১ দশকে শস্যমূল্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। খাজনা শস্যমূল্যের অনুপাতে ক্রমেই কম মনে হইয়াছে।

মধ্যস্বত্ব

জমিদার বা অন্য কোন ভূম্যধিকারীর আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সঙ্গে মধ্যস্বত্ব বৃদ্ধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্তমান। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরবর্তী বৎসরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তালুক পাঁচ শতের অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল।

ভূমির গড় পরিমাণ

সমস্ত কর্ষিত ভূমির মোট পরিমাণ কৃষকপরিবারের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া প্রতি পরিবারের জমির গড় পরিমাণ বাহির করা হয়। এই গড়কে "গ্রোস" পরিমাণ বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে রাস্তা, বাঁধ, পতিত ভূমি ইত্যাদি বাদ দিলে চাষের জমি অনেক কমিয়া যায়। এক পরিবারের জমি সাধারণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংবদ্ধ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। জমির ক্ষুদ্রতার জন্য পুরাতন পদ্ধতিতেও ভাল চাষ করা চলে না, যন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা উন্নত প্রণালীর চাষ সম্পূর্ণ অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কৃষকপরিবারের ভূমির গড় পরিমাণ ৪·৮২ একর।

১৯৫১ সনের জনগণনায় মালিকচাষীর ভূমির পরিচয় সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ফ্লাউড কমিশন ও জনগণনার অনুসন্ধানের মধ্যে এগার বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের ফল প্রায় একরূপ। কমিশনের হিসাবে ৩৪·৪ শতাংশ কৃষকপরিবারের ভূমির পরিমাণ দুই একরের কম। জনগণনা অনুসারে ঐ হার ৩৪·৫। কমিশনের হিসাবে ৮·৮ শতাংশ পরিবারের জমির পরিমাণ ৪ ও ৫ একরের মধ্যে। জনগণনার হিসাবে ৮·৬ শতাংশ পরিবারের জমি ঐরূপ। কমিশনের মতে ১৯·৭ শতাংশ কৃষকপরিবারের ভূমির পরিমাণ ৫ হইতে ১০ একর ; জনগণনার হিসাবে ২০·৩ শতাংশ পরিবারের ঐ পরিমাণ জমি আছে। দেখা যাইতেছে, এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিবারের জমির পরিমাণ পরিবার-প্রতি গড় পরিমাণের অর্ধেকেরও কম। ইহাদের জমির নীট পরিমাণ নিশ্চয়ই আরও কম। এই সামান্য জমি কোন পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

গ্রামাঞ্চলে জমিদারি ও মহাজনী অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়। কৃষককে ঋণজালে জড়িত করিয়া তাহার দখলিস্বত্ব লাভের দিকে মহাজনের দৃষ্টি থাকে। জমিদারও নানা কৌশলে জমি খাস করিবার জন্য চেষ্টিত। সুযোগ ঘটিলেই ব্যবসায়ী, শিল্প-মালিক, মহাজন প্রভৃতি জমিক্রয়ের জন্য ব্যগ্র হয়। ফ্লাউড কমিশনের তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৮-৪০ সনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয়ের দ্বারা ৩,৯১২ একর জমির হাত বদল হইয়াছে। ইহার মাত্র ৩৬·৫ শতাংশ ক্রেতার নিজ চাষে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বর্গাদার কৃষিমজুর ও কোর্ফা রায়তের মধ্যে বিলি করা হইয়াছিল। কেনা জমির ৩২·২ শতাংশ বর্গাদার দ্বারা চাষ করা হইত। ১৯৫১ সনে পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমির ২০·৩ শতাংশ বর্গাদারেরা চাষ করিত। ছোট বড় সকল রকম জোতেই ভাগে চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

একাত্তর শতাংশ কৃষিমজুরের নিজ জমি নাই।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

লোকবৃদ্ধি ও চাষের অগ্রগতি

ফ্লাউড কমিশন এবং অন্যান্য কমিশন ও কমিটির বিবরণীতে জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যশস্যের অবস্থা বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। আউশ ও আমন ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য। প্রতি একরে আউশ ধান ১২ হইতে ১৯ মণ এবং আমন ধান ১৫ হইতে ২২ মণ জন্মিয়া থাকে।

১৯৫১ সন অপেক্ষা ত্রিশ লক্ষ বহিরাগত কম থাকা সত্ত্বেও ১৯৩১ সনে পশ্চিমবঙ্গ ধান ও চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। জনপ্রতি বার্ষিক চার মণ দশ সের হিসাবে ১৯৫১ সনে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ছিল সওয়া ছত্রিশ লক্ষ টন। দেখা যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রাজ্যে চাউলের ঘাটতি চলিতেছিল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

উপসংহার

‘**পশ্চিমবঙ্গের** জমিতে আর পূর্বের মত শস্য জন্মে না’, ১৮৭০ সন হইতে এই অভিযোগ শুনা যাইতেছে। অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিবার মত নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। শতাধিক বৎসর পূর্বের এক বিবরণ অনুসারে একরপ্রতি ৩৫ মণ ধান জন্মিত। সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় বীরভূমে একরে ৭৩ হইতে ১০০ মণ পর্যন্ত ধান জন্মিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে উৎকৃষ্ট বীজ, সেচ ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৮৭২ সনের পর হইতে প্রতি একরে সাধারণত ২২ মণের অধিক ধান জন্মিবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই! ফ্লাউড কমিশনের মতে সমগ্র বঙ্গের ধান উৎপাদনের গড় প্রতি একরে ১৮·৮ মণ। কমিশনের সভ্যদের কয়েক জন মনে করিতেন, বাঙলাদেশে এক একরে ১৬ মণের অধিক ধান জন্মে না ; যদি বেশি ধান জন্মিত তবে বাঙলা ঘাটতি না হইয়া বাড়তি প্রদেশ হইত।

যে হিসাবই ধরা হউক না কেন, উৎপাদন যে কম তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। চাষবাসে এখনও আদিম যুগের পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে এবং কৃষি প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টার কোন প্রমাণ নাই। দেশের লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, কৃষি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক জলের জন্য অসহায়ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত না। প্লাবন খালের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া জলের প্রয়োজন মিটান হইত। বৃটিশ আমলে কৃষির উন্নতি ও জলসেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। কৃষির দুরবস্থা এই ঔদাসীন্যের পরিণাম।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া এ কথাই বলা হইয়াছে যে, ৫০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে নদীর জলসেচের আবশ্যকতা নাই। এই অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পক্ষান্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেলপথ ও সড়ক নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর তীরে বাঁধ তুলিয়া বন্যার জল প্রতিরোধ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বন্যার জল প্রতি বৎসর শস্যক্ষেত্রে যে পলির প্রলেপ দিত, সেই প্রকৃতির দান হইতে কৃষিক্ষেত্র বঞ্চিত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে জলনিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিদেশী শাসকগণ তাহা বানচাল করিয়া দিয়া কৃষির অবনতি ও জনগণের দুর্গতি ঘটাইয়াছে। বনভূমি অরণ্যমুক্ত করায় ভূমিক্ষয় হইয়াছে।

স্বল্পস্থায়ী ‘খাদ্য বাড়াও’ আন্দোলন ভূমিব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ভূমিক্ষয় নিবারণ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না করিলেও ছোট ছোট জলসেচ পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া জলনিকাশের বাধা কিছুটা অপসারিত করিয়াছিল, কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়াছিল এবং উন্নত ধরনের শস্য-উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছিল। আন্দোলনে ক্ষতিও কম হয় নাই। গোচারণভূমির সংকোচ সাধন এবং অসঙ্গতরূপে বৃক্ষছেদন করা হইয়াছিল। বনধ্বংসের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণের চেষ্টা বনবিভাগ আরম্ভ করিয়াছে। বেসরকারী বন আইন তৎপরতার সহিত প্রয়োগ করা হইতেছে।

গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিং প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়া কৃষির উপর দেখা যায়। খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াইবার জন্য যে উদ্যমের প্রয়োজন, রেশনিং প্রবর্তনের ফলে তাহা কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়াছে। পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টায় ধানের চাষ কিছু হ্রাস করা হইয়াছে। পাটের দর কৃষককে ধানের পরিবর্তে পাটচাষ করিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। পাট হইতে আরও কিছু কাল বেশ অর্থাগম হইবে। কিন্তু কত দিন ইহা চলিবে বলা কঠিন। পাটের থলিয়ার প্রধান ক্রেতা উভয় আমেরিকা। আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য তাহারা বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতেছে। পাট-উৎপাদনে বাঙলার একাধিকারও আর নাই। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এককালে নীলের চাষের জন্য বাঙলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগিতায় হঠিয়া গিয়া নীলের চাষ বন্ধ হইয়াছে। পাটের নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত না হইলে পাটশিল্প ও পাটচাষের ভবিষ্যৎ কি হইবে বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের জোত যে অলাভজনক এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ১৯৪০ সনে প্রতি কৃষক পরিবারের জোতের গড় আয়তন ৫·১৭ একর ছিল। ১৯৫১ সনে উহা ৪·৮২ একরে নামিয়া আসিয়াছে। ফ্লাউড কমিশনের মতে প্রতি কৃষক পরিবারের ৮ একর চাষের জমি থাকিলে উহা লাভজনক হইতে পারিত। কমিশন বলিয়াছেন, ‘বাঙলার পল্লীর জনগণের বিবিধ সমস্যার মূলে কারণ এই যে, প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাঙলা দেশে নাই। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতির মূলে রহিয়াছে বিজেতার দুরভিসন্ধি। বাঙলার প্রাচীন জমিদার ছিল কোম্পানির চক্ষুশূল। ইংরেজ যখন বাঙলায় আসে বারভূঁইয়ার স্মৃতি তখন বিলুপ্ত হয় নাই। হেস্টিংস তরুণ বয়স হইতে এদেশে ছিল। বাঙালীর চরিত্র ও স্বাধীনতা-স্পৃহার বিষয় অবগত হইবার তাহার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাহার ছিল। গভর্নর হইবার পর তাহার প্রথম কার্যই হইল প্রাচীন জমিদারবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কোম্পানির অধিকার নিষ্কণ্টক করা। রাজস্ব নিলামে চড়াইবার ফলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অপরপক্ষে রাজস্ব নিলামে চড়াইবার আরও উদ্দেশ্য ছিল, বাঙলাদেশের যত বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, যাহাদের অর্থ সম্পদের দাপটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যে সুবিধা করিতে পারিতেছিলেন না, তাহাদের অর্থ নিলাম সুবাদে জমিতে আটক করিয়া বাণিজ্যের পথ সুগম করা। নন্দকুমারের ফাঁসির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া শোষণের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বন্ধ করা হইল। বাঙলার বস্ত্রশিল্প ছিল ইংলন্ডের নবীন শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আমদানি শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া বাঙলার কাপড় ইংলন্ডের বাজারে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করা হইল। অন্যদিকে বাঙলার বাজারে বিলাতী পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙলার তাঁতী ও অন্যান্য শিল্পী বেকার হইয়া পড়িল। দেওয়ানী প্রাপ্তির পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত হইয়াছিল। কোম্পানির প্রভুত্ব ও বিলাতী পণ্যের বাজার রক্ষার নিমিত্ত উহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিল। পতিত ভূমি কর্ষণাধীনে আনিয়া এবং রায়ত শোষণ করিয়া নূতন জমিদার লাভবান হইল। বৃত্তিহারা কারুশিল্পীর দল অন্ন সংস্থানের নূতন উপায়ের সন্ধান পাইল। অসন্তোষ প্রশমিত হইল এবং বাঙলায় ইংরেজ শাসনেব ভিত্তি সুদৃঢ় হইল।

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই কোম্পানির উদ্দেশ্য বাঙলার প্রধানদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে পার্লামেন্টে চিঠি গেল। ভারতীয় শিল্পধ্বংসের মূল কারণ কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ও দেশীয় শিল্পসংরক্ষণের দাবি জানান হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী রায়তের কথা উত্থাপন করিল না। কিন্তু নীলকরের অত্যাচার ও তাহার ফলে হাঙ্গামা তাহাদিগকে নীরব থাকিতে দেয় নাই। রায়তদের মধ্য হইতেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু উহা নীলচাষের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল। জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইল না। নিরানন্দ কৃষক নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং জমির উৎপাদন হ্রাস পাইতে লাগিল। কৃষকের দুর্গতির আভাস ১৮৭২ সনে হান্টারের মন্তব্যে পাওয়া যায়। “পাঁচ একর জমি চাষ কবিলেও একজন কৃষক মাসিক আট টাকা উপার্জনকারী কোন দোকানীর ন্যায় স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারে না।” রাজস্ব প্রথম নিলামে উঠিবার ঠিক একশত বৎসর পরের অবস্থা এইরূপ ছিল। উৎপাদন হ্রাস এবং কৃষিপণ্যের মূল্যের স্বল্পতা এই অবস্থার জন্য দায়ী। কোন জনকল্যাণকামী জাতীয় সরকার এই দুর্গতি অবসানের জন্য শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ দিয়া জনগণের একাংশ কৃষিক্ষেত্র হইতে শিল্পের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। কিন্তু উহা ছিল বিদেশী সরকারেব স্বার্থবিরোধী। ১৮৮৫ সনে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রাক্কালে যখন দেশময় ব্যাপক আন্দোলন ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখনও ইংরাজ সুনিপুণ চাল খেলিয়া দেশের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীকে চাষীর প্রতি বিমুখ করিবার জন্য ও আপন আয়ত্তে রাখিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের গোড়া পত্তনে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। কালে অবশ্য সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

উপার্জনের অন্য পন্থা ছিল না বলিয়াই গভর্নমেন্ট ভূমি-বিভাগ বন্ধ করিবার জন্য উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করিতে এবং বর্গাদারের স্বত্ব স্বীকার করিতে পারে নাই। বহু খণ্ডিত ভূমি, অকৃষক মালিক এবং স্বত্বহীন ভাগচাষী, ভূমিব্যবস্থাকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, ১৭৯৩ সনের বন্দোবস্ত ১৯৫৩ সনে সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। উহা এখন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। জোড়াতালি দিয়া অবস্থার উন্নতিসাধনের সম্ভাবনা আর নাই, জমিদারি-প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া চাষীর হাতে জমি দিতে হইবে।

জমিদারি-প্রথা বিলোপের পর খণ্ডিত ভূমি সংযুক্ত করা হইবে কৃষির উন্নতির প্রথম সোপান। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন অল্প ব্যয়ে উন্নতিসাধন সম্ভব। পাঁচ একর জমি এক বন্দে থাকিলেই উহাতে যান্ত্রিক চাষের সুবিধা ভোগ করা যায়। ট্র্যাক্টর প্রভৃতির কথা ভাবিবার দরকার নাই। এক গ্রামের সকল কৃষক মিলিয়া ছোট ছোট যন্ত্রের অংশীদার হইতে পারে।

জমি যেন অকৃষকের হাতে না পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমির চাপ হ্রাস না করিতে পারিলে এই রাজ্যের কৃষির উন্নতি অসম্ভব। উদ্বৃত্ত কৃষিজীবিদিগকে উৎপাদনশিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করা ভূমির চাপ হ্রাসের উপায়।

সমবায়নীতি অনুসরণ করিয়া বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র গঠনের পূর্বে দরিদ্র রায়ত, ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষিমজুরদিগকে ভূমিলাভের সুযোগ দিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত কৃষির সহিত উহার অসংগতি নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্নিয়ার বাঙলার ফল ও ইক্ষু চাষের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বনসৃষ্টি, ভূমিক্ষয় নিরোধ, ও গোচারণ ভূমি সংরক্ষণের সঙ্গে ফলের চাষেব জন্য ভূমি পৃথক করিয়া রাখা যায়। জনগণের একাংশ টাটকা ফল, আচার, ফল সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারে।

ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ধারণাই এদেশে বদ্ধমূল। উহার পরিবর্তন করিয়া ভূমির যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরস্পরের সহযোগিতায় শস্যোৎপাদন এবং যন্ত্রপাতির যৌথ মালিকানা এদেশের ধাতের বিরুদ্ধ নহে। ভূমিহীন কৃষিমজুর শ্রেণী সৃষ্টির পূর্বে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে ক্ষেত নিড়ানের সময় গ্রামের সকল চাষী মিলিত হইয়া পালাক্রমে এক এক কৃষকের জমির আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলিত। প্রচণ্ড উত্তাপে সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে; ধান বা পাটের শিশুর শত্রুর সন্ধানরত চক্ষু, কর্মরত হস্ত, কিন্তু কান পাতা আছে গল্পের দিকে। ক্যান্টারবারির তীর্থযাত্রীদের মত এক এক জন পর পর গল্প বলিয়া চলিয়াছে। গল্পশোনার আনন্দে মশগুল কৃষকেরা উত্তাপের তীব্রতা ভুলিয়া যাইত। জমির মালিক সকলের আহারের ব্যবস্থা করিত। আহারটা হইত অনেকটা ভোজের মত। এইরূপে কর্মের সঙ্গে আনন্দ যুক্ত হইত। ঢাকা জেলায় কৃষিমজুরের নাম এখনও “বদলি” অর্থাৎ যে কাজের বদলে কাজ দেয়। দারুণ খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্যের সময় পশ্চিমবঙ্গেও সহযোগিতার ভাব প্রবল হয়।

কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটিলে, তাহার হাতে অর্থ সঞ্চিত হইলে, সে জীবনে আনন্দ পাইবে, নিরাশায় মৃত্যু কামনা করিবে না। জীবন পূর্ণ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে তখন সে স্বেচ্ছায় তাহার পরিবার বৃদ্ধির সীমারেখা টানিয়া দিবে।

একক কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হওয়া অসম্ভব। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সকল ক্ষেত্রের যুগপৎ উন্নতি সাধনের দ্বারাই শোষক শহর ও শোষিত গ্রামের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

অ-কৃষি বর্গ

পরিসংখ্যান বিবরণী হইতে অ-কৃষি বর্গের আর্থিক হিসাবে সক্রিয় জনগণের কর্মবিভাগ ব্যতীত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বিভিন্ন উপজীবিকার উন্নতি বা অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়।

যেসকল বৃত্তির উন্নতি হয় নাই অথবা অবনতি ঘটিয়াছে এখানে প্রথম তাহাদের আলোচনার পর, উন্নতিশীল বৃত্তিসমূহের আলোচনা করা হইবে।

কর্মহ্রাস

শিল্পঃ গৃহশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ও বৃহৎশিল্প, সবই উপজীবিকার পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদনশিল্প রাজ্যের সমৃদ্ধির সূচক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পরিসংখ্যানে যখন দেখা যায় যে, ১৯১১ সন হইতে এই শ্রেণীর কর্মীসংখ্যার ক্রমাবনতি ঘটিতেছে, তখন মন দমিয়া যায়। ১৯১১ সনে জনসমষ্টির প্রতি দশ হাজারে ৮০৪ জন অ-কৃষি উৎপাদনশিল্পে নিযুক্ত ছিল। ১৯৫১ সনে উহা ৬৭১-এ নামিয়া আসিয়াছে। ১৯২৯ সনের দারুণ অর্থসংকটের ফল ১৯৩১ সনের সংখ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৯৩১ সনে ঐ সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫১।

১৯১১ সন হইতে এই শ্রেণীতে নারী উপার্জকের সংখ্যা হ্রাস বিশেষ লক্ষণীয়। চা-বাগান, মিল ও খনির নারী কর্মীর প্রায় সকলেই বহিরাগত। নারীদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র ছিল কুটিরশিল্প, ধান ভানা, গো-পালন প্রভৃতি। কলকারখানার প্রতিযোগিতায় প্রথম দুইটি ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে। গোচারণের ভূমির অভাবে গো-পালন এখন প্রায় অসম্ভব। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের নারীদের অর্থোপার্জন করা মর্যাদাহানিকর বিবেচিত হইত। অর্থোপার্জনের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাদিগকে পর্দার আড়ালে রাখিবার প্রথা "ভদ্র" লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিল। নারীর আর্থিক নিষ্ক্রিয়তা সামাজিক মর্যাদার সহিত যুক্ত ছিল। অনগ্রসর ও তফসিলী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয় লোকদের অনেকে ভদ্র প্রতিবেশীদের অনুকরণে মর্যাদাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে নারীদিগকে কর্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিতেছে। কিন্তু কর্মসংস্থানক্ষেত্রের তীব্র প্রতিযোগিতায় পুরুষ নারীকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, ইহাই নারীকর্মী হ্রাসের প্রধান কারণ।

পশুপালন, ক্ষুদ্র জন্তু ও কীটপালন, ফুল, ফল, সবজি, পান, চা প্রভৃতির বাগান রচনা, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও কাঠ কাটা, বন্যপশু ও মৎস্য শিকার মানুষের আদি শিল্প। শিল্পের এই বিভাগে ১৯০১ সন হইতে ক্রমশ কম লোকের কর্মের সংস্থান হইতেছে। জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজার লোকের ৩০৪ জন ১৯০১ সনে এই বিভাগ হইতে অন্নের সংস্থান করিত। ১৯৫১ সনে হার দাঁড়াইয়াছে ১৪০। এই অবনতি আকস্মিক নহে ; প্রত্যেক দশকেই উহা কমিয়া আসিতেছিল। সাধারণ অভিজ্ঞতায়ও এই অবনতির সমর্থন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে গোচারণভূমি ক্রমশ এরূপ সংকুচিত হইতেছে যে এখানে গবাদি পশু বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। পশুর বংশবৃদ্ধির জন্য আমদানি নহে ; যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন উহারা কাজ করিয়া যায়। মৃত্যু বা হত্যার পর তাহাদের শূন্য স্থান পূরণের জন্য আবার নূতন আমদানি আবশ্যক। রাজ্যে পশুপালনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কোন কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গাভী প্রায় অজ্ঞাত ; লাঙ্গল টানিবার বলদ দেখা যায় মাত্র। মৌমাছি, গুটিপোকা, তসর ও লাক্ষাকীট পালনের প্রথা স্থায়ী অবনতির দিকে চলিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় হাঁস ও মুরগির দর খুব চড়িয়া গিয়াছিল। তদবধি হাঁস ও মুরগি পালনে উন্নতি দেখা যাইতেছে।

পরিচালনব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে চা বাগানে কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

বনজ দ্রব্য সংগ্রহ, কাঠ কাটা ও পশুপক্ষী ধরা ও শিকারকার্যে নিযুক্ত লোকের হার ১৯০১ সন হইতে অপরিবর্তিত রহিয়াছে। লোকবৃদ্ধির অনুপাতে এই বৃত্তিতে কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়াছে।

মৎস্যশিকারীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া প্রতি দশ হাজারে ১৯১১ সনের ৬৪ হইতে ১৯৫১ সনে ১৯-এ নামিয়াছে। মাছই বাঙালীর প্রধান আমিষজাতীয় খাদ্য। মৎস্য-উৎপাদনের অবনতি রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হইবে। এই বিভাগে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। সামাজিক বাধা সৃষ্টির জন্যই হয়ত মেছুনীদের সংখ্যা কমিয়া থাকিবে।

খনি ও পাথরসংগ্রহের কাজে লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। লোহ আকরিক ব্যতীত অন্যান্য ধাতু উত্তোলনকারীর সংখ্যা ১৯০১ সন হইতেই বিশেষরূপে হ্রাস পাইতেছে।

বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত, বয়ন ও চামড়ার কাজ কারুশিল্পের দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগেরও ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। ঘি, মাখন, মিঠাই, আচার প্রভৃতি প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণ গৃহিণীদের কাজ ছিল। উহা কমিয়া গিয়াছে। ধান ভানা, মুড়ি ভাজা, চিঁড়া কোটা, ডাল ভাঙ্গা প্রভৃতি গৃহশিল্প নারীর অধিকারভুক্ত ছিল। ধান ভানা ও ডাল ভাঙ্গা এখন কলেই বেশি হয়। খাদ্যহিসাবে মুড়ি ও চিঁড়া এবং উহা দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যের পূর্ব মর্যাদা আর নাই। আধুনিক শিক্ষিতসমাজের খাদ্যতালিকা হইতে মুড়ি, চিঁড়া, এখন নির্বাসিত। এই গ্রুপের কর্মী, বিশেষত নারীকর্মীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ঘানির কাজ এখন কলে হয়। সুতরাং এই কর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। বয়নের বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইলেও সুতাকাটুনী ও তাঁতীর সংখ্যা কমিয়াছে। ইহার ফলে বয়নশিল্পে নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের কবলে পড়িয়া সকল কুটিরশিল্পই ক্রমাবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই বিভাগের গৃহশিল্পে নারীকর্মীর প্রাধান্য ছিল। উহাদের অবনতিতে নারীগণ কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহা গ্রামাঞ্চলের আর্থিক দুর্গতির অন্যতম কারণ। শিল্পের চতুর্থ বিভাগে কর্মীর সংখ্যা দশকে দশকে ওঠানামা করিয়াছে। ইট, টালি, খোলা, মাটির বাসনকোসন, কাঁচের চুড়ি, দানা ইত্যাদি নির্মাতাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। করাতী, খরাদী, ছুতার, মিস্ত্রী, প্লাইউড প্রস্তুতকারক এবং ঝুড়ি ও চাঙারি নির্মাতাদের সংখ্যাও কমিয়াছে।

বাণিজ্য: উন্নতিশীল সমাজের শতকরা ছয় জনের বেশি লোক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র শতকরা ৩·১২ জন জীবিকার ষষ্ঠ শ্রেণীতে আছে। উদ্বাস্তুদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় এই হার বাড়াইয়াছে। অন্যান্য দশকে ব্যবসায়ীর হার তিনের নীচে ছিল। রেশনভুক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং কয়লা ও কেরোসিনের দোকান হ্রাসের কারণ সুবিদিত।

পরিবহন: এই বিভাগের কর্মীসংখ্যা দশকে দশকে ওঠানামা করিতেছে।

বিবিধ বৃত্তি: উপজীবিকার অষ্টম শ্রেণীতেই সমাজের অধিকাংশ লোক অন্নের সংস্থান কবিয়া থাকে। স্বাবলম্বী লোক এই শ্রেণীতেই সর্বাধিক। এই শ্রেণীর বেশির ভাগ লোক চাকরিজীবী। চাকরির অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে চলিয়াছে। রাজ্য ও ইউনিয়নের চাকরিতে নহে, বেসরকারী কাজে অবনতি ঘটিতেছে।

রাস্তা, পুল ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার নির্মাণ ও সংস্কার কার্যে অস্বাভাবিক অবনতি দেখা যায়। প্রকৃত অবস্থায় ইহার সমর্থন মিলে না। সম্ভবত গ্রুপ বিভাগের অস্পষ্টতার দরুন এই গ্রুপের কর্মীদিগকে অন্য গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

চৌকিদার, দফাদার ও অন্যান্য গ্রাম্য কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। চৌকিদার ও দফাদারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বেতন-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এই হ্রাসের জন্য দায়ী। কোন কোন গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠানে ধাই ও নারী ঝাড়ুদার রাখা হয় বলিয়া এই গ্রুপে ২৩৮ জন নারী রহিয়াছে।

গৃহভৃত্যের হার হ্রাস পাইয়াছে। আর্থিক অনটন এবং ভৃত্যের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেকের ভৃত্য রাখিবার শক্তি নাই। ভৃত্যের কাজে মর্যাদাহানি ঘটে বলিয়া কেহ কেহ উহা স্বীকার করিতে চাহে না।

চুলছাটা ও ক্ষৌরকর্মে নিযুক্ত লোকের হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। দাড়ি কামানো ও নখকাটার জন্য এখন আর সাধারণত নাপিতের সাহায্য নেওয়া হয় না। সম্পন্ন লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করায় নাপিতবৌএর কাজ এখন নাই।

ধোপাখানা আধুনিক ব্যবসায়ের পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিবার পর ধোপার হার হ্রাস পাইলেও সংখ্যা বাড়িয়াছে।

আইনজীবীর সংখ্যা হ্রাস অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নহে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকাধীন ছিল। উহা পৃথক হইয়া যাওয়াতে এই বৃত্তিতে লোক কমিয়াছে।

ধর্ম, দাতব্য ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। সন্ন্যাসী ও ফকির এখন বড় একটা দেখা যায় না। অননুমোদিত নারীকল্যাণ আশ্রম প্রভৃতির জন্য নারীর সংখ্যা বেশ বড় হইয়াছে।

কর্মবৃদ্ধি

শিল্প: উৎপাদনশিল্পের তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদনে বিস্তর কর্মবৃদ্ধি হইয়াছে। নারীকর্মীর সংখ্যাও অনেক। কিন্তু নারীদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে নহে।

কাগজশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। নারীকর্মিগণ প্রায়ই অবাঙালী। ছাপাখানার কাজে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়। সংবাদপত্রের বহুল প্রচার এই উন্নতিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ব্যবসায়: খুচরা ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকের সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাহারা অফিস ও কারখানার কাজের অযোগ্য তাহারা ফেরি ও ছোট দোকান করা উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এজন্যই এই গ্রুপে এত অধিক লোক।

পরিবহন: যুদ্ধের পর বিমান পরিচালনায় বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই রাজ্যেই ভারতের অন্যতম প্রধান বিমান-ঘাটি দমদম অবস্থিত। বিমানকর্মীর সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। রেলকর্মীর সংখ্যা পূর্ব পূর্ব দশকের সংখ্যা ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বিবিধ: বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন-বিভাগ, হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। জনগণের আনন্দবিধানের ব্যবসায়ে লিপ্ত কর্মীদের সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

উপসংহার

উপার্জনক্ষম বয়সের (১৫-৫৫) লোক শতকরা ৫৭·৪। কিন্তু উপার্জক শতকরা মাত্র ৩১·৫। ১৯১১ সনে উপার্জকের হার ছিল ৪১ ১। দশকের পর দশকে উপার্জকের হার কমিয়া আসিতেছে। কৃষিজীবী উপার্জক ১৯২১ সনের ২৩·৪ হইতে ১৯৫১ সনে ১৪·৯-তে নামিয়াছে। এই যে কর্মহীনের দল কৃষিক্ষেত্র হইতে বাহির হইল, অকৃষি উপজীবিকায়ও তাহাদের ঠাঁই হইল না। কারণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অকৃষি উপজীবিকার উপার্জকের হার প্রায় স্থির রহিয়াছে, বৃদ্ধি পায় নাই।

১৯১১ সন হইতে নারী উপার্জকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ১৯১১ সনে প্রতি ১০০ জন নারীকর্মীর স্থলে ১৯৫১ সনে আছে মাত্র ৭১ জন। ইহার মধ্যে চা-বাগানে, কল-কারখানায় ও খনিতে প্রায় সকল নারীই বহিরাগত। স্থানীয় নারীদের মধ্যে স্বাবলম্বীর হার অতি অল্প। ইহার ফলে অল্প সংখ্যক উপার্জকের বহু পোষ্যের অন্ন সংস্থান করিতে হইতেছে।

লোকবৃদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় নাই। লোক ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পৌরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে অধিক। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কর্মাভাবে ক্রমশ বেশি লোক কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুমুঠা ভাতের জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। শহরে কর্ম ও ভোগের বৃহৎ অংশ বহিরাগতদের করতলগত। দুই-চারটি সম্প্রসারিত কলকারখানায় ছাড়া চাকরি দুর্ঘট এবং উহা লাভের জন্য প্রতিযোগিতাও মারমুখী।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাই পশ্চিমবঙ্গের চিত্র। ইহা যদি ক্রমাবনতির ধারা না হইয়া সাময়িক ব্যাপার মাত্র হইত তাহা

হইলে শঙ্কার কিছু থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ১৯১১ সনের পর হইতে অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রেই অবনতির লক্ষণ ক্রমবর্ধমান ও সুস্পষ্ট। কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপ না কমিয়া উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ যাহাদের জন্মভূমি তাহারা অকৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্র, ব্যবসায়, বাণিজ্য, যানবাহন পরিচালনা ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে চালিত হয় নাই ; পক্ষান্তরে এইসকল অকৃষি কর্মক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। নারীর উপার্জনের ক্ষেত্র সংকোচের ফলে পুরুষের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ একক সম্বল পরিবারের ছোটখাট বিপদও কাটাইয়া উঠিবার শক্তি থাকে না। পূর্বকালের ছোট ছোট কর্মশালা দ্রুত লুপ্ত হইয়া বিদেশীর মূলধনে গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু এইসকল প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সন্তান তাহার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত। যে মূলধন এদেশে খাটিতেছে তাহার সুদ এদেশের লোক অতি অল্পই ভোগ করে, যাহারা খাটে বাঙ্গালী, বা অন্য প্রদেশের ভারতীয়, তাহারা অধিকাংশই পায় মোটামুটি প্রাণধারণের অন্ন। ভূমির উর্বরতা হ্রাস, অপর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা, ভাগচাষীর আধিক্য ইত্যাদি কারণে উৎপাদন হ্রাস এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। খাদ্যের অভাব এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণে জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত ক্ষীণদেহ পশ্চিমবঙ্গবাসী কলকারখানায় কাজের অনুপযোগী। নানাবিধ আধুনিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দিন দিন দেশের উন্নতি হইতেছে। সত্য কিন্তু ইহার বিপরীত। ব্যবহৃত জিনিস হয় বিদেশ হইতে আমদানি অথবা বিদেশী মূলধনে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত। ইহা ক্রয় করিয়া দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতি ও বিশেষ সম্প্রদায়

১৯৫১ সনের জনগণনায় জনগণের আর্থিক পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাংখ্যিক খণ্ডের সওয়া পাঁচশত পৃষ্ঠার তিন শত পৃষ্ঠাই আর্থিক তথ্যে পরিপূর্ণ। ধর্ম ও জাতির বিবরণ শেষ করা হইয়াছে মাত্র আট পৃষ্ঠায়। ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ অস্বীকার করা হইয়াছে। তথাপি সংবিধানে নির্দিষ্ট সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি হিন্দুসমাজে অপেক্ষাকৃত নবাগত অনগ্রসর ৫৮টি জাতিকে তফসিলভুক্ত জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বাগদী সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের সংখ্যা নয় লক্ষের উপর। সাড়ে সাত লক্ষ রাজবংশীর স্থান বাগদীর পরেই। পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। গত শতাব্দীর শেষ দশকেও হিন্দুসমাজের সহিত অনার্য বাউড়ীদের বন্ধন ছিল অতিশয় শিথিল। ইহাদের সংখ্যা সওয়া তিন লক্ষের উপর। পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রের সংখ্যা সওয়া তিন লক্ষ। সাতচল্লিশ লক্ষ তফসিলীদের মধ্যে এই পাঁচটি জাতির সংখ্যা ঊনত্রিশ লক্ষ। কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টিতে পৌনে তিন লক্ষাধিক মুচি আছে। বিচিত্র আচার অনুষ্ঠানকারী বাকি ৫২টি জাতির মিলিত সংখ্যা কিঞ্চিদধিক পনর লক্ষ।

তফসিলী খণ্ডজাতির সংখ্যা সাত। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল আছে সাড়ে আট লক্ষ। ছোটনাগপুর যাহাদের আদি বাসভূমি সেই ওরাওঁদের দুই লক্ষ আছে এই রাজ্যে। দ্রাবিড় জাতীয় মুণ্ডাদের সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। অপর চারটি জাতির নাম ভুটিয়া, লেপচা, মেচ ও ম্রু। তফসিলী খণ্ডজাতির মোট সংখ্যা প্রায় পৌনে বার লক্ষ। জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ তফসিলী ও খণ্ডজাতীয় লোক। আহার, পরিচ্ছদ, ভাব, ভাষা ও ধর্মে ইংরেজের অনুসরণকারী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আছে সাড়ে একত্রিশ হাজার। এই তিন শ্রেণী বাদে অপর কাহারও জাতি বা সম্প্রদায় ভেদ স্বীকার করা হয় নাই।

ধর্ম

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৭৮·৪৪ শতাংশ হিন্দু, ১৯·৮৫ শতাংশ মুসলমান; ০·৭১ শতাংশ খ্রীস্টান, খণ্ডজাতীয় ধর্মাবলম্বী ০·৪৪; বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ০·৩৩, শিখ ০·১২; জৈন ০·০৮; ইহুদী ০·০১; জুরথস্ত্রীয় ০·০১ এবং অন্যান্য ০·০১। ১৯২১ সনে যত হিন্দু ছিল ১৯৪১ সনে তদপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৮০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অথচ ১৯৩১ হইতে ১৯৫১, এই বিশ বৎসরে হিন্দু বাড়িয়াছে সাড়ে একাত্তর লক্ষ। এই বৃদ্ধি অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। স্বাভাবিক জনগণের বৃদ্ধির হার অনুসারে ১৯৫১ সনে হিন্দুর সংখ্যা ১,৫৩,৮০,০০০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা উহা হইতে ৪০ লক্ষের অধিক বাড়িয়াছে। ইহার হেতু নির্ণয় করা আবশ্যক।

প্রায় একুশ লক্ষ উদ্বাস্তুর বিশ লক্ষাধিক হিন্দু। ভারতীয় বহিরাগত ১৯৩১ সন অপেক্ষা ১৯৫১ সনে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার বাড়িয়াছে। উহাদের অধিকাংশই হিন্দু। খণ্ডজাতীয় ধর্ম ও বাঙালীর হিন্দুধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠান প্রায় একরূপ। নিম্নশ্রেণীর বাঙালী হিন্দু ও খণ্ডজাতীয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশি নহে। উভয়ের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সত্যই কঠিন। খণ্ডজাতীয় লোকদিগকে হিন্দু করিবার জন্য ধর্ম প্রচারকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুর উৎসবাদি এবং জাঁকজমকের সহিত সম্পাদিত পূজাপার্বণ তাহাদিগকে হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আগের মতই খণ্ডজাতীয়গণ ক্রমশ হিন্দুর গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। হিন্দু হইলে সামাজিক মর্যাদায় এক ধাপ উপরে ওঠা যায়। এইসকল কারণে বহু খণ্ডজাতীয় লোক তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিবে। ১৯৪১ সনের সাম্প্রদায়িক রেষারেষির জন্য খণ্ডজাতীয় ধর্মের লোকসংখ্যা দশ লক্ষ বাড়াইয়া দিয়া হিন্দুর হার শতকরা দুই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫১ সনে এইসকল খণ্ডজাতীয় লোকেরা তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দু বলিয়া লিখাইয়াছে। যাহারা খণ্ডজাতীয় ধর্মের অনুসরণ করে ১৯৫১ সনে তাহাদের সংখ্যা ১৯৩১ সন হইতে প্রায় তিন লক্ষ হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাস হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার ফল।

১৯২১ এবং ১৯৩১ সনে মুসলমানদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ লক্ষ ৮৭ হাজার ও ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার ছিল। ১৯৪১ সনে উহাদের সংখ্যা অকস্মাৎ ৫৫ লক্ষ ৪৩ হাজারে উঠিয়া গিয়াছিল। ১৯৫১ সনে তাহাদের সংখ্যা সওয়া ঊনপঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। মোট সংখ্যা ১৯৩১ সন হইতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বেশি হইলেও স্বাভাবিক নিয়মে বিশ বৎসরে যত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তদপেক্ষা বৃদ্ধি কম দেখা যায়। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ও পাকিস্তান গঠনের পর অনেক মুসলমান এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। উহা মুসলমানদের বৃদ্ধির স্বল্পতার অন্যতম কারণ। হিন্দুর সংখ্যা ১৯৩১ সনের সংখ্যার উপর ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবার ফলে মুসলমানদের হার ৫ শতাংশ কমিয়া গিয়াছে।

শিখের সংখ্যা ১৯৩১ সনের সংখ্যার চার গুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিপাহী ও উদ্বাস্তু এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। উৎপাদনশিল্প, পরিবহন, ঠিকাদারী প্রভৃতি উপজীবিকা উহাদিগকে ক্রমবর্ধমান হারে এই রাজ্যে আকৃষ্ট করিতেছে।

জৈনদের সংখ্যা ১৯৩১ সনের সংখ্যার তিন গুণ হইয়াছে। ইহারা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তাহার পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছে। তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য জৈন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় এ রাজ্যে আসিতেছে।

বৌদ্ধগণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বিদেশী শাসকবৃন্দ ও সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর খ্রীস্টানদের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এইরূপই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের সংখ্যা ১৯৪১ সনের সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ৬৫ হাজার বেশি হইয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়।

পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেক খ্রীস্টান ছিল ; তাহারা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান হইতেও কিছু আসা অসম্ভব নহে। চা-বাগান অঞ্চলে এই দশকে যত শ্রমিক আসিয়াছে তাহাদের এক বৃহৎ অংশ হয়তো খ্রীস্টান। খড়্গপুরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্য হইতে বেশি সংখ্যায় খ্রীস্টান আসিয়া থাকিবে। পূর্ব পূর্ব জনগণনায় খণ্ডজাতীয় খ্রীস্টানদিগকে খণ্ডজাতীয় ধর্মাবলম্বী বলিয়া দেখান হইয়াছিল। এবারে হয়তো তাহা করা হয় নাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের পৃথক সত্তা রক্ষা করিয়া থাকিতে ভরসা পায় নাই। যে সম্প্রদায় হইতে তাহাদের উদ্ভব তাহারা সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এজন্যই দশকের পর দশকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যার ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

পরিবারের আকার ও গঠন

প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। জনগণনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে পল্লী ও শহর উভয় অঞ্চলেই সাধারণত ৪ হইতে ৬ জন লোক নিয়াই এক একটি পরিবার গঠিত। মনে হয় বড় ও অতি বড় পরিবারের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অর্থসংকট এবং আত্মনির্ভরশীল হইবার আকাঙ্ক্ষা পরিবার সংকুচিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

স্ত্রীপুরুষের হার

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষে ৮৫৯ জন নারী। বহিরাগতগণ এই রাজ্যে অপারিবারিক জীবন যাপন করে বলিয়া নারীর হার এখানে কম এ কথা পূর্বে দেখান হইয়াছে। স্বাভাবিক জনগণের মধ্যেও নারীর হার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কৃষিজীবীদের মধ্যে অস্থায়ী বাসিন্দা কম ; এজন্য কৃষিবর্গে নারীর হার ৯৫৩। অকৃষিবর্গে প্রতি হাজার পুরুষে নারী মাত্র ৭৪৭।

বয়সের প্রায় প্রত্যেক গ্রুপেই পুরুষ অপেক্ষা নারী সংখ্যায় অল্প। পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহার বিপরীত দেখা যায়। ১৯৫০ সনের ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে নারীর মাতৃত্ব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাহাতেও দেখা যায় প্রথম বৎসরে বালক অপেক্ষা বালিকার বেশি মৃত্যু ঘটে। পরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নারীর হারের ক্রমাবনতি ভারতের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দিক হইতে উহার আলোচনা হইয়াছে ; কিন্তু এ যাবৎ উহার কারণ নির্ধারণ অথবা উহার গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন আলোচনা হইতে কয়েকটি স্থূল সিদ্ধান্ত করা য়াইতে পারে,—

(১) পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা এদেশে মেয়ের তুলনায় ছেলে অনেক বেশি জন্মে।

(২) মেয়ে এখনও অনাদৃতা, সুতরাং তাহাদের মৃত্যুর হার অধিক।

(৩) সন্তান প্রসবের সময় প্রথম বয়সে বহু মৃত্যু ঘটে।

(৪) পরবর্তী কালেও নারীমৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত অধিক।

বিবাহ

জনগণনায় সংগৃহীত তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি হাজার পুরুষের ৪৭৮ জন অবিবাহিত, ৪৮৩ জন বিবাহিত ও ৩৯ জন বিপত্নীক। নারীদের ৩৬৩ জন অবিবাহিতা, ৪৭৭ জন বিবাহিতা এবং ১৬০ জন বিধবা। নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিবাহিত ও অবিবাহিতের হার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপত্নীক ও বিধবার হার অনেক কমিয়াছে।

বয়সের দিক হইতে দেখা যায় শর্দা আইন অমান্য করিয়া ৫-১৪ বৎসরের বালকদের ২·৪ শতাংশ এবং বালিকাদের ১৫·৮ শতাংশের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ০:৪ শতাংশ বিধবা বা বিবাহবিচ্ছেদী। ১৫-২৪ বৎসরের ৮২·৩ শতাংশ মেয়ে বিবাহিতা। ঐ বয়সের বিবাহিত পুরুষ মাত্র ৪০·৯ শতাংশ। ২৫-৩৪ বৎসর বয়সের বিবাহিত পুরুষ ও নারীর হার প্রায় সমান ৮৩·০ ও ৮৪·৫। ৩৫-৪৪ বৎসরের ৬৯·১ শতাংশ নারী ও ৮৯·৯ শতাংশ পুরুষ বিবাহিত। সকল বয়সের বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা নারী, বিপত্নীক ও বিবাহবিচ্ছেদী পুরুষের প্রায় চারগুণ। বিপত্নীকেরা পুনর্বিবাহ করিয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস ও বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিধবা বিবাহের প্রচলন কম বলিয়া বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিবাহিতা নারীর সংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে। বিপত্নীকেরা বিবাহ করে কম বয়সের কুমারী। পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইতে বিবাহিতা নারীর হার দ্রুত হ্রাস ও বিধবার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫৫ বৎসরের পর বিবাহিত পুরুষের হার ক্রমশ কমিয়া বিপত্নীকের হার বাড়িয়াছে। ঐ বয়সে বিপত্নীকত্ব ঘুচানো কঠিন।

১ হইতে ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বিবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। মেয়েদের প্রকৃত বয়স প্রায়ই গোপন রাখা হয়। এজন্য গত ত্রিশ বৎসরে বিবাহের বয়স কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। গ্রামাঞ্চলে আইন অমান্য করিয়া অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও শহরের শিক্ষিতদের মধ্যে যে বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

বয়স

গণনার সময় সংগৃহীত হইলেও ব্যয় ও সময় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সকল লোকের বয়সের সারণী প্রস্তুত না করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে বাছাই করা শতকরা দশ জনের বয়সের সারণী প্রস্তুত করা হইয়াছে। নিজের বয়স অনেকে ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বা ইচ্ছা করিয়াই বয়স বাড়াইয়া বা কমাইয়া বলে। এই ত্রুটি এড়াইবার জন্য লোকের বয়সের দশটি গ্রুপ করা হইয়াছে। এক বৎসরের কম বয়সের শিশুদের গ্রুপ ০ ; দ্বিতীয় গ্রুপ ১-৪। তাহার পর ৫-১৪, ১৫-২৪ প্রভৃতি প্রতি ১০ বৎসরে এক এক গ্রুপ। শেষ গ্রুপ ৭৫ ও তদূর্ধ্ব। প্রতি দশ হাজারে ০ গ্রুপের শিশুর সংখ্যা ২৬০ ; দ্বিতীয় গ্রুপে ৯০৯ ; তৃতীয় গ্রুপে ২,৩৪৩ ; ১৫-৩৪ বৎসরের সংখ্যা ৩,৭২১ ; ৩৫-৫৪ বৎসরের ২,০২৩ ; এবং ৫৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে ৭৩৬ জন লোক। সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বাঙালীর স্বল্পায়ুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালের বিপদ কাটাইয়া ৫-১৪ বৎসরের গ্রুপে উঠিলে মৃত্যু অপেক্ষাকৃত কম ঘটে। ১৫-২৪ গ্রুপেই সংখ্যা হ্রাস আরম্ভ হয়। তাহার পর হ্রাস দ্রুত। পৌনে তেইশ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬৪ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে মাত্র ছিয়াল্লিশ হাজার। পঁচাত্তর ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকের সংখ্যা ঊনিশ হাজারেরও কম। একশত বৎসরের পুরুষ ৫৩ এবং নারী ৫৯। তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ ৩৫ ও নারী ৬২ মাত্র। গড়পড়তা বয়স এখনও খুব কম রহিয়াছে। উহা মোটের উপর ২৫, পুরুষের ২৬, নারীর ২৫।

শিক্ষা

পরিসংখ্যান বিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার প্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা সরল ভাষায় লিখিত চিঠি পড়িতে পারে এবং নিজেরা বন্ধুবান্ধবের নিকট সরল ভাষায় চিঠি লিখিতে সক্ষম অথচ কোন লিখিত পরীক্ষায় পাস করে নাই তাহারই জনগণনার Literate বা সাক্ষর। চার-বৎসর বা তাহার কম বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। হিসাবের সময় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে তাহারা নিরক্ষর। পাঁচ লক্ষাধিক লোক পড়িতে পারে কিন্তু লিখিতে জানে না। সাক্ষর লোকদের সংজ্ঞা অনুসারে তাহাদিগকেও নিরক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

শিক্ষার প্রগতি শীর্ষক উপসারণীতে (Subsidiary Table) ১৯৪১ ও ১৯৫১ সনের বিভিন্ন বয়সের শিক্ষিতের হারের তুলনা করা হইয়াছে। ৫-৯ বৎসরের বালক ও বালিকাদের মধ্যে সাক্ষরের হার ১৯৪১ সনের সংখ্যার উপর শতকরা ৫০-এরও বেশি বাড়িয়াছে। ৫ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকাদের মধ্যে সাক্ষরদের বৃদ্ধির হার ঐরূপ। কিন্তু ঐ বয়সের বালকদের হার ৫০-এর কম। বালকবালিকাদের শিক্ষার প্রসারতার মধ্যে জনসাধারণ যে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা হইতেছে। অধিকসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার ফলে ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালক ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার হারের ১৯৪১ সনের বৈষম্য বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পাঁচ ও তদূর্ধ্ব বয়সের নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ১৯৪১ সনের সংখ্যার শতকরা ৫০-এর অধিক বাড়িলেও শিক্ষায় ঐ বয়সের পুরুষদের সমকক্ষ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব ঘটিবে। পূর্ণবয়স্কা নারীদের নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, বুঝা যায়। বালক অপেক্ষা বালিকাদের মধ্যে অধিকতর দ্রুত শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে।

রাজ্যের প্রায় একষট্টি লক্ষ "শিক্ষিতের" মধ্যে প্রায় সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ terate বা সাক্ষরদের শ্রেণীভুক্ত। সাড়ে তের লক্ষ ৬ষ্ঠ মান পর্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং বলা যায় যে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ লোক আধুনিক বিদ্যায় প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পূর্বেই বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। অবশিষ্ট ছয় লক্ষের মধ্যে ম্যাট্রিক সাড়ে তিন লক্ষ। কেহ কেহ বলেন, ম্যাট্রিক পাসের নিদর্শনপত্র সাক্ষরতার তকমার অধিক আর কিছু নহে। তিনটি দেশী, বিদেশী ও মৃত ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের ক্ষমতা অতি অল্পসংখ্যকের জন্মে। ভূগোল ও ইতিহাসের অস্পষ্ট ধারণা পরীক্ষার অল্প পরেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ও মনে স্থায়ী দাগ কাটিবার অবসর পায় না। যে জ্ঞানের সাহায্যে সভ্যজগত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার দ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্বেই রাজ্যের বিদ্যার্থীদের সাড়ে আটান্ন লক্ষ তথা হইতে ফিরিয়া যায়। সাংখ্যিক অগ্রগতির পশ্চাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সময়, শক্তি ও অর্থের বিপুল অপচয় নিবারণের পন্থা উদ্ভাবন করা আবশ্যক। কলা, বিজ্ঞান বা ব্যবসায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা এক লক্ষ। গ্রাজুয়েট ৫৯,৩৫৯ ; স্নাতকোত্তরদের সংখ্যা ১৩,০৯৬। ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক ১৬,২২১; ডাক্তারি পাস ১৬,১৫৫; ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১০,৫৫৩ ; আইন পরীক্ষায় পাস ১০,৩৮০ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৬,০১০। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

প্রতি ১০০ জন "শিক্ষিতের" ৩৮·৪ জন কৃষি ও ৬১·৬ জন অকৃষিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, শতকরা ৩৮ ৪ জন "শিক্ষিত" লোকের অপর কোন উপার্জন অপেক্ষা জমির আয় অধিক। কৃষিজীবী ম্যাট্রিকুলেট ১৫·৫ এবং অকৃষিজীবী ৮৪·৫। গ্রাজুয়েটের হার যথাক্রমে ১০·৩ ও ৮৯ ৭। কৃষিজীবী "শিক্ষিত"দের শতকরা ৭৫ জনের অধিক সাক্ষর শ্রেণীর অন্তর্গত। মালিকচাষী, ভাগচাষী ও কৃষি মজুরদের সাক্ষর লোকের বেশির ভাগ নারী। পুরুষেরা একটু অধিক অগ্রসর হইয়া অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীর প্রতি একজন ম্যাট্রিকের স্থলে খাজনাভোগীদের ম্যাট্রিক প্রায় পাঁচ জন।

অকৃষিজীবীদের অষ্টম শ্রেণীতে মধ্যবিত্তদের সংখ্যা বেশি। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিতের হার এই শ্রেণীতেই অধিক। কেবলমাত্র সাক্ষরদের সংখ্যা এই শ্রেণীতে কম।

ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকদের ৪২·৬ জন কৃষিজীবী। শিক্ষকতা ইহাদের গৌণ উপজীবিকা। জনগণনায় মুখ্য উপজীবিকা অনুসারে লোকের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষকতা ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানিবার উপায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১০·৩ শতাংশ লোক কলিকাতার অধিবাসী। কিন্তু গ্রাজুয়েটদের ৫২·৫ শতাংশ, স্নাতকোত্তরদের ৫৯·৮ শতাংশ ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্তদের শতকরা ৭০ জনের অধিক কলিকাতায় বাস করে। মোটের উপর শিক্ষিতদের ২২·২ শতাংশ কলিকাতার বাসিন্দা। ধনীর ন্যায় গুণীও কলিকাতাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।

ভাষা

মাতৃভাষা ও গৌণভাষা : পশ্চিমবঙ্গে মোট ১১৬টি ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে খন্ডজাতীয় ভাষা একটি। খন্ডজাতীয় ভাষা নামে কোন ভাষা নাই। গণনার সময় গণনাকারী খন্ডজাতীয় লোকদের কোন কোন ভাষার নাম নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞাতনাম ভাষাকে খন্ডজাতীয় ভাষা বলিয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। সারণী প্রস্তুতের সময় ঐ নামকরণই রক্ষিত হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ লোকের ভাষা খন্ডজাতীয় ভাষারূপে অভিহিত। বাঙলা সহ ভারতীয় ভাষার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭ ; খন্ডজাতীয় ভাষা এই ৭৭টির অন্তর্গত হইবারই সম্ভাবনা, উহার পৃথক সত্তা নাই। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষা ১৮ এবং অন্যান্য মহাদেশের ভাষা ২০।

প্রতি দশ হাজার লোকের মাত্র ১৬ জন এশিয়ার বাহিরের ভাষাভাষী। তন্মধ্যে ইংরেজীভাষীর সংখ্যাই ১৫। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণও ইহার মধ্যে আছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষা বলে দশ হাজারে মাত্র চার জন। তাহাদের ২·৩ জনের মাতৃভাষা চীনা। ভারতীয় ভাষায় কথা বলে ৯,৯৮০ জন। তন্মধ্যে ১১৮ জনের ভাষাকে খন্ডজাতীয় ভাষা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ৮,৪৬২ জনের মাতৃভাষা বাঙলা। অবশিষ্ট ১,৪০০ জন ৭৬টি ভারতীয় ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, হিন্দীভাষীর সংখ্যাই ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক। ৬৩৫ জনের মাতৃভাষা হিন্দী। আদি বাসভূমি সাঁওতাল পরগনা

হইলেও সাঁওতালগণ এখন পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী। সাঁওতালী ভাষা বলে ২৬৭ জন। পরবর্তী স্থান উর্দুভাষীর। তাহাদের সংখ্যা ১৮৪। উড়িয়াভাষীর সংখ্যা ৭৩ ; নেপালী ৭০ ; রায় ২৬, তামাঙ ও তেলুগু প্রত্যেকের সংখ্যা ২০ ; গুরুমুখী ও পাঞ্জাবীর মিলিত সংখ্যা ১৫ এবং ওরাওঁভাষী ১২। অবশিষ্টদের সংখ্যা ৮ হইতে একের ভগ্নাংশ পর্যন্ত। মাতৃভাষার সংখ্যায় বিস্ময় উৎপাদন করিলেও ভাষা পশ্চিমবঙ্গের কোন সমস্যা নহে। ১১৬টি ভাষার ৩৮টি অভারতীয়। ইংরেজী ও চীনা ব্যতীত অপর কোন বিদেশী ভাষা এ রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীদের মাতৃভাষা নাই। দার্জিলিঙ ও সিকিমের উপভাষা সহ ১৭টি ভাষার নাম করা হইয়াছে। ইহার তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিভেদ অতি অল্প। অ-বাঙলাভাষী ভারতীয়দের প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গে প্রবাসী। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের ভাষা শেষ পর্যন্ত বাঙলা, হিন্দী, সাঁওতালী, নেপালী, ইংরেজী, চীনা এবং ওরাওঁ প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় আসিয়া দাঁড়ায়। মাতৃভাষা না হইলেও বাঙলা কাজকর্মে ব্যবহার করিয়া থাকে এরূপ লোকের সংখ্যা পোনে আট লক্ষ। দ্বিতীয় ভাষারূপে হিন্দী ব্যবহার করে সাড়ে চার লক্ষ এবং নেপালী ব্যবহার করিয়া থাকে প্রায় সওয়া দুই লক্ষ লোক।

আমাদের প্রতিবেশী

চন্দননগর

চন্দননগর হুগলি জেলায় অবস্থিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার নবাব উহা ফরাসীদিগকে দান করেন। তদবধি উহা ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ১৯৪৯-৫০ সনে চন্দননগর ভারত-সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এখনও উহা কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে রহিয়াছে। ইহার আয়তন ৩·৭৩ বর্গমাইল। ১৯৫১ সনেই সর্বপ্রথম ভারত গভর্নমেন্ট চন্দননগরের জনগণনার ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গের গণনার সঙ্গে উহার গণনা করা হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের লোক দ্বারাই চন্দননগরের জনসমষ্টি গঠিত। আশি বৎসরে লোক শতকরা ৮৬ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সনে ৪৯,৯০৯-তে উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে উদ্বাস্তু ৫,১৭০। জনসংখ্যার ২৮,২২০ পুরুষ ও ২১,৬৮৯ নারী। ১৯৩১-৫১ সনের মধ্যে বহু লোক এই শহরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রিত ভারতে চন্দননগর ছিল স্বাধীন ব্যবসায়ের মরূদ্যান। সেখানে প্রথম দিকে পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ ছিলই না; নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের পরেও বাঙলার মত উহার নিয়মের কঠোরতা ছিল না। ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারগণ দলে দলে চন্দননগরে বসতি স্থাপন করিয়া লরী ও গাড়ির বহর সেখানে রেজেস্ট্রী করিত ও পেট্রল সংগ্রহ করিত। ক্রমে এই ফরাসী শহর বেআইনী ব্যবসায়ের এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হইল। ১৯৩৯-৫১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে লোকের অতিবৃদ্ধির ইহা অন্যতম কারণ।

চন্দননগরের ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১৩,৩৮০। ৯,৯২৭টি বাড়িতে লোক গণনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৯,৩৯০টিতে গৃহস্থ পরিবার এবং ৫৩৭টি বাড়িতে মেস, হোটেল, ডাক্তারখানা, জেলখানা, ছাত্রাবাস প্রভৃতি ছিল।

চন্দননগরে অকৃষিজীবী স্বাবলম্বীর সংখ্যা ১৭,১৯৯। তন্মধ্যে শিল্পাশ্রয়ী ৬,১৬৭; ব্যবসায়ী ৪,৬২৬; পরিবহন কর্মী ১,১৩০; অন্যান্য চাকরি ও বৃত্তিতে নিযুক্ত ৫,২৭৬।

জনসংখ্যার ৯৬·০৮ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

"শিক্ষিতের" হার শতকরা ৪২·৪ শতাংশ।

সিকিম

প্রাকৃতিক

সিকিম পূর্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, আয়তন ২,৭৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তর ও পূর্বে তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্বে ভুটান, দক্ষিণে দার্জিলিঙ ও পশ্চিমে নেপাল। ঘোড়ার নালের আকারে হিমালয়ের পর্বতমালা ইহার তিন দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা প্রধানত একটি পার্বত্যদেশ; এখানে একটিও বৃহৎ সমভূমি নাই। পর্বতসমূহ ধাপে ধাপে উত্তর দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তুষারমণ্ডিত পর্বত ও শিখরের ক্রমে কাঞ্চনজঙ্ঘায় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। সিকিমের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা অতীব মনোহর। ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। দেশের উত্তর ভাগ খাড়া খাড়া পাহাড়ে খণ্ডিত। লাসেন ও লাসাং উপত্যকা ব্যতীত ঐ অঞ্চলে লোকের বসতি নাই। দক্ষিণ সিকিম অপেক্ষাকৃত নিম্ন, খোলামেলা ও মোটামুটি সুকর্ষিত। দেশের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ কঠিন, বিশাল শিলায় গঠিত। শিলার কাঠিন্য ক্ষয় প্রতিরোধ করে। মধ্য ও দক্ষিণাংশ প্রধানত অপেক্ষাকৃত নরম, অপুরু শ্লেট জাতীয় শিলায় গড়া, সুতরাং সহজেই ক্ষয় হইয়া যায়। দেশের জলের প্রবাহ দক্ষিণাভিমুখী। দক্ষিণ ভাগের উচ্চতাই সর্বাপেক্ষা কম এবং এখানে লোকের বসতি অধিক। সিকিমের প্রধান শৈলশিরাগুলি উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত। উদাহরণস্বরূপ সিঙ্গালিলা ও চোলা শৈলশিরার নাম করা যাইতে পারে। অপর একটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শৈলশিরা তিস্তার উপত্যকা হইতে রংগীতের উপত্যকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল উপত্যকা অতিশয় গভীর। দেশের উত্তরাংশের শুভ্রতুষার কিরিটিনী শৈলশিরাগুলি হইতে সাড়ে তের হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত হিমপ্রবাহ নামিয়া আসে। কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমপ্রবাহগুলি আরও হাজার ফুট নীচে নামে। সিকিমের হিমরেখা ১৬,০০০ ফুটের কাছাকাছি। সুতরাং তুষারস্রোত ঐ রেখার আড়াই হইতে সাড়ে তিন হাজার ফুট পর্যন্ত নীচে নামিয়া থাকে। রাজ্যের উচ্চতা গ্যাঙটকের ৫,৭০০ ফুট হইতে ন্যাটঙের ১২,৩০০ ফুট মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। সুতরাং তাপের প্রভেদও বিস্তর। গ্যাঙটকের গড় সর্বোচ্চ উত্তাপ জানুয়ারির ৫৮°ফা হইতে জুলাইএর ৭৪° ফা পর্যন্ত উঠে। ন্যাটাঙে উহা যথাক্রমে ৩৭·৫° ও ৫৬°। উত্তাপের নিম্নতম গড় গ্যাঙটকে জানুয়ারিতে ৩৬° ফা ও জুলাই-এতে ৫৯° ফা; ন্যাটঙে উহা যথাক্রমে ১৭° ও ৪২°। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত লাসাং-এ ৬৪", গ্যাঙটকে ১৩৭" এবং ন্যাটঙে ১৭০"।

সিকিমের বিস্তৃত অঞ্চলে তাম্র আকরিক আছে। ইহাই রাজ্যের ভাবী খনিজ সম্পদের প্রধান উপকরণ। ভারতে প্রচলিত দেশীয় প্রথায় খনির কাজ করা হয়। ধাতুনিষ্কাশনে কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। নেপালী খনি শ্রমিকেরা খনির সন্ধান করিতে পটু। লোহখনিও আছে, কিন্তু উহাতে কাজ করা হয় না। পূর্বে প্রচুরপরিমাণে চুন দার্জিলিঙে চালান

হইত। সিকিমে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। রংগীত নদীর পূর্বদিকে ফুংসাচু ও পশ্চিম তীরে রালং সাচু। কাঞ্চনঝাউ হিমপ্রবাহের এক মাইল নীচে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফুট উচ্চে মাময় উষ্ণ প্রস্রবণ অবস্থিত।

তিস্তা, জলঢাকা ও তোরসা, পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল সিকিম।

রাজনৈতিক অবস্থা

গুরখাদের দ্বারা সিকিমের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তিতলিয়ার সন্ধিতে উহার স্বাধীনতা-রক্ষাব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তদবধি ১৮৮৯ অব্দ পর্যন্ত নেপালীদের সিকিমে বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতীদের আক্রমণে এক যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ইহার পর হইতে ভারত গভর্নমেন্ট সিকিমের শাসনব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। সিকিমে একজন রাজনৈতিক কর্মচারী রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তা ও পুল নির্মাণের দ্বাবা যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজ্যেব কোন কোন অঞ্চলে গুরখাদের বসতি স্থাপনেব অনুমতি প্রদান করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটিতে লাগিল। নেপাল হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। ১৯৪৮ সনে সিকিম দরবার ভারত গভর্নমেন্টের সহিত নূতন সন্ধি সম্পাদন করেন। ভারত সরকার প্রধান প্রধান রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেন্টের একজন কর্মচাবী রাজ্যের দেওয়ানের কাজ করিতেছেন। গত বিশ বৎসরে ভাল ভাল রাস্তা ও পান্থনিবাসে সারাটি রাজ্য ছাইয়া গিয়াছে।

অধিবাসী

সিকিমের প্রাচীনতম জাতি রঙের, নেপালী নাম লেপচা। তাহার পরেই তিব্বতের খাম প্রদেশ হইতে আগত খামপা বা খাম্বাদেব স্থান। সাংপো বা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণেব তিব্বতীয় প্রদেশ হইতে আসিয়াছে লিম্বাস। রাজ্যের প্রধান জাতিসমূহেব নাম লেপচা, ভুটিয়া, লিম্বাস, গুরুং, মুরমি, রায়, খাম্বু, কামি, ব্রাহ্মণ, মংগর, ছত্রী, নেওয়ার, কাগাতে ও দরজি। ইহাদের অনেকে নেপাল হইতে আসিয়াছে। নেপালীদেব সিকিমে আগমন এখনও অব্যাহত আছে।

সিকিমের অধিবাসীদেব ৭১ ০৬ শতাংশ হিন্দু এবং ২৮·৬১ শতাংশ বৌদ্ধ। জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হইলেও তাহারা নেপালী বহিরাগত। বৌদ্ধধর্মই রাজধর্ম। নানাস্থানে বৌদ্ধমঠ এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্য।

জনসংখ্যার অনুপাতে বিবাহিতা নারীব সংখ্যা অতি অল্প এবং ক্রমশ উহা আরও হ্রাস পাইতেছে। নারীর একাধিক পতিগ্রহণের প্রথা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সিকিমি নারী সাধারণত বহু সন্তানের জননী। পাড়ায় পাড়ায় শিশুর মেলা সিকিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কৃষি

চাষবাস নিম্নাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এই স্থান বহুলপরিমাণে অরণ্যমুক্ত করা হইয়াছে। পর্বতেব ঢালে ভুট্টা, জোয়ার ও কলাই উৎপন্ন করা হয়। ছোট ছোট ক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত বাড়িতে লোকেরা বাস করে। উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে ধানের চাষ করা হয়। ধানের ক্ষেত কোন কোন সময় ২,০০০ হইতে ৩,০০০ ফুট উর্ধ্বে পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে তাকের মত করিয়া নির্মিত হয়। নেপালী বহিরাগতগণ এইরূপ ক্ষেত্রনির্মাণে সুদক্ষ। তিন-চার ফুট নীচে নীচে নির্মিত ক্ষেত্রে উপরের ক্ষুদ্র নদীর জল অভিনব পন্থায় সিঞ্চিত করা হয়। উর্বর মৃত্তিকায় চারা রোপণের ফলে প্রচুর ধান জন্মে। চোলা পর্বতশ্রেণী তিব্বতের সীমায় অবস্থিত। তাহার নিম্নে, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, তিস্তা ও পূর্ব দিক হইতে আগত তাহার উপনদীসমূহের উপত্যকায় বসতি সর্বাধিক ঘন। রাজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এই অঞ্চল। বড় রংগীতে যেসকল ক্ষুদ্র নদী পতিত হইতেছে তাহাদের উপত্যকাতেও বিস্তর চাষবাস হইয়া থাকে। সিকিমের সর্বপ্রধান শস্য এখনও ভুট্টা। মারুয়া, ধান, গম ও যবের স্থান তাহার পরে। এখন বিস্তৃত অঞ্চলে কলা, কমলা ও আপেল জন্মান হয়।

জনগণনা

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ হইতে সিকিমের জনগণনা বাঙলার জনগণনার সহিত এক সঙ্গে হইয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক ভাটপাড়া শহরে যত লোক, সমগ্র সিকিম রাজ্যের লোকসংখ্যা তত, অর্থাৎ ১,৩৭,৭২৫। সিকিমের লোকসংখ্যা কলিকাতার মুচিপাড়া থানার লোকের সমান। ষাট বৎসর পূর্বে, ১৮৯১ সনে সিকিমে ৩০,৪৫৮ জন লোক গণনা করা হইয়াছিল। সিকিমের লোকগণনা অতি দুরূহ ব্যাপার। পর্বতের গায়ে, উন্নত অধিত্যকায়, গভীর উপত্যকায়, বনের ফাঁকে ফাঁকে পৌনে তিন হাজার বর্গমাইল ব্যাপিয়া প্রায় পঁচিশ হাজাব দূরধিগম্য বাড়িতে উপস্থিত হইযা লোকগণনা করিতে হইয়াছে। প্রথম বৎসরেব নূতন গণনায় অসুবিধা ছিল আরও বেশি। সুতরাং ১৮৯১ সনের হিসাবে জনগণেব পূর্ণসংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। দশ বৎসব পবে, ১৯০১ সনে, ২৮,৫৫৬ জন লোক বেশি গণনা কবা হইযাছিল। ইহা ১৮৯১ সনের সংখ্যার উপর ৯৩·৮ শতাংশ বৃদ্ধি। ইহার মধ্যে ২৫,০০০ ছিল বহিরাগত। ১৯০১ সনে জনগণের ৩৮ ৫ শতাংশ লোকের জন্মস্থান নেপাল বলিযা লিপিবদ্ধ কবা হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই নবাগত ছিল। ১৯১১ সনের গণনায় উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইযাছিল। গণনার আপেক্ষিক বিশুদ্ধতা, অতিপ্রজতা ও বহিরাগতের আগমন ১৯১১ সনে ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধির কারণ। ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পৌনঃপুনিক জ্বরের আক্রমণে বহু লোকক্ষয় ঘটে। তাহার ফলে ১৯২১ সনে ৭ শতাংশ লোক হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার পর বহিরাগতের আগমনের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে মোট জনসংখ্যা প্রভাবিত হইয়াছে। সিকিমের ২৪,৪০২টি পরিবারের ২৩,৭০৭টি পল্লীবাসী।

এ রাজ্যে 'লিটারেট' বা সাক্ষর লোকের হার শতকরা ৭·৩। কৃষিবর্গের স্বাবলম্বী পুরুষ ২৩,৯২৩ ও নারী ২,৫৯০। অ-কৃষিবর্গের স্বাবলম্বী পুরুষের সংখ্যা ৬,০১৮ ও নারী ৬৯১।

পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয়

আয়তন

পশ্চিমবঙ্গের ভূমির আয়তন

রাজ্য, বিভাগ, জেলা ও মহকুমা	ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল প্রদত্ত (বর্গমাইলে)	পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপত্রের অধিকর্তা প্রদত্ত
পশ্চিমবঙ্গ	৩০,৭৭৫·৩	৩১,০৪৪·৩
বর্ধমান বিভাগ	..	১৪,১৬৩·৭
বর্ধমান	২,৭১৫·৯	২,৭০৫·৪
সদর মহকুমা	..	১,২৮৬·৯
আসানসোল মহকুমা	..	৬২৪·১
কালনা মহকুমা	..	৩৮৫·১
কাটোয়া মহকুমা	..	৪০৯·৩
বীরভূম	১,৭৫৪·২	১,৭৪২·৯
সদর মহকুমা	..	১,১৩৬·৯
রামপুরহাট মহকুমা	..	৬০৬·০
বাঁকুড়া	২,৬৫৭·৭	২,৬৪৬·৯
সদর মহকুমা	..	১,৯৩৩·৪
বিষ্ণুপুর মহকুমা	..	৭১৩·৫
মেদিনীপুর	৫,২৫৮·৫	৫,২৫৩·১
সদর মহকুমা	..	২,০৩৮·০
কাঁথি মহকুমা	..	৯১১·৬
তমলুক মহকুমা	..	৭৪৯·১
ঘাটাল মহকুমা	..	৩৬৮·৫
ঝাড়গ্রাম মহকুমা	..	১,১৮৫·৯
হুগলি	১,২০৯·২	১,২০৮·৪
সদর মহকুমা	..	৪৪৬·১
শ্রীরামপুর মহকুমা	..	৩৪৯·৮
আরামবাগ মহকুমা	..	৪১২·৫
হাওড়া	৫৬৮·২	৫৬০·১
সদর মহকুমা	..	১৭৪·১
উলুবেড়িয়া মহকুমা	..	৩৮৬·০
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৬,৬১১·৬	১৬,৯২৭·৫
চব্বিশপরগনা	৫,২৯২·৮	৫,৬৩৯·৯
সদর মহকুমা	..	১,১০৬·৭
বসিরহাট মহকুমা	..	৮১৭·৯
বারাসত মহকুমা	..	৩৮৪·০
বনগাঁ মহকুমা	..	৩১৯·৮
বারাকপুর মহকুমা	..	১১৯·১
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা	..	১,২৬২·৪
চব্বিশপরগনার বনবিভাগ	..	১,৬৩০·০
কলিকাতা	৩২·৩	৩২·৩
কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের এলাকা	..	২৮·৩৪
নদিয়া	১,৫২৭·২	১,৫০৯·০
সদর মহকুমা	.	৯৬৮·৮
রাণাঘাট মহকুমা	..	৫৪০·২
মুর্শিদাবাদ	২,০৯৪·৫	২,০৭২·১
সদর মহকুমা	..	৬৫৮·৮
লালবাগ মহকুমা	..	৫২১·৯
জঙ্গীপুর মহকুমা	..	৪৩৭·১
কান্দী মহকুমা	..	৪৫৪·৩
মালদহ	১,৪০৭·৯	১,৩৯২·০
সদর মহকুমা	..	১,৩৯২·০
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৩৮৪·৮	১,৩৮৫·৫
বালুরঘাট মহকুমা	.	৫৮৫·৬
রায়গঞ্জ মহকুমা	..	৭৯৯·৯
জলপাইগুড়ি	২,৩৭৮·৩	২,৩৭৪·৪
সদর মহকুমা	..	১,২৯৫·৯
আলিপুরদুয়ার মহকুমা	..	১,০৭৮·৫
দার্জিলিঙ	১,১৫৯·৭	১,১৯৯·৭
সদর মহকুমা	..	৩৬১·২
কার্সিয়াঙ মহকুমা	..	১৬৪·২
শিলিগুড়ি মহকুমা	..	২৬৬·৪
কালিম্পঙ মহকুমা	..	৪০৭·৯
কোচবিহার	১,৩৩৪·১	১,৩২২·৬
সদর মহকুমা	..	২৮৪·৮
তুফানগঞ্জ মহকুমা	..	২২৪·০
দিনহাটা মহকুমা	..	২৭১·৯
মাথাভাঙ্গা মহকুমা	..	৩৮৩·০
মেকলিগঞ্জ মহকুমা	..	১৭৮·৯

রাজ্যের গ্রাম, শহর ও থানার সংখ্যা, ১৯৫১

রাজ্য ও জেলা	মোট মৌজার সংখ্যা	জনবিহীন মৌজা	শহরের অন্তর্ভুক্ত মৌজা	বসতিপূর্ণ গ্রাম	শহর	থানা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৯,১৫১	৩,৫৮৯	৫১৮	৩৫,০৬৩	১১৪	২৮০
বর্ধমান বিভাগ	২৪,২৯৩	২,৪২৬	২৪৮	২১,৬১৯	৫০	১২৫
বর্ধমান	২,৮২৫	১৩৫	৪১	২,৬৪৯	১৪	২৪
বীরভূম	২,৪৮৯	২৬৬	১৬	২,২০৭	৫	১৪
বাঁকুড়া	৩,৮৪৬	৩০২	১৯	৩,৫২৫	৫	১৯
মেদিনীপুর	১২,২৮৮	১,৬৬৯	১০২	১০,৫১৭	১১	৩৪
হুগলি	১,৯৯৮	৪৫	৪৭	১,৯০৬	১১	১৮
হাওড়া	৮৪৭	৯	২৩	৮১৫	৪	১৬
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৪,৮৫৮	১,১৪৩	২৭০	১৩,৪৪৪	৬৪	১৫৫
চব্বিশপরগনা	৪,১১৩	১০৬	১৬১	৩,৮৪৬	৩৩	৪০
কলিকাতা	..	..	..	..	১	২৮
নদিয়া	১,৪৫১	১৮৪	২৯	১,২৩৮	৭	১৩
মুর্শিদাবাদ	২,২৮৯	৩৪২	৪৬	১,৯০১	৬	২১
মালদহ*	১,৮০২	২১৪	৯	১,৫৭৭	২	১০
পশ্চিম দিনাজপুর	২,৪০২	৮৭	১২	২,৩০৩	৩	১১
জলপাইগুড়ি	৮০১	২৪	৫	৭৭৬	২	১২
দার্জিলিঙ	৬৭১	৫৫	১২	৬০৫	৪	১২
কোচবিহার	১,৩২৯	১৩১	..	১,১৯৮	৬	৮

*ববরা থানার ৩১নং মৌজা পূর্ণিয়া জেলাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জনসংখ্যা

রাজ্য ও জেলার জনসংখ্যা, ১৯০১-৫১

রাজ্য ও জেলা	জনসংখ্যা, ১৯৫১	জনসংখ্যা, ১৯৪১	জনসংখ্যা, ১৯৩১	জনসংখ্যা, ১৯২১	জনসংখ্যা, ১৯১১	জনসংখ্যা, ১৯০১
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৮,১০,৩০৮	২,১৮,৩৭,২৯৫	১,৭৬,৬৩,৪২৭	১,৬৪,০০,৮৩৭	১,৬৭,৯২,৮০০	১,৫৮,৩৪,০১০
চব্বিশপরগনা	৪৬,০৯,৩০৯	৩৬,৬৯,৪৯০	২৮,৮৮,৬৯৪	২৬,৩৬,৭১০	২৪,৭৮,৩৩৫	২১,৫৫,৯৮১
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	৩১,৯০,৬৪৭	২৭,৯৯,০৯৩	২৬,৬৬,৬৬০	২৮,২১,২০১	২৭,৮৯,১১৪
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	২১,০৮,৮৯১	১১,৪০ ৮৬২	১০,৩১,৬৯৭	৯,৯৮,০১২	৯,২০,৯৩৩
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	১৮,৯০,৭৩২	১৫,৭৫,৬৯৯	১৪,৩৪,৭৭১	১৫,৩৩,৮৭৪	১৫,২৮,২৯০
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	১৬,৪০,৫৩০	১৩,৭০,৬৭৭	১২,২৪,১৮১	১৩,৪৫,০৭৩	১৩,২২,৪৮৬
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	১৪,৯০,৩০৪	১০,৯৮,৮৬৭	৯,৯৭,৪০৩	৯,৪৩,৫০২	৮,৫০,৫১৪
হুগলি	১৫,৫৪,৩২০	১৩,৭৭,৭২৯	১১,১৪,২৫৫	১০,৮০,১৪২	১০,৯০,০৯৭	১০.৪৯,০৪১
বাঁকুড়া	১৩,১৯,২৫৯	১২,৮৯,৬৪০	১১,১১,৭২১	১০,১৯,৯৪১	১১,৩৮,৬৭০	১১,১৬,৪১১
নদিয়া	১১,৪৪,৯২৪	৮,৪০,৩০৩	৭,২১,৯০৭	৭,১১,৭০৬	৭,৭৫,৯৮৬	৭,৭৩,২০২
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	১০,৪৮,৩১৭	৯,৪৭,৫৫৪	৮,৫১,৭২৫	৯,৪০,১৬২	৯,০৬,৮৯১
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	৮,৪৪,৩১৫	৭,২০,৪৪০	৬,৮৬,১৭৪	৬,৯৮,৫৪৭	৬,০৩,৬৪৯
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	৮,৪৫,৭০২	৭,৩৯,১৬০	৬,৯৪,০৫৬	৬,৬১,২৮২	৫,৪৪,৯০৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	৫,৮১,৪৮৪	৫,২৩,৯৭৭	৪,৯০,৪৩৪	৫,০৯,৫৫৭	৪,৫৬,৫০১ "
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৮	৬,৪০,৮৪২	৫,৯০,৮৮৬	৫,৯২,৪৮৯	৫,৯২,৯৫২	৫,৬৬,৯৭৪
দার্জিলিঙ	৪,৪৫,২৬০	৩,৭৬,৩৬৯	৩,১৯,৬৩৫	২,৮২,৭৪৮	২,৬৫,৫৫০	২,৪৯.১১৭

[illegible]র গঠন

	১৯৫১	১৯৪১ (সংশোধিত)	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
মোট জনসংখ্যা ..	২,৪৮,১০,৩০৮	২,০৭,৫৬,৬৮২	১,৭৬,৬৩,৪২৭	১,৬৪,০০,৮৩৭	১,৬৭,৯২,৮০০	১,৫৮,৩৪,০১০	১,৪৬,৪৯,৮৫০
বহিরাগত ..	৪৬,০০,৬৭২	১৭,২৯,৮২০	১৪,৭৭,৯০৫	১৪,৬০,০৫৪	১৪,২৮,০৭৫	১০,৪৫,৩১৪	৬,৮৭,৬৬২
বিদেশগামী ..	৩,১১,১১৬	১,৮৫,৭৫৩	১,৫৫,৭৮১	১,৯১,২০০	২,৬২,০১০	৬৬,১২১	১,০১,৩০৫
নীট বা স্বাভাবিক জনসংখ্যা	২,০৫,২০,৭৫২	১,৯২,১২,৬১৫	১,৬৩,৪১,৩০৩	১,৫১,৩১,৯৮৩	১,৫৬,২৬,৭৩৫	১,৪৮,৫৪,৮১৭	১,৪০.৬৩,৪৯৩
শতাংশে বিভিন্ন দশকের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি	+৬·৮	+১৭·৬	+৮·০	--৩·২	+৫·২	+৫·৬	..

শহর ও পল্লীর লোকসংখ্যা, ১৯৫১

রাজ্য, বিভাগ, জেলা ও মহকুমা	মোট লোক			পুরুষ			নারী		
	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৮,১০,৩০৮	১,৮৬,৫৭,০৪৫	৬১,৫৩,২৬৩	১,৩৩,৪৫,৪৪১	৯৬,৩১,৪১৩	৩৭,১৪,০২৮	১,১৪,৬৪,৮৬৭	৯০,২৫,৬৩২	২৪,৩৯,২৩৫
বর্ধমান বিভাগ	১,১১,০২,৫৩০	৯৪,৯৪,৮৪৮	১৬,০৭,৬৮২	৫৭,৯৯,৫৬১	৪৮,৬৭,৩৯৩	৯,৩২,১৬৮	৫৩,০২,৯৬৯	৪৬,২৭,৪৫৫	৬,৭৫,৫১৪
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	১৮,৬৭,৭২৬	৩,২৩,৯৪১	১১,৬০,৭৬১	৯,৭৮,৪৫০	১,৮২,৩১১	১০,৩০,৯০৬	৮,৮৯,২৭৬	১,৪১,৬৩০
সদর মহকুমা	৮,০২,০৫৭	৭,২১,৬৭৬	৮০,৩৮১	৪,২০,০৪৮	৩,৭৪,০০১	৪৬,০৪৭	৩,৮২,০০৯	৩,৪৭,৬৭৫	৩৪,৩৩৪
আসানসোল মহকুমা	৭,৬৯.২৬৫	৫,৬৬.৭১১	২,০২.৫৫৪	৪,২৭,২৮৪	৩,১২,৭৭২	১,১৪,৫১২	৩,৪১,৯৮১	২,৫৩,৯৩৯	৮৮,০৪২
কালনা মহকুমা	৩,০৫,৭৫১	২,৮৮,৪২৭	১৭,৩২৪	১,৫৪,৯৪৮	১.৪৫,৬৮৫	৯,২৬৩	১,৫০,৮০৩	১,৪২,৭৪২	৮,০৬১
কাটোয়া মহকুমা	৩,১৪,৫৯৪	২,৯০.৯১২	২৩,৬৮২	১,৫৮.৪৮১	১,৪৫,৯৯২	১২,৪৮৯	১,৫৬,১১৩	১,৪৪,৯২০	১১,১৯৩
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	৯,৯৭.৮৯৬	৬৮,৯৯৩	৫,৪০,৩৬১	৫,০৩,০৯৫	৩৭,২৬৬	৫,২৬,৫২৮	৪,৯৪,৮০১	৩১,৭২৭
সদর মহকুমা	৬,৩৮,১৫৯	৫.৮৪ ৩১০	৫৩.৮৪৯	৩.২৩,৯৯৩	২,৯৫,০০৬	২৮,৯৮৭	৩,১৪,১৬৬	২,৮৯,৩০৪	২৪,৮৬২
রামপুরহাট মহকুমা	৪,২৮,৭৩০	৪,১৩.৫৮৬	১৫ ১৪৪	২.১৬,৩৬৮	২,০৮,০৮৯	৮,২৭৯	২,১২,৩৬২	২,০৫,৪৯৭	৬,৮৬৫
বাঁকুড়া	১৩,১৯ ২৫৯	১২,২৪,৬৪১	৯৪,৬১৮	৬.৬৫,৮৫৩	৬,১৭.২৪২	৪৮,৬১১	৬,৫৩,৪০৬	৬.০৭,৩৯৯	৪৬,০০৭
সদর মহকুমা	৯,৬৫,৩৬৩	৯.১১.৮৬৭	৫৩ ৪৯৬	৪,৮৭,০৬৬	৪,৫৮.৬৬৫	২৮,৪০১	৪.৭৮,২৯৭	৪,৫৩,২৩২	২৫,০৬৫
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৩,৫৩,৮৯৬	৩,১২,৭৭৪	৪১,১২২	১,৭৮.৭৮৭	১.৫৮.৬০৭	২০,১৮০	১,৭৫.১০৯	১.৫৪,১৬৭	২০,৯৪২
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	৩১,০৬,১৪২	২.৫২.৮৮০	১৭,১৮,৪৫৯	১৫,৮৪,২৯০	১,৩৪.১৬৯	১৬,৪০,৫৬৩	১৫,২১,৮৫২	১,১৮,৭১১
সদর মহকুমা	১০,৫৭.৬৫৮	৮,৭৭,৭৪০	১,৭৯.৯১৮	৫,৪৩,৫০১	৪,৪৭,৭৭১	৯৫,৭৩০	৫,১৪,১৫৭	৪,২৯.৯৬৯	৮৪,১৮৮
কাঁথি মহকুমা	৭,৩৯.৮৪১	৭,২৭.১০৩	১২,৭৩৮	৩.৮১.১১৮	৩,৭৪.৩১০	৬,৮০৮	৩,৫৮,৭২৩	৩,৫২.৭৯৩	৫,৯৩০
তমলুক মহকুমা	৭,৮৮,৪৩৮	৭,৭৪,৮৩৯	১৩,৫৯৯	৪,০৩.২৯৬	৩,৯৬,১২৭	৭,১৬৯	৩,৮৫,১৪২	৩,৭৮,৭১২	৬,৪৩০
ঘাটাল মহকুমা	৩,১১,৩৮২	২,৭২,৭৩২	৩৮,৬৫০	১.৫৮.৯১৫	১.৩৮.৮৬২	২০,০৫৩	১,৫২,৪৬৭	১,৩৩,৮৭০	১৮,৫৯৭
ঝাড়গ্রাম মহকুমা	৪,৬১.৭০৩	৪,৫৩.৭২৮	৭,৯৭৫	২ ৩১.৬২৯	২,২৭,২২০	৪,৪০৯	২,৩০,০৭৪	২,২৬.৫০৮	৩.৫৬৬
হুগলি	১৫,৫৪.৩২০	১২.০৯.৩৯০	৩.৪৪,৯৩০	৮,২৩,৯২৩	৬,১৮.৪৮৭	২.০৫,৪৩৬	৭,৩০,৩৯৭	৫,৯০,৯০৩	১,৩৯,৪৯৪
সদর মহকুমা	৪,৫৪,৫৭৩	৩,৬৭,১৪৬	৮৭,৪২৭	২,৩৭,৯২৭	১,৮৮,২৫৫	৪৯,৬৭২	২,১৬,৬৪৬	১.৭৮,৮৯১	৩৭,৭৫৫

শহর ও পল্লীর লোকসংখ্যা, ১৯৫১—পূর্বানুবৃত্তি

রাজ্য, বিভাগ, জেলা ও মহকুমা	মোট লোক			পুরুষ			নারী		
	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী
হুগলি—সমাপ্ত									
শ্রীরামপুর মহকুমা	৭,২৯,৩৩১	৪,৮৩,২৮৮	২,৪৬,০৪৩	৪,০০,০০১	২,৫০,৩৭৬	১,৪৯,৬২৫	৩,২৯,৩৩০	২,৩২,৯১২	৯৬,৪১৮
আরামবাগ মহকুমা	৩,৭০,৮১৬	৩,৫৮,৯৫৬	১১,৮৬০	১,৮৫,৯৯৫	১,৭৯,৮৫৬	৬,১৩৯	১,৮৪,৮২১	১,৭৯,১০০	৫,৭২১
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	১০,৮৯,০৫৩	৫,২২,৩২০	৮,৯০,২০৪	৫,৬৫,৮২৯	৩,২৪,৩৭৫	৭,২১,১৬৯	৫,২৩,২২৪	১,৯৭,৯৪৫
সদর মহকুমা	৯,২৮,৪৫৬	৪,৩১,৬৮৮	৪,৯৬,৭৬৮	৫,৩৯,২১৬	২,২৯,৬১৯	৩,০৯,৫৯৭	৩,৮৯,২৪০	২,০২,০৬৯	১,৮৭,১৭১
উলুবেড়িয়া মহকুমা	৬,৮২,৯১৭	৬,৫৭,৩৬৫	২৫,৫৫২	৩,৫০,৯৮৮	৩,৩৬,২১০	১৪,৭৭৮	৩,৩১,৯২৯	৩,২১,১৫৫	১০,৭৭৪
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১,৩৭,০৭,৭৭৮	৯১,৬২,১৯৭	৪৫,৪৫,৫৮১	৭৫,৪৫,৮৮০	৪৭,৬৪,০২০	২৭,৮১,৮৬০	৬১,৬১,৮৯৮	৪৩,৯৮,১৭৭	১৭,৬৩,৭২১
চব্বিশপরগনা	৪৬,০৯,৩০৯	৩২,৪৩,৩৪০	১৩,৬৫,৯৬৯	২৪,৯৯,৬৬০	১৬,৮৫,৪২৬	৮,১৪,২৩৪	২১,০৯,৬৪৯	১৫,৫৭,৯১৪	৫,৫১,৭৩৫
সদর মহকুমা	১৫,১৩,৯৪৮	১০,৬৫,১০৭	৪,৪৮,৮৪১	৮,১২,২৫২	৫,৫৩,৯৬১	২,৫৮,২৯১	৭,০১,৬৯৬	৫,১১,১৪৬	১,৯০,৫৫০
বসিরহাট মহকুমা	৭,১৩,৬১৯	৬,৪৯,২৭৩	৬৪,৩৪৬	৩,৭২,১০৭	৩,৩৭,৭৭০	৩৪,৩৩৭	৩,৪১,৫১২	৩,১১,৫০৩	৩০,০০৯
বারাসাত মহকুমা	৩,৯৩,৯৮০	৩,৭১,৪৩৪	২২,৫৪৬	২,০৬,২৬৮	১,৯৪,২০১	১২,০৬৭	১,৮৭,৭১২	১,৭৭,২৩৩	১০,৪৭৯
বনগাঁ মহকুমা	২,০৮,৭৪২	১,৮৫,৩৭৮	২৩,৩৬৪	১,০৮,৫৬৪	৯৬,৪৩০	১২,১৩৪	১,০০,১৭৮	৮৮,৯৪৮	১১,২৩০
বারাকপুর মহকুমা	৮,৭৭,৯০০	৮০,৮৪৬	৭,৯৭,০৫৪	৫,৩৬,০৬০	৪৪,০৮৭	৪,৯১,৯৭৩	৩,৪১,৮৪০	৩৬,৭৫৯	৩,০৫,০৮১
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা	৯,০১,১২০	৮,৯১,৩০২	৯,৮১৮	৪,৬৪,৪০৯	৪,৫৮,৯৭৭	৫,৪৩২	৪,৩৬,৭১১	৪,৩২,৩২৫	৪,৩৮৬
চব্বিশপরগনার বনবিভাগ	২,৪৯৬	২,৪৯৬	..	২,৪২৭	২,৪২৭	.	৬৯	৬৯	..
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	..	২৫,৪৮,৬৭৭	১৬,২৩,২১১	.	১৬,২৩,২১১	৯,২৫,৪৬৬	..	৯,২৫,৪৬৬
কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের এলাকা	২৫,২০,৯২১	..	২৫,২০,৯২১	১৫,৯৭,৪১৬	..	১৫,৯৭,৪১৬	৯,২৩,৫০৫	..	৯,২৩,৫০৫
নদিয়া	১১,৪৪,৯২৪	৯,৩৬,৮২৩	২,০৮,১০১	৫,৯০,৯৩৬	৪,৮২,৯৩২	১,০৮,০০৪	৫,৫৩,৯৮৮	৪,৫৩,৮৯১	১,০০,০৯৭
সদর মহকুমা	৭,০২,৮৭১	৫,৯৬,৫৩১	১,০৬,৩৪০	৩,৬০,৫৭৮	৩,০৫,৫০৮	৫৫,০৭০	৩,৪২,২৯৩	২,৯১,০২৩	৫১,২৭০
রাণাঘাট মহকুমা	৪,৪২,০৫৩	৩,৪০,২৯২	১,০১,৭৬১	২,৩০,৩৫৮	১,৭৭,৪২৪	৫২,৯৩৪	২,১১,৬৯৫	১,৬২,৮৬৮	৪৮,৮২৭
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	১৫,৮০,৮৩২	১,৩৪,৯২৭	৮,৬৯,৪৫৮	৭,৯৯,২৮১	৭০,১৭৭	৮,৪৬,৩০১	৭,৮১,৫৫১	৬৪,৭৫০
সদর মহকুমা	৫,৪৪,২২৮	৪,৮৮,৬১৫	৫৫,৬১৩	২,৮০,০০৬	২,৫০,২৪৯	২৯,৭৫৭	২,৬৪,২২২	২,৩৮,৩৬৬	২৫,৮৫৬
লালবাগ মহকুমা	৩,৯৩,৮৭১	৩,৬৩,৯৬৭	২৯,৯০৪	১,৯৮,৫৫৯	১,৮৩,৩১৭	১৫,২৪২	১,৯৫,৩১২	১,৮০,৬৫০	১৪,৬৬২

শহর ও পল্লীর লোকসংখ্যা, ১৯৫১ —সমাপ্ত

রাজ্য, বিভাগ, জেলা ও মহকুমা	মোট লোক			পুরুষ			নারী		
	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী	মোট	পল্লীবাসী	নগরবাসী
মুর্শিদাবাদ—**সমাপ্ত**									
জঙ্গীপুর মহকুমা ..	৪,৩১,৯৭৯	৩,৯৭,৭৮৯	৩৪,১৯০	২,১৫,৪০৯	১,৯৮,১৪০	১৭,২৬৯	২,১৬,৫৭০	১,৯৯,৬৪৯	১৬,৯২১
কান্দী মহকুমা ..	৩,৪৫,৬৮১	৩,৩০,৪৬১	১৫,২২০	১,৭৫,৪৮৪	১,৬৭,৫৭৫	৭,৯০৯	১,৭০,১৯৭	১,৬২,৮৮৬	৭,৩১১
মালদহ ..	৯,৩৭,৫৮০	৯,০২,৪১৯	৩৫,১৬১	৪,৭৬,৭৯৪	৪,৫৭,৮২০	১৮,৯৭৪	৪,৬০,৭৮৬	৪,৪৪,৫৯৯	১৬,১৮৭
সদর মহকুমা ..	৯,৩৭,৫৮০	৯,০২,৪১৯	৩৫,১৬১	৪,৭৬,৭৯৪	৪,৫৭,৮২০	১৮,৯৭৪	৪,৬০,৭৮৬	৪,৪৪,৫৯৯	১৬,১৮৭
পশ্চিম দিনাজপুর ..	৭,২০,৫৭৩	৬,৭৮,৬৩৩	৪১,৯৪০	৩,৮৩,৮৫৩	৩,৬০,১৭৭	২৩,৬৭৬	৩,৩৬,৭২০	৩,১৮,৪৫৬	১৮,২৬৪
বালুরঘাট মহকুমা ..	৩,২৮,১১৪	৩,০১,৬৪৭	২৬,৪৬৭	১,৭১,২৬৯	১,৫৬,৩৬১	১৪,৯০৮	১,৫৬,৮৪৫	১,৪৫,২৮৬	১১,৫৫৯
রায়গঞ্জ মহকুমা ..	৩,৯২,৪৫৯	৩,৭৬,৯৮৬	১৫,৪৭৩	২,১২,৫৮৪	২,০৩,৮১৮	৮,৭৬৬	১,৭৯,৮৭৫	১,৭৩,১৭০	৬,৭০৫
জলপাইগুড়ি ..	৯,১৪,৫৩৮	৮,৪৮,৩৯৩	৬৬,১৪৫	৫,০১,০৯০	৪,৬১,৭০৫	৩৯,৩৮৫	৪ ১৩,৪৪৮	৩,৮৬,৬৮৮	২৬,৭৬০
সদর মহকুমা ..	৫,৪৬,১৪২	৫,০৪,৮৮৩	৪১,২৫৯	৩,০০,৩৫২	২,৭৫,৮০১	২৪,৫৫১	২,৪৫,৭৯০	২,২৯,০৮২	১৬,৭০৮
আলিপুরদুয়ার মহকুমা ..	৩,৬৮,৩৯৬	৩,৪৩,৫১০	২৪,৮৮৬	২,০০,৭৩৮	১,৮৫,৯০৪	১৪,৮৩৪	১,৬৭,৬৫৮	১,৫৭,৬০৬	১০,০৫২
দার্জিলিঙ ..	৪,৪৫,২৬০	৩,৫০,৭৭৯	৯৪,৪৮১	২,৩৯,০১৮	১,৮৪,১০৬	৫৪,৯১২	২,০৬,২৪২	১,৬৬,৬৭৩	৩৯,৫৬৯
সদর মহকুমা ..	১,৬৯,৬৩১	১,৩৬,০২৬	৩৩,৬০৫	৮৮,১৪৬	৬৯,৭৩২	১৮,৪১৪	৮১,৪৮৫	৬৬,২৯৪	১৫,১৯১
কার্সিয়াঙ মহকুমা ..	৬৫,৭১৩	৫৩,৯৯৪	১১,৭১৯	৩৪,১৭৬	২৭,৭৮৯	৬,৩৮৭	৩১,৫৩৭	২৬,২০৫	৫,৩৩২
শিলিগুড়ি মহকুমা ..	১,১৬,৪৭৫	৮৩,৯৯৫	৩২,৪৮০	৬৭,৪৫৯	৪৬,৫৫৬	২০,৯০৩	৪৯,০১৬	৩৭,৪৩৯	১১,৫৭৭
কালিম্পঙ মহকুমা ..	৯৩,৪৪১	৭৬,৭৬৪	১৬,৬৭৭	৪৯,২৩৭	৪০,০২৯	৯,২০৮	৪৪,২০৪	৩৬,৭৩৫	৭,৪৬৯
কোচবিহার ..	৬,৭১,১৫৮	৬,২০,৯৭৮	৫০,১৮০	৩,৬১,৮৬০	৩,৩২,৫৭৩	২৯,২৮৭	৩,০৯,২৯৮	২,৮৮,৪০৫	২০,৮৯৩
সদর মহকুমা ..	১,৭১,৮৬৫	১,৩৮,৬২৩	৩৩,২৪২	৯৪,৫৩১	৭৫,১৯২	১৯,৩৩৯	৭৭,৩৩৪	৬৩,৪৩১	১৩,৯০৩
তুফানগঞ্জ মহকুমা ..	৯৭,৭১৩	৯৫,৩৯৭	২,৩১৬	৫২,৪৭৫	৫১,১৭০	১,৩০৫	৪৫,২৩৮	৪৪,২২৭	১,০১১
দিনহাটা মহকুমা ..	১,৬১,০৫৪	১,৫৫,২০৬	৫,৮৪৮	৮৫,৯৭৪	৮২,৪২৫	৩,৫৪৯	৭৫,০৮০	৭২,৭৮১	২,২৯৯
মাথাভাঙ্গা মহকুমা ..	১,৪৮,৬৯১	১,৪৪,৪৩৫	৪,২৫৬	৭৯,৪১৬	৭৬,৮৮৬	২,৫৩০	৬৯,২৭৫	৬৭ ৫৪৯	১,৭২৬
মেকলিগঞ্জ মহকুমা ..	৯১,৮৩৫	৮৭,৩১৭	৪,৫১৮	৪৯.৪৬৪	৪৬,৯০০	২,৫৬৪	৪২,৩৭১	৪০,৪১৭	১,৯৫৪

শহরের লোকবৃদ্ধি

(জনসংখ্যার শতাংশে)

রাজ্য ও জেলা	১৯৫১	১৯৪১ (প্রকাশিত লোক-সংখ্যার শতাংশে)	১৯৪১ (অপ্রকাশিত গৃহ-তালিকার লোক-সংখ্যার শতাংশে)	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·৮	২১·৩	১৯·৫	১৬·০	১৫·০	১৩·৭	১২·৭
বর্ধমান	১৪·৮	১১·৮	১০·৮	৮·২	৬·৭	৬·১	৫·৭
বীরভূম	৬·৫	৫·৮	৫·৩	২·২	২·৭	১·০	১·০
বাঁকুড়া	৭·২	৭·১	৬·৩	৬·০	৬·০	৫·০	৪·৮
মেদিনীপুর	৭·৫	৫·৯	৫·৭	৫·০	৩·৬	৩·৬	৩·২
হুগলি	২২·২	২০·৫	২০·৩	১৮·৩	১৬·৬	১৩·৯	১২·৮
হাওড়া	৩২·৪	২৮·৮	২৪·০	২৩·২	২১·৯	২১·৩	২০·৭
চব্বিশপরগনা	২৯·৬	২৩·৮	২৪·০	২০·৬	১৯·২	১৮·০	১৫·১
কলিকাতা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
নদিয়া	১৮·২	১৩·৮	১৪·২	১১·৯	১১·২	১০·৩	১০·৩
মুর্শিদাবাদ	৭·৯	৭·৩	৭·৪	৬·৭	৭·২	৬·২	৫·৭
মালদহ	৩·৮	৩·২	২·৮	২·৭	২·৫	২·৬	২·৯
পশ্চিম দিনাজপুর	৫·৮	১·২	১·০	..	..	..	..
জলপাইগুড়ি	৭·২	৩·৩	২·৮	২·৬	২·১	১·৮	১·৯
দার্জিলিঙ	২১·২	১৫·৫	১৫·৫	১৩·৬	১০·২	৯·৩	৮·৬
কোচবিহার	৭·৫	৪·২	৪·২	৩·১	২·৯	২·৭	২·৫

শহরে পশ্চিমবঙ্গের লোক

রাজ্য ও জেলা	জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে মোট পুরবাসীর হার শতাংশ	জেলার উদ্বাস্তু ছাড়া জনসংখ্যার অনুপাতে মোট পুরবাসীর হার শতাংশ	জেলার সাধারণ জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম এরূপ পুরবাসীর হার শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·৮	২২·৫	১৩·৪
বর্ধমান	১৪·৮	১৩·৮	৮·৬
বীরভূম	৬·৫	৬·১	৫·৪
বাঁকুড়া	৭·২	৭·০	৬·৫
মেদিনীপুর	৭·৫	৭·২	৫·৫
হুগলি	২২·২	২১·০	১৪·২
হাওড়া	৩২·৪	৩০·৭	২৩·৪
চব্বিশপরগনা	২৯·৬	২৬·০	১৪·৯
কলিকাতা	১০০	১০০	৪৫·৫
নদিয়া	১৮·২	১৭·৫	৯·৫
মুর্শিদাবাদ	৭·৯	৭·১	৬·৩
মালদহ	৩·৮	৩·২	২·৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৫·৮	৩·৫	২·১
জলপাইগুড়ি	৭·২	৪·৮	২·১
দার্জিলিঙ	২১·২	১৯·৪	১২·৫
কোচবিহার	৭·৫	৬·০	৩·৩

বসতির ঘনতা

বসতির ক্রমবর্ধমান ঘনতা

(প্রতি বর্গমাইলে)

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
পশ্চিমবঙ্গ									
মোট	৭৯৯	৭০৩	৬৬৯	৫২৮	৫৪১	৫১০	৪৭২	৪৪৬	৪৩৮
পল্লী	৬১০	৫৬২	৪৮৫	৪৫৬	৪৭৪	৪৫২	৪২২	৪০২	৩৯৫
শহর	১৩,৬৩২	১০,২৮১	৬,২৬৬	৫,৪৪৫	৫,০৮১	৪,৪৬০	৩,৮৩৭	৩,৩৮৬	৩,৪১১
বর্ধমান বিভাগ									
মোট	৭৮৬	৭২৯	৬১৩	৫৭০	৬০০	৫৮৪	৫৪৫	৫২৪	৫৩৯
পল্লী	৬৮১	৬৪৬	৫৬২	৫২৯	৫৬৩	৫৫২	৫১৮	৫০১	৫১৩
শহর	৯,০৩৭	৭,১৭৩	৪,৫৮৩	৩,৭৯২	৩,৪৫৮	৩,০৮৪	২,৬৬৮	২,১১৫	২,৫৪৮
বর্ধমান									
মোট . .	৮১০	৬৯৯	৫৮২	৫১০	৫৬৭	৫৬৫	৫১৪	৫১৪	৫৪৮
পল্লী	৭০০	৬২৫	৫৪২	৫০২	৫৪০	৫৯১	৪৯৬	৪৯৬	৫২১
শহর .	৮,১২৮	৫,৭৩৭	৩,১১৯	২,৪৬১	২,৪২১	২,২১০	১,৭১৪	১,৭৪৭	২,৪৩৬
বীরভূম									
মোট	৬১২	৬০১	৫৪৪	৪৮১	৫১৯	৫২০	৪৫৮	৪৫৬	৪৯০
পল্লী	৫৭৭	৫৭২	৫১৬	৪৭৯	৫১৯	৫২০	৪৫৭	৪৫৫	৪৮৯
শহর	৪,৭৯১	৪,১১০	১,৪৫০	১,৬১৫	৬৩৪	৬০৪	৫২০	৫৪৫	৬২৫
বাঁকুড়া									
মোট . ..	৪৯৮	৪৮৭	৪২০	৩৮৫	৪৩০	৪২২	৪০৪	৩৯৪	৩৬৬
পল্লী	৪৬৭	৪৫৭	৩৯৮	৩৬৬	৪১২	৪০৫	৩৮৯	৩৮১	৩৫২
শহর	৩,৮৭৮	৩,৭৭০	২,৭৫৬	২,৪৯৫	২,৩৪৪	২,১৮১	২,০৬৫	১,৭৭০	১,৮৮৪
মেদিনীপুর									
মোট	৬৩৯	৬০৭	৫৩৩	৫০৮	৫৩৭	৫৩১	৫০১	৪৭৯	৪৮৫
পল্লী .. .	৫৯৭	৫৭৭	৫১১	৪৯৪	৫২৩	৫১৭	৪৮৮	৪৬৮	৪৭১
শহর	৫,১০৯	৩,৭৯৯	২,৮০০	১,৯৫৭	২,০৫৮	১,৮১৬	১,৮১৬	১,৬৫১	১,৮৮৬
হুগলি									
মোট	১,২৮৬	১,১৪০	৯২২	৮৯৪	৯০২	৮৬৮	৮৫৬	৮৩৮	৯৫৮
পল্লী	১,০৩০	৯৩২	৭৭৫	৭৬৭	৭৯৯	৭৭৯	৭৭৫	৭৭০	৮৯০
শহর	১০,১১৫	৮,২৯৬	৫,৯৭০	৫,২৫৯	৪,৪৪২	৩,৯২৬	৩,৬৩৭	৩,১৯৮	৩,২৯৭

বসতির ক্রমবর্ধমান ঘনতা—পূর্বানুবৃত্তি

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা			১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
হাওড়া											
মোট	..	..	২,৮৭৭	২,৬৬১	১,৯৬২	১,৭৮১	১,৬৮৫	১,৫১৯	১,৩৬৩	১,১১৪	১,০৬৪
পল্লী	..	..	২,০০৪	১,৯৫১	১,৫৫২	১,৪৩৩	১,৩৬৫	১,২৪১	১,১৬০	৯৭৫	৯১৬
শহর	..	..	৩১,৪৬৫	২৫,৮৮৫	১৫,৩৭৫	১৩,১৬৩	১২,১৩৩	১০,৬১৮	৮,০৩০	৬,৩৬৩	৫,৮৯১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ											
মোট	..	..	৮১০	৬৮২	৫৩৩	৪৯৩	৪৯২	৪৪৯	৪১১	৩৮১	৩৫৫
পল্লী	..	..	৫৫০	৪৯১	৪২১	৩৯৪	৩৯৯	৩৬৮	৩৪২	৩২০	২৯৫
শহর	..	..	১৬,৬২০	১২,৩০২	৭,৩৬০	৬,৫২১	৬,১৩৭	৫,৩৫৫	৪,৫৯৮	৪,০৭০	৩,৯৭২
চব্বিশপরগনা											
মোট	..	..	৮১৭	৬৫১	৫১২	৪৬৮	৪৩৯	৩৮২	৩৫৩	৩২১	৩৩১
পল্লী	..	..	৫৯১	৫০৯	৪১৮	৩৮৮	৩৭০	৩৩৩	৩৬০	২৮৫	২৭২
শহর	..	..	৯,২৩০	৫,৮৯২	৪,০১৭	৩,৪১৯	৩,০১৭	২,১৯৬	১,৯৪৮	১,৬১৬	১,৩৭৭
কলিকাতা											
মোট	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.
পল্লী	..	..	..	..	..	..	.	.	.	..	.
শহর	..	..	৭৮,৮৫৮	৬৫,২০০	৩৫,২৯৯	৩১,৯২১	৩০,৮৭৯	২৮,৪৯৪	২১,৯৫৪	২০,০৬৫	২০,৭১২
নদিয়া											
মোট	..	..	৭৫৯	৫৫৭	৪৭৮	৪৭.	৫১৪	৫১২	৫১২	৫১৬	৪৯৫
পল্লী	..	..	৬৩৩	৪৯০	৪৩০	৪২৭	৪৭১	৪৬৯	৪৬২	৪৮৩	৪৫০
শহর	..	..	৬,৯১৪	৩,৮৬৩	২,৮৫২	২,৬৫৩	২,৬৬১	২,৬৮৭	২,৯৮৪	৩,০৯৮	২,৭০২
মুর্শিদাবাদ											
মোট	..	..	৮২৮	৭৯২	৬৬১	৫৯১	৬৪৯	৬৩৮	৬০৪	৫৯২	৫৮৬
পল্লী	..	..	৭৭৩	৭৪৩	৬২৫	৫৫৬	৬১৭	৬০৯	৫৭২	৫৫৯	৫৪৬
শহর	..	..	৫,০৫৩	৪,৫১১	৩,৪৩৯	৩,২৯২	৩,১২৭	২,৮৪৩	২,৯৯৭	৩,১৩৪	৩,৬২১
মালদহ											
মোট	..	..	৬৭৪	৬০৭	৫১৮	৪৯৩	৫০২	৪৩৪	৩৯৩	৩৩৮	৩২৩
পল্লী	..	..	৬৫৫	৫৮৮	৫০৫	৪৮২	৪৯০	৪২২	৩৮১	৩২৬	৩১১
শহর	..	..	১১,৩৪২	৮,৭৬৭	৬,৩৫০	৫,৫৪৯	৫,৮৩০	৫,৬১৬	৫,৮০৫	৫,৫২৪	৫,৮৪৫
পশ্চিম দিনাজপুর											
মোট	..	..	৫২০	৪২১	৩৭৮	৩৫৪	৩৬৮	৩২৯	৩০৬	২৯৪	২৯০
পল্লী	..	..	৪৯২	৪১৮	..	..	..	..	..	..	..
শহর	..	..	৫,৫৯২	৯২৭	..	..	..	..	..	..	..

বসতির ক্রমবর্ধমান ঘনতা—সমাপ্ত

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
জলপাইগুড়ি									
মোট .. .	৩৮৫	৩৫৬	৩১১	২৯২	২৭১	২২৯	১৮৩	১৩১	৮৫
পল্লী	৩৫৯	৩৪৬	৩০৪	২৮৭	২৭৫	২২৬	১৭৯	১৩০	৮২
শহর	৭,৬০৩	৩,১৯১	২,১৮০	১,৭০৩	১,৩৫২	১,১৮৩	১,১৭২	৯১২	৭৫৮
দার্জিলিঙ									
মোট	৩৭১	৩১৪	২৬৬	২৩৬	২২১	২০৮	১৮৬	১২৯	৭৯
পল্লী ..	২৯৬	২৬৮	২৩৩	২১৪	২০৩	১৯২	১৭৩	১২১	৭৭
শহর .. .	৭,৩৮১	৪,৫৪৪	৩,৩৯৭	২,২৪২	১,৯২০	১,৬৭১	১,৩৮০	৮৬৩	২৪৭
কোচবিহার									
মোট .. .	৫০৭	৪৮৫	৪৪৭	৪৪৮	৪৪৮	৪২৯	৪৩৮	৪৫৬	৪০৩
পল্লী	৪৭১	৪৬৬	৪৩৫	৪৩৬	৪৩১	৪১৯	৪৩০	৪৫০	৩৯৯
শহর	১১,৬৭০	৬,২৩৮	৪,১১১	৪,০১৪	৩,৬৭১	৩,২৭০	২,৬৭২	২,২১৭	১,৬৬২

বিভিন্ন রাজ্যের ঘনতা, আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনা

রাজ্য	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা	বর্গমাইলে আয়তন	লোকসংখ্যা
আসাম . ..	১০৬	৮৫,০১২	৯০,৪৩,৭০৭
মধ্যপ্রদেশ	১৬৩	১,৩০,২৭২	২,১২,৪৭,৫৩৩
উড়িষ্যা .. .	২৪৪	৬০,১৩৬	১,৪৬,৪৫,৯৪৬
মহীশূর	৩০৮	২৯,৪৮৯	৯০,৭৪,৯৭২
বোম্বাই	৩২৩	১,১১,৪৩৪	৩,৫৯,৫৬,১৫০
পাঞ্জাব	৩৩৮	৩৭,৩৭৮	১,২৬,৪১,২০৫
মাদ্রাজ	৪৪৬	১,২৭,৭৯০	৫,৭০,১৬,০০২
উত্তরপ্রদেশ	৫৫৭	১,১৩,৪০৯	৬,৩২,১৫,৭৪২
বিহার	৫৭২	৭০,৩৩০	৪,০২,২৫,৯৪৭
পশ্চিমবঙ্গ	৮০৬	৩০,৭৭৫	২,৪৮,১০,৩০৮
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	১,০১৫	৯,১৪৪	৯২,৮০,৪২৫

লোকের হ্রাসবৃদ্ধি

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি (শতাংশে)

[বৃদ্ধি + ; হ্রাস —]

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা	১৯০১-৫১	১৯০১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯১১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১	১৯৩১-৪১	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১
পশ্চিমবঙ্গ									
মোট	+৫৬·৭	+৪৩·৪	+২৮·৬	+৪·০	+১৩·৬	+২৩·৬	+৭·৭	—২·৩	+৬·১
পল্লী	+৩৫·০	+২৭·৪	+১৮·৭	+২·৪	+৮·৫	+১৫·৯	+৬·৪	—৩·৮	+৪·০
শহর	+২০৫·৬	+১৫৩·৫	+৮০·৪	+১০·০	+৩২·৬	+৬৪·১	+১৫·১	+৭·২	+১১·৯
বর্ধমান বিভাগ									
মোট	+৩৪·৭	+৩১·৫	+২৫·৪	+৫·৪	+৭·৯	+১৯·০	+৭·৪	—৪·৯	+২·৮
পল্লী	+২৩·৪	+২১·৭	+১৯·৫	+৩·৯	+৫·৪	+১৫·১	+৬·২	—৬·১	+২·১
শহর	+১৯৩·০	+১৬৯·৪	+৮১·৩	+১৫·৯	+২৬·০	+৫৬·৫	+২০·৯	+৯·৬	+১২·১
বর্ধমান									
মোট	+৪৩·৪	+৩৭·১	+৩৩·০	+১০·৮	+১৫·৯	+২০·০	+৯·৮	—৬·৫	+০·৪
পল্লী	+২৯·৬	+২৫·৩	+২৪·৯	+৮·৩	+১২·০	+১৫·৩	+৮·০	—৭·০	—০·১
শহর	+২৭৩·৫	+২৩৩·৫	+১২২·৭	+২৯·৬	+৪৫·২	+৭১·৮	+৩৫·৭	+১·৭	+৮·৬
বীরভূম									
মোট	+১৭·৬	+১৬·৩	+১১·৪	+০·৬	+১·৮	+১০·৬	+১১·৩	—৯·৪	+৩·৭
পল্লী	+১১·১	+১০·৩	+৬·৯	+০·৩	+১·০	+৬·৬	+১১·৬	—১১·০	+৩·৭
শহর	+৬৯৩·৮	+৬৪০·৪	+২০৮·২	+৬·৭	+১৪·৩	+১৮৯·০	—১১·৪	+১৫৪·৬	+৫·১
বাঁকুড়া									
মোট	+১৮·২	+১৭·৩	+১৭·৮	+১·৬	+২·৩	+১৬·০	+৯·০	—১০·৪	+২·০
পল্লী	+১৫·২	+১৪·৬	+১৬·৬	+১·৭	+২·৩	+১৪·৭	+৮·৯	—১১·৩	+১·৭
শহর	+৭৭·৬	+৭২·৬	+৩৬·৭	—০·০	+২·৯	+৩৬·৮	+১০·৪	+৬·৪	+৭·৪
মেদিনীপুর									
মোট	+২০·৪	+১৯·২	+১৮·৮	+৪·২	+৫·৩	+১৪·০	+৫·০	—৫·৫	+১·২
পল্লী	+১৫·১	+১৪·৩	+১৫·৯	+২·৭	+৩·৪	+১২·৯	+৩·৫	—৫·৫	+০·৭
শহর	+১৮১·৪	+১৬৮·০	+৭৩·৮	+২৮·১	+৩৪·৫	+৩৫·৭	+৪৩·১	—৪·৯	+১১·৩
হুগলি									
মোট	+৪৮·২	+৪৩·৩	+৩৪·৯	+৯·১	+১২·৮	+২৩·৬	+৩·২	—০·৯	+৩·৯
পল্লী	+৩২·২	+২৯·৮	+৩০·৪	+৮·৫	+১০·৫	+২০·২	+১·১	—৪·০	+২·৬
শহর	+১৫৭·৬	+১৩৫·৭	+৫৫·০	+১১·৬	+২১·৯	+৩৯·০	+১৩·৫	+১৮·৪	+১১·১

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি (শতাংশে)—পূর্বানুবৃত্তি

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা	১৯০১-৫১	১৯০১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯১১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১	১৯৩১-৪১	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১
হাওড়া									
মোট	+৮৯·৫	+৮২·৩	+৪১·১	+৪·০	+৮·১	+৩৫·৬	+১০·২	+৫·৭	+১০·৯
পল্লী	+৬১·৫	+৫৯·৩	+২৭·৩	+১·৩	+২·৭	+২৫·৭	+৮·৩	+৫·০	+১০·১
শহর	+১৯৬·৩	+১৭০·৩	+৮৬·৭	+১০·৯	+২১·৬	+৬৮·৪	+১৬·৮	+৮·৫	+১৪·৩
প্রেসিডেন্সি বিভাগ									
মোট	+৮০·৫	+৫৬·৩	+৩১·৭	+২·৮	+১৮·৭	+২৮·১	+৮·০	+০·৩	+৯·৬
পল্লী	+৪৯·৫	+৩৪·৫	+১৭·৮	+০·৭	+১১·৯	+১৬·৯	+৬·৬	—১·২	+৮·৪
শহর	+২১০·৪	+১৪৭·৫	+৮০·১	+৭·৮	+৩৫·১	+৬৭·১	+১২·৯	+৬·৩	+১৪·৬
চব্বিশপরগনা									
মোট	+১১৩·৮	+৮৯·৩	+৪১·৩	+১১·২	+২৫·৬	+২৭·০	+৯·৬	+৬·৪	+১৫·০
পল্লী	+৭৭·১	+৬৫·০	+৩১·৭	+৮·০	+১৫·৯	+২১·৯	+৭·৭	+৪·৯	+১১·০
শহর	+৩২০·৩	+২২৬·৫	+৭৮·৫	+২১·৭	+৫৬·৬	+৪৬·৭	+১৭·৫	+১৩·৩	+৩৭·৪
কলিকাতা									
মোট			.					..	..
পল্লী	.				.			..	..
শহর	+১৭৬·৭	+১২৯·৭	+৮৫·৪	+০·৩	+২০·৯	+৮৪·৯	+১০·৬	+৩·৪	+৮·৪
নদিয়া									
মোট	+৪৮·১	—৭·১	০·৫	—১৪·৬	+৩৬·৩	+১৬·৪	+১·৪	—৮·৩	+০·৪
পল্লী	+৩৫·১	—১৪·৬	—৬·৯	—১৮·২	+২৯·৪	+১১·৮	+০·৭	—৯·২	+০·৩
শহর	+১৬১·২	+৫৭·৯	+৪৬·৫	+৮·২	+৭৯·০	+৩৫·৪	+৭·৫	—০·৩	+০·৫
মুর্শিদাবাদ									
মোট	+২৯·৭	+২৫·৩	+২০·৯	+১·০	+৪·৬	+১৯·৭	+১১·০	-৯·০	+১·৭
পল্লী	+২৬·৮	+২৩·৫	+২০·৪	+১·৩	+৪·০	+১৮·৯	+১১·৫	—৯·৯	+১·২
শহর	+৭৭·৮	+৫৪·৯	+২৮·১	-২·৪	+১২·০	+৩১·২	+৪·৫	+৫·৩	+১০·০
মালদহ									
মোট	+৫৫·৩	+৪৫·৩	+২১·৮	+৩·৯	+১১·০	+১৭·২	+৫·০	—১·৮	+১৫·৭
পল্লী	+৫৩·৯	+৪৪·৯	+২১·৩	+৪·০	+১০·৪	+১৬·৬	+৪·৮	—১·৭	+১৬·১
শহর	+১০২·০	+৩৮·৮	+৪০·৪	+১·৭	+২৯·৪	+১৮·১	+১৪·৪	—৪·৮	+৩·৮
পশ্চিম দিনাজপুর									
মোট	+৫৭·৮	+৩২·৫	+১৫·৫	+৩·৭	+২৩·৫	+১১·৪	+৬·৮	—৩·৮	+১১·৬
পল্লী	+৪৮·৭	+২৭·৯	+১১·৪	+১·২	+১৭·৭	+১০·০	+৬·৮	—৩·৮	+১১·৬
শহর	..	..	..	+২০৭·২	+৫০৩·৩		..	..	..

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি (শতাংশে)—সমাপ্ত

রাজ্য, বিভাগ ও জেলা	১৯০১-৫১	১৯০১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৩১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১ (উদ্বাস্তু ছাড়া)	১৯৪১-৫১	১৯৩১-৪১	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১
জলপাইগুড়ি									
মোট	+৬৭·৮	+৪৯·৭	+১০·৪	−৩·৫	+৮·১	+১৪·৪	+৬·৫	+৫·০	+২১·৪
পল্লী	+৫৮·৭	+৪৫·৪	+৭·৯	−৫·০	+৩·৭	+১১·৬	+৬·০	+৪·৬	+২১·৫
শহর	+৫৪২·৯	+২৭৭·৩	+১০৪·৭	+৩৯·৮	+১৩৮·২	+৪৬·৪	+২৮·০	+২৫·৯	+১৪·৩
দার্জিলিঙ									
মোট	+৭৮·৭	+৭২·৪	+৩৪·৪	+১৪·১	+১৮·৩	+১৭·৭	+১১·০	+৬·৫	+৬·৬
পল্লী	+৫৪·০	+৫২·০	+২৫·৪	+৮·৮	+১০·২	+১৫·২	+৮·৭	+৫·৪	+৫·৮
শহর	+৩৪১·৬	+২৮৯·৫	+৯১·৬	+৪৩·২	+৬২·৪	+৩১·৮	+৫১·৫	+১৬·৮	+১৪·৯
কোচবিহার									
মোট	+১৮·৪	+০·৮	−৩·৩	−১০·৯	+৪·৭	+৮·৫	−০·৩	−০·১	+৪·৬
পল্লী	+১২·৩	−২·৯	−৬·৭	−১২·৬	+১·১	+৭·২	−০·৪	−০·৩	+৪·৪
শহর	+২৫৬·৯	+১৪৪·৮	+৯০·৯	+২৮·৩	+৮৭·১	+৪৮·৮	+৪·৫	+৯·৩	+১২·৩

প্রধান প্রধান রাজ্যের হ্রাসবৃদ্ধির গড় হার (১৯৪১-৫১) এবং ১৯৫১ সনে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা

রাজ্য	হ্রাসবৃদ্ধির গড় (শতাংশে) ১৯৪১-৫১	প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা
আসাম	+১৭·৪	৮৭৯
মধ্যপ্রদেশ	+৭·৯	৯৯৩
উড়িষ্যা	+৬·২	১,০২২
মহীশূর	+২১·২	৯৪৯
বোম্বাই	+২০·৮	৯৩২
পাঞ্জাব	−০·৫	৮৬৩
মাদ্রাজ	+১৩·৪	১,০০৬
উত্তরপ্রদেশ	+১১·২	৯১০
বিহার	+৯·৬	৯৮৯
পশ্চিমবঙ্গ	+১২·৭	৮৫৯
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	+২১·২	১,০০৮

নারী

নগর ও শহরে মোট লোক ও নারীর হার

রাজ্য	মোট জনসমষ্টির প্রতি হাজারে			প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা		
	পুরবাসী	নগরবাসী	শহরবাসী	পুরবাসী	নগরবাসী	শহরবাসী
আসাম	৪৬		৪৬	৬৮৩	.	**৬৮৩**
মধ্যপ্রদেশ .. .	১৩৫	৩২	১০৩	৯২৫	৮৮৭	**৯৩৬**
উড়িষ্যা .	৪১	৭	৩৪	৮৮১	৭৫৫	**৯০৯**
মহীশূর .. .	২৪০	১৩০	১১০	৯১৬	৯১২	**৯২২**
বোম্বাই	৩১১	১৪১	১৭০	৮১৮	৬৯৭	**৯৩২**
পাঞ্জাব	১৯০	৫১	১৩৯	৮০৯	৮০২	**৮১১**
মাদ্রাজ	১৯৬	৮৭	১০৯	৯৮৯	৯৪৯	**১,০১০**
উত্তরপ্রদেশ ..	১৩৬	৭৫	৬১	৭৯৬	৭৮৪	**৮৩৮**
বিহার . .	৬৭	২১	৪৬	৮৪৫	৮২৬	**৮৫৫**
পশ্চিমবঙ্গ .	২৪৮	১৪৫	১০৩	৬৫৭	৬০০	**৭৪৪**
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন .	১৬০	৩২	১২৮	৯৮১	৯৫৩	**৯৮৯**

বিভিন্ন শ্রেণীর শহরে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা, ১৮৮১-১৯৫১

	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
আবাসিক শহর	৮৩৭	৮১৬	৮২৮	৮৫৮	৮৭৪	৯০৭	**৯৪৮**	১,০০২
শিল্প শহর .	৫৯৬	৪৮৭	৪৯৮	৫০৫	৫২৭	৫৫৮	**৫৭৮**	**৬৩০**
রেলওয়ে শহর	৮৩৮	৬১৬	৬৫৮	৬৯৩	৬৮৭	৭৭৫		.

পল্লী ও পৌরাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা, ১৯৫১

	প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা		
	মোট	পল্লীতে	শহরে
পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা	৮৫১	৯৩৭	৬৫৭
পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বহিরাগত	৪২৬	৬৪২	৩৩৫
ভারতীয় অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত	৪৫২	৫৩৭	৪৩৯
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গমনকারী	১,০০৬		
পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্যান্য রাজ্যে গমনকারী	৭৭১		
পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণ .	৯২০		

বহিরাগত

পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গমনাগমন এবং অন্য রাজ্যে বাঙলাভাষীর সংখ্যা

রাজ্য	পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগত (হাজারের অঙ্কে)	পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য রাজ্যে গমনকারী (হাজারের অঙ্কে)	বাঙলাভাষী (হাজারের অঙ্কে)
বিহার	১,১০৯	১৩৭·৪	১,৭৫৯·৭
উত্তরপ্রদেশ	২৯৫	৪৯	৭১
উড়িষ্যা	২০১	৩৪	৮৬
রাজস্থান	৫৬	২·১	২·৮
মাদ্রাজ	৫২	৩·৭	৩·৪
পাঞ্জাব	৩৮·৪	৪	১·০
মধ্যভারত	৩৮	১·৬	১·৫
বোম্বাই	১১·৭	১৪	১৫·৬
সৌরাষ্ট্র	৫·৫	·৯	·৫
দিল্লী	৩	৬	১০·৩
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	২·৩	·২৫	..
বিন্ধ্যপ্রদেশ	২	·৫	·৭
হায়দ্রাবাদ	২	১	·৮
মধ্যপ্রদেশ	২·৪	১৯·৫	২১·৮
পেপস্যু	১	·৬	·৫
ত্রিপুরা	৬	৩	..
মহীশূর	৫	১·৫	২·৪
আসাম	১৯·৬	২৩·৫	১,৭১৯
আজমীর	.	·৩	·৬

পল্লী ও শহরে ভারতীয় বহিরাগত

(হাজারের অঙ্কে)

রাজ্য ও জেলা	পল্লীর জনসংখ্যা		পল্লীতে ভারতীয় বহিরাগত		পল্লীর জনসংখ্যার অনুপাতে বহিরাগতের হার		শহরের জনসংখ্যা		শহরে ভারতীয় বহিরাগত		শহরের জনসংখ্যার অনুপাতে বহিরাগতের হার	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
পশ্চিমবঙ্গ	৯,৬৩১	৯,০২৬	৩৩১	২০৭	৩ ৪	২·৩	৩.৭১৪	২,৪৩৯	৯৮২	৩৬১	২৬ ৪	১৪·৮
বর্ধমান	৯৭৮·৫	৮৮৯	৮৮·৫	৫১	৯·০	৫·৭	১৮২·৫	১৪২	৫৫	৪০	৩০·১	২৮·৫
বীরভূম	৫০৩	৪৯৫	১৫	১৬	২·৯	৩·৪	৩৭	৩২	১	১	২·৬	২ ৮
বাঁকুড়া	৬১৭	৬০৭	৭·৫	১০	১·১	১·৭	৪৯	৪৬	১·৫	১·৫	২·৪	৩·৪
মেদিনীপুর . ..	১,৫৮৪	১,৫২২	২০	১৮	১·৩	১·২	১৩৪	১১৯	২৯	২০	২১·৪	১৬·৯
হুগলি ..	৬১৮·৫	৫৯১	২০	৯	৩·২	১·৬	২০৫·৫	১৩৯	৪৩	৩৭	২১·০	২৬·৪
হাওড়া ..	৫৬৬	৫২৩	১৮·৫	১১	৩·৩	২·১	৩২৪	১৯৮	৫৭	২০	১৭·৫	৯·৯
চব্বিশপরগনা ..	১,৬৮৫	১,৫৫৮	৩১	১১	১·৮	০·৭	৮১৪·৫	৫৫২	২১৯	৮৯	২৬·৮	১৬·২
কলিকাতা	..			..	..	..	১,৬২৩	৯২৫	৫৩৭	১৩৯	৩৩·১	১৫·১
নদিয়া . ..	৪৮৩	৪৫৪	১০	৪·৫	২·১	০·৯	১০৮	১০০	৬	১·৫	৬·০	১·৭
মুর্শিদাবাদ .. .	৭৯৯	৭৮২	৪·৫	৩·৫	০·৬	০·৫	৭০	৬৫	৩·৫	২	৫·২	৩·২
মালদহ . ..	৪৫৮	৪৪৫	৭·৫	৮	১·৭	১·৮	১৯	১৬	২	·৫	৯·৬	২·৮
পশ্চিম দিনাজপুর ..	৩৬০	৩১৮	১৪	৬	৪·০	২·১	২৪	১৮	২·৫	১	৯·৪	৫·৮
জলপাইগুড়ি	৪৬২	৩৮৭	৬৫	৪৬	১৪·০	১১·৮	৩৯·৫	২৭	১০	২	২৬·২	৬·৫
দার্জিলিঙ .. .	১৮৪	১৬৭	১৪	১২	৭·৫	৭·০	৫৫	৩৯	১১	৪·৫	২০·৭	১০·২
কোচবিহার	৩৩৩	২৮৮	১৫·৫	১	৪·৮	০·৪	২৯	২১	৪·৫	২	১৬·২	৮·৬

প্রতি দশকে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বহিরাগতের হার

(শতাংশে)

রাজ্য ও জেলা	১৯৫১		১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
	মোট	উদ্বাস্তু							
পশ্চিমবঙ্গ	১৮·৫	৮·৫	৯·৫	৮·৪	৮·৯	৮·৫	৬·৬	৪·৭	২·২
বর্ধমান	১৫·৮	৪·৪	৯·৭	৭·৪	৬·৬	৫·৪	৫·১	১·৬	০·৫
বীরভূম	৪·৫	১·১	৩·০	৩·২	৩·৩	৩·৭	৩·৬	০·৭	০·১
বাঁকুড়া	২·৩	০·৭	১·৬	১·৩	১·২	১·২	১·০	০·৩	০·১
মেদিনীপুর	৩·৭	১·০	২·৪	২·৩	১·৮	১·৭	০·৯	০·৪	০·১
হুগলি	১১·৭	৩·৩	৯·৭	৯·৯	৮·৪	৬·৩	৪·২	১·৫	০·৫
হাওড়া	১২·৫	৩·৮	১৩·৮	১২·৫	১৩·০	১১·৬	১০·২	৬·৪	২·৪
চব্বিশপরগনা ..	২১·২	১১·৪	১০·৩	৯·৩	১১·২	১০·০	৬·৩	৪·৭	১·২
কলিকাতা	৫৪·৫	১৭·০	৩২·৭	৩৩·২	৩৬·০	৩৯·৮	৩৫·৩	৩৩·৭	২১·৬
নদিয়া	৪০·৬	৩৭·৩	১·৩	০·৮	১·০	১·১	০·৭	০·৬	০·২
মুর্শিদাবাদ	৪·৬	৩·৪	১·৫	১·৬	১·৮	২·২	২·১	১·৯	০·৭
মালদহ . ..	৮·৮	৬·৪	২·৭	৪·২	৬·৪	৭·৯	২·৮	৩·৪	১·২
পশ্চিম দিনাজপুর ..	২১·৩	১৬·০	৪·৪	৪·৪	৬·৬	৮·৫	৬·৩	৩·৬	০·৮
জলপাইগুড়ি ..	৩০·৫	১০·৮	১৮·৫	২১·৫	২৩·৫	২৩·০	১৭·৬	১০·২	৭·৬
দার্জিলিঙ	২২·৫	৩·৫	২৫·৪	৩১·৫	৩৬·০	৪১·৯	৪৫·৬	৫৩·৬	৩৮·৩
কোচবিহার	২১·৭	১৪·৯	২·৯	২·৫	৩·৮	৪·২	৩·৩	২·৫	১·০
পশ্চিমবঙ্গের মোট পুরুষের অনুপাতে বহিরাগত পুরুষের হার	২১·১	৮·৪	১৩·১	১১·২	১১·৮	১১·৪	৮·৯	৬·৫	৩·০
পশ্চিমবঙ্গের মোট নারীর অনুপাতে বহিরাগত নারীর হার	১৫·৫	৮·৬	৫·৩	৫·২	৫·৭	৫·৪	৪·২	২·৮	১·৩

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতীয় অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গমনাগমন

(হাজারের অঙ্কে)

রাজ্য ও জেলা	জনসংখ্যা		ভারতের অন্য রাজ্য হইতে আগত		পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য রাজ্যে গমনকারী		জেলার লোকের অনুপাতে বহিরাগতের 'নীট' হার (শতাংশে)	
	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১	১৯৫১	১৯২১
পশ্চিমবঙ্গ	২৪,৮১০	১৬,৪০১	১,৮৮১	১,৩৩৪	৩১১	১৮৬	+৬·৩	+৭·০
বর্ধমান	২,১৯২	১,৪৩৫	২৩৫	৯৪	৩১	১৭	+৯·৩	+৫·৪
বীরভূম	১,০৬৭	৮৫২	৩৩	২৮	১৭	৮	+১·৫	+২·৩
বাঁকুড়া	১,৩১৯	১,০২০	২০	১২	৫৯	২৯	−৩·০	−১·৭
মেদিনীপুর	৩,৩৫৯	২,৬৬৭	৮৭	৪৭	৬২	৩৬	+০·৭	+০·৪
হুগলি	১,৫৫৪	১,০৮০	১০৯	৯০	২১	৭	+৫·৭	+৭·৭
হাওড়া	১,৬১১	৯৯৭	১০৬	১২৮	৬	৩	+৬·২	+১২·৫
চব্বিশপরগনা	৪,৬০৯	২,৬৩৭	৩৫০	২৯১	১৪	৬	+৭·৩	+১০·৮
কলিকাতা	২,৫৪৯	১,০৩২	৬৭৭	৩১৪	৪৫	৪১	+২৪·৮	+২৬·৫
নদিয়া	১,১৪৫	৭১২	২২	৭	৬	৩	+১·৪	+০·৬
মুর্শিদাবাদ	১,৭১৬	১,২২৪	১৪	২২	১৯	১২	−০·৩	+০·৮
মালদহ	৯৩৮	৬৮৬	১৮	৪৪	১১	৮	+০·৮	+৫·২
পশ্চিম দিনাজপুর	৭২১	৪৯০	২৪	৩২	৪	২	+২·৮	+৬·১
জলপাইগুড়ি	৯১৪	৬৯৪	১২২	১৬৩	৫	৭	+১২·৮	+২২·৫
দার্জিলিঙ	৪৪৫	২৮৩	৪১	৪০	৭	৬	+৭·৬	+১২·০
কোচবিহার	৬৭১	৫৯২	২৩	২২	৪	১	+২·৯	+৩·৫

অভারতীয় বহিরাগত

রাজ্য ও জেলা	অনুমাস্ত পাকিস্তানি ১৯৫১	নেপাল ও সিকিম হইতে আগত ১৯৫১	পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে আগত			
			১৯৫১			১৯২১
			মোট	পুরুষ	নারী	
পশ্চিমবঙ্গ	৫,১৯,৮৬৭	৯৫.৫৮৬	২৬,৭০৪	১৬,২৬০	১০.৪৪৪	১,০৮,৯৯০
বর্ধমান	১২,৭৪৫	১,৭১০	৮৭৯	৫৭১	৩০৮	৯৮০
বীরভূম	৩,১০৪	১৩৮	৪৯	৩১	১৮	৬০
বাঁকুড়া	১,২৩২	৫৬	২৫	৭	১৮	২০
মেদিনীপুর	২,৮০৯	১,০৭৫	১০৬	৬২	৪৪	১৬০
হুগলি	২০,৮৮১	২৯০	৩৫০	২০৬	১৪৪	৭০০
হাওড়া	৩২,৭০৫	১,৪৪১	৯৯৩	৭৯৫	১৯৮	১,৩০০
চব্বিশপরগনা	৯৩,৯৬৫	২.৬০৪	২,১৮৪	১,৩৪৪	৮৪০	৩,১৫০
কলিকাতা	২.৫২,৪৪৪	১০,৮৩১	১৫,৯০৮	৯,৫৩২	৬,৩৭৬	১১,৮০০
নদিয়া	১৪,৯৬৭	২১৩	৯২	৫১	৪১	৬০
মুর্শিদাবাদ	৫,০৩২	৫৪	৬৩	৪৩	২০	৬০
মালদহ	৩,৯৩৫	৬৬	১৬	৮	৮	৭০
পশ্চিম দিনাজপুর	১৩,২৭০	৭৪২	১১	৭	৪	২৫০
জলপাইগুড়ি	৩৩,৭৮৬	২৬,৮৬৩	১,৭৬৫	১,১৯৫	৫৭০	২৫,১৯০
দার্জিলিঙ	৬,৮৬৩	৪০,৪০৬	৪,২১৭	২,৩৮৮	১,৮২৯	৬২,৪৪০
কোচবিহার	২২,১২৯	৯,০৯৭	৪৬	২০	২৬	৭৫০

উদ্বাস্তু

উদ্বাস্তুর আগমন, ১৯৪৬-৫১

		১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	পুরুষ	২৪,৩২০	২,০৬,৫১৭	২,২৩,৫৯৮	১,৪০,৬৪১	৪,৯২,৭০০	১৬,২৩৮	১১,০৪,০১৪
	নারী	২০,৩০৪	১,৭১,৩৮২	১,৯৫,৪২০	১,৩২,৯৫১	৪,৩২,৪৮৫	১৪,৬৪১	৯,৬৭,১৮৩
	মোট	৪৪,৬২৪	৩,৭৭,৮৯৯	৪,১৯,০১৮	২,৭৩,৫৯২	৯,২৫,১৮৫	৩০,৮৭৯	২০,৭১,১৯৭

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা

রাজ্য ও জেলা	উদ্বাস্তু			মোট জনসংখ্যার অনুপাতে উদ্বাস্তুর হার (শতাংশে)
	মোট	পুরুষ	নারী	
পশ্চিমবঙ্গ	২০,৯৯,০৭১	১১,১৮,৪৭৫	৯,৮০,৫৯৬	+৮·৫
বর্ধমান	৯৬,১০৫	৫১,১৯২	৪৪,৯১৩	+৪·৪
বীরভূম	১১,৭৮৩	৬,২০৫	৫,৫৭৮	+১·১
বাঁকুড়া	৯,২৯৪	৪,৮১৭	৪,৪৭৭	+০·৭
মেদিনীপুর	৩৩,৫৭৯	১৭,৪৭৭	১৬,১০২	+১·০
হুগলি	৫১,১৫৩	২৬,৮৪৪	২৪,৩০৯	+৩·৩
হাওড়া	৬১,০৯৬	৩২,৯৮৪	২৮,১১২	+৩·৮
চব্বিশপরগনা	৫,২৭,২৬২	২,৮৪,৮৯৭	২,৪২,৩৬৫	+১১·৪
কলিকাতা	৪,৩৩,২২৮	২,৩৪,২৪২	১,৯৮,৯৮৬	+১৭·০
নদিয়া	৪,২৬,৯০৭	২,১৯,৩৬৩	২,০৭,৫৪৪	+৩৭·৩
মুর্শিদাবাদ	৫৮,৭২৯	৩১,১৬৮	২৭,৫৬১	+৩·৪
মালদহ	৬০,১৯৮	৩০,৯১৮	২৯,২৮০	+৬·৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১,১৫,৫১০	৬১,১৯৭	৫৪,৩১৩	+১৬·০
জলপাইগুড়ি	৯৮,৫৭২	৫৪,১১৯	৪৪,৪৫৩	+১০·৮
দার্জিলিঙ	১৫,৭৩৮	৮,৯৩১	৬,৮০৭	+৩·৫
কোচবিহার	৯৯,৯১৭	৫৪,১৮১	৪৫,৭৩৬	+১৪·৯

বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তু

রাজ্য	অনুদ্বাস্তু	উদ্বাস্তু	অনুদ্বাস্তুর অনুপাতে উদ্বাস্তুর হার (শতাংশে)
আসাম	৮৭,৬৯,২৫২	২,৭৪,৪৫৫	৩·১৩
মধ্যপ্রদেশ	২,১১,৩৪,৭৬২	১,১২,৭৭১	০·৫৩
উড়িষ্যা	১,৪৬,২৫,৯০৭	২০,০৩৯	০·১৪
মহীশূর	৯০,৬৭,৭৭৯	৭,১৯৩	০·০৮
বোম্বাই	৩,৫৬,১৮,০৫৪	৩,১৮,০৯৬	০·৯৫
পাঞ্জাব	৯৪,০৯,২২৪	১২,৩১,৯৮১	১৪·১৫
মাদ্রাজ	৫,৭০,০৭,০৭৩	৮,৯২৯	০·০২
উত্তরপ্রদেশ	৬,২৭,৩৫,৪৭২	৪,৮০,২৭০	০·৭৭
বিহার	৪,০১,৪৮,৩৯৫	৭৭,৫৫২	০·১৯
পশ্চিমবঙ্গ	২,২৭,১১,২৩৭	২০,৯৯,০৭১	৯·২৪
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৯২,৮০,১১৮	৩০৭	০·০০৩

বয়স

জনসংখ্যায় বিভিন্ন বয়সের লোকের শতকরা হার

বয়স	১৯৫১			১৯৪১			১৯৩১		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
০—৫	১৪·৩	১৩·৩	১৫·৬	১২·৭	১১·৭	১৩·৮	১৪·০	১৩·১	১৫·০
৫—১০	১১·৯	১১·৫	১২·৫	১৩·১	১২·৭	১৩·৬	১২·৩	১২·৪	১২·২
১০—১৫	১১·৩	১১·২	১১·৪	১০·৬	১০·৫	১০·৭	১০·৯	১১·১	১০·৮
১৫—২০	১০·৬	১০·২	১১·২	৯·২	৮·৯	৯·৫	৯·৫	৯·০	১০·২
২০—৩০	১৯·০	১৯·৫	১৮·৩	১৯·২	১৯·২	১৯·২	১৯·৯	১৯·৭	২০·২
৩০—৪০	১৩·৮	১৪·৭	১২·৬	১৫·৭	১৬·৮	১৪·৪	১৫·১	১৬·২	১৩·৯
৪০—৫০	৯·৫	১০·১	৮·৭	৯·৯	১০·৭	৯·১	৯·৫	১০·১	৮·৭
৫০—৬০	৫·৬	৫·৭	৫·৪	৫·৮	৫·৯	৫·৬	৫·৩	৫·২	৫·৩
৬০ ও তদূর্ধ্ব	৪·০	৩·৮	৪·৩	৩·৮	৩·৬	৪·১	৩·৫	৩·২	৩·৭
০—১৫	৩৭·৫	৩৬·০	৩৯·৫	৩৬·৪	৩৪·৯	৩৮·১	৩৭·২	৩৬·৬	৩৮·০
১৫—৬০	৫৮·৫	৬০·২	৫৬·২	৫৯·৮	৬১·৫	৫৭·৮	৫৯·৩	৬০·২	৫৮·৩
১৫—৫৫	৫৭·৪	৫৯·৩	৫৫·২	৫৪·৬	৫৫·১	৫৪·০	৫৪·০	৫৪·৩	৫৩·৭

ছয়টি শিল্পপ্রধান নগরে অনুদ্বাস্তু পুরুষের অনুপাতে পুরুষ এবং নারীর অনুপাতে নারীর শতকরা হার, ১৯৫১

	বয়স								
	০—৪	৫—৯	১০—১৪	১৫—২৪	২৫—৩৪	৩৫—৪৪	৪৫—৫৪	৫৫—৬৪	৬৫ ও তদূর্ধ্ব
কলিকাতা									
পুরুষ	৭·০	৬·৩	৭·৯	২৩·৬	২৪·৯	১৬·১	৯·১	৩·৫	১·৬
নারী	১৩·৪	১১·২	১১·৮	২১·৪	১৬·৭	১১·২	৭·৪	৪·৩	২·৬
টালিগঞ্জ									
পুরুষ	১৩·৭	৯·৮	১০·৫	২১·৭	২০·৪	১২·৮	৬·১	৩·২	১·৮
নারী	১৫·০	১০·৬	১১·৪	২২·৫	১৫·৪	১০·৩	৭·১	৪·৩	৩·৪
সাউথ সুবার্বন্									
পুরুষ	১০·৩	৮·৯	৯·৯	২১·৭	২১·৩	১৪·৪	৮·৩	৩·৭	১·৪
নারী	১৪·৫	১১·৫	১০·৬	২৩·৬	১৫·৯	১০·১	৭·৩	৪·১	২·৪

ছয়টি শিল্পপ্রধান নগরে অনুদ্বাস্তু পুরুষের অনুপাতে পুরুষ এবং নারীর অনুপাতে নারীর শতকরা হার, ১৯৫১—সমাপ্ত

	বয়স								
	০—৪	৫—৯	১০—১৪	১৫—২৪	২৫—৩৪	৩৫—৪৪	৪৫—৫৪	৫৫—৬৪	৬৫ ও তদূর্ধ্ব
গার্ডেনরীচ									
পুরুষ	৭·৮	৯·০	৯·৮	২০·২	২৪·১	১৫·৪	৮·৩	৩·৭	১·৭
নারী .	১২·১	১৩·০	১২·১	১১·৬	২১·২	৯·১	৭·১	৩·৫	২·৩
হাওড়া									
পুরুষ	৭·৩	৭·০	৯·৩	২১·৪	২৫·১	১৫·১	৮·২	৩·৪	১·৫
নারী .	১১·৪	১০·৬	১১·৮	২২·১	১৬·৯	১০·৩	৭·৪	৪·৭	২·৮
ভাটপাড়া									
পুরুষ	৬·৮	৭·০	৮·৮	১৬·৯	২৫·০	১৯·০	১০·৫	৪·২	১·৮
নারী	১০·৮	১২·১	১১·৪	২০·২	১৯·৫	১১·০	৬·০	৪·৩	২·৭

কলিকাতা শিল্পাঞ্চল এবং অন্যান্য শিল্প, আবাসিক ও রেলওয়ে শহরের অনুদ্বাস্তু পুরুষের অনুপাতে পুরুষ এবং নারীর অনুপাতে নারীর শতকরা হার

বয়স	কলিকাতা শিল্পাঞ্চল		অন্যান্য শিল্প শহর		আবাসিক শহর		রেলওয়ে শহর	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
০—৪	৭	১৩	১০	১২	১০	১২	১৬	১৬
৫—৯	৭	১১	৮	১২	১০	১২	১২	১০
১০—১৪	৮	১০	১১	১২	১১	১৩	১৫	১৫
১৫—২৪	২১	২২	২১	২১	২১	২২	২০	১৭
২৫—৩৪	২৫	১৭	২১	১৭	১৯	১৫	১৫	১৬
৩৫—৪৪	১৬	১১	১৩	১১	১২	১১	১১	১২
৪৫—৫৪ .. .	৯	৭	৯	৭	৯	৭	৬	৮
৫৫—৬৪	৩	৪	৪	৫	৫	৫	৩	৪
৬৫ ও তদূর্ধ্ব	২	৩	৩	৩	৩	৩	২	২
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
০—১৪	২২	৩৬	২৯	৩৬	৩১	৩৭	৪৩	৪১
১৫—৫৪ . .	৭৩	৫৭	৬৪	৫৬	৬১	৫৫	৫২	৫৩
৫৫ ও তদূর্ধ্ব	৫	৭	৭	৮	৮	৮	৫	৬

শিক্ষা

প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা, ১৯৫১

রাজ্য ও জেলা	১৯৫১			১৯৪১			১৯৩১		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৫৪	৩,৪৬৮	১,২৭৩	১,৮৮২	২,৭৭৭	৮৩৪	১,১৪২	১,৮৫৪	৩৪০
বর্ধমান	২,০৬৫	২,৯৮০	১,০৩৪	১,৭৩০	২,৬৪৬	৭০৪	১,০৭১	১,৮৩২	২৫৫
বীরভূম	১,৭৬৬	২,৭৫৭	৭৫০	১,৩৩৮	২,১৭৩	৫০২	৬৯২	১,২৮০	১০৫
বাঁকুড়া	১,৭২১	২,৭২৮	৬৯৪	১,৪৬৩	২,৫০৪	৩৯৯	৮৫১	১,৫৯৩	১০৬
মেদিনীপুর	২,৩১৭	৩,৬৬৪	৯০৬	১,৮১৯	৩,০৪৭	৫৩৪	১,৫১৭	২,৭১০	২৯৪
হুগলী . .	২,৪৬৬	৩,৫২৪	১,২৭১	২,৩২১	৩,৩৪৬	১,১১৬	১,১৯৮	২,২৭৮	৪০০
হাওড়া	২,৮৩৭	৩,৭৬৪	১,৬৯২	২,৮২৭	৩,৭৫২	১,৬৫২	১,৮০০	২,৬৭৫	৭৫০
চব্বিশ পরগনা	২,৭১০	৩,৯১৬	১,৩২৫	১,৯৬৩	২,৯৭১	৭১১	১,০৯১	১,৭৯৯	২৬৬
কলিকাতা	৫,৩১২	৫,৮৬৯	৪,৩৩৫	৫,৩৮৬	৫,৮১২	৪,৪৪৪	৩,৯৫৭	৪,৪৪৯	২,৯৩৭
নদীয়া	২,১০৯	২,৮৭১	১,২৯৫	১,০২৫	১,৫০২	৫১৫	৫৮৯	৯১১	২৭৫
মুর্শিদাবাদ	১,৩০৬	১,৯৬০	৬৩৩	৯৬২	১,৫৩৭	৩৮০	৫২৫	৯০১	১৫১
মালদহ	৯৫৭	১,৫২৯	৩৬৫	৬৮৯	১,১৪৪	২২৯	৩১৬	৫৭১	৬০
পশ্চিম দিনাজপুর .	১,৪৭৩	২,১৮৩	৬৬৩	৯৭৪	১,৫২৯	৩৫২	৬২৩	১,১০১	৯২
জলপাইগুড়ি ..	১,৪৪৬	২,১১৬	৬১১	৯৮১	১,৪৪৩	৪৩২	৪৭১	৭৯২	১০৮
দার্জিলিঙ .	২,১১২	৩,১১৯	৯২১	১,৪০৬	২,২০৮	৪৯৭	১,০৭৪	১,৮১৬	২৩০
কোচবিহার ..	১,৫০৯	২,৩৯১	৪৭৮	৮২৬	১,৪০০	১৭৬	৬৫৫	১,১৩১	১১৮

ক্রমাবনতি অনুসারে সজ্জিত পল্লী ও পৌরাঞ্চলের সাক্ষরের হার (শতাংশে)

জনসংখ্যার সাক্ষরের হার		গ্রামাঞ্চলের সাক্ষরের হার		পৌরাঞ্চলের সাক্ষরের হার	
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·৫৪	পশ্চিমবঙ্গ	১৭·৭৩	পশ্চিমবঙ্গ	৪৫·১৮
কলিকাতা	৫৩·১২	হাওড়া	২৫·৫৪	কলিকাতা	৫৩·১২
হাওড়া	২৮·৩৭	মেদিনীপুর	২১·৬৩	পশ্চিম দিনাজপুর	৪৫·০৫
চব্বিশপরগনা	২৭·৩০	চব্বিশপরগনা	২১·৫২	দার্জিলিঙ	৪৩·৭৮
হুগলি	২৪·৬৬	হুগলি	২১·১৫	মালদহ	৪২·৯১
মেদিনীপুর	২১·১৭	বর্ধমান	১৭·৪৭	কোচবিহার	৪২·৭০
দার্জিলিঙ	২১·১২	নদিয়া	১৬·৫৮	জলপাইগুড়ি	৪২·৫৯
নদিয়া	২১·০৯	বীরভূম	১৬·৩৫	মেদিনীপুর	৪২·০৬
বর্ধমান	২০·৬৫	বাঁকুড়া	১৫·৫৭	নদিয়া	৪১·৩৭
বীরভূম	১৭·৬৬	দার্জিলিঙ	১৫·০১	চব্বিশপরগনা	৪১·০১
বাঁকুড়া	১৭·২১	কোচবিহার	১২·৮৬	মুর্শিদাবাদ	৪০·১৭
কোচবিহার	১৫·০৯	পশ্চিম দিনাজপুর	১২·৮৫	বর্ধমান	৩৮·৯৮
পশ্চিম দিনাজপুর	১৪·৭৩	জলপাইগুড়ি	১২·২৭	বাঁকুড়া	৩৮·৪৫
জলপাইগুড়ি	১৪·৪৬	মুর্শিদাবাদ	১০·৭৪	হুগলি	৩৬·৯৩
মুর্শিদাবাদ	১৩·০৬	মালদহ	৮·২৭	বীরভূম	৩৬·৬৭
মালদহ	৯·৫৭			হাওড়া	৩৪·২৮

জনসংখ্যার অনুপাতে সাক্ষরের হার, ১৯৫১

রাজ্য	জনসংখ্যার শতাংশে সাক্ষরের হার								
	মোট জনসংখ্যা			পল্লীবাসী			পুরবাসী		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
আসাম	১৮·১	২৭·১	৭·৮	১৬·৫	২৫·৪	৬·৬	৫০·৩	৫৮·৮	৩৭·৮
মধ্যপ্রদেশ	১৩·৫	২১·৯	৫·০	৯·৯	১৭·৩	২·৬	৩৬·১	৪৯·৭	২১·৩
উড়িষ্যা	১৫·৮	২৭·৩	৪·৫	১৪·৯	২৬·২	৩·৯	৩৭·৫	৫১·৭	২১·৪
মণিপুর	২০·৬	৩০·৪	১০·৩	১৪·৫	২৩·৮	৪·৯	৩৯·৭	৫০·৬	২৭·৮
বোম্বাই	২৪·১	৩৫·৯	১২·৬	১৬·৯	২৬·৬	৬·৯	৪০·৬	৫২·০	২৬·৭
পাঞ্জাব	১৬·৫	২২·৫	৯·৫	১২·০	১৭·৫	৫·৮	৩৫·৬	৪৩·৩	২৬·১
মাদ্রাজ	১৯·৩	২৮·৫	১০·১	১৫·৪	২৩·৯	৬·৯	৩৫·৪	৪৭·১	২৩·৪
উত্তরপ্রদেশ	১০·৮	১৭·৪	৩·৬	৭·৮	১৩·৬	১·৫	৩০·০	৪০·১	১৭·৬
বিহার	১১·৯	১৯·৯	৩·৮	১০·২	১৬·৬	৩·১	২৯·২	৪০·৮	১৫·১
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·৫	৩৪·৭	১২·৭	১৭·৭	২৮·১	৬·৭	৪৫·২	৫১·৮	৩৫·১
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫·৮	৫৪·৮	৩৭·০	৪৪·৮	৫৩·৮	৩৬·০	৫১·৩	৬০·০	৪২·৪

শিক্ষার প্রগতি

পুরুষ

	প্রতি হাজার পুরুষে সাক্ষরের সংখ্যা						
	বয়স ৫—৯ ১-৩-৫১	বয়স ৫—৯ ১-৩-৪১	বয়স ৫—১৪ ১-৩-৫১	বয়স ৫—১৪ ১-৩-৪১	বয়স ৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৫১	বয়স ৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৪১	বয়স ১৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৫১
পশ্চিমবঙ্গ	১৮৮	১৩৭	২৮২	২০৭	৩৬৬	৩৩৩	৩৯৫
গ্রামাঞ্চল	১৫২	..	২৩০	..	২৯৫	..	৩২০
পৌরাঞ্চল	৩২৫	..	৪৬৩	..	৫৪৫		৫৬৬

নারী

	প্রতি হাজার নারীতে সাক্ষরের সংখ্যা						
	বয়স ৫—৯ ১-৩-৫১	বয়স ৫—৯ ১-৩-৪১	বয়স ৫—১৪ ১-৩-৫১	বয়স ৫—১৪ ১-৩-৪১	বয়স ৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৫১	বয়স ৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৪১	বয়স ১৫ ও তদূর্ধ্ব ১-৩-৫১
পশ্চিমবঙ্গ	৯৯	৬৬	১৫৬	৯৪	১৫১	৯৮	১৪৯
গ্রামাঞ্চল	৬০	.	৯৬		৮২		৭৬
পৌরাঞ্চল	২৫৩		৩৭৫	..	৪০৬		৪১৮

শিক্ষার পিরামিড

	পুরুষ	নারী
স্নাতকোত্তর (Post-graduate)	১১,৯৪৪	১,১৫২
স্নাতক (Graduate)	৫৩,৪৯৪	৫,৮৬৫
মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Intermediate)	৯১,৩৮১	১২,২৬০
আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Matric or School Final)	৩,০৮,৩১৯	৪৩,৯৪৯
মধ্যমান (Class VI and above)	১০,৫৯,৮১০	২,৮৭,৩০১
সহজ চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম	৩০,৩৮,২৪৯	১১,০৫,০১৩
সর্ব মানের মোট	৪৬,২৮,৫৮১	১৪,৫৯,২১৬
নিরক্ষর	৮৭,১৬,৮৬০	১,০০,০৫,৬৫১
জনসংখ্যা	১,৩৩,৪৫,৪৪১	১,১৪,৬৪,৮৬৭

কৃষি ও অকৃষি উপজীবিকা : শিক্ষার মান

	কৃষিবর্গ	অ-কৃষিবর্গ
স্নাতকোত্তর (Post-graduate)	৮১৪	১২,২৮২
স্নাতক (Graduate)	৬,০৯০	৫৩,২৬৯
মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Intermediate)	১৩,৩৬৮	৯০,২৭৩
আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Matric or School Final)	৫৪,৬৫৬	২,৯৭,৬১২
মধ্যমান (Class VI and above)	৪,৮৫,০৬১	৮,৬২,০৫০
সহজ চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম	১৭,৬৫,৮৯০	২৩,৭৭,৩৭২
সর্ব মানের মোট	২৩,৩৮,৯৩৩	৩৭,৪৮,৮০৪
নিরক্ষর	১,১৮,৫৬,২২৮	৬৮,৬৬,৩৪৩
জনসংখ্যা	১,৪১,৯৫,১৬১	১,০৬,১৫,১৪৭

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

	পুরুষ	নারী	কৃষিবর্গ	অ-কৃষিবর্গ
শিক্ষকতা	১৪,৩১৮	১,৯০৩	৬,৯১৬	৯,৩০৫
ইঞ্জিনিয়ারিং	৫,৮৬০	১৫০	২৯৩	৫,৭১৭
কৃষিবিদ্যা	১,১০৬	৫৮	৩৮৬	৭৭৮
পশুচিকিৎসা	৫০৫	৫	৬৭	৪৪৩
ব্যবসাসংক্রান্ত শিক্ষা	১০,৪০৪	১৪৯	৫২৩	১০.০৩০
আইন শিক্ষা	১০,২৮০	১০০	৮৮১	৯,৪৯৯
চিকিৎসাবিদ্যা	১৫,৪৩০	৭২৫	২,৭০৭	১৩,৪৪৮
অন্যান্য	৫,৬৩৮	৪৬২	১,৩৩০	৪,৭৭০
বিদেশী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা ..	১,৮৪৩	১২৪	১১	১,৯৫৬

উপজীবিকা

উপজীবিকা : ধারা, ১৯৫১

	প্রতি দশ হাজারে বিভিন্ন উপজীবিকার শ্রেণীতে লোকের সংখ্যা							
	১ম মালিকচাষী	২য় ভাগচাষী	৩য় কৃষিমজুর	৪র্থ খাজনাভোগী	৫ম শিল্পশ্রমী	৬ষ্ঠ ব্যবসায়ী	৭ম পরিবহনকর্মী	৮ম বিবিধ বৃত্তি ও চাকরি
১। শিল্পাঞ্চল								
মোট (গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চল)								
মোট লোক	২,১৩১	৮৫৭	১,০৮২	৬৮	২,০৫৯	১,৩৭৮	৫০১	১,৯২৪
বহিরাগত	৩৩১	১৭৮	৩৫৮	১৮	৪,৪৮৭	১,৪৯৫	১,০৫৮	২,০৭৫
উদ্বাস্তু	৫১৪	১৫৬	৪৬৭	৬৩	২,০৩২	২,৩৩৬	৫০২	৩,৯৩০
গ্রামাঞ্চল								
মোট লোক	৩,৪৪২	১,৩৬৮	১,৭৫৬	৭১	১,৪৫১	৬৮০	১৭৮	১,০৫৪
বহিরাগত	১,১৯৩	৪২২	১,২৬৪	২৯	২,৯৯১	১,১৭৮	৬৯৬	২,২২৭
উদ্বাস্তু	১,২৫৭	৩০৭	১,১২১	৬৮	১,৬৩৫	১,৬৪৬	৪৫২	৩,৫১৪
পৌরাঞ্চল								
মোট লোক	১৬৭	১০৬	১১৪	৬৩	৩,৪৯৪	২,১৩৬	৮৯৮	৩,০২২
বহিরাগত	৪৬	৬১	৭৬	১৫	৪,৮৫২	১,৬৫৪	১,১৩৯	২,১৫৭
উদ্বাস্তু	৭৮	৮৫	৮৫	৬৮	২,২৫০	২,৫৯৮	৫৮৬	৪,২৫০
২। পশ্চিমের কৃষি অঞ্চল								
মোট (গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চল)								
মোট লোক	৪,৮৩৯	১,২৯৪	১,৯৬৯	৬১	৬৫৮	৩২৪	১০৯	৭৪৬
বহিরাগত	৩,০৫৩	৬৪৫	১,৩৪৫	৪৪	১,৪১৫	৮০২	৯১২	১,৭৮৪
উদ্বাস্তু	৩০৪	২৩৭	৪৪৬	৪৫	৭৫৪	১,০১৩	৪৪৯	৬,৭৫২
গ্রামাঞ্চল								
মোট লোক	৫,১৪৬	১,৩৭০	২,০৭১	৫৪	৫৩৭	২১৬	৪৪	৫৬২
বহিরাগত	৩,৭৮৭	৯০৭	১,৭৮১	৪৪	৯৫৯	৭৩৬	১৭৯	১,৬০৭
উদ্বাস্তু	৪৫৫	৩৪৮	৬৯১	৩৩	৬২০	৮৯৬	২৫৪	৬,৭০৩
পৌরাঞ্চল								
মোট লোক	৮৩৫	৩০৮	৫৯০	১৪৬	২,২১০	১,৭৬৯	৯৪৭	৩,১৯৫
বহিরাগত	২৬১	১৭৫	২৩৮	১১৫	৩,০৪১	১,৪৮৫	২,২৮২	২,৪০৩
উদ্বাস্তু	৪৪	৫১	১৩	৬৮	১,০০৩	১,১৮০	৮১৫	৬,৮২৬

উপজীবিকার ধারা, ১৯৫১—পূর্বানুবৃত্তি

	প্রতি দশ হাজারে বিভিন্ন উপজীবিকার শ্রেণীতে লোকের সংখ্যা							
	১ম মালিকচাষী	২য় ভাগচাষী	৩য় কৃষিমজুর	৪র্থ খাজনাভোগী	৫ম শিল্পশ্রমী	৬ষ্ঠ ব্যবসায়ী	৭ম পরিবহনকর্মী	৮ম বিবিধ বৃত্তি ও চাকরি
৩। মধ্য ও উত্তর ভাগের কৃষি অঞ্চল								
মোট (গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চল)								
মোট লোক	৪,২৮১	১,৭৭৪	১,১৪৬	৪৯	৭১৩	৬০৫	৮০	১,৩৫২
বহিরাগত	১,১১১	৮৩২	১,৭৮০	৬০	১,৯২৬	১,০৯৪	৭১৬	২,৪৮১
উদ্বাস্তু	১,১০৪	২,২৯১	৮৮৪	৩৫	১,৩২৩	১,২৪৯	১০০	৩,০১৪
গ্রামাঞ্চল								
মোট লোক	৪,৬২৩	১,৯০৬	১,২৪৭	৪২	৬৩৫	৩৯৪	৪৫	১,১০৮
বহিরাগত	১,৩৫৪	১,০২৮	২,৪৪৯	৩৮	১,৭২৪	৬৫১	৫৫৪	২,২০২
উদ্বাস্তু	১,২৮১	২,৭২৮	১,০৬৭	২৫	১,৩১৫	৮৬৬	৬৭	২,৬৫১
পৌরাঞ্চল								
মোট লোক	৪৭৬	১৬৬	৯৭	১৩৬	১,৫২১	২,৯৪৪	৪২৪	৪,২৩৬
বহিরাগত	১৪১	৪২	৫৯	৯২	২,৩৪৩	২,৬১৪	১,২৫২	৩,৪৫৭
উদ্বাস্তু	৩৫২	১১৬	৮৮	৯০	১,৫৫৩	৩,০৫৪	২৩৬	৪,৫১১
৪। চা-বাগান অঞ্চল								
মোট (গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চল)								
মোট লোক	২,১০০	১,৭৫৮	১৪৯	৩২	৩,৮৩০	৬০৪	২৫৫	১,২৭২
বহিরাগত	৩৬৯	৬৫১	১১৮	৪৮	৫,০৯৭	১,০৮৬	৪৮৫	২,১৪৬
উদ্বাস্তু	৭১৭	২,০৭৩	১৯৩	২০	১,৪০৫	২,৩০৬	৭৭৬	২,৫১০
গ্রামাঞ্চল								
মোট লোক	২,৪৩৫	১,৯৭০	১৭৬	২৮	৪,২৮১	২৭৯	১৪৮	৬৮৩
বহিরাগত	৫০৪	৮৫৪	১৬৪	৬০	৬,১৭০	৩১১	৩২৭	১,৬১০
উদ্বাস্তু	১,০৭০	৪,২০২	৩৬৪	১২	১,২৪৮	১,১৩৬	৫৬১	১,৪০৭
পৌরাঞ্চল								
মোট লোক	১৬৭	৯৮	১৪	৫৬	১,৪০৬	২,৭৬৫	৯২২	৪,৫৭২
বহিরাগত	৫৮	২২	১৭	২৫	১,৩১৪	২,৯৯০	১,২৬৫	৪,৩০৯
উদ্বাস্তু	৫৪	৮৩	৬	৩৭	১,৬৭৫	৩,৪৫০	১,০৪৩	৩,৬৫২

উপজীবিকার ধারা, ১৯৫১—সমাপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ	প্রতি দশ হাজারে বিভিন্ন উপজীবিকার শ্রেণীতে লোকের সংখ্যা							
	১ম মালিকচাষী	২য় ভাগচাষী	৩য় কৃষিমজুর	৪র্থ খাজনাভোগী	৫ম শিল্পাশ্রয়ী	৬ষ্ঠ ব্যবসায়ী	৭ম পরিবহনকর্মী	৮ম বিবিধ বৃত্তি ও চাকরি
মোট (গ্রামাঞ্চল ও পৌরাঞ্চল)								
মোট লোক	৩,২৩৪	১,২০১	১,২২৬	৬০	১,৫৩৬	৯৩২	৩০৫	১,৫০৬
বহিরাগত	৪০৭	২৫৩	৩৬২	২৫	৩,৬৯৯	১,৭৬৩	১,২১০	২,২৮১
উদ্বাস্তু	৮১৬	৯৭৬	৫৩৮	৪৬	১,৫৭৬	২,০২৪	৩৫৬	৩,৬৬৮
গ্রামাঞ্চল								
মোট লোক	৪,২৪২	১,৫৭৪	১,৫৯৯	৫৬	১,০৯৯	৪৪০	৯৭	৮৯৩
বহিরাগত	১,৩৪১	৮১৯	১,১৮৩	৩৫	৩,৭৯০	৭৩৭	৪৩৩	১,৬৬২
উদ্বাস্তু	১,৫৪৩	১,৯০৮	১,০৩৪	৩১	১,০৭৬	১,০৮১	১৩৩	৩,১৯৪
পৌরাঞ্চল								
মোট লোক	১৭৭	৭১	৯৫	৭৪	২,৮৬৫	২,৪২০	৯৩৪	৩,৩৬৪
বহিরাগত	৩৩	২৬	৩৩	২২	৩,৬৬২	২,১৭৪	১,৫২১	২,৫২৯
উদ্বাস্তু	৯০	৪২	৪২	৬১	২,০৭৬	২,৯৬৬	৫৮০	৪,১৪৩

ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যে স্বাবলম্বী, পরাশ্রয়ী ও উপার্জক পরাশ্রয়ী, এই তিন উপশ্রেণীতে প্রতি হাজার কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবীর বণ্টন

রাজ্য	সর্ব শ্রেণীর কৃষিজীবী তিন শ্রেণীতে প্রতি হাজার লোকের বণ্টন			সর্ব শ্রেণীর অ-কৃষিজীবী তিন শ্রেণীতে প্রতি হাজার লোকের বণ্টন		
	স্বাবলম্বী	পরাশ্রয়ী	উপার্জক পরাশ্রয়ী	স্বাবলম্বী	পরাশ্রয়ী	উপার্জক পরাশ্রয়ী
ভারতবর্ষ	২৮৭	৫৯৬	১১৭	৩১৩	৬২৮	৫৯
উত্তরপ্রদেশ	২৯৭	৫৬১	১৪২	৩২৭	৬১৬	৫৭
বিহার	৩১৯	৬৪০	৪১	২৯৫	৬৬৩	৪২
পশ্চিমবঙ্গ	২৬০	৬৯৮	৪২	৩৮৮	৫৯৩	১৯
মাদ্রাজ	২৫৮	৬৯১	৫১	২৭০	৬৮৯	৪১
বোম্বাই	২৪৬	৫৪৬	২০৮	৩১৪	৬১৪	৭২
মধ্যপ্রদেশ	৩০০	৪১১	২৮৯	৩১২	৫৪৪	১৪৪
পাঞ্জাব	২৬৮	৫৮৪	১৪৮	২৬৬	৬৪৮	৮৬
উড়িষ্যা	২৭৮	৬২৩	৯৯	৩১৬	৫৯৭	৮৭
আসাম	২৪৫	৫৮৫	১৭০	৪১০	৫২৪	৬৬
রাজস্থান	৩৯৩	৪৫০	১৫৭	৩১৬	৬০৭	৭৭
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	২৬৮	৬৫৬	৭৬	৩০৭	৬১৭	৭৬
মহীশূর	২৫৩	৭১৫	৩২	২৭৭	৬৮৫	৩৮
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩১১	৫৩৫	১৫৪	৩৪২	৫৬৩	৯৫
মধ্যভারত	৩১৯	৫৬৯	১১২	৩১১	৬৩৪	৫৫

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে উপজীবিকার বিভিন্ন শ্রেণীতে স্বাবলম্বী, পরাশ্রয়ী ও উপার্জক পরাশ্রয়ীর হার

উপজীবিকার শ্রেণী	মোট জনসংখ্যা				পল্লীবাসী				পুরবাসী			
	মোট জনসংখ্যার শতাংশ	দ্বিতীয় কলমের শতাংশে			মোট জনসংখ্যার শতাংশ	ষষ্ঠ কলমের শতাংশে			মোট জনসংখ্যার শতাংশ	দশম কলমের শতাংশে		
		স্বাবলম্বী	পরাশ্রয়ী	উপার্জক পরাশ্রয়ী		স্বাবলম্বী	পরাশ্রয়ী	উপার্জক পরাশ্রয়ী		স্বাবলম্বী	পরাশ্রয়ী	উপার্জক পরাশ্রয়ী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১ম মালিকচাষী	৩২·৩	২৩·৩	৭৩·৩	৩·৭	৪২·৪	২৩·৩	৭৩·০	৩·৭	১·৮	২৬·২	৭১·১	২·৭
২য় ভাগচাষী	১২·৩	২৫·১	৬৯·৯	৫·০	১৫·৭	২৫·১	৬৯·৮	৫·১	০·৭	২০·০	৭৭·৫	২·৫
৩য় কৃষিমজুর	১২·৩	৩৪·১	৬১·৩	৪·৬	১৬·০	৩৪·০	৬১·৩	৪·৭	১·০	৩৬·৪	৬০·৩	৩·৩
৪র্থ খাজনাভোগী	০·৬	২৬·১	৭১·৬	২·৩	০·৬	২৭·৬	৬৯·৮	২·৬	০·৭	২২·৭	৭৫·৫	১·৮
৫ম শিল্পাশ্রয়ী	১৫·৪	৪৩·৭	৫৪·২	২·১	১১·০	৪২·৯	৫৪·৩	২·৮	২৮·৭	৪৪·৭	৫৪·০	১·৩
৬ষ্ঠ ব্যবসায়ী	৯·৩	৩৩·৫	৬৫·০	১·৫	৪·৪	৩১·১	৬৬·৭	২·২	২৪·২	৩৪·৮	৬৪·১	১·১
৭ম পরিবহনকর্মী	৩·০	৪৩·১	৫৫·৭	১·২	১·০	৩৩·৭	৬৪·২	২·১	৯·৩	৪৬·১	৫৩·০	০·৯
৮ম বিবিধ বৃত্তি ও চাকরি	১৫·১	৩৬·৩	৬১·৮	১·৯	৮·৯	৩৩·৪	৬৩·৮	২·৮	৩৩·৬	৩৮·৬	৬০·৩	১·১
কৃষিজীবীর সকল শ্রেণী	৫৭·২	২৬·০	৬৯·৮	৪·২	৭৪·৭	২৬·০	৬৯·৮	৪·২	৪·২	২৬·৯	৭০·৫	২·৬
অ-কৃষিজীবীর সকল শ্রেণী ..	৪২·৮	৩৮·৮	৫৯·৩	১·৯	২৫·৩	৩৭·১	৬০·২	২·৭	৯৫·৮	৪০·২	৫৮·৬	১·২
সর্ব শ্রেণী . .	১০০·০	৩১·৫	৬৫·৩	৩·২	১০০·০	২৮·৮	৬৭·৪	৩·৮	১০০·০	৩৯·৬	৫৯·২	১·২

প্রতি বর্গমাইলে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা এবং সাধারণ জনসংখ্যার প্রতি হাজারে কৃষিজীবীর অনুপাত

রাজ্য ও জেলা	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	গ্রামাঞ্চলে ঘনতা (বর্গমাইলে)	অনুপাত	গ্রামাঞ্চলে ঘনতা (বর্গমাইলে)	অনুপাত	গ্রামাঞ্চলে ঘনতা (বর্গমাইলে)	অনুপাত	গ্রামাঞ্চলে ঘনতা (বর্গমাইলে)	অনুপাত
পশ্চিমবঙ্গ	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১	৪৫২	৬০৭
বর্ধমান	৭০০	৬২৬	৫০২	৬৮০	৫৪০	৬৭১	৫৪১	৫৮৫
বীরভূম	৫৭৭	৮১৪	৪৭৯	৭৬৪	৫৩৯	৭৬২	৫২০	৬৮১
বাঁকুড়া	৪৬৭	৮১৮	৩৬৬	৭৭০	৪১২	৭৩৮	৪০৫	৬০২
মেদিনীপুর	৫৯৭	৮১৮	৪৯৪	৮৪০	৫২৩	৮১২	৫১৭	৭৬৭
হুগলি	১,০৩০	৫৮৬	৭৬৭	৬১৩	৭৯৯	৬৪১	৭৭৯	৫২৮
হাওড়া	২,০০৪	৩১৪	১,৪৩৩	৪৬৬	১,৩৬৫	৪৯১	১,২৪১	৪০৬
চব্বিশপরগনা	৫৯১	৫৩৪	৩৮৮	৬৭৪	৩৭০	৬৯০	৩৩৩	৬৩৮
কলিকাতা	..	৯	.	৪৫	..	২৮	..	২৩
নদিয়া	৬৩৩	৫৩৪	৪২৭	৬৭২	৪৭১	৬৬০	৪৬৯	৫৫০
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩	৬৯২	৫৫৬	৮২৪	৬১৭	৭০৭	৬০৯	৫৭০
মালদহ	৬৫০	৭১২	৪৮২	৭৬৫	৪৯০	৬৫৮	৪২২	৬৮১
পশ্চিম দিনাজপুর	৪৯২	৮৫২	৩৫৪	৯১২	৩৬৮	৯১১	৩২৯	৮৭১
জলপাইগুড়ি	৩৫৯	৪৮৭	২৮৭	৭১৪	২৭৫	৭২০	২২৬	৭৪৭
দার্জিলিঙ	২৯৬	৩২১	২১৪	৪২৩	২০৩	৪৩৬	১৯২	৪১৮
কোচবিহার	৪৭১	৮৩৫	৪৩৬	৮৮৬	৪৩৮	৮৭৩	৪১৯	৮৬৪

উপজীবিকার বিভিন্ন শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ, তফসিলী হিন্দু জাতি ও তফসিলী খণ্ডজাতির বণ্টন

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী	ষষ্ঠ শ্রেণী	সপ্তম শ্রেণী	অষ্টম শ্রেণী
সাধারণ জনগণ	৩,২১৪	১,২০১	১,২২৬	৬০	১,৫৩৬	৯৩২	৩০৫	১,৫০৬
তফসিলী হিন্দু জাতি	২,৬৩৬	১,৮৬৩	২,৪৩১	২২	১,৪৪৪	৩৯২	১৭৬	১,০৩৬
তফসিলী খণ্ডজাতি	২,৮০৯	২,৯৩৫	২,১৫৩	৮	১,৫৮৫	৩৬	৫০	৪২৪

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিবর্গের বিভিন্ন শ্রেণীতে সাধারণ জনগণ, তফসিলী হিন্দু জাতি ও তফসিলী খণ্ডজাতির সংখ্যা, ১৯৫১

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী
কৃষিজীবী সাধারণ জনগণ	৮০,২৩,৭৫৭	২৯,৮০,৪০২	৩০,৪১,৮৮১	১,৪৯,১২১
তফসিলী জাতির লোক	১২,৩৭,৮৭৯	৮,৭৪,৯৪৪	১১,৪১,৯৫৬	১০,১৬১
খণ্ডজাতির লোক	৩,২৭,৩৫৩	৩,৪২,০২০	২,৫০,৯১২	৯৩৬
মোট জনসংখ্যার শতাংশে তফসিলী ও খণ্ডজাতির লোক ..	১৯·৫	৪০·৮	৪৫·৮	৭·৪

মোট জনসংখ্যার শতাংশে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন উপজীবিকায় জনগণের হার, ১৯৫১

রাজ্য	সর্ব শ্রেণীর কৃষিজীবী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	সর্ব শ্রেণীর অ-কৃষিজীবী	পঞ্চম শ্রেণী	ষষ্ঠ শ্রেণী	সপ্তম শ্রেণী	অষ্টম শ্রেণী
পশ্চিমবঙ্গ ..	৫৭·২১	৩২·৩৪	১২·০১	১২·২৬	০·৬০	৪২·৭৯	১৫·৩৬	৯·৩২	৩·০৫	১৫·০৬
আসাম ..	৭৩·৩৪	৫৭·৮৯	১২·৮১	১·৭৪	০·৯০	২৬·৬৬	১৪·৬৮	৩·৯০	১·২৮	৬·৮০
বিহার ..	৮৬·০৪	৫৫·২৯	৮·২১	২১·৮৭	০·৬১	১৩·৯৬	৩·৯৪	৩·৪০	০·৭২	৫·৯০
বোম্বাই ..	৬১·৪৬	৪০·৭৪	৯·৬৯	৯·০৫	১·৯৮	৩৮·৫৪	১৩·৭৬	৭·৬১	২·২৩	১৪·৯৪
মধ্যপ্রদেশ ..	৭৬·০০	৪৯·৫০	৪·৪৭	২০·৪১	১·৬২	২৪·০০	১০·৬০	৪·৩৯	১·৪৭	৭·৫৪
মাদ্রাজ ..	৬৪·৯৩	৩৪·৯৫	৯·৫৮	১৮·২৩	২·১৭	৩৫·০৭	১২·৩৫	৬·৬৯	১·৬৮	১৪·৩৫
মহীশূর ..	৬৯·৯০	৫৫·৪৬	৪·৭৬	৬·৭৯	২·৮৯	৩০·১০	১০·২৪	৫·৫৭	১·১৬	১৩·১৩
উড়িষ্যা ..	৭৯·২৮	৫৯·৫৩	৫·৯৪	১২·৩১	১·৫০	২০·৭২	৬·৩৩	২·৯১	০·৫৩	১০·৯৫
উত্তরপ্রদেশ ..	৭৪·১৯	৬২·২৭	৫·১৫	৫·৭১	১·০৬	২৫·৮১	৮·৩৮	৫·০৩	১·৩৬	১১·০৪
বিন্ধ্যপ্রদেশ ..	৮৭·১২	৬২·৬১	৬·৩৬	১৭·৬২	০·৫৩	১২·৮৮	৪·৬০	২·৮০	০·৪৩	৫·০৫

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি ও অ-কৃষি উপজীবিকায় উপার্জকের ও কর্মক্ষম বয়সের (১৫—৫৫) লোকের হার

	১৯৫১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
কৃষিবর্গ	১৪·৯	১৮·৫	২৩·৪	২৩·৪	১৯·৮
অ-কৃষিবর্গ	১৬·৬	১৪·৩	১৬·১	১৭·৭	১৯·১
কৃষি ও অ-কৃষিবর্গের সমষ্টি	৩১·৫	৩২·৮	৩৯·৫	৪১·১	৩৮·৯
মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মক্ষম বয়সের (১৫—৫৫) লোকের হার	৫৭·৪	৫৪·০	৫৪·২	৫৩·৩	৫৩·১
মোট পুরুষের অনুপাতে কর্মক্ষম বয়সেব (১৫—৫৫) পুরুষের হার	৫৯·৩	৫৪·৩	৫৪·৩	৫৩·৪	৫২·৯
মোট নারীর অনুপাতে কর্মক্ষম বয়সের (১৫—৫৫) নারীর হার	৫৫·২	৫৩·৭	৫৪·১	৫৩·১	৫৩·৮

মোট জনসংখ্যার শতাংশে অ-কৃষিবর্গের লোকের ও পুরবাসীর হার এবং পুরবাসীর শতাংশে অ-কৃষিবর্গের বিভিন্ন শ্রেণীতে পৌরাঞ্চল অধিবাসীদের বণ্টন

রাজ্য	মোট জনসংখ্যার শতাংশে অ-কৃষিবর্গের লোকের হার	মোট জনসংখ্যার শতাংশে পুরবাসীর হার	পৌরাঞ্চলের মোট অধিবাসীর শতাংশে অ-কৃষিবর্গের বিভিন্ন শ্রেণীতে লোকের বণ্টন				অ-কৃষি উপজীবিকার সমষ্টি
			অ-কৃষি উৎপাদন	ব্যবসায়	পরিবহন	বিবিধ	
আসাম	২৬·৭	৪·৬	১৬·৫	২৭·৬	৭·২	৪২·২	৯৩·৫
মধ্যপ্রদেশ	২৪·০	১৩·৫	২৭·৮	১৯·৯	৭·৫	২৯·১	৮৪·৩
উড়িষ্যা	২০·৭	৪·১	১৩·৩	১৭·৫	৫·৬	৪৯·৬	৮৬·০
মহীশূর	৩০·১	২৪·০	২৮·৬	১৭·৯	৪·২	৩৫·৯	৮৬·৬
বোম্বাই	৩৮·৫	৩১·১	২৮·৯	১৯·২	৫·২	৩১·২	৮৪·৫
পাঞ্জাব	৩৫·৫	১৯·০	১২·০	২৯·০	৪·০	৪৫·০	৯০·০
মাদ্রাজ	৩৫·১	১৯·৬	২৪·০	১৯·০	৬·০	৩৪·০	৮৩·০
উত্তরপ্রদেশ	২৫·৮	১৩·৬	২৪·৯	২১·৯	৬·২	৩৪·৬	৮৭·৬
বিহার	১৪·০	৬·৭	..	..	..	..	৭৭·০
পশ্চিমবঙ্গ	৪২·৮	২৪·৮	২৮·৭	২৪·২	৯·৩	৩৩·৬	৯৫·৮
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫·২	১৬·০	২৪·৭	১৪·৯	৬·৬	২৯·০	৭৫·২

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাবলম্বী, উপার্জক পরোপজীবী ও ১৫—৫৪ বৎসর বয়স্ক লোকের হার

	উপজীবিকার শ্রেণী							
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
প্রতি উপজীবিকার শ্রেণীতে মোট জনসংখ্যার শতাংশে স্বাবলম্বীর হার	২৩·৩	২৫·১	৩৪·১	২৬·১	৪৩·৭	৩৩·৫	৪৩·১	৩৬·৩
প্রতি উপজীবিকার শ্রেণীতে মোট জনসংখ্যার শতাংশে উপার্জক পরোপজীবীর হার	৩·৭	৫·০	৪·৬	২·৩	২·১	১·৫	১·২	১·৯
প্রতি উপজীবিকার শ্রেণীতে মোট জনসংখ্যার শতাংশে স্বাবলম্বী ও উপার্জক পরোপজীবীর হার	২৭·০	৩০·১	৩৮·৭	২৮·৪	৪৫·৮	৩৫·০	৪৪·৩	৩৮·২
প্রতি উপজীবিকার শ্রেণীতে মোট জনসংখ্যার শতাংশে ১৫—৫৪ বৎসর বয়স্ক লোকের হার	৫৪·৪	৫৫·০	৫৭·৭	৫৩·৬	৬০·৭	৫৯·২	৬৬·৭	৬০·৮

ভাষা

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান ভাষা

ভাষা	পুরুষ	নারী
বাঙলা	১,১০,১৫,৭৪১	৯৯,৭৮,৬৩৩
হিন্দী	১০,৬৭,২৭৪	৫,০৭,৫১২
সাঁওতালী	৩,৩৬,০৬৫	৩,২৭,৪৩৮
উর্দু	২,৮৯,৭০০	১,৬৭,৯৩৫
উড়িয়া	১,৪০,৫৫০	৪১,৭২১
নেপালী	৯০,০০৮	৮৪,০০৯
তেলেগু	২৭,৩৪১	২২,১৯৮
ইংরেজী	২৩,১৮৬	১৪,৯৭৯
গুরুমুখী	২২,৯৮৪	১০,৩৪১
গুজরাটী	৬,৮৬৩	৮,১০৮
তামিল	৯,৬৭৫	৫,০৩৫
অসমিয়া	৬,৬৮৩	২,৭০৪
রাজস্থানী	২,৩৮৮	৬,০০৭
মারাঠি	৪,৩০২	৩,৩১৮
পাঞ্জাবী	৪,১৭৭	১,৫৪৪
মাড়োয়ারী	৩,৯০০	১,২৫৩

ধর্ম

পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্য ও জেলা	জনসংখ্যা	হিন্দু	জনসংখ্যার শতাংশ	শিখ	জনসংখ্যার শতাংশ	জৈন
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৮,১০,৩০৮	১,৯৪,৬২,৭০৬	৭৮·৪৫	২৯,৮৬৪	০·১২	১৯,১১৬
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	১৮,৩৫.১০৬	৮৩·৭৩	৫,৩৭৫	০·২৫	১,০০৩
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	৭,৭৪.৫২৭	৭২·৬০	৩২৭	০·০৩	১৩৭
বাঁকুড়া	১৩.১৯,২৫৯	১২,০২,৬৫৩	৯১·১৬	১২০	০·০১	১,৬৮৭
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	৩০,৮২,৯০০	৯১ ৭৮	২,৯২৩	০·০৯	৯৩৮
হুগলি	১৫,৫৪,৩২০	১৩,৪৪,৭৬৫	৮৬·৫২	৩৬২	০·০২	১০৫
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	১৩,৪৪,৬১৬	৮৩·৪৫	১,৫৩৬	০·১০	১৯৯
চব্বিশপরগনা	৪৬,০৯,৩০৯	৩৪,০৬,২৯৮	৭৩·৯০	৩,১৬৪	০·০৭	৩৮৪
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	২১,২৫,৯০৭	৮৩·৪১	১৪,১০৬	০·৫৬	১১,৭৪১
নদিয়া	১১,৪৪,৯২৪	৮,৮১,৯৫৫	৭৭·০৩	৩২৮	০·০৩	৭৭
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	৭,৬৫,২১৮	৪৪·৬০	৫১	০·০০	১,৪০৮
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	৫,৮৯,৮৯৬	৬২·৯২	৫৬	০·০১	৫০
পশ্চিম দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	৪,৯৯,৩২৭	৬৯·৩০	১৮	০·০০	২৪৯
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	৭,৬৯,৮৭৮	৮৪·১৮	১,০৭৩	০·১২	৩৭৭
দার্জিলিঙ	৪,৪৫,২৬০	৩,৬৩,৮৩৬	৮১·৭১	৩২২	০·০৭	১২৩
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৮	৪,৭৫,৮২৪	৭০·৯০	৪৩	০·০১	৬৩৮

র্ম, ১৯৫১

জনসংখ্যার শতাংশ	বৌদ্ধ	জনসংখ্যার শতাংশ	জরথুস্ত্রীয়ান (পার্শী)	জনসংখ্যার শতাংশ	মুসলমান	জনসংখ্যার শতাংশ	খ্রীস্টান	জনসংখ্যার শতাংশ
০·০৮	৮১,৫৭৬	০·৩৩	১,৯১৮	০·০১	৪৯,২৫,৪৯৬	১৯·৮৫	১,৭৫,০২১	০·৭০
০·০৫	২৭১	০·০১	২	০·০০	৩,৪১,৮৭৮	১৫·৬০	৬,১১৫	০·২৮
০·০১	২৭	০·০০	২	০·০০	২,৮৬,৫১৮	২৬·৮৬	৬৮৬	০·০৬
০·১১	৮	০·০০	..	..	৫৮,১০৩	৪·৪০	১,২৫১	০·১০
০·০৩	১,০৬৬	০·০৩	৪৩	০·০০	২,৪০,৮৬০	৭·১৭	৯,২৬৮	০·২৮
০·০১	৯০	০·০১	১	০·০০	২,০৬,২১০	১৩·২৭	১,২৭৮	০·০৮
০·০১	২২১	০·০২	৩১	০·০০	২,৬১,৪১৪	১৬·২২	৩,২৬৮	০·২০
০·০১	১,৪৬৮	০·০৩	১৬৬	০·০০	১১,৬৮,৬২৯	২৫·৩৫	২৮,৫১৪	০·৬২
০·৪৬	৯,৪২৭	০·৩৭	১,৬২৩	০·০৬	৩,০৫,৯১২	১২·০০	৭৫,৮৩৬	২·৯৮
০·০১	২১৭	০·০২	..	..	২,৫৬,০১৭	২২·৩৬	৫,৮৮৫	০·৫১
০·০৮	২০	০·০০	..	..	৯,৪৭,৮১৫	৫৫·২৪	৭৪৫	০·০৫
০·০০	৭	০·০০	..	..	৩,৪৬,৬৪৯	৩৬·৯৭	৮৩০	০·০৯
০·০৩	৪৫	০·০১	..	..	২,১৫,৭৩৯	২৯·১৪	৩,২৩৩	০·৪৫
০·০৪	৬,৫৪০	০·৭১	..	..	৮৯,০৯৯	৯·৭৪	২৫,৪৮১	২·৭৯
০·০৩	৬২,১৫০	১৩·৯৬	৪১	০·০১	৬,৩৯৩	১·৪৪	১২,৩১০	২·৭৭
০·০৯	১৯	০·০০	৯	০·০০	১,৯৪,২২০	২৮·৯৪	২৮১	০·০৪

বিবিধ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমির ব্যবহার

(একরের হিসাবে)

			চলতি পতিত	যে পরিমাণ জমিতে শস্যোৎপাদন করা হইয়াছিল	ধানের জমি		
					ভাদই	আমন	বোরো
১৯০৫-৬	..	..	১৪,০৮,৩৮৮	৭১,৬৬,৮০০	..	..	..
১৯১৪-৫	..	..	২৩,০৭,৬৫২	৯৯,১৮,৯০০	১৬,৪৯,৬০০	৬৬,১৫,১০০	৫১,৫০০
১৯২০-১	..	..	৩১,০৩,৪৫৬	৯১,৭৭,৬০০	১৭,৪৩,৭০০	৬৪,৭৯,৮০০	৬৫,৩০০
১৯৩০-১	..	..	৩৬,২১,৯৮৪	৮৫,৫৬,৬০০	১৮,৯৪,৫০০	৫৯,৮৪,১০০	৪১,০০০
১৯৪০-১	..	..	৩৫,৯৫,১০৩	৮৭,৮৭,০০০	১৭,৭২,৩০০	৫৬,২২,৬০০	৩৬,৫০০
১৯৪৯-৫০	..	..	৯,৩২,৫০০	১,১২,৮০,৮০০	১২,৭২,৬০০	৮১,৩৫,২০০	৩৭,৫০০

দ্রষ্টব্য : ১৯৪৯-৫০ সন ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে নদিয়া, মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার অবিভক্ত আয়তন ধরা হইয়াছে।

খাদ্য ও শস্যের অবস্থা

(হাজার টনের হিসাবে)

	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
মাথাপিছু বার্ষিক ৪ মণ ১০ সের হারে যত খাদ্যশস্য প্রয়োজন	..	..	..	..	৩,৮৭৩·৬	..
উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ						
আমন	৩,১৪৭·৬	৩,০৪১·৬	২,৮৮২·৮	৩,২৬৯ ৫	৩,৫৫৯·০	৩,১০৩·৩
আউশ	৩৫৫·৪	৩৯৯·৮	৩৭৬·০	৩৩৫·৯	৩৫৯·৭	৩৫৯·৭
বোরো	১৬·৬	৯·৪	১১·৩	১৬·১	১৫·৫	১৫·৫
মোট	৩,৫১৯·৬	৩,৪৫০·৮	৩,২৭৫·১	৩,৬২১·৫	৩,৯৩৪·২	৩,৪৭৮·৫
অন্যান্য খাদ্যশস্য	৭৬·৪	৭০·২	৭৪·৯	৭৪·৫	১০৪·৮	১০৪·৫
মোট খাদ্যশস্য	৩,৫৯৬	৩,৫২১	৩,৩৫০	৩,৬৯৬	৪,০৩৯	৩,৫৮৩
বীজ ও ঘাটতি ১০ শতাংশ বাদে	৩,২৩৬	৩,১৬৯	৩,০১৫	৩,৩২৬	৩,৬৩৫	৩,২২৫
লোকসংখ্যা (লক্ষে)	২১৯	২২৪	২৩২	২৪৬	২৪৮	২৫২
উৎপন্ন শস্য সমবণ্টন করিলে প্রতি লোক বৎসরে যত মণ পাইত	৪·০২	৩·৮৫	৩·৫৪	৩·৬৮	৩·৯৯	৩·৫১
বিদেশ হইতে আমদানি						
চাউল	৫৬	৮৯	৯৮	১৮	৩২	..
গমজাত দ্রব্য, গম, যব প্রভৃতি	১৫৭	২১০	৩১৪.	২৯২	৫২২	..
মোট	২১৩	২৯৯	৪১২	৩১০	৫৫৪	..
রেশনপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা (লক্ষে)						
পূর্ণ রেশন	৬০	৫৮	৬১	৬৩	৭১	..
আংশিক রেশন	৭	৮	১২	২০	২৯	..
মোট	৬৭	৬৬	৭৩	৮৩	১০০	..

জলপাইগুড়ি জেলার চায়ের পরিসংখ্যান, ১৮৭৪—১৯৫১

বৎসর		বাগানের সংখ্যা	চা-বৃক্ষ রোপিত ভূমির মোট আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ (পাউণ্ডে)	পূর্ণতাপ্রাপ্ত চা-বৃক্ষের এক একর জমির গড় উৎপাদন (পাউণ্ডে)	নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা		
						স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১৮৭৪	..	১	..	..	..	..	..	..
১৮৮১	..	৪৭	৫,৬৩৭	..	..	..	..	..
১৮৯১		৭৯	৩৮,৬৮৩			.	.	.
১৯০১	..	২৩৫	৭৬,৪০৩	৩,১০,৮৭,৫৩৭	৪৪১	৪৭,৩৬৫	২১,২৫৪	৬৮,৬১৯
১৯১১	.	১৯১	৯০,৮৫৯	৪,৮৮,২০,৬৩৭	৫৮৩	৫৬,৬৯৩	১৮,৬২২	৭৫,৩১৫
১৯২১	.	১৩১	১,১২,৬৮৮	৪,৩২,৮৭,১৮৭	৪২৬	৮৬,৬৯৩	১,৮৭১	৮৮,৫৬৪
১৯৩১	.	১৫১	১,৩২,০৭৪	৬,৬৪,৪৭,৭১৫	৫৩৪	১,১২,৫৯১	৪,২৬২	১,১৬,৮৫৩
১৯৪১	.	১৮৯	১,৩১,৭৭০	৯,৪৬,০৪,৪৫০	৭৬৫	১,৩৬,৪৯১	৪,৮৯৬	১,৪১,৩৮৭
১৯৫১		১৫৮	১,৩৪,৪৭৩	১৩,৭১,৯৪,৬৬০	১,০২০	.		১,৭৬,১৯৬

দার্জিলিঙ জেলার চায়ের পরিসংখ্যান, ১৮৬১—১৯৫১

বৎসর		বাগানের সংখ্যা	চা-বৃক্ষ রোপিত ভূমির মোট আয়তন	উৎপাদনের পরিমাণ (পাউণ্ডে)	পূর্ণতাপ্রাপ্ত চা-বৃক্ষের এক একর জমির গড় উৎপাদন (পাউণ্ডে)	নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা		
						স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১৮৬১	..	২২	৩,২৫১	৪২,৬০০	..	..	.	২,৫৩৪
১৮৮১	..	১৫৫	২৮,৩৬৭	৫১,৬০,৩১৬	২৩৮	..	..	..
১৮৯১	..	১৭৭	৪৫,৫৮৫	১,০৯,১০,৪৮৭	২৭৭	.	..	..
১৯০১	..	১৭০	৫১,৭২৪	১,৩৫,৩৫,৫৩৭	২৭৬	২৪,২৫৭	১৬,১৯৪	৪০,৪৫১
১৯১১	..	১৫৬	৫১,৪৮৮	১,৪২,৫০,৬১৫	২৮৪	২৬,৫১০	১৩,০৫১	৩৯,৫৬১
১৯২১	..	১৬৮	৫৯,০০৫	১,৪০,৮০,৯৪৬	২৫২	৪৫,৯৭৭	২,৭৩৩	৪৮,৭১০
১৯৩১	..	১৬৯	৬১,১৭৮	২,০৪,৯৬,৪৮১	৩৪৫	৬১,৫৭২	২,০৯৩	৬৩,৬৬৫
১৯৪১	..	১৩৬	৬৩,১৭৩	২,৪৮,১৫,২১৬	৪০০	৬৭,৮৩৮	১,৮৬১	৬৯,৬৯৯
১৯৫১	..	১৩৮	৬২,৫৮০	২,৯২,৮৩,৪৯৯	৪৬৮	..	..	৬৯,৫৯০

মালিক-চাষী পরিবারের মধ্যে জমির বণ্টন

রাজ্য ও জেলা	প্রতি মালিক-চাষী পরিবারে ভূমির গড় পরিমাণ (একরে)	মোট মালিক-চাষী পরিবারের কত শতাংশের কি পরিমাণ জমি আছে					
		২ একরের কম	২—৩ একর	৩—৪ একর	৪—৫ একর	৫—১০ একর	১০ একর ও তদূর্ধ্ব
পশ্চিমবঙ্গ (কোচবিহার সমেত), ১৯৫১	৪·৮২	৩৪·৫	১৫·৩	১২·৩	৮·৬	২০·৩	৯·০
পশ্চিমবঙ্গ (কোচবিহার বাদে), ১৯৪০	৫·১৭	৩৪·৪	১০·৭	৯·৬	৮·৮	১৯·৭	১০·১
বর্ধমান, ১৯৪০	৫·৬৩	২৮·৬	১০·৯	৮·৯	১০·৮	২৬·৬	১২·৮
বীরভূম, ১৯৪০	৪·৬৪	১৫·১	১০·১	৭·৪	৮·৫	১৯·২	৮·২
বাঁকড়া, ১৯৪০	৮·১৭	৫৩·৭	৮·৯	৭·৮	৪·৫	১৪·৮	১০·৩
মেদিনীপুর, ১৯৪০	৪·২৩	৩৮·২	১৬·১	১০·৯	১০·৫	১৭·৬	৬·৭
হুগলি, ১৯৪০	৩·৭৪	৩২·৪	১৩·১	১৩·০	১০·৯	১৮·৮	১০·২
হাওড়া, ১৯৪০	৩·৫৩	৫৩·২	১৪·৩	৫·১	৪·৫	১৭·৫	৫·৪
চব্বিশপরগনা, ১৯৪০	৪·৩৩	৫৬·৫	১০·৭	৮·৬	৪·৭	১০·৯	৭·২
নদিয়া, ১৯৪০	৪·৮৩	১৬·৮	৯·৬	১০·৮	১০·১	২০·৩	১১·৮
মুর্শিদাবাদ, ১৯৪০	৪·৩০	৩৮·৩	১০·১	৯·৩	৭·৫	১৬·৯	৭·৭
মালদহ, ১৯৪০	৩·৩৪	৫৪·২	৭·৮	৮·৪	৬·৯	১৫·৯	৬·৮
দিনাজপুর, ১৯৪০	৬·৩৮	২৪·২	৮·৯	১১·১	১০·২	২৮·৩	১৫·০
জলপাইগুড়ি, ১৯৪০	৮·৭৬	৫·৩	৬·০	১০·৯	১৬·৪	৩৩·২	২০·৪

জমি চাষের উপায়, ১৯৪০ ও ১৯৫১

রাজ্য ও জেলা	কর্ষিত ভূমির শতাংশ			
	পরিবারস্থ লোক ও শ্রমিকের সাহায্যে চাষ		বর্গাদারের সাহায্যে চাষ	
	১৯৫১	১৯৪০	১৯৫১	১৯৪০
পশ্চিমবঙ্গ	৭৯·৭	৭৭·৪	২০·৩	২২·৬
বর্ধমান	৭০·৮	৭৪·৮	২৯·২	২৫·২
বীরভূম	৭৭·৯	৭৫·২	২২·১	২৪·৮
বাঁকুড়া	৭২·৬	৭০·৮	২৭·৪	২৯·২
মেদিনীপুর	৮১·০	৮২·৯	১৯·০	১৭·১
হুগলি	৭৯·৬	৬৯·৫	২০·৪	৩০·৫
হাওড়া	৮৫·০	৭৬·৬	১৫·০	২৩·৪
চব্বিশপরগনা	৮৬·৭	৭৭·৭	১৩·৩	২২·৩
নদিয়া	৮৪·৪	৭৫·৯	১৫·৬	২৪·১
মুর্শিদাবাদ	৭৯·৮	৭৪·২	২০·২	২৫·৮
মালদহ	৮১·৮	৯০·৪	১৮·২	৯·৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৭৮·৬	৮৫·৫	২১·৪	১৪·৫
জলপাইগুড়ি	৬৮·০	৭৪·১	৩২·০	২৫·৯
দার্জিলিঙ	৯২·১	..	৭·৯	..
কোচবিহার	৮০·২	..	১৯·৮	..

১৯৫১ সনে বিভিন্ন আয়তনের জমির যত শতাংশ বর্গাপ্রথায় চাষ করা হইয়াছিল

মালিকচাষীর জমির পরিমাণ ১	এক নম্বর কলমের যত শতাংশ বর্গা-প্রথায় চাষ করা হইয়াছিল ২
০—১ একর	১৬·০
১—২ ,,	১৫·৯
২—৩ ,,	১৫·৭
৩—৪ ,,	১৭·৮
৪—৫ ,,	২১·৩
৫—৬ ,,	২২·৮
৬—৭ ,,	২৪·০
৭—৮ ,,	২৬·০
৮—৯ ,,	২৫·৩
৯—১০ ,,	২৮·৭
১০—১৫ ,,	৩০·৩
১৫—২০ ,,	৩৬·১
২০—২৫ ,,	৪০·৭
২৫—৩৩⅓ একর	৪১·০
৩৩⅓ একর ও তদূর্ধ্ব	৫৫·৩
মোট	২০ ৩

জনসমষ্টির প্রতি দশ হাজারে স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গে স্বাবলম্বী নারীর সংখ্যা, ১৯০১—৫১

বৎসর	মোট জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে স্বাবলম্বীর সংখ্যা			স্বাবলম্বী নারীর সংখ্যা		
	মোট	কৃষিবর্গ	অ-কৃষিবর্গ	মোট	কৃষিবর্গ	অ-কৃষিবর্গ
১৯৫১	৩,১৫০	১,৪৮৯	১,৬৬১	১০,৩৯,৮৬২	৪,৩০,৭৪০	৬,০৯,১২২
১৯৩১	৩,২৮১	১,৮৪৮	১,৪৩৩	৯,৬২,২৯১	৩,৪২,০৭৬	৬,২০,২১৫
১৯২১	৩,৯৪৯	২,৩৩৮	১,৬১১	১৩,৪৯,৭৬৪	৫,৪৭,৪২৯	৮,০২,৩৩৫
১৯১১	৪,১১২	২,৩৪০	১,৭৭২	১৪,৬৪,৮০১	৪,৬৬,২৫৬	৯,৯৮,৫৪৫
১৯০১	৩,৮৯০	১,৯৮৩	১,৯০৭	১৩,৭৬,০১০	৩,১৪,১৩৪	১০,৬১,৮৭৬

পশ্চিমবঙ্গের জেলা, থানা, শহর, তিন হাজার ও তদুর্ধ্ব লোকের অধ্যুষিত
গ্রাম, প্রধান নদী ও কয়েকটি বিশেষ স্থানের

ভৌগোলিক বিবরণ

তালিকায় ব্যবহৃত সংকেত পরিচিতি

নারী ৫০৭	প্রতি হাজার পুরুষে ৫০৭ জন নারী
আসানসোল শ, থানা ঐ	থানা আসানসোল
তুফানগঞ্জ থা, মহকুমা ঐ	মহকুমা তুফানগঞ্জ
লো	লোকসংখ্যা
ঘ	ঘনতা
গ্রা	গ্রাম
শ	শহর
ন	নগর
থা	থানা
ম	মহকুমা
জে	জেলা
নং	নদী
উ	উত্তর
দ	দক্ষিণ
পু	পূর্ব
প	পশ্চিম
মা	মাইল
ফু	ফুট
আ	আয়তন
আ ৩২	আয়তন ৩২ বর্গমাইল

শহর ও গ্রামের পরবর্তী নাম থানা

ভৌগোলিক বিবরণ

অগ্রদ্বীপ গ্রা, কাটোয়া, ভাগীরথীর তীরে বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, লো ৩,১৮০ ; ডাকঘর, পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অজয় নং, ছোটনাগপুরের পাদশৈলে উৎপন্ন, দেওঘরের ৫ মা দ, দুই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মিলনে সৃষ্টি ; বর্ধমান ও বীরভূমের সীমা গঠনের পর বর্ধমানের মধ্য দিয়া কাটোয়াতে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

অন্ডাল শ, থানা ঐ, দামোদরের নিকটে, রানীগঞ্জের ৬ মা পু দ-পু, রেল জংসন, বিস্তৃত কয়লার খনি অঞ্চলের কার্য সম্পাদিত হয়, রেলের বড় কর্মশালা, সিমেন্ট ও চীনামাটির বাসন প্রস্তুত, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ভাটিখানা ; আ ১·৩০, লো ৪,২৮৮, নারী ৭৫৯।

অন্ডাল থা, আসানসোল ম, একটিমাত্র শিল্প শহর, আ ৭১, লো ৮৬,০০৮, ঘ ১,২০৫, ১৯২১ সন পর্যন্ত বৃদ্ধি ১৮৭২ সনের ৪৩·৩ শতাংশ।

অনন্তপুর গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৯,৪০৩।

অনুপনগর গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৪,৫৩০।

অবজারভেটারি হিল, দার্জিলিঙ শহরের সর্বোচ্চ পাহাড় ৭,১৬০ ফু। গায়ে বৌদ্ধ মঠ।

অমলহাড়া গ্রা, পাঁশকুড়া, লো ৪,২৯৩।

আউসগ্রাম গ্রা, থানা ঐ, গুসকরা স্টেশন হইতে ৫ মা, থানা, হাই স্কুল, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস।

আউসগ্রাম থা, বর্ধমান সদর ম, অজয়ের দ, আ ২৩১, লো ৯০,৬৩২, ঘ ৩৯১, গুসকরা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান অঞ্চল।

আকড়া গ্রা, মেটিয়াবুরুজ, লো ৫,২১৪।

আখানগর গ্রা, কালিয়াগঞ্জ, লো ৩,৪৪৬।

আগুরিবাদ পুনিশোল গ্রা, অন্ডা, লো ৩,১৫৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আড়-গড়ি গ্রা, সাঁকরাইল (হা), লো ৩,০২৬ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

আড়ংঘাটা-নারায়ণপুর গ্রা, রানাঘাট, লো ৩,১৭১ ; ডাকঘর, ডিসপেনসারী, স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪।

আটপুর গ্রা, জঙ্গীপুর, এখানে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, লো ১,১০৬।

আত্রাই নং, শিলিগুড়ির ৬ মা উ উ-পু, হিমালয়ের পাদশৈলে উৎপন্ন ; দ দিকে বালুরঘাট ও আত্রাই গ্রাম হইয়া দ-পু চলন বিলের মধ্য দিয়া যমুনায়, উপরের অংশের নাম করতোয়া ও নিম্নাংশের নাম বড়াল, প্রায় ২৪০ মা।

আনন্দপুর গ্রা, কেশপুর, লো ৪,০৮৮ ; স্কুল, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

আনন্দপুর গ্রা, বাঁকুড়া, বাঁকুড়া শহরের ১৫ মা দ-পু, কয়লার ছোট খনি, লো ২৯।

আন্দরন ফুলবাড়ী গ্রা, তুফানগঞ্জ, লো ৩,৮১০।

আন্দুল গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৫,৪২৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, স্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর।

আন্ধারকোঠা গ্রা, করিমপুর, লো ৪,৭৬৬।

আপ্তৈর গ্রা, হিলি, লো ৩,০৫৩ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আমডাঙ্গা থা, বারাসাত ম, আ ৫৪, লো ৪০,৮৩৮, ঘ ৭৬২।

আমতা থা, উলুবেড়িয়া ম, শহরবিহীন, আ ১৪১, লো ২,৩০,২৫৪ ঘ ১,৬৩২।

আমতা গ্রা, থানা ঐ, লো ৬,৫৩৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩, স্কুল, হাসপাতাল ২, ডাকঘর।

আমাদাবাদ গ্রা, নন্দীগ্রাম, লো ৪,৪৫৪ ; স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫।

আমোদর নং, বাঁকুড়া জেলার এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি, হুগলি জেলার মান্দারণ গ্রাম পার হইবার পর তারাজুলি খাল মিলিত হইয়াছে, চণ্ডীকাব্য ও দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে উল্লেখ, পার্বত্য নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র, খরস্রোতা, খাতের তলদেশ কঙ্করময়।

আহাম্মদপুর গ্রা, সাঁইথিয়া, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লকের নাম এই গ্রামের নাম হইতে।

আরামবাগ ম, হুগলি জে, আ ৪১২, লো ৩,৭০,৪১৬, ঘ ৮৯৮।

আরামবাগ থা, মহকুমা ঐ, আ ১১৫, লো ৯৫,১৭২, ঘ ৮২৮।

আরামবাগ শ, থানা ঐ, মহকুমার সদর, দারকেশ্বরের তীরে, পুরাতন স্থান, পূর্ব নাম জাহানাবাদ, মিয়াঁদের বাগানের নাম হইতে ১৯০০ সনে নূতন নামকরণ, বর্ধমান মেদিনীপুরের বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, উড়িষ্যা অভিযানের পথে মানসিংহ সসৈন্যে এখানে বর্ষাযাপন করেন (১৫৯০), দেখিতে পল্লীসদৃশ, নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ ; লো ১১,৪৬০, নারী ৮৬৭।

আরাসংরি গ্রা, বনগাঁ, লো ৩,১৯৮।

আলডিহি গ্রা, কুল্টি, লো ৩,১৯৭। প্রাইমারী স্কুল।

আলিপুর শ, কলিকাতার কর্মকেন্দ্রের ৩ মা দ, কলিকাতার ওয়ার্ড, চব্বিশপরগনা জেলার সদর। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, মুদ্রণ, ও বই বাঁধাই, সিমেন্ট প্রস্তুত, তেলকল, পশুশালা, জাতীয়গ্রন্থাগার, পুষ্পোদ্যান, হাওয়া অফিস।

আলিপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,৪২৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আলিপুরদুয়ার ম, জলপাইগুড়ি জে, আ ১,০৭৮, লো ৩,৬৮,৩৯৬, ঘ ৩৪২।

আলিপুরদুয়ার শ, আলিপুরদুয়ার্স, লো ২৪,৮৮৬।

আলিপুরদুয়ার থা, আলিপুরদুয়ার্স ম, আ ২৭০, লো ১,১৯,০৩৮, ঘ ৪৪১।

আলুন্দা গ্রা, সিউড়ি হইতে ২ মা ; ডোরাকাটা টেবিলের কাপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালে, সাদা টেবিলের কাপড়, মশারির থান, অন্যান্য মোটা কাপড় উৎপাদন।

আসনবনি গ্রা, কুল্টি, লো ৩,২৬৩।

আসানসোল ম, বর্ধমান জে, আ ৬২৪, লো ৭,৬৯,২৬৫, ঘ ১,২৩৩। প্রস্তরময় তরঙ্গায়িত অনুর্বর ভূমি, অজয়ের দক্ষিণে ছোট ছোট লাল মাটির পাহাড়, তরুলতা বিরল। রাজ্যের খনি ও শিল্পাঞ্চল। রানীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র এই মহকুমায়। নিরবচ্ছিন্ন লোকবৃদ্ধি। ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি।

আসানসোল থা, মহকুমা ঐ, আ ৩১, লো ১,১৫,৪৮৫, ঘ ৩,৭৬২। শিল্প-থানা, উন্নতিশীল, ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের ১৭১ শতাংশ বৃদ্ধি।

আসানসোল শ, থানা ঐ, আ ৪, লো ৭৬,২৭৭। নারী ৯৩৭। বর্ধমান শহরের ৬৫ মা উ-প। রানীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলের কয়লাব প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র, প্রধান রেল জংসন, কলেজ, উচ্চতা ৪১৪ ফু, তাপের গড় ৭৬ ডিগ্রী, বৃষ্টিপাত ৫৬ ই।

ইছাপুর গ্রা, হাসানাবাদ, লো ৩,০৪০।

ইছাপুর ডিফেন্স স্টেট শ, নোয়াপাড়া, কলিকাতার প্রায় ১৫ মা উ, অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ও অস্ত্রাগার, লো ১৪,৬০০, উদ্বাস্তু ৪,৮৫৮, নারী ৫৭৮।

ইছলিপাড়া গ্রা, সুতী, লো ৯,৩৭৩।

ইছামতী নং, নদীয়া জেলায় মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপত্তি, চব্বিশ-পরগনার স্বরূপনগর থানায় প্রবেশ, এই জেলায় নাব্য, হিঙ্গলগঞ্জের নিকট হইতে নাম কালিন্দী বা কালীনদী, পরে রায়মঙ্গল নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত।

ইটাহার থা, রায়গঞ্জ ম, আ ১৬৫, লো ৮০,৯৫৩, ঘ ৫৪৭।

ইদপুর থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১১৬, লো ৬৩,০৬৯, ঘ ৫৪৪।

ইন্দাস থা, বিষ্ণুপুর ম, আ ৯৮, লো ৫১,১৭৫, ঘ ৫২০। বহু মুসলমানের বাস।

ইলামবাজার থা, বীরভূম সদব ম. আ ১০০, লো ৪৮,২৮৯, ঘ ৪৮২।

ইসলামপুর গ্রা, রানীনগর, লো ৩,৩৩৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, স্কুল, ডাকঘর, ডিসপেনসারী।

ইড়পালা গ্রা, ঘাটাল, লো ৩,৩৭৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২।

ইংরেজবাজার থা, মালদহ সদর ম, আ ৯৮, লো ৯৩,৮৭২, ঘ ৯৫৪।

ইংরেজবাজার শ, থানা ঐ, বহরমপুরেব ৬৫ মা উ, মহানন্দার তীবে, মালদহ জেলার বর্ধিষ্ণু সদব ; ব্যবসায় কেন্দ্র, ধান, চাউল, গম. তৈলবীজ. পাট, যব, ভুট্টা. অনতিদূরে তুঁতের চাষ ও রেশম উৎপাদন কেন্দ্র ; আ ২, লো ৩০,৬৬৩।

উখরা গ্রা, অন্ডাল, লো ৪,২৪৭ ; ডাকঘর, ডিসপেনসারী, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

উজানি গ্রা, কোগ্রাম দ্রঃ।

উত্তর কাশীনগর গ্রা, মথুরাপুর, লো ৪,৬৩০ ; হাসপাতাল।

উত্তর চন্ডীপুর গ্রা, মানিকচক, লো ৩,২০০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তর ঝাপড়দহ গ্রা, ডোমজুড়, লো ৪,৩৭৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তর দারুয়া গ্রা, কাঁথি, লো ৩,৪১৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

উত্তরপাড়া থা, শ্রীরামপুর ম, আ ১১, লো ৬৫,৭২৬, ঘ ৫,৮৬৮।

উত্তরপাড়া শ, কলিকাতার ৬ মা উ, হুগলি নদীর তীরে, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও হাড়চূর্ণ, মোটর কারখানা, ইটখোলা ; কলেজ ও বড় গ্রন্থাগার, উইলিংডন সেতু নির্মাণের পর হইতে কলিকাতার আবাসিক উপকণ্ঠ ; লো ১৭,১২৬, উদ্বাস্তু ২,৫১৩, নারী ৮৯৪।

উত্তর বাকসড়া গ্রা, জগাছা, লো ৪,৩২৫ ; ডাকঘর।

উত্তর বারাকপুর শ, নোয়াপাড়া, কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত, পাটের সুতাকাটা প্রভৃতি শিল্প ; লো ৩২,১৭৩, উদ্বাস্তু ৭,৬৭৪, নারী ৭৩৫।

উত্তর রায়পুর গ্রা, বজবজ, লো ৭,৩৫০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,৫৬০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উত্তর লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রা, মথুরাপুর, লো ৪,১৩৪।

উত্তর হরিশচন্দ্রপুর গ্রা, হরিশচন্দ্রপুর, লো ৩,০৭৭।

উদং গ্রা, আমতা, লো ৩,৩৯৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩, স্কুল, ডাকঘর, ডিসপেনসারী।

উনসানি গ্রা, জগাছা, লো ৫,১৯৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, ডাকঘর।

উলুবেড়িয়া ম, হাওড়া জে, আ ৩৮৬, লো ৬,৮২,৯১৭, ঘ ১,৭৬৯।

উলুবেড়িয়া থা, মহকুমা ঐ, আ ৭৬, লো ১,৫৮,৫৮৭, ঘ ২,০৮৭।

উলুবেড়িয়া শ, থানা ঐ, লো ১২,৫৭৫ ; কলেজ।

এগরা থা, কাঁথি ম, আ ১৫৬, লো ১,১১,৭১৬, ঘ ৭১৮।

এনায়েতপুর গ্রা, মানিকচক, লো ৩,৩০০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল।

এড়ুয়ার গ্রা, ভাতাড়, লো ৩,১৬৩। হাইস্কুল, ডিসপেনসারী, পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

ওন্দা (ওন্ডা) থা, বাঁকুড়া সদর ম, লো ৮৪,৮২০, ঘ ৪৩৭।

কাঞ্চননগর গ্রা, বর্ধমান, বর্ধমান শহরের দ-প উপকণ্ঠে অবস্থিত, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদির জন্য খ্যাত।

কন্যানগর গ্রা, বিষ্ণুপুর, লো ৩,০৬৯।

কমলপুর গ্রা, রতুয়া, লো ৩,৩৭৪।

করজগ্রাম গ্রা, কাটোয়া, লো ৩,৩৩৭ ; ডিসপেনসারী, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

করতোয়া নং, আত্রাই দ্রঃ।

কল্যাণপুর গ্রা, বাগনান, লো ৩,০৭১ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

কল্যাণী শ, বীজপুর, কলিকাতার ২৮ মা উ কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশনের অব্যবহিত উত্তর, রেলপথ, সড়ক ও নদীপথে কলিকাতার সহিত যুক্ত, কলিকাতার জনতা ও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আধুনিক শহর, কাঁচড়াপাড়া রেলের কর্মশালা, সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল, কয়েকটি সৈনিক ইউনিট, কাঁচড়াপাড়া শহর, হরিণঘাটার গবাদি পশু সম্বন্ধে গবেষণাগার ও দুগ্ধপল্লী এই নূতন শহরের অনতিদূরে ; শহরের জন্য ১০ হাজার একর স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে, শহরের সর্ব-সুবিধা যুক্ত একটি ব্লক সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কসবা গ্রা, টালিগঞ্জ, লো ৬,০০৫।

কয়থা গ্রা, নলহাটী, লো ৩,৬৫১।

কলিকাতা ন, ২২০৩২ মি উ ৮৮০২০ মি পূ, বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৭০ মা উ, দিল্লীর ৮০০ মা দ-পূ, রেলপথে ৯০২ মা, গঙ্গার ব-দ্বীপে হুগলী নদীর পূর্বতীরে, সুগভীর পলিস্তরের উপর অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ; উচ্চতা ২১ ফু, পশ্চিমে হুগলী নদী অন্য তিনদিকে ২৪-পরগনা জেলা দ্বারা বেষ্টিত, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৩ ই, গড়তাপ ৭৬০ ফা, আয়তন ৩২·৩২, লো ২৫,৪৮,৬৭৭; ঘ ৭৮,৮৫৮, জনসংখ্যার ৫৪·৫ শতাংশ বহিরাগত, নারী ৫৭০, ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, রেলপথ ও সড়কের দ্বারা বহির্জগতের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত. ছোটনাগপুরের মালভূমি ও দামোদরের উপত্যকার খনিজ দ্রব্যের বহির্গমনের প্রধান পথ, কাঁচা পাট ও পাটজাত শিল্পদ্রব্য রপ্তানির পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ; লৌহপিন্ড, ম্যাঙ্গানিজ, চা, গালা ও উদ্ভিজ তৈল রপ্তানি, চাউল, চিনি ও বিবিধ শিল্পদ্রব্য আমদানী, ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র চটকল ও পাটের গাঁট বাঁধা কল এখানে কেন্দ্রীভূত, বয়নশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র (সুতী ও রেশম) ; মুদ্রণ ও বই বাঁধাই শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচ, কাগজ, সিগারেট, রং, সাবান, চীনামাটির বাসন, সিমেন্ট, ইট, রবারের দ্রব্যাদি, দিয়াশলাই, হোশিয়ারী, জুতা ও অন্যান্য চর্মশিল্প, চাউল, তৈল ও ময়দা প্রস্তুত, কাঠচেরা, বিবিধ যন্ত্রশিল্প ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির কারখানা, রেলের কর্মশালা, লৌহপিন্ড হইতে বিবিধ লোহ ও ইস্পাতের দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, চামড়া পাকা করা প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প।

কলিকাতা অঞ্চল, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ছয় মাইলের মধ্যে পাঁচটি নগর, কলিকাতা, হাওড়া, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ ও সাউথ সুবার্বস্, এবং সংলগ্ন শহর বালী, দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম ও বরানগরের মিলিত নাম। ৮৫·২ বর্গমাইল, লো ৩৫,৭৩,১৫২, রাজ্যের পুরবাসীদের ৫৮·১ শতাংশের বাস।

কলিকাতা শিল্পাঞ্চল বা বৃহত্তর কলিকাতা, কলিকাতা, হাওড়া, বালী, বজবজ, সাউথ সুবার্বস, গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ, বাটানগর, ১৫টি মিউনিসিপ্যাল শহর, একটি সেনানিবাস, বারাকপুর মহকুমার একটি শহর এবং হুগলি জেলার দশটি শহর নিয়া এই অঞ্চল, আয়তন ১৬০ বর্গ মা, লো ৪৫,৭৮,০৭১, ঘ ২৮,৬৩১, নারী ৬০২।

কালিকাতলা গ্রা, ক্যানিং, লো ৪,২৩৫ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

কলিগ্রাম গ্রা, খরবা, লো ৩,২৭৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল।

করিধ্যা গ্রা, সিউড়ী, সিউড়ীর ১ মা প, তসরের সুতা, তসর বয়ন, বাপ্তা প্রস্তুত ; লো ৩,৭৪০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪।

করিমপুর থা, নদিয়ার সদর ম, আ ১৭৪, লো ৮৭,৬৮৫, ঘ ৫০৫।

কাকদ্বীপ থা, ডায়মন্ডহারবার ম, আ ২৪৬, লো ৯৭,৮১৯, ঘ ৩৯৮।

কাকড়ীবাঁধা ঝাউবোনা গ্রা, কালিয়াচক, লো ৬,৯৯১।

কার্টরোড গ্রা, কার্শিয়াঙ, লো ৭,২৭৪।

কাটুচুয়া গ্রা, বীণপুর, সোপস্টান, পাথরের বাসন প্রস্তুত, লো ৭৬।

কান্তনগর গ্রা, ভগবানগোলা, লো ৪,৭১০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কাদড়া গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,৩৭৬ ; ডিসপেনসারী, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

কান্দরা গ্রা, ভরতপুর, লো ৩,৩১৩, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কামরাবাদ গ্রা, সোনারপুর, লো ৩,০৭০, হাসপাতাল।

কালচিনি থা, আলিপুরদুয়ার্স ম, আ ৩৪৪, লো ৮৫,৬০৯, ঘ ২৪৯। চা বাগানের থানা।

কালচিনি চা বাগান গ্রা, কালচিনি, লো ১২,১৯১।

কালনা ম, বর্ধমান জে, আ ৩৮৫, লো ৩,০৫,৭৫১, ঘ ৭৯৪।

কালনা শ, থানা ঐ, নদী যখন মাল ও যাত্রীবহনের প্রধান পথ ছিল সে সময়ে অনত্যম প্রধান বন্দর ; নদী ভরাট হইতে আরম্ভ করায় এবং রেলপথে যাত্রী ও মাল চলাচলের প্রচলন হওয়ায় অবনতি ঘটে. দীর্ঘকাল বর্ধমান জ্বরের প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত। লো ১৭,৩২৪, নারী ৮৭০।

কালনা থা, কালনা ম, আ ১৩৪, লো ১,২২,৫৩৪, ঘ ৯১৩।

কাঁকসা থা, আসানসোল ম, আ ১০৯, লো ৫০,১৯১, ঘ ৪৬১।

কাঁচড়াপাড়া শ, বীজপুর, হুগলি নদীর অনতিদূরে, কলিকাতার ২৬ মা উ উ-পূ, রেলপথে ২৮ মা, সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল, সুবৃহৎ রেলের কর্মশালা, চটকল, লো ৫৬,৬৬৮, উদ্বাস্তু ২০,৫২৬, নারী ৭৫৭।

কাঁচড়াপাড়া ডেভলপমেন্ট এরিয়া রুর‍্যাল কলোনি, চাকদহ থা, জনগণনার শহর, অধিবাসিগণ পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু, আ ০·৫৬, লো ১২,০১৯।

কাঁসাই (কংসাবতী) নং, ছোটনাগপুর পাহাড়ে উত্থিত হইয়া বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ও রায়পুর থানা অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অত্যন্ত কুটিল গতিতে মেদিনীপুর শহর অতিক্রম করিয়া ইহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। দক্ষিণের শাখা দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণে যাইয়া কালিঘাইর সহিত মিলিত হইবার পর হলদি নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া হুগলিতে পতিত হইয়াছে।

কাঁথি ম, মেদিনীপুর জে, আ ৯১২, লো ৭,৩৯,৮৪১, ঘ ৮১২।

কাঁথি শ, থানা ঐ, মেদিনীপুরের ৫০ মা দ-পূ, বালিয়াড়ির উপর স্থাপিত, বেতের চেয়ার নির্মিত হয় ; চাউল, আলু, সরিষা, লঙ্কার ব্যবসায়, কলেজ, লবণ তৈয়ার কেন্দ্র ছিল, বাতিঘর ১৩ মা পূ উ-পূ হুগলী তীরে, আ ৩·২৪, লো ১২,৭৩৮ ; নারী ৮৭১।

কাঁথি থা, মহকুমা ঐ, আ ১৯৬, লো ১২,৭৩৮ ; ঘ ৯৭৩।

কাঁকুড়িয়া গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৪,১২৭।

কাগ্রাম গ্রা, ভরতপুর, লো ৫,১৫৩ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, স্কুল, ডাকঘর।

কাঁঠালপাড়া গ্রা, ২৪ পরগনা জে, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান।

কানা নং, কুন্তী দ্রঃ।

কানা দামোদর নং, দামোদরের শাখা ; তারকেশ্বর শহর অতিক্রম করিয়া হাওড়া জেলায় প্রবেশ, ইহার সহিত কৌশিকি মিলিত হইয়াছে।

কানা দ্বারকেশ্বর নং, আরামবাগের ২ মাইল উপরে দ্বারকেশ্বর হইতে বহির্গত ; দ-পূ, মুণ্ডেশ্বরী খালের সহিত মিলিত।

কাপাসডাঙ্গা গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,১৩২ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

কামারগাঁতি গ্রা, হাড়োয়া, লো ৩,২১৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কামারদা গ্রা, খেজরী, লো ৩,৯৫৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩।

কামারপুকুর গ্রা, হুগলী জেলা, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবেব জন্মস্থান।

কামারহাটী শ, বরাহনগব থা, কলিকাতার ৭ মা উ, হুগলী তীরে, পাট ও কার্পাস শিল্প, রবারের দ্রব্যাদি, সিমেন্ট, চীনামাটির বাসন, রং, চামড়া পাকা ; আ ৪·০৪, লো ৭৭,২৫১।

কামারিয়া গ্রা, জয়নগর, লো ৭,৪১৯।

কালান্তর, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশের নিম্নভূমি। নদিয়া জেলাতেও কিছু দূর সম্প্রসারিত হইয়াছে ; প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ ও ৮ মাইল প্রশস্ত। উপরের মৃত্তিকা কাল, বর্ষায় জলমগ্ন হয়। ক্রমশঃ শুষ্ক হইতেছে। উৎকৃষ্ট আমন ধান জন্মে।

কাজিডাঙ্গা গ্রা, চুঁচুড়া, লো ৩,৩২৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ক্যানিং থা, ২৪-পরগনা সদর ম, আ ৩৪৬, লো ১,৮৮,২১৬ ; ঘ ৫৪৪।

ক্যানিং শ, থানা ঐ, কলিকাতাব ২৭ মা দ-পূ মাতলা নদীর তীরে, রেল সীমান্ত, চাউল কল ; চাউল, ডাল, মাছ ও কাঠের ব্যবসায় ; কলিকাতার সহকারী বন্দররূপে প্রথম পরিকল্পিত ; এখন সুন্দরবনের ভূমি কর্ষণাধীনে আনয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট, অপর নাম মাতলা, লো ৭,৮৩৬ ; নারী ৬৮৮।

কার্তিকখালী গ্রা, খেজবী, লো ৩,৯১৩ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কার্তিকা রায়ডাক চা-বাগান গ্রা, কুমারগ্রাম, লো ৪,৮৮১।

কাবিলপুর গ্রা, সাগরদীঘি, লো ৩,৪৩১ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কালিগঞ্জ থা, নদীয়া সদর, আ ১২৪, লো ৭৭,৩০৫ ; ঘ ৬২৩।

কালিন্দী নং, ইচ্ছামতী দ্রঃ।

কালিনদী নং, ইচ্ছামতী দ্রঃ।

কালিম্পং ম, দার্জিলিঙ জে, আ ৪০৮, লো ৯৩,৪৪১ ; ঘ ২২৯।

কালিম্পং থা, মহকুমা ঐ, আ ২৩৫, লো ৭৬,৪৬৩ ; ঘ ৩২৫।

কালিম্পং শ, থানা ঐ, দার্জিলিঙের ১৩ মা পূ, তিস্তার তীরে, সিকিম ও তিব্বতের পথের প্রবেশদ্বার, তিব্বতীয় পণ্যের কেন্দ্র, হস্তশিল্প ও বয়ন কেন্দ্র, সিঙ্কোনা বাগান ৬ মা উ-পূ, ৪ মা দ-প গিলখোলায় রেলস্টেশন, আ ৪, লো ১৬,৬৭৭ ; নারী ৮১১ ; বৃষ্টিপাত ৮৬ ইঞ্চি, জানুয়ারিতে গড় তাপ ৫৯° ফা।

কালিম্পং খাসমহল গ্রা, কালিম্পং, লো ৩,৫৭৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

কালিয়াগঞ্জ থা, রায়গঞ্জ ম, আ ১২০, লো ৬৭,৩৬৬ ; ঘ ৫৬০।

কালিয়াচক থা, মালদহ সদর ম, আ ২০৭, লো ২,২৬,১৮৪ ; ঘ ১,০৯২। শহর নাই। বহিরাগত প্রধান ; মুর্শিদাবাদ জেলার শেরশাবাদিয়া মুসলমানদিগকে যেন উঠাইয়া আনিয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে।

কাশিমবাজার গ্রা, বহরমপুর টাউন, লো ৩,৬৫৫ ; ডাকঘর, ডিসপেনসারী।

কাশিয়াডাঙ্গা গ্রা, রঘুনাথগঞ্জ, লো ৩,৫৮১।

কার্শিয়াং ম, দার্জিলিঙ জে, আ ১৬৪, লো ৬৫,৭১৩ ; ঘ ৩৯২।

কার্শিয়াং থা, মহকুমা ঐ, আ ১২৭, লো ৪৯,৫৭৭ ; ঘ ৩৯২।

কার্শিয়াং শ, থানা ঐ, স্বাস্থ্যনিবাস, রেলের শহর ; চা, চাউল, ভুট্টা, কমলালেবু, পাটের ব্যবসায় ; চা প্রস্তুত ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ; ১৮৫৬ সনে প্রথম চা-বাগান, লো ১১,৭১৯, নারী ৮৩৫।

কালীঘাই নং, মেদিনীপুর, কাঁসাইর দক্ষিণের শাখা দ-পূ ও দ যাইয়া মিলিত হইবার পর হলদি নামে দ-পূ প্রবাহিত হইয়া হুগলীতে পতিত হইয়াছে।

কান্দী ম, মুর্শিদাবাদ জে, আ ৪৫৪, লো ৩,৪৫,৬৮১ ; ঘ ৭৬১।

কান্দী থা, মহকুমা ঐ, আ ৯২, লো ৭১,৪৩৬ ; ঘ ৭৭৬।

কান্দী শ, থানা ঐ, বহরমপুরের ১৭ মা প দ-প, তামা পিতল, কাঁসার বাসন প্রস্তুত ; চাউল, ডাল, সরিষা, পাটের ব্যবসায় ; লো ১৫,২২০, নারী ৯২৪।

কালীনগর গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ৩,৩০২ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কাজোড়া গ্রা, অন্ডাল, লো ১১,৫৯১, ডাকঘর ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কাটোয়া ম, বর্ধমান জে, আ ৪০৯, লো ৩,১৪,৫৯৪ ; ঘ ৭৬৯।

কাটোয়া থা, মহকুমা ঐ, আ ১৩১, লো ১,২৮,১৯৩ ; ঘ ৯৭৬।

কাটোয়া শ, থানা ঐ, ভাগীরথীর তীরে, অজয়ের মোহনায়, বর্ধমানের ৩৩ মা উ উ-পূ, সারা বৎসর স্টীমার যাতায়াত করিত ; ভাগীরথীতে বালি পড়ায় ও রেলপথেব দরুন ব্যবসায়ের প্রাধান্য হ্রাস, রেলের কর্মশালা, চাউলকল, চাউল, পাট, ছোলা, ও আখের ব্যবসায়, চৈতন্যদেব এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ; লো ১৫,৫৩৩ ; নারী ৮৯৭।

কিসমত ইমাদপুর গ্রা, হরিহরপাড়া, লো ৩,৪১৪।

কিসমৎ রাজকুল গ্রা, ভগবানপুর, লো ৫,৬৭৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কুকিম টী স্টেট গ্রা, মিরিক, লো ৩,৭৬৮।

কুকুরজান গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৩,২৩৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কুন্তী নং, হুগলী জেলায় সলিমাবাদের নিকট দামোদর হইতে বহির্গত, দ-পূ ও পূ, উ-পূ, বেহুলার সহিত মিলনের পর হুগলি নদীতে ; উত্তরমুখো হইবার পূর্ব পর্যন্ত নাম কাণা নদী ; শেষ কয়েক মাইলের নাম মগরা খাল।

কুমাড়াখালী গ্রা, ক্যানিং, লো ৩,৪৭৬ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কুমড়াপাড়া গ্রা, মথুরাপুর, লো ৩,১০০।

কুমারগঞ্জ থা, বালুরঘাট ম, আ ১১১, লো ৫৫,৯০৫ ; ঘ ৫০৫।

কুমারগ্রাম থা, আলিপুরদুয়ার্স ম, আ ১৯৫, লো ৪৮,৫৬৩ ; ঘ ২৪৯।

কুমিরমোড়া গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৩,৮৩৭ ; হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কুমীরমারি গ্রা, সন্দেশখালি, লো ৬,১০৬ ; প্রাথমিক স্কুল।

কুলী গ্রা, ফরাক্কা, লো ৮,৩৮৯ ; হাইস্কুল।

কুল্টি থা, আসানসোল ম, আ ৩২, লো ১,২২,২১২ ; ঘ ৩,৭৬০। শিল্পাঞ্চল ; কুল্টি, বরাকর, নিয়ামৎপুর ও দিশেরগড় শিল্প-শহর এই থানার অন্তর্গত।

কুল্টি শ, থানা ঐ, দামোদর উপত্যকার রানীগঞ্জ কয়লার খান অঞ্চলে, আসানসোলের ৯ মা প উ-প ; লৌহ ও ইস্পাতের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র, ইট ও টালি উৎপাদন ; লো ৩১,৩৬৩ ; নারী ৬৮৭।

কুলপী থা, ডায়মন্ডহারবার ম, আ ১২৩, লো ১,৪০,১৮৭ ; ঘ ১,১৩৬ ; শহরবিহীন।

কুশমান্দী থা, রায়গঞ্জ ম, আ ১৮৬, লো ৫৬,৩১৪ ; ঘ ৪৭০।

কৃষ্ণগঞ্জ থা, নদিয়ার সদর ম, আ ৫৮, লো ৩৮,৬৯৬ ; ঘ ৬৬৩।

কৃষ্ণদেবপুর গ্রা, কালনা, লো ৪,১০৯ ; ডিসপেনসারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগর গ্রা, মহেশতলা, লো ৩,৩৮৪ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগর থা, নদিয়ার সদর ম, আ ১৩৮, লো ১,৫৭,৯৮১ ; ঘ ১,১৪১।

কৃষ্ণনগর শ, থানা ঐ, কলিকাতার ৫৫ মা উ, জলঙ্গীর তীরে নদিয়ার সদর, বাণিজ্য কেন্দ্র (চাউল, পাট, তিসি, আখ, গম), পুতুল বিখ্যাত ; চিনির কল, লো ৫০,০৪২ ; নারী ৮৮৪, পূর্বে রাজ্যের সাহিত্য ও সমাজে বিশিষ্ট স্থান।

কৃষ্ণনগর গ্রা, জঙ্গীপাড়া, লো ৩,৬২৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুল।

কৃষ্ণপুর গ্রা, রাজারহাট, লো ৩,৬৭৪।

কৃষ্ণপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৪,১৭২ ; প্রাথমিক স্কুল ২।

কৃষ্ণপুর গ্রা, লালগোলা, লো ৪,৩৮৯।

কৃষ্ণপুর দিনুরপাড়া গ্রা, লালগোলা, লো ৩,২২৯।

কৃষ্ণরামপুর গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৩,৬৯৪ ; প্রাথমিক স্কুল ২।

কেতুগ্রাম থা, কাটোয়া ম, আ ১৩৭, লো ৯৭,৫৩০, ঘ ৭১১।

কেতুগ্রাম গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,২৩৩ ; ডিসপেনসারী, হাইস্কুল, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কেন্দা গ্রা, জামুরিয়া, লো ৩,১৬৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কেন্দুলী গ্রা, ইলামবাজার, কবি জয়দেবের জন্মস্থান।

কেন্দ্রা খোট্টাডি গ্রা, অণ্ডাল, লো ৩,৬৩৫ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কেশবপুর গ্রা, ডোমজুড়, লো ৩,৯৮৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩।

কেশবপুর গ্রা, আরামবাগ, লো ৩,৯৫০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, হাইস্কুল, ডিসপেনসারী ও ডাকঘর।

কেশপুর থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১৮৬, লো ৮৫,৮৫৬ ; ঘ ৪৬২।

কেশিয়াড়ী থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১১৪, লো ৪৩,৬৭৬ ; ঘ ৩৮১।

কোগ্রাম বা উজানি গ্রা, মঙ্গলকোট, 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা লোচন দাসের জন্মস্থান, পিরামিডের আকারে ক্ষুদ্রাকার তাঁহার সমাধিস্থল, লো ৩৪৮।

কোচবিহার জে, পূর্বে দেশীয় রাজ্য, জানুয়ারী ১৯৫০ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, উত্তর ও পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে ও দক্ষিণে পাকিস্তান, মৃত্তিকা প্রচুর বালি মিশ্রিত পলিদ্বারা গঠিত ; তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা জেলার জল নিকাশ করে, আ ১,৩৩৪ ব, মা, লো ৬,৭১,১৫৮ ; ঘ ৫০৭, কৃষিজাত দ্রব্য ধান, পাট, তামাক, তৈলবীজ, আখ, ডাল ; বাঁশ বিস্তর, শিশু ও সুপারি বৃক্ষ জন্মে, বৃষ্টিপাত ১৪৫ ই, শতকরা ৮০ জনের বেশী লোকের উপজীবিকা কৃষি।

কোচবিহার সদর ম, জেলা ঐ, আ ২৮৫, লো ১,৭১,৮৬৫ ; ঘ ৬০৩।

কোচবিহার থা, মহকুমা ঐ, আ ২৮৫, লো ১,৭১,৮৬৫ ; ঘ ৬০৩।

কোচবিহার শ, থানা ঐ, জেলার সদর, দার্জিলিঙ হইতে ৮৮ মাইল, নারী ৭১৯, লো ৩৩,২৪২ ; প্লাইউডের কল, ব্যবসায় কেন্দ্র, প্রথম শ্রেণীর কলেজ।

কোতরং শ, উত্তরপাড়া, কলিকাতার ৮ মা উ হুগলির পশ্চিম তীরে শিল্প শহর ; ইট, টালি, দড়ি উৎপাদন ; লো ১৪,১৭৭ ; উদ্বাস্তু ১,৯৯৫ ; নারী ৬৮১।

কোতুলপুর থা, বিষ্ণুপুর ম, আ ৯৭, লো ৫৪,৩৭৪ ; ঘ ৫৬২। বহু মুসলমানের বাস।

কোদালিয়া গ্রা, চব্বিশপরগনা জে, সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভূমি।

কোনার নং, ধানবাদের প্রায় ৩৫ মা প কোনার ও বোকারোর মিলিত ধারা দামোদরে পড়িয়াছে। দামোদর পরিকল্পনায় ইহার উপর দুইটি বাঁধের প্রস্তাব হইয়াছে। কোনার বাঁধ প্রায় সমাপ্ত ; কোনার ৬০ মা দীর্ঘ।

কোন্নগর শ, উত্তরপাড়া, কলিকাতার ৯ মা উ, রাসায়নিক শিল্প, কাচ ; কার্পাস ও পাটের কল, মদ চোলাই, লো ২০,২৩৩ ; উদ্বাস্তু ২,৪৭৩ ; নারী ৬১২।

কোলড়া গ্রা, ডোমজুড়, লো ৬,৬৮১, ডাকঘর ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩।

কোতলা গ্রা, মথুরাপুব, লো ৫,২৭৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

খণ্ডঘোষ থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১০০, লো ৬০,০৯৫ ; ঘ ৫৯৮।

খরার শ, ঘাটাল থা, লো ৫,০২৩ ; নারী ৯৫৮ ; এক সময়ে কাঁসার বাসন নির্মাণের সুনিয়ন্ত্রিত বড় কারখানা ছিল। শহরের প্রায় অর্ধাংশ লোক কাঁসারী ছিল।

খলিসানী গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ৩,৭৯৪, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

খয়রামারি গ্রা, জলঙ্গী, লো ৩,৭৯০ ; ডিসপেনসারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খয়রাশোল থা, বীরভূম সদর ম, আ ১০৬ ; লো ৬১,৫৫৩, ঘ ৫৮৩।

খড়গপুর টাউন ন, থানা ঐ, মেদিনীপুর হইতে ৬ মা, বেলেব বৃহৎ কর্মশালা, ভাবতীয় কারিগরি বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকব, বিভিন্ন বাজ্যের বহু জাতির লোকেব সমাবেশ, আ ১৩, লো ১,২৯,৬৩৬ ; নাবী ৯০৯।

খড়গপুর লোক্যাল থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ২১৪, লো ৯৫,৭২২ ; ঘ ৪৪৬।

খড়গ্রাম গ্রা, খাড়গ্রাম, লো ৩,৪২০ ; ডাকঘর, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী।

খড়দহ থা, বারাকপুব ম, আ ২১, লো ৮১,৪৬৪ ; ঘ ৩,৮৬১।

খড়দহ শ, থানা ঐ, হুগলি তীরে, কলিকাতার ১১ মা উ, পাট-শিল্পকেন্দ্র, বাসায়নিক দ্রব্য, কাঠের কাজ, বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান, আ ৪, লো ১৮,৫২৪ ; উদ্বাস্তু ৪,৮২৬ ; নারী ৭৩৫।

খর্‌বা থা, মালদহ সদর ম, আ ১৪২, লো ১,০০,৪৯৮, ঘ ৭০৭।

খড়িবাড়ী থা, শিলিগুড়ি ম, আ ৭৮, লো ২৪,৮৭৬ ; ঘ ৩১৭।

খড়িয়া গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৯,৮৭৯, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮।

খাগড়াবাড়ী গ্রা, কোচবিহার, লো ৩,৬০২ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খাটাঙ্গা গ্রা, সিউড়ির ৫ মা উ-প, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সেতুবাঁধ।

খাতরা শ, থানা ঐ, বাঁকুড়ার ২২ মা দ-প ; গালার ব্যবসায় কেন্দ্র; চাউল, ভুট্টা, গমের ব্যবসায়, নিকটে বিস্তৃত অঞ্চলে গালা উৎপাদন, লো ৪,১২৭ ; নারী ৯২৭।

খাতরা থা, বাঁকুড়া সদব ম, আ ১৬৬, লো ৮৪,০২০ ; ঘ ৫০৫।

খানাকুল থা, আরামবাগ ম, আ ১১৩, লো ১,৩০,০৯৭ ; ঘ ১,১৪৭।

খামারদিয়াড়া গ্রা, ভগবানগোলা, লো ৩,৫৬৩।

খাড়গ্রাম থা, কান্দী ম, আ ১২২, লো ৮১.৯০২ ; ঘ ৬৬৯।

খাড়ী গ্রা, মধুবাপুর, লো ৮,৬৮৫।

খিদিরপুর, কলিকাতাব কেন্দ্র হইতে ২ ৫ মা ; কলিকাতার বন্দরের প্রধান পোতাশ্রয়, রেলের কর্মশালা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, করাতকল, হোসিয়ারী।

খুসড়ীপাড়া গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৩,১২১।

খেজরী থা, থা, কাঁথি ম, আ ১৬৫, লো ৯২,৪৩৯ ; ঘ ৫৬১। অপর নাম খাজুরী। রসুলপুর নদীর পূর্ব পার্শ্বে ; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশিষ্ট বন্দর।

খোলতা গ্রা, কোচবিহার, লো ৩,১১৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খাঁটোরা গ্রা, ডোমজুড়, লো ৩,০৪৬ ; ডিসপেনসারী, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

ক্ষিরগ্রাম গ্রা, মঙ্গলকোট, পীঠস্থান, লো ১,৪৬১।

ক্ষীরপাই শ, চন্দ্রকোণা থা, মেদিনীপুরের ২৭ মা উ-পু, চাউল ও ডালের ব্যবসায় কেন্দ্র, আ ৪, লো ৪,২৪৬। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রবয়নের জন্য প্রসিদ্ধ। কার্পাস ও রেশম উভয় প্রকারের বস্ত্র বয়ন করা হইত। ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও ফরাসীদের কুঠী এখানে ছিল। ডাচেরাও কাপড়ের জন্য লোক প্রেরণ করিত।

গঙ্গা নং, বাজমহল পাহাড় হইতে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিবিয়া মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলাব উত্তর ও উত্তব পূর্ব সীমা দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। মুর্শিদাবাদের উত্তর-পূর্ব দিক হইতে গঙ্গার নাম হইয়াছে পদ্মা। ভাঙ্গা-গড়া গঙ্গার নিত্যকর্ম।

গঙ্গাজলঘাটী থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১৪৩, লো ৭০,৮১৭ ; ঘ ৪৯৪।

গঙ্গাজলঘাটী গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,২৩৮ ; ডিসপেনসারী, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গঙ্গারামপুর থা, বালুরঘাট ম, আ ১২৭, লো ৬১,৩০৭ ; ঘ ৪৮৩।

গদাই মহারাজাপুর গ্রা, রাতুয়া, লো ৩,২১৯।

গণেশপুর গ্রা, কাকদ্বীপ, লো ৪,৫৮৪ ; হাসপাতাল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গন্ধেশ্বরী নং, দ্বারকেশ্বরের উপনদী, বাঁকুড়া শহরের ঠিক পূর্বে দ্বারকেশ্বরে পড়িয়াছে।

গর দেওয়ানী গ্রা, জয়নগর, লো ৬,৪৮৮।

গরীবপুর গ্রা, ডোমকাল, লো ৩,৯১৯ ; হাসপাতাল, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গরুবাথান থা, কালিম্পং ম, আ ১৭২ ; লো ১৬,৯৭৮ ; ঘ ৯৮।

গল্‌সী থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৮৪ ; লো ১,০৭,০০১ ; ঘ ৫৮২। হাইস্কুল, ডাকঘর, পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও প্রাইমারী স্কুল।

গড়ইমারী গ্রা, ডোমকাল, লো ৭,৮৬৩, পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গড়ক্ষা গ্রা, টালিগঞ্জ, লো ৫,২৬১ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গড়বেতা থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ৪০৮, লো ১,৫০,১১৫ ; ঘ ৩৬৮। জঙ্গল মহালের অন্তর্গত।

গড়বেতা শ, থানা ঐ, আ ২, লো ৪,৮০৬।

গড়ালবাড়ী গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৬,৩২১ ; ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

গাইঘাটা থা, বনগাঁ ম, আ ৯৪, লো ৫৬,৫৫৮ ; ঘ ৬০২। বঙ্গবিভাগের পূর্বে যশোহর জেলায় ছিল।

গাজল থা, মালদহ সদর ম, আ ১৯৮, লো ৭৩,১৭১ ; ঘ ৩৬৯।

গার্ডেন রীচ ন, মেটিয়াবুরুজ থা, হুগলীর তীরে, কলিকাতার ৪ মা প দ প, চটকল, তুলার কল, তুলার বীজ ছাড়ানো, গাঁট বাঁধা, চামড়া কষা, বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ; পূর্বাঞ্চলে কিং জর্জ ডক (১৯২৮), জলভাগ ১৯০ একর, গভীরতা ৫৬ ফুট, ৩৫টি জাহাজ থাকিবার ব্যবস্থা ; শুল্ক ডক, আ ৩, লো ১,০৯,১৬০ ; উদ্বাস্তু ২,৯৯৪ ; নারী ৬৪৮।

গলসী গ্রা, গলসী, লো ৪,০৪০।

গাড়ুলিয়া শ, নোয়াপাড়া থা, হুগলির তীরে, কলিকাতার ৩০ মা উ ; পাট ও কার্পাস শিল্প ; লৌহ ও ইস্পাতের পাত ইত্যাদি প্রস্তুত, আ ১·৫, লো ২৮,৩০৪।

গ্যাংটক শ, দার্জিলিঙের ২৮ মা উ-পূ, সিকিমের রাজধানী, উচ্চতা ৫,৭০০ ফুট, নিম্নতম গড় তাপ জানুয়ারি ৩৬° ফাঃ, জুলাই ৫৯°, বৃষ্টিপাত ১৩৭ ই, ভুট্টা, চাউল, ডাল কমলার ব্যবসায়, লো ২,৭৪৪ ; নারী ৬৮৬।

গিলার ছাট গ্রা, মথুরাপুর, লো ৮,৫৩৯ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গিরিয়া গ্রা, রঘুনাথগঞ্জ, লো ৫,৮১৫ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গুসকরা গ্রা, আউশগ্রাম, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লকের নামকরণ এই গ্রামের নাম হইতে, লো ৪,৫৩৪। হাইস্কুল, ডিসপেনসারী, প্রাইমারী স্কুল ২।

গেন্দ্রাপাড়া চা বাগান গ্রা, ধূপগুড়ি, লো ৩,১৯৩।

গোকর্ণ গ্রা, কান্দী, লো ৩,৬৮৪ ; হাইস্কুল, ডাকঘর, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গোঘাট থা, আরামবাগ ম, আ ১৪৫, লো ৮৬,৬৩৯ ; ঘ ৫৯৬।

গোপজান গ্রা, বহরমপুর টাউন, লো ৩,২২৯।

গোপালনগর গ্রা, সিঙ্গুর, লো ৪,৫৩৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

গোপালপুর গ্রা, কাঁকসা, লো ৩,৫৬২ ; ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল।

গোপালপুর গ্রা, মানিকচক, লো ৪,২২৮।

গোপালপুর গ্রা, হাড়োয়া, লো ৪,১৭০ ; হাসপাতাল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

গোপালপুর গ্রা, কোচবিহার, লো ৩,৫৯৭।

গোপীবল্লভপুর থা, ঝাড়গ্রাম ম, আ ১৮৫, লো ৮৯,৯১৬ ; ঘ ৪৮৬।

গোপীনাথপুর গ্রা, ফরিদপুর, লো ৪,৮৪৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গোবরডাঙ্গা শ, হাবড়া থা, ইছামতীর তীরে, কলিকাতার ৩৪ মা উ-পূ ; চাউল, পাট, ডাল, সুপারি, নারিকেল, আলুর ব্যবসায় ; লো ৬,৫১৯।

গোবিন্দপুর গ্রা, জগৎবল্লভপুর, লো ৩,৪৮৫।

গোবিন্দপুর গ্রা, হাঁসখালী, লো ৩,১৪৮।

গোলাপগঞ্জ গ্রা, কালিয়াচক, লো ৪,০৭০ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল।

গোলেনহাটী গ্রা, শীতলকুচি, লো ৩,৮৮৬ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

গোসাবা, পোর্ট ক্যানিং হইতে ১৪ মা দ-পূ, সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমি কর্ষণাধীনে আনয়নের আদর্শ পরিকল্পনার রূপ দিবার চেষ্টা চলিতেছিল।

গৌরহাটি বা গরুটি হুগলির তীরে চন্দনগরের দক্ষিণের উপকণ্ঠ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসী ব্যবসায়ের স্থান, চটকল।

গৌরহাটী গ্রা, আরামবাগ, লো ৩,৭৭৯ ; ডিসপেনসারী, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

গৌরীপুর নৈহাটীর শহরতলি, রং তৈয়ারি হয়।

গৌড় মালদহ জেলায়, প্রাচীন বাংলার রাজধানী।

ঘাটাল ম, মেদিনীপুর জে, আ ৩৬৮, লো ৩,১১,৩৮২ ; ঘ ৮৪৫।

ঘাটাল থা, মহকুমা ঐ, আ ৯০, লো ৮৪,৬৭০ ; ঘ ৯৪৩।

ঘাটাল শ, থানা ঐ, শিলাবতীর তীরে, সূতীর কাপড়, তসর, কাঁসা ও মাটির বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, ডাচদের কুঠি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তিন জন বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট এখানে ছিল, ডাচদের কুঠিতেই এখন মহকুমার কাছারি, লো ১৬,১২৫, নারী ৮৮৭।

ঘোষপুর গ্রা, খানাকুল, লো ৪,৭৮১ ; ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঘোড়াদল গ্রা, মথুরাপুর, লো ৩,১০৬ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

চক আলামপুর গ্রা, বজবজ, লো ৩,৩৩৮।

চক চণ্ডাল গ্রা, মহেশতলা, লো ৩,০০৯।

চক হাঁসপুকুরিয়া গ্রা, তেহট্ট, লো ৩,১২৭।

চটা কালিকাপুর গ্রা, মহেশতলা, লো ৪,০৯৭ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল।

চণ্ডী গ্রা, বিষ্ণুপুর(চ) লো ৩,৯৯৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয়।

চণ্ডীতলা থা, শ্রীরামপুর ম, আ ৬৩, লো ১,২৮,৯১২ ; ঘ ২,০৪৩।

চন্দননগর, হুগলির তীরে, কলিকাতা হইতে ২১ মা উ, পাটশিল্প, ফরাসী অধিকারে ছিল। ১৯৪৯ সনের গণভোটের ফলে ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। আ ৩·৯ ; লো ৪৯,৯০৯।

চন্দ্রকোণা শ, থানা ঐ, মেদিনীপুরের ২৫ মা উ উ-পূ শিলাইর তীরে, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতিশীল স্থান ; রেশম বয়ন ; কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর বাসনাদি প্রস্তুত ; চাউল, গম ও ডালের ব্যবসায় ; লো ৫,৭১৭, নারী ৯৫৮।

চন্দ্রকোণা থা, ঘাটাল ম, আ ১৫১, লো ৮৬,৩৭৩ ; ঘ ৫৭৩।

চব্বিশপরগনা জে, পশ্চিমবঙ্গের সর্ব দক্ষিণের জেলা। পশ্চিমে হুগলি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে নদিয়া ও পাকিস্তান, পূর্বে পাকিস্তান। দক্ষিণ প্রান্তে করাতের দাঁতের মত বহু খাড়ি ও অর্ধ গঠিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। খাড়ির মধ্যে সমুদ্রের জোয়ার প্রবেশ করে। দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া সুন্দরবন। জেলার কোন কোন স্থানের পলিস্তর সহস্রাধিক ফুট গভীর। আয়তন ৫,২৯৩ বর্গ মাইল। রাজ্যের বৃহত্তম জেলা। লোক ৪৬,০৯,৩০৯। ভারতের সর্বাধিক জনবহুল জেলা। রাজ্যের সর্বাধিক উদ্বাস্তুর সমাবেশ। ঘনতা ৮৭০·৮৩। লক্ষাধিক লোকের বসতিপূর্ণ নগর টালিগঞ্জ, সাউথ সুবার্বন, গার্ডেনরীচ ও ভাটপাড়া এই জেলার অন্তর্গত। জেলার সদর কলিকাতার আলিপুরে অবস্থিত। কর্ষণাধীন ভূমির প্রায় ৮০ শতাংশে আমন ধান জন্মে। বিপুলভাবে শিল্পায়িত।

চব্বিশপরগনা সদর ম, চব্বিশপরগনা জে, আ ১,১০৭ ; লো ১৫,১৩,৯৪৮ ; ঘ ১,৩৬৮।

চরাবিদ্যার আবাদ গ্রা, ক্যানিং, লো ৩,৭৪১।

চারি অনন্তপুর গ্রা, কালিযাচক, লো ৬,৬৬৬।

চাঁইপাট গ্রা, দাশপুর, লো ৬,২০৪।

চাউলজা গ্রা, ময়ূরেশ্বর, লো ৩,৩৬৪।

চাকদহ থা, রানাঘাট ম, আ ১২৬, লো ১,১৭,৪৯৫ ; ঘ ৯৩৪।

চাকদহ শ, থানা ঐ, কলিকাতার ৩৬ মা উ উ-পূ ; চাউল, পাট, তিসি, আখ, ও গমের ব্যবসায় ; আ ৪, লো ১৫,৩৭২।

চাঁদপুর গ্রা, নঁওদা, লো ৩,৪২১।

চাঁপাডাঙ্গা গ্রা, তারকেশ্বর, লো ৩,৯০৮।

চাঁপদানী শ, ভদ্রেশ্বর, হুগলি নদীর তীরে, হুগলি শহরের ৮ মা দ দ-প। পাট শিল্পকেন্দ্র ; আ ২·৫, লো ৩১,৫৪৩ ; উদ্বাস্তু ৪৬২, নারী ৭০২।

চাপড়া থা, নদিয়ার সদর ম, আ ১৩১, লো ৭৭,৬৭৫ ; ঘ ৫৯৪।

চিত্তরঞ্জন শ, সালানপুর থানার উ-পূ, বিহার রাজ্যের সংলগ্ন। সুপারকল্পিত শিল্প-শহর। চলিষ্ণু ইঞ্জিন নির্মাণেব কারখানা, শহরের মধ্যস্থলে ইস্পাতের কারখানা ; ১৯৪৮ সনে স্থাপিত, ১৯৫৩ সনের জানুয়ারিতে ১০০ ইঞ্জিন নির্মাণ সমাপ্ত। লো ১৬,১৬২ ; নারী ৪২৬।

চিনাকুঁড়ি গ্রা, কুলিট, লো ৩,৫২৭।

চিংড়া গ্রা, থানাকুল, লো ৩,৮৪২।

চুঁচুড়া থা, হুগলির সদর ম, আ ১৫, লো ৭০,৬০১ ; ঘ ৪,৮৬৯।

চুয়াপাড়া চা বাগান গ্রা, কালচিনি, লো ৩,৮২৩।

চুরুলিয়া গ্রা, জামুরিয়া, কবি নজরুলের জন্মস্থান, হাওড়া হইতে ১৩৭ মা জি টি রোডের উপর ; রাজা নরোত্তমের প্রস্তর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ; মুসলমান বসতি, লো ৩,১৩৩।

চুংথাং টী স্টেট গ্রা, পুলবাজার, লো ৩,২০৮।

চেঙ্গমারী চা বাগান গ্রা, নগরাকাটা, লো ৪,৯১২।

চেঙ্গাইল গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ১৩,৭৬৭।

চোয়া গ্রা, হরিহরপাড়া, লো ৩,০৯০।

ছাতনা থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১৭৩, লো ৮৯,১৮২ ; ঘ ৫১৬।

ছেন্দাপাথর গ্রা, রানীবাঁধ, এখানে উলফ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ছোট মোল্লাখালী গ্রা, সন্দেশখালী, লো ৪,০৩৮।

ছোড়া গ্রা, অন্ডাল, লো ৪,৫০১।

জগাছা থা, হাওড়া সদর, ম, আ ৭, লো ৩৩,৮৩৮ ; ঘ ৪,৯০৪।

জগাছা গ্রা, থানা ঐ, লো ৫,৫৬৬।

জঙ্গীপুর ম, মুর্শিদাবাদ জে, আ ৪৩৭ , লো ৭১,৪৩৮ ; ঘ ৯৮৮।

জঙ্গীপুর শ, রঘুনাথগঞ্জ, ভাগীরথীর তীরে, বহরমপুরের ২৮ মা উ উ-প, কোম্পানির প্রথম যুগে প্রধান রেশম কেন্দ্র, বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট ছিল, কার্পাস বস্ত্র বয়ন, চাউল, ডাল, তৈলবীজ, পাট ও যবের ব্যবসায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেশম ব্যবসায় কেন্দ্র, নিকটেই বিস্তৃত অঞ্চলে রেশম উৎপাদন, আ ৩, লো ১৮,২৫৫ ; নারী ১,০১৫।

জঙ্গীপাড়া থা, শ্রীরামপুর ম, আ ৬৩, লো ৭১,৪৩৮ ; য ১,১২৯।

জগতাই গ্রা, সুতী, লো ৩,০৫১।

জগদ্দল গ্রা, সোনারপুর, লো ৩,০৩০।

জগদ্দল থা, বারাকপুর ম, আ ২৩, লো ১,৫২,৬২৪ ; ঘ ৬,৭৫৩। শিল্প-থানা, ভাটপাড়া নগর এই থানার অন্তর্গত।

জগৎবল্লভপুর থা, হাওড়া সদর ম, আ ৪৯, লো ৭৮,৯৯৫ ; ঘ ১,৫৯৬।

জগন্নাথনগর গ্রা, মহেশতলা, লো ৫,১৯৭।

জঙ্গলপাড়া গ্রা, পুরশুড়া, লো ৩,২০০।

জঙ্গলমহাল, মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার গড়বেতা ও শালবনী থানার একত্র নাম।

জগদীশপুর গ্রা, বালী, লো ৩,১২২।

জয়নগর থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, আ ২৮০, লো ১,৯৬,০৪৭ ; ঘ ৭০১।

জয়নগর-মজিলপুর শ, জয়নগর থা, লো ১৩,৩৫৫।

জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়ার ৮ মা উ উ-পূ, হিমালয়ের পাদদেশে রেল সীমান্ত।

জয়পুর থা, বিষ্ণুপুর ম, আ ১০১, লো ৫২,৩৫৯ ; ঘ ৫১৯।

জয়পুর গ্রা, আমতা, লো ৪,০৪৯।

জলঢাকা নং, গ্যাংটকের ১৫ মা পূ দ-পূ, সিকিমের হিমালয়ে উৎপন্ন। দ, দ দ-পূ গতি, মাথাভাঙ্গা পার হইয়া পাকিস্তানের কুড়িগ্রাম, অবশেষে ব্রহ্মপুত্র প্রায় ১৪৫ মা।

জলঙ্গী নং, রাজসাহীর ১৪ মা দ দ-পূ, পদ্মা হইতে বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদে ও নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগর পর্যন্ত দ এবং তথা হইতে প, নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেছে। জলঙ্গীর সংগমস্থল হইতে ভাগীরথীর নাম হুগলি। প্রায় ১২০ মা ; উপনদী যমুনা বা ইচ্ছামতী।

জলঙ্গী থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ৮৬, লো ৫৫,০৪০ ; ঘ ৬৪১।

জনাই গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৫,৯৩৯।

জলপাইগুড়ি জে, রাজ্যের উ-পূ সীমান্তস্থিত জেলা। উত্তরে কালিম্পং ও ভুটানের পাদশৈল। কয়েকটি গিরিপথ দ্বারা পর্বত খণ্ডিত। পূর্বে আসাম, দক্ষিণে কোচবিহার ও পাকিস্তান, পশ্চিমে দার্জিলিঙ জেলা। পাঁচটি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নদীর পরিত্যক্ত ও বর্তমান খাতে জেলা চিহ্নিত। তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা জলনিকাশের প্রধান নদীপথ। ভূমির অধিকাংশ পলিগঠিত ; মিশ্র বালি হইতে উত্তম মৃত্তিকা পর্যন্ত দেখা যায়। চা, ধান, পাট, তামাক, আখ, আলু, তৈলবীজ উৎপন্নশস্য। শাল, শিশু ও বাঁশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বাগরাকোটার নিকটে কয়লা, গাওপাতা ও অন্যান্য স্থানে লোহাপাথর ও মাটিয়ালির নিকটে বক্সায় তাম্র আকরিক ও ভুটান সীমান্তে চুনা পাথর আছে। ধান ছাটা, কাঠচেরা, চা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প। দোমোহনিতে রেলের কর্মশালা আছে। হাতী, গণ্ডার, বাঘ, মহিষাদি বন্য জন্তুর জন্য জেলা প্রসিদ্ধ। আয়তন ২.৩৭৮ ব মা ; লো ৯.১৪,৫৩৮ ; ঘ ৩৮৫।

জলপাইগুড়ি সদর ম, জেলা ঐ, আ ১,২৯৬ ; লো ৫,৪৬,১৪২ ; ঘ ৪২১।

জলপাইগুড়ি থা, মহকুমা ঐ, আ ১৮৬ ; লো ১,১৫,৪৫৯ ; ঘ ৬২২।

জলপাইগুড়ি শ, থানা ঐ, দার্জিলিঙের ৫০ মা দ-পূ। ২৬° ৩২′ উত্তর ৮৮° ৪৩′ পূ। উচ্চতা ২৭১ ফুট। বাৎসরিক গড় তাপ ৭২°, বৃষ্টিপাত ১২৯ ই। ব্যবসায় কেন্দ্র (চাউল, চা, তামাক, পাট, আলু, তেঁতুল)। কলেজ আছে। লো ৪১,২৫৯।

জলপাই গ্রা, মহিষাদল, লো ৪,৮৯৩।

জলাপাহাড়, দার্জিলিঙ শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠ, সর্বোচ্চ পাহাড় ৭,১৬০ ফু।

জাফরপুর গ্রা, বসিরহাট, লো ৩,০০৬।

জামবনী থা, ঝাড়গ্রাম ম, আ ১২৬, লো ৪৯,৫২৮ ; ঘ ৩৯৩।

জামালপুর থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১০১, লো ৮০.১০৬ ; ঘ ৭৮৯।

জামুরিয়া থা, আসানসোল ম, আ ৯১, লো ১,১১,৫৫০ ; ঘ ১,২৩১।

জামুরিয়া গ্রা, থানা ঐ, লো ১৫,৯৪০।

জালাবাড়িয়া গ্রা, জয়নগর, লো ৩,৭৩৮।

জিরাট গ্রা, বালাগড়, লো ৩,৯৫৬।

জিয়াগঞ্জ থা, লালবাগ ম, আ ২০, লো ২৯,১৩০ ; ঘ ১,৪৭৯।

জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ শ, জিয়াগঞ্জ থা, জিয়াগঞ্জ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, আজিমগঞ্জ পূর্ব তীরে, আজিমগঞ্জ বহরমপুরের ৯ মা উ, রেল জংসন। চাউল, ছোলা, তৈলবীজ, পাট ও যবের ব্যবসায়। জৈন মন্দির।

জুগদিয়া গ্রা, মগরাহাট, লো ৩,১৫৫।

জুজারসাহা গ্রা, পাঁচলা, লো ৬,৮৮৮।

জুনপুট গ্রা, কাঁথি, সমুদ্রতীরবর্তী, ডাকবাংলা আছে ; পৌষ সংক্রাতি মেলা।

জেকেনগর, আসানসোল ও রানীগঞ্জের মধ্যপথে, বিরাট এলুমিনিয়াম কারখানা।

জেমেরি গ্রা, রানীগঞ্জ, লো ৪,৮৫০।

জ্যৈষ্ঠা ভবানীপুর গ্রা, নলহাটী, লো ৩,১৬০।

জোত ঘনশ্যাম গ্রা, দাশপুর, লো ৬,৩৪৬।

জোড় বাংলো থা, দার্জিলিঙ সদর ম, আ ৫৬ ; লো ২৮,৯৪৪ ; ঘ ৫১৩।

ঝাড়গ্রাম ম, মেদিনীপুর জে, আ ১,১৮৬ ; লো ৪,৬১,৭০৩ ; ঘ ৩৮৯।

ঝাড়গ্রাম থা, মহকুমা ঐ, আ ২০৮, লো ৮০,৩৮১ ; ঘ ৩৮৬। ২১৯টি গ্রাম সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

ঝাড়গ্রাম শ, মহকুমা ঐ, স্বাস্থ্যকর স্থান ; লো ৭,৯৭৫।

ঝোড়াহাট গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৫,৮৪২।

টাইগার হিল, দার্জিলিঙের ১৩ মা দ-পূ, ৮,৪৮২ ফু।

টাকী শ, হাসনাবাদ, ইছামতীর তীরে, কলিকাতার ৩৭ মা পূ ; ধান. চাউল, পাট, ডালের ব্যবসায় ; লো ১.৪৫,৪৩৬।

টাল, মালদহ জেলায় মহানন্দা ও কালিন্দ্রীর মধ্যবর্তী নিম্নভূমি।

টালির নালা, কলিকাতা ও চব্বিশপরগনার খাল ; খিদিরপুরে হুগলি হইতে দ ও পূ ১৮ মা যাইয়া বারুইপুরের ৮ মা উ উ-পূ, বদ্বীপের নদীর শাখায় পড়িয়াছে। ১৭৭৭ সনে খোলা হইয়াছিল।

ট্যাংরা গ্রা, বনগাঁ, লো ৩,৪৮০।

টালিগঞ্জ থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, আ ২৬, লো ১.৯৪,৫৮৩ ; ঘ ৭,৬০১।

টালিগঞ্জ ন, থানা ঐ কলিকাতার ৪·৫ মা দ ; সাবান, রবারের দ্রব্যাদি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, রেশমের কল, চামড়া কষা ; পাটের গবেষণাগার (১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত)। আ ৬·৬ লো ১,৪৯,৮১৭ ; উদ্বাস্তু ৬৪,১৭৬ ; নারী ৭৮০।

টিকাসী গ্রা, খেজরী, লো ৩,৭৫০।

টিটাগড় থা, বারাকপুর ম, আ ১১, লো ১,২১,৭৯৮ ; ঘ ১০,৮৭৫।

টিটাগড় শ, থানা ঐ, কলিকাতার ১২ মা উত্তরে হুগলি নদীর তীরে, পাট ও কাগজের কল ; কাচ উৎপাদন, চা ও বয়ন যন্ত্রাদি। আ ১·২৫, লো ৭১,৬২২ ; নারী ৫৩৩।

ডাবগ্রাম গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৭,০২৭।

ডায়মন্ডহারবার ম, চব্বিশপরগনা জে, আ ১,২৬২ ; লো ৯,০১,১২০ ; ঘ ৭১৪।

ডায়মন্ডহারবার থা, মহকুমা ঐ, আ ৭৬, লো ১,১৮,৯২৩ ; ঘ ১,৭০১।

ডায়মন্ডহারবার শ, থানা ঐ, হুগলির তীরে, কলিকাতার ২৮ মা দ দ-প, রেলের সীমান্ত, চাউলের কল ; ধান, চাউল, ডাল, লংকার ব্যবসায়। কলিকাতাগামী জাহাজের শুল্ক অফিস ও পোতাশ্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অফিস। বঙ্গদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ নোঙর করিবার প্রাচীন স্থান। আ ২·৫, লো ৯,৮১৮।

ডালমোর চা বাগান গ্রা, মাদিরাহাট, লো ৪,২৩৫।

ডিঙ্গেল গ্রা, কালিগঞ্জ, লো ৫,১৫৬।

ডুমচিপাড়া চা বাগান গ্রা, মাদিরাহাট, লো ৩,৪৮১।

ডুয়ার্স (পশ্চিম), জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল। ৩,৪৩২ ব মা। পূর্ব ডুয়ার্স গোয়ালপাড়া জেলায়।

ডেবরা গা, মেদিনীপুর সদর, ম, আ ১৩২, লো ৬৯,০৯০ ; ঘ ৫২৩।

ডোমকাল থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ১১৭, লো ৮২,৮০৪ ; ঘ ৭০৫।

ডোমজুড় থা, হাওড়া সদর ম, আ ৩৮, লো ৯৮,১৬৮ ; ঘ ২,৬১১।

তপন থা, বালুরঘাট ম, আ ১৭০, লো ৭০,৬৪৪ ; ঘ ৪১৫।

তমলুক ম, মেদিনীপুর জে, আ ৭৪৯, লো ৭,৮৮,৪৩৮ ; ঘ ১,০৫৩।

তমলুক থা, মহকুমা ঐ, আ ৯৪. লো ১,৪২,০৩৮ ; ঘ ১,৫১১। একটিমাত্র শিল্পবিহীন শহর।

তমলুক শ, থানা ঐ, কলিকাতার ৩৪ মা দ-প রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে, পূর্বনাম তাম্রলিপ্ত, প্রাচীন বন্দর, তাম্র রপ্তানি হইত। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ ; সে যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষা ও বৌদ্ধ কেন্দ্র। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফা হিয়ান এখানে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের প্রতিলিপি ও মূর্তির চিত্রাঙ্কণ করেন। এই বন্দর হইতে তিনি সিংহলগামী পোতে ভারত ত্যাগ করেন (৪১৪ খৃঃ অঃ) সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি মন্দির দেখিয়াছিলেন। জলপথে ও স্থলপথে এখানে বিপুল পরিমাণে দুর্লভ ও বহুমূল্য পণ্যসম্ভার আমদানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত ও সিংহলের মধ্যে প্রায়ই জাহাজ যাতায়াত করিত। আধুনিক কালে রেশম ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লো ১৩,৫৯৯ ; নারী ৮৯৭।

তরফ রসুলপুর পাটানিপাড়া গ্রা, ডোমকাল, লো ৩,৬১৮।

তরাই (দার্জিলিঙ), শিলিগুড়ি মহকুমার সমস্ত এবং কার্সিয়াং মহকুমার পূর্বপ্রান্তের এক ফালি।

তাঁতিপাড়া গ্রা, রাজনগর, লো ৩,০০২।

তারকেশ্বর থা, শ্রীরামপুর ম, হিন্দুদের তীর্থস্থান, আ ৪৬, লো ৬১,৩৬৬ ; ঘ ১,৩২৫।

তারকেশ্বর গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,০৯২।

তালডাঙরা থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১৩৫, লো ৫০,৭৩৩ ; ঘ ৩৭৬।

তালিবপুর গ্রা, ভরতপুর, লো ৪,১০২।

তাড়দহ কাপাশ আটী গ্রা, ভাঙ্গড়, লো ৩,৫৬৬।

তিলদুড়ি গ্রা, সালতোড়া, লো ৩,৭২৩।

তিস্তা নং, সিকিমের উত্তরে হিমপ্রবাহে উৎপন্ন, দ রাংপু ও কালিম্পং, দ দ-পূ জলপাইগুড়ি শহর, মেকলিগঞ্জ পার হইয়া পূ পাকিস্তানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে।

ত্রিবেণী, হুগলি জে, পুরাতন স্থান ; এখান হইতে ভাগীরথী দক্ষিণে, সরস্বতী পশ্চিমে এবং যমুনা বা কাঁচড়াপাড়া খাল পূর্ব দিকে গিয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম মুক্তবেণী। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিত হইয়াছে, সুতরাং উহার নাম যুক্তবেণী।

তুফানগঞ্জ ম, কোচবিহার জে, আ ২২৪, লো ৯৭,৭১৩।

তুফানগঞ্জ থা, মহকুমা ঐ, আ ২২৪, লো ৯৭,৭১৩ ; ঘ ৪৩৬।

তুফানগঞ্জ শ, থানা ঐ, রায়দকের তীরে, কোচবিহারের ১৪ মা পূ। চাউল, তামাক, পাট, তৈলবীজের ব্যবসায় ; আ ০·৩৪ ; লো ২,৩১৬।

তেঁতুলিয়া গ্রা, কোতুলপুর, লো ৩,৯৯৯।

তেহট্ট থা, নদিয়ার সদর ম, আ ১৬৩ ; লো ৯০,৪০২ ; ঘ ৫৫৩।

তেহট্ট গ্রা, থানা ঐ, লো ৪,৫৬৮।

তোরসা নং, দ-পূ তিব্বতের হিমালয়ে উৎপন্ন, ভুটানের মধ্য দিয়া, দ দ-পূ, কোচবিহার শহরের পাশ দিয়া পূ-দ, পাকিস্তানের উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্রে। প্রায় ২০০ মা।

দক্ষিণ খন্ড গ্রা, অন্ডাল, লো ৩,৮৩৩।

দক্ষিণ গঙ্গারামপুর গ্রা, মথুরাপুর, লো ৩,৪২৪।

দক্ষিণ চন্ডীপুর গ্রা, মানিকচক, লো ৩,৪৩৩।

দক্ষিণ ঝাপড়াদহ শ, ডোমজুড়, লো ৩,৪৯৬।

দক্ষিণ রায়পুর গ্রা, বজবজ, লো ৩,৩০৯।

দমদম থা, বারাকপুর ম, আ ১৬, লো ৬১,৩৯১ ; ঘ ৫,৯০১।

দমদম শ, থানা ঐ, কলিকাতার ৬ মা উ-পূ, কলিকাতার বিমান বন্দর। চটকল, কাচ, দিয়াশলাই, সাবান উৎপাদন, লৌহ ও ইস্পাতের বিবিধ কারখানা ও চামড়া কষা। উনবিংশ শতাব্দীতে এখানকার অস্ত্রশালায় প্রথম দমদম কার্তুজ প্রস্তুত হয়। প্রথম হেগ কনফারেন্সে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। লো ১৪,০০২ ; নারী ৫৫২।

দরিয়াপুর গ্রা, কাঁথি, সমুদ্রোপকূলের ক্ষুদ্র গ্রাম, কপালকুণ্ডলায় উল্লেখ ; বঙ্কিম স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

দলগাঁও চা বাগান গ্রা, ফালাকাটা, লো ৩,১৭৮।

দলসিংপাড়া চা বাগান গ্রা, কালচিনি, লো ৪,৭২২।

দাঁইহাট শ, কাটোয়া, ভাগীরথীর তীরে, কালনা ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী। পূর্বে পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, নদী দূরে সরিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ের প্রাধান্য এখন আর নাই, আ ৪, লো ৮,১৪৯ ; নারী ৮৯৬।

দার্জিলিঙ জে, উত্তরে সিকিম, পশ্চিমে নেপাল, দক্ষিণে বিহার ও পাকিস্তান, পূর্বে জলপাইগুড়ি ও ভুটান। তিস্তা, মেচি, বালাসন, মহানন্দা এবং বড় ও ছোট রঙ্গীত প্রধান নদী। খনিজ দ্রব্য কয়লা, লোহা, তামা, গ্রাফাইট, চুনাপাথর। ধান, ভুট্টা, সরিষা, কলাই, পান, মারুয়া, তামাক ও পাট এবং উৎকৃষ্ট চা জন্মে। আয়তন ১,১৬০ ব মা, লো ৪,৪৫,২৬০ ; ঘ ৩৭১। রাজ্যের মধ্যে এই জেলাতেই লোক সর্বাপেক্ষা কম, প্রায় হাওড়া নগরের লোকের সমান।

দার্জিলিঙ সদর ম, দার্জিলিঙ জে, আ ৩৬১ ; লো ১,৬৯,৬৩১ ; ঘ ৪৭০।

দার্জিলিঙ থা, মহকুমা ঐ, আ ৪০, লো ৬৩,১৭১ ; ঘ ১,৫৬৪।

দার্জিলিঙ শ, থানা ঐ, কলিকাতা হইতে ৩০৫ মা উ। উচ্চতা ৭,৪৩২ ফুট। বার্ষিক গড় তাপ ৫৩ ৫, বৃষ্টিপাত ১২৬ ই। স্বাস্থ্যনিবাস ; এখান হইতে হিমালয়ের দৃশ্য মনোহর ; পাহাড়ের গায়ে চা বাগান। সিকিমের রাজার নিকট হইতে ১৮৩৫ খৃঃ ক্রীত। পরবর্তী কালে লেবং ও জলাপাহাড় পর্যন্ত শহর প্রসারিত হইয়াছে। ছিন্ন কুয়াশার ফাঁকে ৪৬ মা উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃষ্টিগোচর হয়। জলাপাহাড় ও টাইগার হিল হইতে ১০৬ মাইল উ-পূ এভারেস্ট দেখা যাইতে পারে। শহরের সর্বোচ্চ স্থান অবজারভেটারি হিলের (৭,১৬০ ফুট) গায়ে বৌদ্ধ মঠ। বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রসিদ্ধ। ৮ মা দক্ষিণে ঘুম গ্রামে ছুরি, কাঁচি, কাটারি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। আ ৪·১, লো ৩৩,৬০৫।

দাঁড়কা গ্রা, লাভপুর, লো ৩,২৫০।

দাতন থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১৭১, লো ৯০,৩৪৬ ; ঘ ৫২৯।

দানকুনি বিল হুগলি জেলায়, হুগলি নদী ও সরস্বতীর মধ্যে অবস্থিত।

দামোদর নং, লোহারডগার প্রায় ১৫ মা উ, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন। পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সীমায় আসিয়াছে। পরে পূ, দ-পূ রানীগঞ্জ ও বর্ধমানের নিকটে ; বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমা ; অকস্মাৎ দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া হুগলি ও হাওড়া জেলার উপর দিয়া কলিকাতার ২৫ মা দ-প হুগলিতে পতিত হইতেছে। প্রায় ৩৪০ মা। দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে ইহার উপর দুইটি বাঁধ নির্মিত হইবে।

দামোদর উপত্যকা, আয়তন প্রায় ৮,৫০০ ব মা ; মধ্যভাগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনি অঞ্চল (কয়লা, অভ্র), নিম্নভাগে সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল (প্রধানত ধান), গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও হাওড়া বেনারস রেলপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ সনে এই উপত্যকা উন্নয়নের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আটটি বাঁধ ও শস্যক্ষেত্রে জল বিতরণের জন্য একটি সেতুবাঁধ নির্মিত হইবে। আশি মাইল দীর্ঘ একটি নাব্য খাল কয়লার খনি অঞ্চল কলিকাতার সহিত যুক্ত করিবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র স্থাপন, প্রায় ১১,৫৬,৮৫০ একর জমিতে (বেশির ভাগ পশ্চিমবঙ্গে) জলসেচ, অরণ্য সৃষ্টি, মৎস্যের চাষ, চিত্তবিনোদন এবং সাধারণভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সকল বাঁধই বিহারে নির্মিত হইবে। দামোদরের উপর ২, বরাকরে ৩, কোনার নদীর উপর ২, বোকারো নদীতে ১। জলসেচের জন্য সেতুবাঁধ (দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ ফু, উচ্চতা ২৫ ফু) রানীগঞ্জের ১৫ মা দ-পূ, দুর্গাপুর গ্রামের নিকট দামোদরের উপর নির্মিত হইবে। বরাকর নদীর উপরের তিলাইয়া বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ সারা বৎসর পাওয়া যাইবে না। এইজন্য বোখারোতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুরের সেতুবাঁধ নির্মাণের পর বর্ধমান ও বাঁকুড়ার প্রায় ১০,২৫,৭৬২ একর জমিতে নিরবচ্ছিন্ন সেচের সুযোগ পাওয়া যাইবে। এই বাঁধের বাম দিক হইতে ১৭২ ফু প্রশস্ত ও ১২ ফু গভীর একটি খাল ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথীতে পড়িবে খাল দিয়া সারা বৎসর নৌকা ও লঞ্চ চলিতে পারিবে।

দাশপুর থা, ঘাটাল ম, আ ১২৮, লো ১,৪০,৩৩৯ ; ঘ ১,০৯৭।

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রা, মথুরাপুর, লো ৪,৭৪৬।

দিনহাটা ম, কোচবিহার জে, আ ২৭২, লো ১,৬১,০৫৪ ; ঘ ৬৫০।

দিনহাটা থা, মহকুমা ঐ, আ ২১১, লো ১,৩৭,০০০ ; ঘ ৬৫০। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

দিনহাটা শ, থানা ঐ, জলঢাকার উপনদীর তীরে, কোচবিহারের ১৩ মা দ, চাউল, পাট, তামাক, তৈলবীজ, আখের ব্যবসায়, আ ০·৫১, লো ৫,৮৪৮।

দিনহাটা গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,৯৬২।

দিয়ারা, মালদহ জেলায়, পশ্চিম ও দক্ষিণে গঙ্গার তীরবর্তী নূতন পলিতে গড়া আট কি দশ মাইল প্রশস্ত ভূমির নাম।

দিশেরগড় শ, কুল্টি থা, কুল্টির আড়াই মাইল দক্ষিণে, কয়লার খনি ; লো ৭,৮৪২।

দীঘা গ্রা, রামনগর, সমুদ্র তীরবর্তী, উন্নতিসাধনের দ্বারা স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ডাকবাংলো। পৌষ সংক্রান্তি মেলা।

দুইল্যা গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৪,২৩৪।

দুর্গাপুর গ্রা, দামোদর তীরে, রানীগঞ্জের প্রায় ১৫ মা দ-পূ। দামোদর পরিকল্পনার সেতুবাঁধ নির্মাণের স্থান ; ইট ও টালি নির্মাণ ; ধান, চাউল, গম, আলু, আখের ব্যবসায়।

দুবদা গ্রা, এগরা, লো ৩,৪৯৪।

দুবরাজপুর শ, থানা ঐ, সিউড়ির ১২ মা দ-প, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও পাথর সংগ্রহের কেন্দ্র, ধান ছাটাই, তেল ভাঙ্গা, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র ও ধাতুর বাসনাদি প্রস্তুত। ধান, চাউল, ছোলা, গম, আখের ব্যবসায়, ঠিক দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন শিলার উপর মন্দির। আ ১ ৪৪, লো ১২,২০৫ ; নারী ৯৪৪।

দুবরাজপুর থা, সিউড়ী ম, আ ১৩৯ , লো ৭৬.২২৬ , ঘ ৫৪৯।

দেউলপাড়া গ্রা, নৈহাটী, লো ৩,৮৬৩।

দেউলপুর গ্রা, পাঁচলা, লো ৫,২৩৫।

দেওনাপুর গ্রা, ফরাক্কা, লো ৪,০৬৪।

দেগঙ্গা থা, বারাসত ম, আ ৭৮, লো ৭১,৭৯২ ; ঘ ৯২০।

দেবকুণ্ডু গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,০৮৪।

দেবানন্দপুর গ্রা, চুঁচুড়া, কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

দেড্যাচক গ্রা, পাঁশকুড়া, লো ৩,৭১৫।

দেবীপুর গ্রা, জলঙ্গী, লো ৩,৮১৬।

দোগাছি গ্রা, করিমপুর, লো ৩,৯৫৪।

দোমোহনী গ্রা, ময়নাগুড়ি, লো ৩,৬৪৬।

দোমহনী গ্রা, বরাবনি, লো ৪,৩০১।

দৌলতপুর গ্রা, কাঁথি, সমুদ্রোপকূলের ক্ষুদ্র গ্রাম। ডাকবাংলো, পৌষ সংক্রান্তি মেলা।

দ্বারকা নং বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ পার হইয়া ভাগীরথীতে।

দ্বারকেশ্বর নং বাঁকুড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া হুগলিতে। রূপনারায়ণ দ্রঃ।

দ্বারিরজাঙ্গাল গ্রা, সন্দেশখালি, লো ৩,২৮৬।

ধর্মপুর গ্রা, ময়নাগুড়ি, লো ৪,৪৯০।

ধরলা নং, কোচবিহারের পশ্চিমে উৎপন্ন তোবসার এক শাখা। কোচবিহাবের ১৮ মাইল দক্ষিণে জলঢাকায় পড়িয়াছে। সংগমস্থলের নিম্নে জলঢাকাকেও ধরলা বলা হয়।

ধলাকিশোর নং, রূপনারায়ণ দ্রঃ।

ধাপা বা লবণ হ্রদ, বিল, চব্বিশপরগনা জেলায় হুগলি ও বিদ্যাধরী নদীর মধ্যবর্তী নিম্নভূমি। কলিকাতার প্রায় ৫ মা পূর্বে আরম্ভ। ক্রমশ ভরাট হইতেছে। আয়তন প্রায় ৩০ বর্গমাইল ধাপা বা লবণ হ্রদ অঞ্চলের অন্তর্গত, বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত আয়তন প্রায় ২০ ব মা।

ধামুয়া গ্রা, মগরাহাট, লো ৩,৩৮৮।

ধনিয়াখালী থা, হুগলি সদর ম, আ ১০৬, লো ৯৪,৭৮৫ , ঘ ৮৯৩।

ধুলিয়ান শ, সমসেরগঞ্জ, গঙ্গার সন্নিকট, বহরমপুরের ৪৫ মা উ উ-প ; বস্ত্রবয়ন, ধান, চাউল, তৈলবীজ, গম, যবের ব্যবসায়। বার্ষিক মেলা। আ ৪, লো ১৫,৯৩৫ ; নারী ৯৪১।

ধুলাগাড়ি গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৬,১৮৫।

ধূপগুড়ি থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ২১৭, লো ১,১০,৯১০ ; ঘ ৫১২।

ন'ওদা থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ৮৯, লো ৫৮,৬৫২ ; ঘ ৬৬০।

নওপুখুরিয়া গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,০৪৯।

নওয়াপাড়া গ্রা, আমতা, লো ৩,৫২৬।

নর্থ দমদম শ, দমদম থা ; আ ৭·০, লো ১২,১৫৬ ; কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত।

নর্থ ব্যারাকপুর শ, নোয়াপাড়া থা, আ ৩·২৫, লো ৩২,১৭৩।

নদিয়া জে, উত্তরে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে চব্বিশপরগনা, পূর্বে পাকিস্তান। বারটি থানা পাকিস্তানে যাওয়াতে জেলার পূর্ব আয়তন ২,৮৭৯ ব মা, এখন ১,৫২৭ বর্গমাইলে দাঁড়াইয়াছে। জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণি ও ইচ্ছামতী জেলার জল নিকাশ করে। জলঙ্গি ও চুর্ণি পশ্চিমে ভাগীরথীতে পতিত হইতেছে। মৃত্তিকা পলি গঠিত। রাজ্যের মধ্যে এ জেলাতেই আমন অপেক্ষা আউশ ধান বেশি জন্মে। কর্ষিত ভূমির তিন চতুর্থাংশে আউশ ধানের চাষ হয়। অন্যান্য শস্য, পাট, তিসি, সরিষা, আখ, গম ও বিবিধ ডাল। বাঁশ ঝাড় ও সুপারিগাছ বিস্তব। লো ১১,৪৪,৯২৪ তন্মধ্যে ৪,২৬,৯৩৭ উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুর সংখ্যায় এই জেলাব স্থান তৃতীয় ; ঘ ৭৫৯।

নদিয়া সদর ম, নদিয়া জে, আ ৯৬৯, লো ৭,০২,৮৭১ ; ঘ ৭২৬।

নন্দনপুর গ্রা, খানাকুল, লো ৩,২৭২।

নন্দী গ্রা, জামুরিয়া, লো ৪,০১৭।

নন্দীগ্রাম থা, তমলুক ম, আ ১৯১, লো ১,৫৯,৫৮৪ ; ঘ ৮৩৬।

নফরগঞ্জ গ্রা, ক্যানিং, লো ৩,৮৮৩।

নবগ্রাম থা, লালবাগ ম, আ ১১৮, লো ৬০,৪৪৩ ; ঘ ৫১০।

নবদ্বীপ থা, নদিয়ার সদর ম, আ ৪০, লো ৯১,৩৮০ ; ঘ ২,২৭৩।

নবদ্বীপ শ, থানা ঐ, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মিলনস্থলে। কৃষ্ণনগরের ৮ মা প, ধাতু ও মাটির বাসন প্রস্তুত ; চাউল, পাট, তিসি, আখের ব্যবসায়। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। চৈতন্যদেবের জন্ম ও কর্মভূমি। বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড় হইতে স্থানান্তরিত সেন রাজাদের রাজধানী। আ ৪, লো ৫৬,২৯৮ , নারী ৯৭৫।

নবাবপুর গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৩,২৯৫।

নরসিংহবাদ গ্রা, হীরাপুর, লো ৯,৯৯৬, হাইস্কুল ২।

নলগোড়া গ্রা, জয়নগর, লো ৩,১২৩।

নলহাটী থা, রামপুরহাট ম, বীরভূম জেলার পশ্চিমপ্রান্তে, থানার পশ্চিমাংশে এক বন্দে ৮৫টি গ্রাম নিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লক গঠিত হইয়াছে। আ ১৩৯, লো ১,০২,১১৬ ; ঘ ৭৩৬।

নলহাটী গ্রা, থানা ঐ, লো ৬,৪২৭।

নয়াগ্রাম থা, ঝাড়গ্রাম ম, আ ১৯৫, লো ৫৭,৯৪৪ ; ঘ ২৯৭।

নয়াগ্রাম গ্রা, কালিয়াচক, লো ৪,৯৪৫।

নশিগ্রাম গ্রা, ভাতাড়, লো ৩,৭৮৬ ; হাইস্কুল, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩।

নশীপুর গ্রা, ভগবানগোলা, লো ১০,৬৭৮।

নহাজারী গ্রা, বিষ্ণুপুর, লো ৩,৭৫৬।

নাকাশীপাড়া থা, নদিয়ার সদর ম, আ ১৪০ ; লো ৮১,৭৪৭ ; ঘ ৫৮৪।

নাগরাকাটা থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ১০৭, লো ৪২,৩৮৯ ; ঘ ৩৯৭।

নাটশালা গ্রা, মহিষাদল, লো ৪,৭৭৭।

নানগি গ্রা, মহেশতলা, লো ৯,৫৭১।

নারায়ণগড় থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১৯৫, লো ৭৫,৪৯৯ ; ঘ ৩৮৮।

নারায়ণপুর, দমদমের ৩ মা পূ উ-পূ, রেশম উৎপাদনের গবেষণাগার।

নান্নুর থা, বীরভূম সদর ম, কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, আ ১১৯, লো ৬৯,৩৫৯ ; ঘ ৫৮১।

নালুয়া গ্রা, মথুরাপুর, লো ৩,১৮৫।

নিবড়া গ্রা, ডোমজুড়, লো ৫,৩২৪।

নিমচা গ্রা, রানীগঞ্জ, লো ৩,০৪৭।

নির্মতিতা, সমসেরগঞ্জ, ধুলিয়ানের ৫ মা দ-পূ, গালা উৎপাদন।

নিয়ামতপুর শ, কুল্টি থা, লো ১১,৭৫৬ ; কয়লার খনির শহর, নারী ৭৬৫।

নিয়ামতপুর গ্রা, ইংরাজবাজার, লো ৩,১৯৮।

নুরপুর গ্রা, মানিকচক, লো ৩,৫৪৭।

নৈহাটী শ, থানা ঐ, কলিকাতার ২২ মা উ, হুগলির তীরে, পাট, চাউল, তৈলবীজ ও কাগজের কল। বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আ ১·৬৮ ; লো ৫৫,৩১৩ ; নারী ৬৫৩ ; উদ্বাস্তু ৯,৪২৩।

নৈহাটী থা, বারাকপুর ম, আ ১৬, লো ৭৫,৫৯৬ ; ঘ ৪,৮৪৬।

নোয়াপাড়া থা, বারাকপুর ম, আ ৬, লো ৭৫,০৭৭ ; ঘ ১২,৫১৩।

পটাশপুর থা, কাঁথি ম, আ ১৩৮, লো ১,০০,৭৩৫, ঘ ৭২৯ অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বয়ন।

পড়াশকোল গ্রা, অণ্ডাল, লো ৩,৮৩১।

পতিহাল গ্রা, জগৎবল্লভপুর, লো ৪,৯৬৬।

পরাণপাড়া গ্রা, ফরাক্কা, লো ৫,৪২১।

পরিহারপুর গ্রা, জামুরিয়া, লো ১১,২৬৭।

পঞ্চানন্দপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ১০,৩২২।

পশ্চিম খালনা গ্রা, আমতা, লো ৩,০৭১।

পশ্চিম গাজিপুর, আমতা, লো ৪,০২৮।

পশ্চিম দিনাজপুর জে, সদর বালুরঘাট, আত্রাই নদী জলনিকাশ করে ; পলিগঠিত ; জনসখ্যার ৮০ শতাংশের অধিক কৃষিজীবী ; শস্য, ধান, পাট, যব, তামাক, সরিষা, লঙ্কা ; হিলি ও রায়গঞ্জে চাউলের কল। বঙ্গবিভাগের ফলে ১৯৪৭ সনে গঠিত। আ ১,৩৮৫, লো ৭,২০,৫৭৩, ঘ ৫২০ ; উদ্বাস্তু ১,১৫,৫১০। উদ্বাস্তুর সংখ্যায় জেলার মধ্যে স্থান চতুর্থ।

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য, ক শ্রেণীর অন্তর্গত, আয়তন ৩০,৭৭৫, ক-শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ; প্রাকৃতিক বিভাগ দুই, হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্র ; শাসনবিভাগও দুইটি, বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ ; জেলার সংখ্যা ১৫ ; মহকুমা ৪৪, থানা ২৮০, ইউনিয়ন প্রায় দুই হাজার, লোকের বসতি আছে এরূপ গ্রাম বা মৌজা ৩৫,০৬৩, নগর ৭, অন্যান্য শহর ১০৭। খনিজ সম্পদ, কয়লা, লৌহ, তাম্র, চীনামাটি, সোপস্টোন, চুনা পাথর ইত্যাদি ; শস্য, ধান, পাট, আখ, সরিষা, ডাল, গম, ভুট্টা, পান, চা, প্রভৃতি। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য, পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা। রাজ্যে বিবিধ শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ; ভবিষ্যতে আরও শিল্পের প্রসার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গড় বৃষ্টিপাত ৭৫ই, তাপ জানুয়ারিতে ৬৫ ডিগ্রী, মে মাসে ৮৩ ডিগ্রী। প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৮৫৯, লিখনপঠনক্ষম শতকরা ২৪·৫। বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী।

পশ্চিম বাইনান গ্রা, বাগনান, লো ৩,৬৬৬।

পাইকর গ্রা, মুরারই, লো ৬,৭৪২।

পাঁচগ্রাম গ্রা, নবগ্রাম, লো ৩,৯৩১।

পাঁচপাড়া গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৪,৩০০।

পাঁচলা থা, হাওড়া সদর, শহরবিহীন, আ ২৭, লো ৭৩,৯২০, ঘ ২,৬৯৮।

পাঁচলা গ্রা, থানা ঐ, লো ৮,৪০৯।

পাঁচুড়া' গ্রা, মেটিয়াবুরুজ, লো ৭,০০৭।

পাটিকাবাড়ি গ্রা, নওদা, লো ৩,৪৮২।

পাটুলি গ্রা, পূর্বস্থলী, লো ৩,৮২৫।

পাণ্ডুয়া থা, হুগলি সদর, আ ১১১, লো ৮৫,৮৭২, ঘ ৭৭৬।

পাণ্ডুয়া গ্রা, থানা ঐ, প্রাচীন স্থান, কুতুবমিনারের অনুরূপ ১২৫ ফুট উচ্চ পাঁচতলা একটি মিনার আছে। লো ৩,৫১১।

পাতাকাটা গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৬,১৯২।

পাত্রসায়ের থা, বিষ্ণুপুর ম, একটি শহর থাকা সত্ত্বেও ঘনতা কম। আ ১২৪, লো ৬০,৯৪০, ঘ ৪৯১।

পাত্রসায়ের শ, থানা ঐ, বাঁকুড়ার ৩০ মা পূ, পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কার্পাস ও রেশমের বস্ত্রবয়ন, শাঁখার অলঙ্কার ; চাউল, গম, ডাল, সরিষা ও আলু, লো ৪,৭৮৯, নারী ৯৪০।

পাথরঘাটা গ্রা, তেহট্ট, লো ৩,৯৯২।

পানাগড়, কাঁকসা, লো ৬,৯৯৭।

পানিতর গ্রা, বসিরহাট, লো ৪,৩৮৮।

পানিপারুল গ্রা,- এগরা, লো ৩,২৩২।

পানিহাটি শ, খড়দহ, কলিকাতার প্রায় ৯ মা উ, হুগলির তীরে, কাপড়ের কল ; রাসায়নিক দ্রব্য, চীনামাটির বাসন, সিমেণ্ট, কাচ, রং, রবারের দ্রব্য প্রস্তুত ও চামড়া কষা। **দ শহরতলি** আগরপাড়া, লো ৪৯,৫১৪, নারী ৬০২ ; উদ্বাস্তু **১৫,৯৮৩।**

পাঁশকুড়া থা, তমলুক ম, শহরবিহীন ; ভূমি উর্বর, জলসেচের ব্যবস্থা উত্তম, সেচখাল ও কাঁসাই নদী মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত ; ঘনতা বরাবরই বেশি, ১৮৭২ সনে ১,০৬০ ছিল, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মধ্যে কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। আ ১৫৫, লো ১,৭৬,৪০৫, ঘ ১,১৪০।

পাহাড়পুর গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৩,৯৮৫।

পিংগলা থা, মেদিনীপুর সদর, আ ৮৭, লো ৫০,৩৬৩, ঘ ৫৮৪।

পুখুরিয়া গ্রা, রাতুয়া, লো ৬,৮৩৩।

পুজালি গ্রা, বজবজ, লো ৩,২৭০।

পুড়োপাড়া গ্রা, সুতী, লো ৭,৭৯৬।

পুরশুড়া থা, আরামবাগ ম, শহরবিহীন, আ ৩৯, লো ৫৮,৫০৮, ঘ ১,৫০৮।

পুরাতন মালদহ শ, মালদহ, ইংবেজবাজারের দুই মাইল উত্তরে মহানন্দার তীরে ; ধান, চাউল, গম, তৈলবীজ ও পাটের ব্যবসায়। পূর্বে ডাচদের ব্যবসায় ও ফরাসীদের কুঠি ছিল। লো ৪,৪২৮, নারী ৭১৩

পুরানগা গ্রা, গলসী, লো ৪,৮৪৩ ; প্রাইমারী স্কুল।

পুলবাজার থা, দার্জিলিঙ সদর ম, আ ৫৩, লো ২৬,৯২৯, ঘ ৫০৮।

পূর্বগাববেরীয়া গ্রা, জয়নগর, লো ৩,৫৭০।

পূর্ব বিষ্ণুপুর গ্রা, মগরাহাট, লো ৪,১৬০।

পূর্বস্থলী থা, কালনা ম, আ ১৩৩, লো ১,০৪,৬২৮, ঘ ৭৮৭।

পোদড়া গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৩,৬১০।

পোল গ্রা, খানাকুল, লো ৩,২৮১।

পোলবা থা, হুগলি সদর ম, যে সকল থানায় ১৯২১ সন পর্যন্ত লোকবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহাদের অন্যতম ; আ ১১০. লো ৮৩,৫৯৪, ঘ ৭৫৮।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ, চব্বিশপরগনা, কলিকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ ও কোচবিহার লইয়া গঠিত। আ ১৬,৬১২, লো ১,৩৭,০৭,৭৭৮, ঘ ৮১০।

ফজিলনগর গ্রা, করিমপুর, লো ৩,০৪১।

ফতেপুর গ্রা, ফলতা, লো ৩,৫০৫।

ফরাক্কা থা, জঙ্গীপুর ম, আ ৫৭, লো ৫৮.৭৯১, ঘ ১,০৩১।

ফরিদপুর থা, আসানসোল ম, আ ১২০, লো ৫৪,৫০৬, ঘ ৪৫৩।

ফরিদপুর গ্রা, জলঙ্গী, লো ৩,০২৮।

ফলতা থা, ডায়মন্ডহারবার ম, শহরবিহীন, আ ৫২, লো ৮৯,১১২, ঘ ১,৭০১, চাউল-কল। সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা দখল করিলে কোম্পানির কর্মচারিগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ফুলমালঞ্চ গ্রা, ক্যানিং, লো ৩,৮৩৮।

ফুলিয়া, সমাজ উন্নয়ন ব্লক। পূর্বে চূর্ণী নদী, ভাগীরথী দক্ষিণে ও ব্লকের পশ্চিম সীমার একাংশে। রানাঘাট, শান্তিপুর ও হাঁসখালি থানার অন্তর্গত। দ-পূ রানাঘাট শহর, পশ্চিম সীমার এক মাইল দূরে শান্তিপুর শহর, উ-প সীমার ৪ মা দূরে **কৃষ্ণনগর** শহর। ছোট শহর বীরনগর ব্লকের সীমার মধ্যে অবস্থিত।

ফালাকাটা থা, আলিপুরদুয়ার ম, আ ১২৩, লো ৫,৭০০, ঘ ৪৫৪।

ফালাকাটা গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,০১১।

ফাঁসিদেওয়া থা, শিলিগুড়ি ম, আ ৬৪, লো ২৩,৩১৯, ঘ ৩৬৭।

বংশীহারী থা, রায়গঞ্জ ম, আ ১৩৪, লো ৫১,২৭৬, ঘ ৩৮২।

বক্সা ফরেস্ট গ্রা, কালচিনি, লো ৩,৫৬৭।

বগড়ি, ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার অংশের নাম। পলিগঠিত নিম্নভূমি, বর্ষায় প্লাবিত হয়।

বগুলা গ্রা, হাঁসখালি, লো ৩,১৭২।

বজবজ থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, আ ৫৫, লো ১,৪৭,১২৩, ঘনতা ২,৬৭৫ ; শিল্প-থানা।

বজবজ শ, থানা ঐ, কলিকাতার ১২ মা দ-প, রেলের শাখার সীমান্ত। পাট-শিল্পকেন্দ্র, পেট্রোলিয়ামের বড় গোলা, কেনেস্তারা তৈয়ারের কারখানা ; আ ৩ ; লো ৩২,১৯৬, নারী ৫৮০।

বড় আন্দুলিয়া গ্রা, চাপড়া, লো ৩,৭৭৯।

বড় কমলাপুর গ্রা, সিঙ্গুর, লো ৬,২৫২।

বড়জোড়া থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১৫২, লো ৬৯,৮৩১, ঘ ৪৬০।

বড়জোড়া গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,০০৮।

বড় ধেমো গ্রা, আসানসোল, লো ৫,০২০।

বড় পলাশন গ্রা, মেমারী, লো ৩,১০১ ; হাইস্কুল, ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২।

বড় বেলুন গ্রা, ভাতার, লো ৪,৩৭৮, হাই স্কুল, ডাকঘর, প্রাইমারী স্কুল ৩।

বনগাঁ ম, চব্বিশপরগনা, পূর্বে যশোহর জেলায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে চব্বিশপরগনার অন্তর্ভুক্ত, সীমান্ত মহকুমা, আ ৩২০, লো ২,০৮,৭৪২, ঘ ৬৫৩।

বনগাঁ থা, মহকুমা ঐ, আ ২২৬, লো ১,৫২,১৮৪, ঘ ৬৭৪।

বনগাঁ শ, থানা ঐ, কলিকাতা হইতে ৪৫ মা উ উ-পূ, রেল জংসন, বঙ্গবিভাগের পূর্বে যশোহর জেলার অন্তর্গত। ধান, চাউল, তিসি, আখ, ও পাটের ব্যবসায়। লো ২৩,৬২৪, নারী ৯২৫।

বনপাশ গ্রা, ভাতার, লো ৩,২২৯ ; হাইস্কুল, ডাকঘর, প্রাইমারী স্কুল।

বন হরিশপুর গ্রা, পাঁচলা, লো ৩,৮৯৩।

বয়রামারী আবাদ গ্রা, সন্দেশখালি, লো ৩,৭৬০।

বর্ধমান বিভাগ, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলা নিয়া গঠিত। আ ১৪,১৬৪, লো ১,১১,০২,৫৩০ ; ঘ ৭৮৬।

বর্ধমান জে, পশ্চিমে বরাকর, উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর ও পূর্বে ভাগীরথী ; দামোদর ও অজয় নিম্নগতিতে জেলার মধ্যে প্রবেশ। অন্য নদী ধলকিশোর, কুনুর, খারি। পশ্চিমাংশে ল্যাটারাইট, পূর্বাংশে পলি। আসানসোল মহকুমায় রাজ্যের বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় এই জেলা বিশেষ উপকৃত হইবে। কর্ষিত ভূমির চার পঞ্চমাংশে আমন ধান ; বোরো ও আউশ অল্প। অন্যান্য শস্য পাট, আখ, তৈল বীজ, ডাল, ভুট্টা, ফল ও তরিতরকারি। বৃষ্টিপাত ৫৯-৬২ ই। আ ২,৭১৬, লো ২১,৯১,৬৬৭, ঘ ৮১০।

বর্ধমান সদর ম, আ ১,২৮৭, লো ৮,০২,০৫৭, ঘ ৬২৩।

বর্ধমান থা, সদর ম, আ ১৫৭, লো ১,৫৩,১৯৮, ঘ ৯৭৫। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার শক্তিগড় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ধমান শ, জেলার সদর, আবাসিক শহর, কলিকাতার ৬০ মা উ-প ; সড়ক ও রেলপথের মিলনকেন্দ্র ; চাউল ও তেল কল হোসিয়ারি, যন্ত্রাদি মেরামতের কারখানা, দ-প উপকণ্ঠে কাঞ্চননগর ছুরি, কাঁচি ইত্যাদির জন্য খ্যাত ; মিঠাই প্রসিদ্ধ। কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল। লো ৭৫,৩৭৬, নারী ৭৪৯।

বড়ঞা থা, কান্দী ম, আ ১০৮, লো ৮১,৯১৭, ঘ ৭৬১।

বরাকর নং দামোদরের উপনদী, ১৫৫ মা দীর্ঘ ; আসানসোলের ১১ মা প দামোদরে পড়িয়াছে। ইহার উপর প্রস্তাবিত তিনটি বাঁধের তিলাইয়া বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বরাকর শ, কুল্টি, আসানসোলের ৭ মা প উ-প, রানীগঞ্জের খনি অঞ্চলে ; ধান ও কয়লার খনি অনতিদূরে। লো ১০,৪৪০।

বরাবনি থা আসানসোল ম, শিল্প-থানা, আ ৬০, লো ৫০,৫৩০, ঘ ৮৩৭।

বরাহনগর থা, বারাকপুর ম, শিল্প-থানা, আ ৮, লো ১,৫৪,৩৭৭, ঘ ২০,০৪৯, বরানগর ও কামারহাটি শিল্প-শহর এই থানায়।

বরাহনগর শ, থানা ঐ, হুগলির তীরে, কলিকাতার ৪ মা উ, চটকল ও কাপড়ের কল, তুলার বীজ ছাড়ানো ও গাটবাঁধা, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, দিয়াশলাই, কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রাদি প্রস্তুত, লো ৭৭,১২৬ ; নারী ৭১৭। অন্য বানান বরানগর।

বরুণহাট গ্রা, হাসনাবাদ, লো ৭,০১৪।

বলাগর থা, হুগলি সদর ম, আ ৮০, লো ৬৭,৬১৩, ঘ ৮৫০।

বসিরহাট ম, চব্বিশপরগনা, আ, ৮১৮, লো ৭,১৩,৬১৯, ঘ ৮৭৩।

বসিরহাট থা, মহকুমা ঐ, আ ১০১, লো ১,৩৭,৯৫১, ঘ ১,৩৭৩।

বসিরহাট শ, থানা ঐ, মহকুমার সদর, লো ৩৪,৮২৩।

বলভূত গ্রা, তুফানগঞ্জ, লো ৩,৫৮৮।

বলরামপুর গ্রা, তুফানগঞ্জ, লো ৯,৪২১।

বল্লভপুর গ্রা, রানীগঞ্জ, লো ৩,৬১৩।

বসন্তপুর গ্রা, আমতা, লো ৪,০৫২।

বহরমপুর টাউন থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ১২৬, লো ১,৩৭,৮২৩, ঘ ১,০৯৬।

বহরমপুর শ, বহরমপুর টাউন, মুর্শিদাবাদ জেলার সদর ; ব্যবসায় কেন্দ্র ; রেশমের বস্ত্র বয়ন, দিয়াশলাই, চাউল ও তেল কল, রেশম শিল্প বিদ্যালয়, রেশম গবেষণা কেন্দ্র, কলেজ। লো ৫৫,৬১৩, নারী ৮৬৯।

বহরু গ্রা, জয়নগর, লো ৫,০৯২।

বহুতালী গ্রা, সূতী, লো ৩,৩২১।

বহুলা গ্রা, অন্ডাল, লো ৬,৩৩০।

ব'ইচা গ্রা, শান্তিপুর, লো ৩,২০২।

ব্রজলালচক গ্রা, নন্দীগ্রাম, লো ৩,৮০৮।

ব্রহ্মোত্তর মাণিক গ্রা, লালগোলা, ৩,৪৩৩।

বাউড়িয়া থা, উলুবেড়িয়া ম, শিল্প থানা, পাটের সুতাকাটা ইত্যাদি, আ ৬, লো ৩১,৪১৮, ঘ ৫,৬১০।

বাউড়িয়া শ, থানা ঐ, শিল্প-শহর, পাটের সুতা কাটা ইত্যাদি, লো ১২,৯৭৭, নারী ৫৭৯।

বাওয়ালী গ্রা, বজবজ, লো ৫,৫৪৭।

বাংলা গ্রা, মহেশতলা, লো ৩,১৯৯।

বাঁকড়া গ্রা, ডোমজুড়, লো ৪,০৮৯।

বাগডোগরা গ্রা, দার্জিলিঙের ২৪ মা দ, বিমানক্ষেত্র।

বাগনান থা, উলুবেড়িয়া ম, আ ৬৩, লো ১,২৪,৪৬৩, ঘ ১,৯৬৬, শহর নাই।

বাগানগ্রাম গ্রা, বনগাঁ, লো ৩,২৪২।

বাঠরা গ্রা, জয়নগর, লো ৪,২৬২।

বানলী গ্রা, জামুরিয়া, লো ৩,০৬৯।

বাবলতলি গ্রা, রানীনগর, লো ৪,৩২৫।

বামনগাছি গ্রা, বালী, লো ৩,৭৪৪।

বামনগোলা থা, মালদহ, আ ৭১, লো ৩৯,৬৬৫, ঘ ৪৯৮।

বারপাটীয়া নূতনবস গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৩,৪৮৮।

বাঁকুড়া জে, উ দ'মোদর, প মানভূম, দ মেদিনীপুর, পূ হুগলি ও বর্ধমান। দ্বারকেশ্বর জেলার মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত। কাঁসাই ও ধলকিশোর অন্য প্রধান নদী ; পশ্চিমাংশে ল্যাটারাইট, পূর্বাংশে পলি। আমন প্রধান ধান, বোরো ও আউশ অল্প। অন্য শস্য, আখ, ভুট্টা, তৈলবীজ, ডাল, গম, অতসী। বিস্তৃত অঞ্চলে লাক্ষা উৎপন্ন হয় ; শতকরা ৮ জনের অধিক কৃষিনির্ভর। কয়লা কেওলিন, উলফ্রাম খনিজ ; সাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ ও বাঁশ ঝাড়। সূতী, তসর ও রেশমের বস্ত্র বয়ন, কম্বল প্রস্তুত, ধাতুর ও পাথরের বাসন। কোদাল, ছুরি, কাঁচি, কাঁঠের খেলার সরঞ্জাম। কাঠের মালা, অম্বরি তামাক প্রভৃতি শিল্প। আ ২,৬৫৮, লো ১৩,১৯,২৫৯, ঘ ৪৯৮, বৃষ্টিপাত ৫৬ ই।

বাঁকুড়া সদর ম, আ ১,৯৩৩, লো ৯,৬৫,৩৬৩, ঘ ৪৯৯।

বাঁকুড়া শ, কলিকাতা হইতে ৯৫ মা প উ-প, দ্বারকেশ্বরের তীরে জেলার সদর। প্রধানত আবাসিক শহর ; বৃহৎ কৃষি-কেন্দ্র ; পশ্চিমে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ; কয়েকটি চাউল কল, অনেক বিড়ির কারখানা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর বাসন ; কলেজ, উপকণ্ঠে কুষ্ঠাশ্রম ; রেল জংসন ; স্বাস্থ্যকরস্থান বলিয়া খ্যাতি। লো ৪৯,৩৬৯, নারী ৮৭৮।

বাঁশদ্রা গ্রা, ক্যানিং লো ৩,৩৭৮।

বাঁশপুল গ্রা, হাবড়া, লো ৪,৩৯৩।

বাঁশবেড়িয়া শ, মগরা, হুগলির ৭ মা উ, হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে শিল্প শহর। পাটশিল্প প্রধান। বড় শিখ মন্দির। লো ৩০,৬২২, উদ্বাস্তু ৩,৪০২, নারী ৬১৩।

বাটানগর শ, মহেশতলা, বজবজের ৩ মা উ-পূ। ভারতের অন্যতম প্রধান পাদুকা-শিল্প কেন্দ্র।

বাড়া গ্রা, নলহাটী, লো ৩,৭১৫।

বাদুড়িয়া থা, বসিরহাট ম, আ ৮১, লো ৮৯,৫৯২, ঘ ১,১০৬।

বাদুড়িয়া শ, থানা ঐ, কলিকাতার ৩০ মা পূ উ-পূ, ইচ্ছামতীর তীরে। বস্ত্রবয়ন, ধান, পাট, ডাল, সুপারি, গুড় ও আলুর ব্যবসায়। লো ১৬,৩৮৫।

বানারহাট চা বাগান, ধূপগুড়ি, লো ৩,৬৭০।

বাণীতবলা গ্রা উলুবেড়িয়া, লো ৪,৫৭৮।

বানুপুর গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৪,৫৮৯।

বামুনিয়া গ্রা, ভাঙ্গড়, লো ৩,০৭৯।

বারাকপুর ম, চব্বিশপরগনা, আ ১১৯, লো ২,০৮,৭৪২, ঘ ৭,৩৭১।

বারাকপুর থা, মহকুমা ঐ, আ ৩, লো ১৬,১৮৯, ঘ ৫,০৫৯।

বারাকপুর শ, টিটাগড়, হুগলির তীরে কলিকাতার ১৪ মা উ ; চটকল, চাউল-কল, করাত-কল, হোসিয়ারি, কৃষি-বিদ্যালয় ; পূর্বে বড়লাটের আবাস ; সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট। লো ৪২,৬০৯ ; নারী ৬০০।

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট শ, বারাকপুর, কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত শিল্প-শহর ; লো ১৬,১৮৯, নারী ৬৪২।

বারাসত ম, চব্বিশপরগনা, আ ৩৮৪, লো ৩,৯৩,৯৮০, ঘ ১,০২৬।

বারাসত থা, মহকুমা ঐ, আ ১০৪, লো ১,১৯,৪৪২ ঘ ১,১৪৭ ; শিল্পহীন থানা।

বারাসত শ, থানা ঐ, লো ১৬,০২৭, নারী ৮৬৪ ; কলিকাতার ১৩ মা উ পূ, সড়ক ও রেলপথের সংযোগস্থল ; বস্ত্রবয়ন , ধান, চাউল, পাট, আখ, ডাল, আলু ও নারকেলের ব্যবসায় ; বার্ষিক মেলা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তরুণ সৈনিক কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল। তখন ইহাকে বাঙলার স্যান্ডার্স্ট বলা হইত।

বারিন্দ মালদহ জেলার মহানন্দার পূর্বদিকের অংশের নাম। তরঙ্গায়িত উন্মুক্ত উচ্চভূমি। মাটি লাল, কোথাও হলদে, কঙ্করময়। আমন ধান জন্মে।

বারুইপাড়া গ্রা, করিমপুর, লো ৩,৫৯৬।

বারুইপুর থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, আ ৮৩, লো ১,০৫,৩২১, ঘ ১,২৭১ ; থানার দুই-তৃতীয়াংশ, ৫৭ ব মা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বারুইপুর শ, থানা ঐ, লো ৯,২৩৮। কলিকাতার ১৬ মা দ-পূ, শিল্পবিহীন শহর। চাউল, ডাল, পান ও নারকেলের ব্যবসায়।

বারুইপুর গ্রা, থানা ঐ. লো ৪,৯৪৭।

বালিতড়া গ্রা, কুল্টি, লো ৩,৪৩০, প্রাইমারী স্কুল।

বালী থা, হাওড়া সদর ম, শিল্প-থানা, আ ১৮, লো ১,১০,১৮৯, ঘ ৬,২৯৭।

বালী শ, থানা ঐ, শিল্প শহর, হাওড়ার সাড়ে চার মাইল উ উ-পূ, কলিকাতার ৫ মা উ, হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে ; চটকল, রাসায়নিক সার উৎপাদন, কাপড়, ইট, কাঁচ প্রস্তুত, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, উইলিংডন সেতু দ্বারা দক্ষিণেশ্বরের সংগে যুক্ত, লো ৬৩,১৩৮, নারী ৫৩৩।

বালী গ্রা, থানা ঐ, লো ১৫,১২৫।

বালী গ্রা, নওদা, লো ৫,৯০৯।

বালুরঘাট ম, পশ্চিম দিনাজপুর, আ ৫৮৬, লো ৩,২৮,১১৪, ঘ ৫৬০।

বালুরঘাট থা, মহকুমা ঐ, আ ১৪৪, লো ১,০১,৪৭১, ঘ ৭০০।

বালুরঘাট শ, থানা ঐ, আত্রাই নদীর তীরে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর, হিলির ১৫ মা প দ-প। ধান, চাউল, পাট, আখ, সরিষার ব্যবসায়। লো ১৮,১২১, নারী ৮০৯।

বাসুদেবপুর গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ৪,১২৮।

বাহাদুর গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৪,০৯৪।

বাঙ্গালানী, স্বরূপনগর, লো ৫,৬২৭।

ব্যান্ডেল, বন্দরের অপভ্রংশ, হুগলি শহরের একাংশ। এই নামীয় রেল স্টেশন এক মাইল দূরে।

বার্নপুর শ, হিরাপুর, দামোদর উপত্যকায়, আসানসোলের ২ মা প-দ। লৌহ, ইস্পাত, অন্যান্য শিল্প, গ্যাস উৎপাদন, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, তাপসহ দ্রব্যাদি ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। লো ১৮,৪৮৭, নারী ৫৩৬।

বিচ, চা বাগান, কালচিনি, লো ৩,১৫১।

বিজপুর থা, বারাকপুর ম, শিল্পাঞ্চল, কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহর এই থানায়। আ ১৬, লো ১,০৫,১৮৫, ঘ ৬,৭৮৬।

বিথারী গ্রা, স্বরূপনগর, লো ৪,৪৮৮।

বিদ্যাধরী নং, চব্বিশপরগনায়। হাড়োয়া খাল হইতে উৎপত্তি। বেলিয়াঘাটা খাল ও টালির নালার মিলনস্থল পর্যন্ত দ, পরে দ-পূ মাতলা পর্যন্ত ; এখানে করাটিয়া ও আঠারবাঁকী আসিয়া মিলিয়াছে ; যুক্ত স্রোত মাতলা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত। সমুদ্রের জোয়ার প্রবেশ করে ; ক্রমশ ভরাট হইতেছে।

বীনপুর থা, ঝাড়গ্রাম ম, আ ৩৬৫, লো ১,৩৬,৯৩৩ ঘ ৩৭৫ ; শিল্প-সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল। ৭৬টি গ্রাম ঝাড়গ্রাম সমাজ উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত।

বিন্নাগুড়ি গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৬,০৪৩।

বিপ্র নওপাড়া গ্রা, ডোমজুড়, ৩,৪৯৬।

বিবি হাচোলা গ্রা, পাঁচলা, লো ৩,৬৪১।

বিলাত মহাল, মেদিনীপুর সদর মহকুমার শালবনি ও গড়বেতা ব্যতীত অবশিষ্ট থানাসমূহের নাম।

বিহারিয়া গ্রা, হরিহরপাড়া, লো ৩,৪৭৩।

বিষ্ণুপুর ম, বাঁকুড়া জে, আ ৭১৪, লো ৩,৫৩,৮৯৬, ঘ ৪৯৬ ; বন্যা প্রতিরোধের জন্য নদীর তীরে বাঁধ দেওয়ার ফলে এই মহকুমার জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে ; আর্দ্রতা ও জলায় ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি। এই মহকুমায় সর্বাধিক মুসলমানের বাস, বিশেষত কোতুলপুর ও ইন্দাস থানায়।

বিষ্ণুপুর থা, মহকুমা ঐ, আ ১৪৭, লো ৭৩,৭৪১, ঘ ৫০৩।

বিষ্ণুপুর শ, থানা ঐ, হস্তশিল্পের ক্রমাবনতির সংগে লোক হ্রাস পাইয়াছে। বাপ্তা, তসর, বিলাতি খেলার কাঠের সরঞ্জাম, ও অম্বুরি তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। চাউলের কল আছে। লো ২৩,৯৮১, নারী ১,০৪৯।

বিষ্ণুপুর থা, চব্বিশপরগনার সদর ম, আ ৮২, লো ১,৪৩,৫৮৩, ঘ ১,৭৪৩, থানায় একটিও শহর নাই।

বীরনগর শ, রানাঘাট, কৃষ্ণনগরের ১২ মা দ দ-পূ। পূর্ব নাম উলা। ধান, চাউল, পাট, তিসি ও আখের ব্যবসায়। লো ৩,৮৯৩।

বীরপাড়া চা বাগান, মাদাবিহাট, লো ৪,৭৮৩।

বীরপুর গ্রা, নাকাশীপাড়া, লো ৩,২০৯।

বীরভূম জে, উ ও পূ মুর্শিদাবাদ, দ বর্ধমান, প সাঁওতাল পরগনা। প্রধান নদী বাঁশলই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, মোর বা ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই ও অজয়। ভূমি তরঙ্গায়িত। শতকরা ৮০ জনের অধিক কৃষিজীবী। অর্ধাংশের অধিক কর্ষিত ভূমিতে আমন ধানের চাষ ; অন্য শস্য ভুট্টা, ছোলা ও আখ। তুঁতের চাষ হ্রাস, পাটের চাষ বৃদ্ধি। পশ্চিমেব বনে শাল, মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষ। খনিজ দ্রব্য কয়লা ও লোহা। সুতি ও রেশমের বস্ত্রবয়ন, ধাতুর বাসন, মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত ; তেল ও চাউল কল। পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী জেলার গৌরব। আ ১,৭৫৪, লো ১০,৬৬,৮৮৯, ঘ ৬১২। বৃষ্টিপাত ৫৬ ই। ময়ূরাক্ষীর সেচ-ব্যবস্থায় উপকৃত। সদরের নাম সিউড়ি।

বীরভূম সদর মহকুমা, আ ১,১৩৭, লো ৬,৩৮,১৫৯, ঘ ৫৬১।

বুড়িখানা গ্রা, বাউড়িয়া, লো ৪,৬৭২।

বুইতা গ্রা, বজবজ, লো ৪,৫৩৫।

বৃন্দাবনচক গ্রা, পাঁশকুড়া, লো ৩,২১০।

বৃন্দাবনপুর গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ৩,৪৭৫।

বেগমপুর গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৬,৩৩৩।

বেজডিহি, কুল্টি, লো ৩,৮৮৭ ; প্রাইমারী স্কুল।

বেড়ন্দরী বাগড়িয়া গ্রা, কুল্পী, লো ৩,১৮৮।

বেড়মজুর গ্রা, সন্দেশখালি, লো ৩,৮৯০।

বেদরাবাদ গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,১৩০।

বেরুবাড়ী গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ১৩,২০৯।

বেলগাছী কিসমত গ্রা, বালী, লো ৩,৪৩৮।

বেলডাঙ্গা থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ১৪৩, লো ১,৫১,৩৩৯, ঘ ১,০৫৬ একটিও শহর নাই।

বেলডাঙ্গা গ্রা, থানা ঐ, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৪১ সনের জনগণনায় শহর বলিয়া গণ্য ছিল। চিনির কল বন্ধ হওয়াতে ১৯৫১ সনে শহর ধরা হয় নাই। লো ৬,২৮৬। বহরমপুরের ১১ মা দ। রেশমের বস্ত্র বয়ন ; ধান, চাউল, পাট, ছোলা, তৈলবীজ ও খড়ের ব্যবসায়।

বেলডুবি গ্রা, পাঁচলা, লো ৩,৩২৩।

বেলুড়, হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে, হাওড়ার ৩ মা উ উ-পূ, পাট ও কাপড়ের কল, কাচ উৎপাদন, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা ; রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র।

বেলপুকুরিয়া গ্রা, কুল্পী, লো ৪,৭০০।

বেহালা থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, শিল্প-থানা, সাউথ সুবারবস্ নগর ইহার অন্তর্গত। আ ২০, লো ১,১৩,৩৭৯, ঘ ৫,৬৪১।

বেহুলা নং, বর্ধমান জেলায় উৎপত্তি। হুগলি জেলায় প্রবেশের পূর্বে দুই শাখায় বিভক্ত। উত্তরের শাখা হুগলি নদীতে এবং দক্ষিণের শাখা কুন্তীর সহিত মিলিত হইয়া হুগলিতে পড়িয়াছে।

বৈকুর গৌরগ্রাম গ্রা, ময়নাগুড়ি, লো ৩,৭৪০।

বৈঁচি গ্রা, পাণ্ডুয়া, লো ৩,৩২২।

বৈদ্যবাটী শ, শ্রীরামপুর, শিল্প-শহর, লো ২৪,৮৮৩, উদ্বাস্তু ১,৮৬৪, নারী ৭৪১। হুগলি নদীর প, হুগলি শহরের ১০ মা দ দ-পূ, কলিকাতার ১৫ মা উ। চাউল, পাট, আলু ও আখের ব্যবসায়। রেল জংসন অদূরে। নিমাই তীর্থঘাট এখানে। 'আলালের ঘরের দুলালের' বাসস্থল।

বোকারো নং, ৪৫ মা দীর্ঘ দামোদরেব উপনদী। ধানবাদের ৩৫ মা প বোকারো ও কোনারের মিলিত ধারা দামোদরে পড়িয়াছে। দামোদর পরিকল্পনায় ইহার উপর একটি বাঁধের প্রস্তাব হইয়াছে।

বোলপুর থা, বীরভূম সদর ম, আ ১২৯, লো ৭৭,৪৪০, ঘ ৬০১।

বোলপুর শ, থানা ঐ, লো ১৪,৮০২, নারী ৮৪৯ ; তেল ও চাউলের কল ; সিউড়ির ১৪ মা দ দ-পূ, শান্তিনিকেতন ১ মা উ উ-প।

ভগতপুর চা বাগান গ্রা, নাগরাকাটা, লো ৩,৮৭৬।

ভগবানগোলা থা, লালবাগ ম, আ ১১৭, লো ৮৯,৮০৮, ঘ ৭৭০।

ভগবানপুর থা, কাঁথি ম, আ ১৪০, লো ১,৪০,৪৯৯, ঘ ১,০০৪। এই থানার গোপীনাথপুরে সুদৃশ্য পাল্‌কী ও কাঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

ভগবানপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৪,৪২৩।

ভগীরথপুর গ্রা, ডোমকাল, লো ৩,২২০।

ভবানীপুর গ্রা, ইংলেজবাজার, লো ৩,১৩৫।

ভরতপুর থা, কান্দী ম, আ ১৩২, লো ১,১০,৪২৬, ঘ ৮৩০।

ভরতপুর গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,৪২১।

ভদ্রেশ্বর থা, শ্রীরামপুর, শিল্প-থানা, চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বর এই থানায়, আ ১৫, লো ৮০,৭৫৩, ঘ ৫,২৪৪।

ভদ্রেশ্বর শ, থানা ঐ, শিল্প-শহর, পাটের সুতা বনট ইত্যাদি, লো ৩৬,১৯২ নারী ৫২১। হুগলি নদীর তীরে, হুগলি শহবের ৬ মা দ দ-প।

ভাটপাড়া ন, জগদ্দল, লো ১,৩৪,৯১৬, নারী ৫৩৩ ; হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত নগর। পাট, কাপড় ও কাগজের কল। পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র।

ভাটপাড়া চা বাগান, কালচিান, লো ৪,০৫৯।

ভাতার থা, বর্ধমান সদর ম, আ, ১৬০, লো ৮৪,৬৩৩, ঘ ৫২৯। একাংশ গুসকরা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

ভাবতা গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,৩০৬।

ভামাইপাইকর গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৩,৪৬৩।

ভালুকা গ্রা, কৃষ্ণনগর, লো ৪,১৪৭।

ভাঙ্গর থা, চব্বিশপবগনা সদর ম, আ ১২৫, লো ১,১৫,০৫৭, ঘ ৯২১।

ভানোয়ারা গ্রা, বরাবনি, লো ৬,০৩৭।

ভার্নোবাড়ি চা বাগান, কালচিনি, লো ৩,০২৮।

ভেলাচোরা, জলপাইগুড়ি, লো ৩,৫৪০।

মগরা থা, হুগলি সদর ম, আ ২৫, লো ৫২,১০৮, ঘ ২,০৮৪, শিল্পাঞ্চল, শহর বাঁশবেড়িয়া।

মগরাহাট থা, ডায়মন্ডহারবার ম, আ ১১৮, লো ১,৯১,৬৯৮, ঘ ১,৬৩১।

মগরা খাল, কুন্তী নং দ্রঃ।

মঙ্গলকোট থা, কাটোয়া ম, আ ১৪১, লো ৮৮,১৭১, ঘ ৬৩১, মুসলমানের বসতি। একাংশ গুসকরা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলকোট গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,১৪৭।

মঠেরদীঘি গ্রা, ক্যানিং, লো ৬,০২৭।

মন্ডলগ্রাম গ্রা, মেমারী, লো ৩,৫৭৭ . হাইস্কুল, ডাকঘর, প্রাইমারী স্কুল।

মন্ডলঘাট গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৫,০৬১।

মন্ডলপুর গ্রা, জামুরিয়া, লো ৫,৫৫৭।

মণিরটাট গ্রা, জয়নগব, লো ৩,৯১৯।

মথুরা চা বাগান, আলিপুরদুযাব, লো ৪,৮৬২।

মথুরাপুর থা, ডায়মন্ডহারবার ম, আ ৪২৩, লো ২,০২,১০০, ঘ ৪৭৭।

মথুরাপুর গ্রা, থানা ঐ, লো ৪,০০১।

মথুরাপুর গ্রা, মাণিকচক, লো ৩,৭৩৯।

মধুপুর গ্রা, ন'ওদা, লো ৪,০৮১।

মন্তেশ্বর থা, কালনা ম, আ ১১৮, লো ৭৮,৫৮৯, ঘ ৬৬৭।

ময়না থা, তমলুক ম, আ ৫৭, লো ৬৯,৬৩৯, ঘ ১,২১৫ ; শহর নাই ; অতি উর্বর ধান্য উৎপাদন ক্ষেত্র, কাঁসাই ও হলদি নদী থানার উপর দিয়া প্রবাহিত, দক্ষিণ সীমায় কালিঘাই।

ময়নাগুড়ি থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ২৫২, লো ৮৮,৩১৫, ঘ ৩৫১।

ময়ুরাক্ষী নং, সাঁওতাল পরগনায় উৎপত্তি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে ভাগীরথীতে। বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। সিউড়ির নিকটে তিলপাড়ায় সেতু বাঁধ নির্মাণ শেষ হইয়াছে। ১,২০,০০০ একর জমিতে সারা বৎসর জল সেচের ব্যবস্থা হইবে।

ময়ুরেশ্বর থা, রামপুরহাট, ম, আ ১৪৭, লো ৯১,৮৩৫, ঘ ৬২৫। রাজ্যের মধ্যে বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা অল্প।

মলঙ্গী চা বাগান, কালচিনি, লো ৩,৯৭১।

মলয়পুর গ্রা, আরামবাগ, লো ৩,১৪৯।

মল্লিকবাগান গ্রা, পাঁচলা, লো ৩,০৩০।

মহম্মদবাজার থা, বীরভূমের সদর ম, আ ১২১, লো ৫৩,৩৯২, ঘ ৪৪১। ১২২টি গ্রামের ৭৫·৫ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লক গঠিত হইয়াছে।

মহলা গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,৩৫৪।

মহাদেবনগর গ্রা, ফরাক্কা, লো ৪,০৮০।

মহাদেবপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,৮৪২।

মহানন্দা নং, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পাকিস্তানের উপর দিয়া প্রবাহিত। কার্শিয়াঙের উ-প, দার্জিলিঙ পাহাড়ে উৎপন্ন। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সীমানা গঠন করিয়া দ-প পূর্ণিয়া জেলায়, পরে দ-পূ মালদহের উপর দিয়া গোদাগাড়িতে পদ্মায়। প্রায় ২২৫ মা।

মহানন্দী গ্রা, কান্দী, লো ৪,৫৭৪।

মহিয়াড়ী গ্রা, ডোমজুড়, লো ৫,১৯৭।

মহিশুড়া গ্রা, নবদ্বীপ, লো ৩,৬৩৫।

মহিষাদল থা, তমলুক ম, আ ১২৫, লো ১,৪১,৩৯০, ঘ ১,১৩২; অতি উর্বর ধান্যক্ষেত্র, রূপনারায়ণ পূর্ব প্রান্তে, হিজলির জোয়ারের খাল থানার উপর দিয়া গিয়াছে, হলদি দ-প প্রান্তে।

মহিষাস্থলি গ্রা, ভগবানগোলা, লো ৪,২১৯।

মহীশিলা গ্রা, আসানসোল, লো ৪,৫৮০।

মহেশতলা থা, চব্বিশপরগনা সদর ম, শিল্প থানা, শহর বাটানগর, আ ২১, লো ৯৩,১৯৫, ঘ ৪,৫৪৬।

মাখনা গ্রা, উত্তরপাড়া, লো ৪,৩১২।

মাজিয়াড়া গ্রা, বরাবনি, লো ৩,৩৬৪।

মাটিয়ারী গ্রা, কালিগঞ্জ, লো ৪,৮৮২।

মাটিয়ালি থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ৯২, লো ৪৯,১৮৮, ঘ ৫৩৪।

মাণিকচক গ্রা, থানা ঐ, লো ৪,৮৬৫।

মাণিকচক থা, মালদহ সদর ম, আ ১২২, লো ৭৭,৫৮৭, ঘ ৬৩৫ ; শেরশাবাদিয়া মুসলমান মুর্শিদাবাদ হইতে এবং অন্যান্য বহিরাগত বিহার হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

মাণিকনগর গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৪,০২৮।

মাণিকনগর গ্রা, রাতুয়া, লো ৩,৩৯৩।

মাণিকপুর গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৬,৮৯৪।

মাদারিহাট থা, আলিপুরদুয়ার ম, আ ১৪৭, লো ৫৯,৪৮৬, ঘ ৪০৫।

মানসোং সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন, কালিম্পং, লো ৫,০৭৭।

মাংপো সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন, কার্শিয়াং, লো ৩,৮৭৫।

মাল থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ১৯৭, লো ৮৮,১৫৮, ঘ ৪৪৭।

মাল গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,৭৬০।

মালঞ্চ গ্রা, সমসেরগঞ্জ, লো ৩,১৮৭।

মালদহ জে, মহানন্দা প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত কবিয়াছে। পূর্বে বারিন্দ, পশ্চিমের নিম্নভূমিব নাম টাল, গঙ্গার তীরবর্তী নূতন-গড়া ভূমির নাম দিয়ারা। মৃত্তিকা পলিগঠিত, বাবিন্দে পুরাতন পলি। পশ্চিমবঙ্গের সমতলক্ষেত্র অপেক্ষা পশ্চিমের জলবায়ুর সহিত সাদৃশ্য অধিক। জ্যৈষ্ঠে সর্বোচ্চ উত্তাপ ১১০ ডিগ্রী, শীতের রাত্রিতে তাপ ৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত নামিতে দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম হইতে লু বহিতে থাকে। বৃষ্টিপাত ৫৭ ই ; আমন, আউশ, ও বোরো ধান জন্মে। পাট, শন, তামাক, আখ, ডাল অপর শস্য। তুঁতের চাষ এখানেই সর্বাধিক। আম হইতে বার্ষিক প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। সাক্ষরদের হার নিম্নতম, মাত্র ৯·৫৭ শতাংশ। আ ১,৪০৮, লো ৯,৩৭,৫৮০, ঘ ৬৭৪। ইংরেজবাজার জেলার সদর, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ।

মালদহ সদর মহকুমা, আ ১,৩৯২, লো ৯,৩৭,৫৮০, ঘ ৬৭৪।

মালদহ থা, সদর ম, আ ৮৭, লো ৩৭,৪২০, ঘ ৪২৮।

মান্ডা গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৪,১৫৭।

মাড়গ্রাম গ্রা, রামপুরহাট, লো ৮,৯০০।

মাস গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৩,৪২২।

মাথাভাঙ্গা ম, কোচবিহার, আ ৩৪৩, লো ১,৪৮,৬৯১, ঘ ৪২৫।

মাথাভাঙ্গা থা, মহকুমা ঐ, আ ২৪২, লো ১,০২,৯৩৬।

মাথাভাঙ্গা শ, থানা ঐ, লো ৪,২৫৬। জলঢাকার তীরে, কোচবিহারের ১৫ মা প ; চাউল, পাট, তামাক ও তৈলবীজের ব্যবসায়।

মায়াহাউরি গ্রা, জয়নগর, লো ৭,০৫৯।

মাঝের চর গ্রা, চাকদহ, লো ৪,৩৪৫।

মানুষপুর গ্রা, চুঁচুড়া, লো ৪,২৬৭।

মামুদপুর গ্রা, হাসনাবাদ, লো ৩,৩৯৪।

মালিয়াড়া গ্রা, বড়জোড়া, লো ৫,৩৪১।

মাশিনা গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৩,২৯৩।

মির্জাপুর গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৬,১৬৪।

মিরিক থা, কার্শিয়াং ম, আ ৩৮, লো ১৬,১৩৬, ঘ ৪২৯।

মুগকল্যাণ গ্রা, বাগনান, লো ৩,৪১৫।

মুরাদপুর জলঙ্গি গ্রা, জলঙ্গি, লো ৩,৬৭১।

মুরারই থা, রামপুরহাট ম, আ ১৩৮, লো ১,০৩,৪৭০, ঘ ৭৫১।

মুর্শিদাবাদ জে, ভাগীরথীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত ; পশ্চিম ভাগ রাঢ়, পূর্বভাগ বগড়ি। বগড়ি পলিগঠিত বন্যা-প্লাবিত নিম্নভূমি, অতি উর্বর। আউশ ধান ও পাট প্রধান শস্য। রাঢ় উচ্চ ভূমি কিন্তু এখানে-সেখানে বহু বিল ও নদীর পুরাতন খাত। আমন ধান প্রধান শস্য, আখ, তুঁত, তামাক, আলু ও অন্যান্য তরিতরকারি জন্মে। রাঢ়ের নদী বাঁশলই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী ; বগড়ির নদী ভৈরব ও জলঙ্গী। রাঢ় স্বাস্থ্যকর, বগড়ি অস্বাস্থ্যকর। কৃষিজীবী শতকরা ৭১। রেশমের বস্ত্র বয়নের জন্য খ্যাত ; কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ। আ ২,০৯৫, লো লো ১৭,১৫,৭৫৯, ঘ ৮২৮। বহরমপুর জেলার সদর।

মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমা, আ ৬৫৯, লো ৫,৪৪,২২৮, ঘ ৮২৬।

মুর্শিদাবাদ থা, লালবাগ ম, আ ৬০, লো ৪৪,৫৭১, ঘ ৭৪০।

মুর্শিদাবাদ শ, থানা ঐ, বহরমপুরের ৫ মা উ, ভাগীরথীর তীরে। রেশম বয়ন কেন্দ্র। চাউল, ডাল, সরিষা, পাট, গম ও যবের ব্যবসায়। নবাবীর অবসান হইতে অবনতি আরম্ভ। আ ৫, লো ১০,৭৫৬, নারী ৯৭০।

মুলটী গ্রা, মগরাহাট, লো ৩,০৭৪।

মেকান্দরা গ্রা, রঘুনাথগঞ্জ, লো ৪,২৫৪।

মেখলিগঞ্জ ম, কোচবিহার, আ ১৯৯, লো ৯১,৮৩৫, ঘ ৪০২ ; তিস্তার তীরে, কোচবিহারের ৩০ মা প ; চাউল, পাট, তামাক। তৈলবীজ ও আখের ব্যবসায়।

মেখলিগঞ্জ শ, লো ১,৩৫৬।

মেচপাড়া চা বাগান গ্রা, কালচিনি, লো ৩,৭৬৫।

মেমারী থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৬৫, লো ১,১৫,২২৩, ঘ ৬৯৯, শক্তিগড় সমাজ উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত।

মেমারী শ, থানা ঐ, লো ৫,০০৫ ; ডিসপেনসারী, ডাকঘর, পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইমারী স্কুল।

মেজিয়া থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ৬৩, লো ৩৪,০৬৮, ঘ ৫৪২।

মেটিয়াবুরুজ থা, চব্বিশপরগনা সদব ম, আ ৪, লো ১,২৯,০৩১, ঘ ৩৪,৮৭৩ ; শিল্পাঞ্চল, গার্ডেনরীচ নগর এই থানায়।

মেদিনীপুর জে, হুগলি নদীর প, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে, রাজ্যের মধ্যে আয়তনে দ্বিতীয়। রূপনারায়ণ, রসুলপুর, কালিঘাই, হলদি, শিলাই, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা প্রধান নদী। পশ্চিমাংশে ল্যাটারাইট, পূর্বভাগে পলি। বৃষ্টিপাত ৫৯ ই ; ঝড় ও বন্যা জেলার অভিশাপ। বৈশাখে সর্বোচ্চ তাপ ১০০ ডিগ্রী, জ্যৈষ্ঠে ১১৫° পর্যন্ত। শতকরা ৮০ জনের অধিক কৃষিজীবী। চার ভাগের তিন ভাগ কর্ষিত ভূমিতে ধানের চাষ, তন্মধ্যে আমন শতকরা ৯৩ ভাগ। অন্যান্য শস্য গম, যব, মটর, তিল, সরিষা, আখ, পান, তুঁত, তামাক, হলুদ, তরিতরকারি ও ফল। পশ্চিমের বন্যাঞ্চলে শাল, মহুয়া, ও ঢাক বৃক্ষ। হিজলী বাদাম অর্থকর ফল। আ ৫,২৫৮, লো ৩৩,৫৯,০২২, ঘ ৬৩৯।

মেদিনীপুর সদর ম, আ ২,০৩৮, লো ১০,৫৭,৬৫৮, ঘ ৫১৯।

মেদিনীপুর থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১৩০, লো ৯৪,৩৬২, ঘ ৭২৫।

মেদিনীপুর শ, থানা ঐ, লো ৪৫,৪৭৬, নারী ৮১০। কলিকাতা হইতে ৬৫ মা, কাঁসাই নদীর তীরে, জেলার সদর। রাস্তার কেন্দ্র ; চাউল কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত, রেশমের বস্ত্র বয়ন। গালিচা, পাপোষ, বিছানার চাদর, বেতের চেয়ার, টেবিল, উৎকৃষ্ট কম্বল ও জুতা প্রভৃতি শিল্প ও কলেজ আছে।

মেরাগঞ্জ গ্রা, জয়নগর, লো ৫,৪৭৫।

মোহনপুর থা, মেদিনীপুব সদর, আ ৫৪, লো ৩০,৫৫০, ঘ ৫৬৩।

মৌগ্রাম গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,১৫১।

যাদবপুর গ্রা, টালিগঞ্জ, লো ৩,৭৯১ ; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রঘুদেববাটী গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৩,২৩২।

রঘুনাথগঞ্জ থা, জঙ্গীপুর ম, আ ১০২, লো ১,৩২,৬৩৩, ঘ ১,৩০০ জঙ্গীপুর একমাত্র শিল্পহীন শহর।

রঘুনাথপুর গ্রা, উত্তরপাড়া, লো ৩,১৭৮।

রতুয়া থা, মালদহ সদর ম, আ ১৫৪, লো ১,১৫,৮৩৪ ; ঘ ৭৫৪।

রমানাথপুর গ্রা, চণ্ডীতলা, লো ৩,২৯৫।

রসুলপুর নং, মেদিনীপুর জেলার উ-প বাগদা নদী নামে উৎপত্তি। পূ দিকে কালীনগর পর্যন্ত প্রবাহিত হইবার পর রসুলপুর নাম। পরে দ-পূ কাউখালি বাতিঘরের নিচে হুগলিতে পড়িয়াছে।

রংলি রংলিওট থা, দার্জিলিঙ সদর ম, আ ১১৯, লো ৩১,৩২৯ ঘ ২৬৪।

রাজগঞ্জ থা, জলপাইগুড়ি সদর ম, আ ২৪৬, লো ৫১,৭২৩, ঘ ২১০।

রাজনগর থা, বীরভূম সদব ম, আ ৮৫, লো ৩৩,৫২৬, ঘ ৩৯৩।

রাজনগর গ্রা, থানা ঐ, লো ৪,০৯৭।

রাজনগর গ্রা, রানীনগর, লো ৩,১৪৩।

রাজপুর শ, সোনারপুর, লো ১৬,৩১০ ; কলিকাতার ১১ মা দ দ-পূ ; চাউল কল ; চাউল, পাট ও ডালের ব্যবসায়। নারী ৯০৭।

রাজপুর গ্রা, সোনারপুর, লো ৫,৯০৩।

রাজবলহাট গ্রা, জঙ্গীপাড়া, লো ৫,২২৫।

রাঢ়, গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার অংশের নাম। ভূমি সাধারণত উচ্চ ; মধ্যে মধ্যে বিল ও নদীর পুরাতন খাত।

রামচন্দ্রনগর গ্রা, মগরাহাট, লো ৩,৫৮৮।

রামচন্দ্রপুর গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৩,১৩৫।

রামচন্দ্রপুর গ্রা, নওদা, লো ৪,২৩০।

রামজীবনপুর শ, চন্দ্রকোণা, লো ৭,৫৩৯। মেদিনীপুরের ৩৩ মা উ উ-পূ ; বস্ত্রবয়ন ও তামা, পিতল ও কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হাট তাঁতের কাপড়ের প্রসিদ্ধ বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। এখন কাপড় বোনা ও চাউল, ভুট্টা, গম, আখের ব্যবসায়।

রামদাসহাট্টী গ্রা, মেজিয়াবুরুজ, লো ৪,৮৭০।

রামনগর থা, কাঁথি ম, আ ১১৭, লো ১,০৩,৬০২, ঘ ৮৮৬। সমুদ্রতীরবর্তী।

রামনগর গ্রা, কুল্টি, লো ৩,০৬৮ ; প্রাইমারী স্কুল।

রামনগর গ্রা, বারুইপুর, লো ৪,৮৮৪।

রামনগর দোয়েম কানুন গ্রা, রানীনগর, লো ৩,৮৮৬।

রামপুরহাট ম, বীরভূম, আ ৬০৬, লো ৪,২৮,৭৩০, ঘ ৭০৭।

রামপুরহাট থা, মহকুমা ঐ, আ ১৮২, লো ১,৩১,৩০৯, ঘ ৭২০।

রামপুরহাট শ, থানা ঐ, লো ১৫,১৪৪। সিউড়ির ২০ মা উ উ-পূ ; দীর্ঘকালের রেলকেন্দ্র। তসর ও কার্পাস বস্ত্রবয়ন, চাউলের কল, অনতিদূরে রেশম উৎপাদন।

রায়গঞ্জ ম, পশ্চিম দিনাজপুর, আ ৮০০, লো ৩,৯২,৪৫৯, ঘ ৪৯১।

রায়গঞ্জ থা, মহকুমা ঐ, আ ১৮৬, লো ১,০১,৮৭০, ঘ ৫৪৭।

রায়গঞ্জ শ, মহকুমার সদর, বালুরঘাটের ৫০ মা উ-প ; চাউল কল। লো ১৫,৪৭৩।

রায়ডাক নং, ভুটান ও পশ্চিমবঙ্গ। ভুটানের উ-প হিমালয়ে উৎপন্ন। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশমাত্র দ্বিধা বিভক্ত ; ডান দিকের শাখা দ তুফানগঞ্জ হইয়া তোরসায়, প্রায় ১৫০ মা, বাঁয়ের শাখা প্রায় ২৫ মা দ সঙ্কোশে পতিত হইয়াছে।

রায়না থা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৮৭, লো ১,১১,১৬৯, ঘ ৫৯৪।

রায়দিঘী আবাদ গ্রা, মথুরাপুর, লো ৩,৮৯৬।

রায়পুর থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ২২৭, লো ১,১০,০২৮, ঘ ৪৮৪। লর্ড সিংহের জন্মস্থান।

রায়পুর গ্রা, ডোমকাল, লো ৩,৪৯৯।

রায়মঙ্গল নং, ইচ্ছামতী দ্রঃ।

রাঙ্গামাটী চা বাগান গ্রা, কালচিনি, লো ৪,৫৩২।

রাজারহাট থা, বারাসত ম, আ ৪০, লো ৫০,৬৫৬, ঘ ১,২৭৯, শহর নাই।

রানাঘাট ম, নদিয়া, আ ৫৪০, লো ৪,৪২,০৫৩, ঘ ৮১৮।

রানাঘাট থা, মহকুমা ঐ. আ ১৭১, লো ১,৫১,৮৫২, ঘ ৮৮৮ ; একাংশ, ফুলিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্লকের অন্তর্গত।

রানাঘাট শ, থানা ঐ, লো ২৮,০৬৪ ; হুগলি নদীর নিকটবর্তী, কৃষ্ণনগরের ১৬ মা দ দ-পু, রেল জংসন ও ব্যবসায় কেন্দ্র।

রানীগঞ্জ থা, আসানসোল ম, আ ৩৩, লো ৭১,৪৯৫, ঘ ২.১৮০। সুপ্রসিদ্ধ কয়লার খনি ও শিল্পাঞ্চল।

রানীগঞ্জ শ, থানা ঐ, লো ২৫,৯৩৯, নারী ৮৮৬। দামোদরের উত্তর তীরে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ; কাগজ, কাচ, তাপসহ দ্রব্যাদি, তেল কল। চাউল ও তেলের ব্যবসায়, কুষ্ঠাশ্রম, বিদ্যালয়।

রানীচক গ্রা, দাশপুর, লো ৩,৩১১।

রানীনগর থা, লালবাগ ম, আ ১২৩, লো ৯১,৬৭২, ঘ ৭৪৩।

রানীবাঁধ থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১৬৫, লো ৫৭,৮৫০, ঘ ৩৫০।

রিষড়া শ, শ্রীরামপুর থা, লো ২৭,৪৬৫, নারী ৫৬১ ; কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত ; পাটশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি। কলিকাতার সাড়ে দশ মাইল উত্তরে। ১৮৫৫ সনে প্রথম চটকল এখানে স্থাপিত।

রুকুনপুর গ্রা, হরিহরপাড়া, লো ৪,৪৫৩।

রূপনারায়ণ নং, পুরুলিয়ার উ-পু ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপত্তি। দ-পু বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর অতিক্রম করিয়া দ দ-পু আরামবাগ ও তমলুক মহকুমা পার হইয়া গেঁওখালিব নিকটে হুগলিতে। ১৫০ মা দীর্ঘ। উপরের অংশের নাম ধলকিশোর, বাঁকুড়া ও আরামবাগে নাম দারকেশ্বর।

লংকাপাড়া চা বাগান, মাদারিহাট, লো ৩,৬২৯।

লক্ষ্মীপুর গ্রা, কুল্পী, লো ৯,৭৬৪।

লক্ষ্মীপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,২১২।

লস্করপুর গ্রা, জগৎবল্লভপুর, লো ৩,১৯১।

লাখী গ্রা, খেজরী, লো ৪,৩৯০।

লাভপুর থা, বীরভূম সদর ম, আ ১০৪, লো ৬৬,৭৭৮, ঘ ৬৩৮ ; সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আহামদপুর ব্লকের একটি সাব-ব্লক এই থানার অন্তর্গত।

লালগোলা থা, লালবাগ ম, আ ৮৪, লো ৭৮,২৪৭, ঘ ৯৩৭।

লালগোলা গ্রা, থানা ঐ, লো ৯,৬০০।

লালবাগ ম, মুর্শিদাবাদ, আ ৫২২, লো ৩,৯৩,৮৭১, ঘ ৭৫৫।

লালবাজার গ্রা, কুল্টি, লো ৩,৭৯৬ ; প্রাইমারী স্কুল।

লিলুয়া, হাওড়া নগরীর উত্তরের শহরতলি। হাওড়ার আড়াই মাইল উত্তর, রেলের বৃহৎ কর্মশালা ; ইস্পাতের বিস্তৃত কারখানা ; রাসায়নিক দ্রব্য, পিতল ও তামার চাদর উৎপাদন, সুতী ও রেশমের বস্ত্রবয়ন, সাবান, রং, সিমেন্ট ইত্যাদি।

লেবং, দার্জিলিঙের উত্তর শহরতলি, দার্জিলিঙ হইতে ১,০০০ ফু উচ্চ।

শক্তিপুর গ্রা, বেলডাঙ্গা, লো ৩,২২২।

শালতোড়া থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১২২, লো ৫৯,৩০৪, ঘ ৪৮৮।

শান্তিনিকেতন, বোলপুরের ১ মা উ উ-প, বিশ্বভারতীর আবাস। প্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য নিয়া ১৯২২ সনে প্রতিষ্ঠিত।

শ্যামপুর গ্রা, মগরাহাট, লো ৬,২২৩।

শ্যামপুর গ্রা, মহেশতলা, লো ৩,৮১৮।

শ্যামপুর থা, উলুবেড়িয়া ম, আ ১০০, লো ১,৩৮,১৯৫, ঘ ১,৩৮২, শহর নাই।

শ্যামসুন্দরপুর গ্রা, বরাবনি, লো ৩,৭৬৪।

শাণ্ডেলের বিল, হাসনাবাদ, লো ৩,২৮২।

শান্তিপুর থা, রানাঘাট ম, আ ৭৫, লো ৭৯.৬৬৭, ঘ ১,০৬২।

শামসিং চা বাগান, মাটিয়ালী, লো ৩,৮৯৬।

শালিগ্রাম গ্রা, নাকাশীপাড়া, লো ৪,০৩৯।

শিবপুর থা, হাওড়া সদর ম, লো ৩৩২।

শিবপুর গ্রা, জামুরিয়া, লো ৫,৮০৮।

শিবনগর গ্রা, রানীনগর, লো ৫,০৪৪, হাইস্কুল।

শিবনগর লস্করপুর গ্রা, ডোমকাল, লো ৪,৪৫৩।

শিকারপুর গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৪,৬৯৪।

শিলাই নং, দ্বারকেশ্বরের উপনদী, বাঁকুড়া, মানভূমে উৎপন্ন।

শিলিগুড়ি ম, দার্জিলিঙ, আ ২৬৬, লো ১,১৬,৪৭৫, ঘ ৪৩৭, সমস্ত অঞ্চল দার্জিলিঙ তরাইর অন্তর্গত।

শিলিগুড়ি থা, মহকুমা ঐ, আ ১২৪, লো ৬৮,২৮০, ঘ ৫৪৯।

শিলিগুড়ি শ, থানা ঐ, লো ৩২,৪৮০। মহানন্দার তীরে, দার্জিলিঙের ২৫ মা দ দ-পু ; তিব্বত ও সিকিমের সহিত ব্যবসায়ের কেন্দ্র ; করাত-কল, চাউল-কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ; চাউল, ভুট্টা, গম, পাট ও কমলার ব্যবসায়।

শীতলকুচি থা, মাথাভাঙ্গা ম, আ ১০১, লো ৪৫,৭৫৫, ঘ ৪৫৩।

শীতলকুচি গ্রা, থানা ঐ, লো ৭,৮২৪।

শীতলপুর গ্রা, কুল্টি, লো ৪,৮১১ ; ডাকঘর।

শ্রীখণ্ড গ্রা, কাটোয়া, লো ৪,৪৭০।

শ্রীনগর গ্রা, কাকদ্বীপ, লো ৩,৪১০।

শ্রীপুর গ্রা, জামুরিয়া, লো ৯,২৮৬।

শ্রীরামপুর ম, হুগলি জে, আ ৩৫০, লো ৭,২৯,৩৩১, ঘ ২,০৮৫।

শ্রীরামপুর থা, মহকুমা ঐ, আ ২২, লো ১,৪১,০৭১, ঘ ৬,২৯৮ ; শিল্পাঞ্চল, শ্রীরামপুর, রিষড়া, বৈদ্যবাটী শহর।

শ্রীরামপুর শ, থানা ঐ, লো ৭৪,৩২৪, নারী ৬৪০। পাট, কার্পাস ও চাউলের কল ; রাসায়নিক দ্রব্য, দড়ি, গহনা, তাঁতের কাপড়, ধাতুর পালিশ প্রস্তুত ; কলেজ, বিখ্যাত গ্রন্থাগার, সরকারী বয়নশিক্ষা বিদ্যালয়, প্রথমে ডেন উপনিবেশ, নাম ফ্রেডারিক নগর। ১৮৪৫ সনে ইংরেজের অধিকারে আসে।

শ্রীরামপুর গ্রা, পূর্বস্থলী, লো ৪,২৫৩।

শ্রীরামপুর গ্রা, তমলুক, লো ৩,২৪৭।

শুখিয়াপুকরি থা, দার্জিলিঙ সদর ম, আ ৯৩, লো ১৯,২৫৮, ঘ ২০৮।

শুভর আড়া গ্রা, পাঁচলা, লো ৩,৩৮১।

শুশুনিয়া পাহাড়, বাঁকুড়া জেলার সর্বোচ্চ পাহাড়, ১,৪৪২ ফুট। পরিধি ৬ মা ; পর্বতগাত্র জঙ্গলময়। উপরিভাগ কোআর্টসাইট নামক সাদা দানাদার রূপান্তরিত বেলে পাথরে গঠিত। এই পাথরে নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ছাতন স্টেশন হইতে ৬ মা উ।

সঙ্কোশ নং, ভুটান ও ভারত। ভুটান সীমান্তে তিব্বতের চোমলহারি পর্বতে উৎপন্ন, ভুটানের মধ্য দিয়া দ দ-পূ, গোমা ও পুনীখা অতিক্রম করিয়া দ, দ-প, দ আসাম-পশ্চিমবঙ্গ সীমা গঠন ; (রায়ডকের নাম শাখা আসিয়া মিলিত হইবাব পর নাম গদাধর) গোলকগঞ্জ পার হইয়া, ধুবরির ৯ মা পশ্চিমে, ব্রহ্মপুত্রে। প্রায় ২০০ মা।

সঙ্কোশ চা বাগান গ্রা, কুমারগ্রাম, লো ৩,১৯৩।

সদাশিবপুর গ্রা, মগরাহাট, লো ৪,১২৭।

সন্নাসীকাটা গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৫,৬৯২।

সন্দেশখালি থা, বসিরহাট ম, আ ২৭৬, লো ১,৭৬,২৬৬ : ঘ ৬৩৯।

সমসেরগঞ্জ থা, জঙ্গীপুর ম, আ ৪২, লো ৭৪,৩২৪ ; ঘ ১,৭৪৯।

সবঙ্গ থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ১২০ ; লো ৭৪,১৭৭ ; ঘ ৬১৬। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট মাদুর প্রস্তুত হয়। কয়েকটি মাদুরের হাট আছে।

সর্বাঙ্গপুর গ্রা, নওদা, লো ৪,৮০৩।

সরস্বতী নং, ভাগীরথীর একটি 'লুপ' নদী, ত্রিবেণীতে ভাগীরথী হইতে বাহির হইয়া হুগলি জেলার মধ্য দিয়া পুনরায় হাওড়ার রাজগঞ্জেব নিকট হুগলি নদীতে পড়িয়াছে। ইহা এখন মৃতপ্রায় , পূর্বে নাব্য ও প্রসিদ্ধ।

সাঁইথিয়া শ, থানা ঐ, রেল জংসন, চাউল কল ও অন্যান্য ছোট কল। ব্যবসায় কেন্দ্র। আ ১·৩, লো ৮,৭০৭।

সাঁইথিয়া থা, বীরভূমের সদর ম, জেলাব মধ্যভাগে, আ ১২০, লো ৭০,৭৭৩ ; ঘ ৫৮৯। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আহাম্মদপুর ব্লকের ৫টি সাব-ব্লকের ৪টি এই থানায় অবস্থিত।

সাউথ দমদম শ, দমদম থা, আ ৫·৯৮ ; লো ৬১,৩৯১।

সাউথ সুবারবন ন, মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতার প্রায় ৫ মা দ দ-প ; টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরীচ হইতে পৃথক কবিয়া ১৯০১ সনে গঠিত। বেহালা ও বরিষা প্রধান অঞ্চল। বহু চাউল কল, রাসায়নিক দ্রব্য, ইট, রং উৎপাদন ; টাঁকশাল। আ ১২·২৫, লো ১,০৪,০৫৫ ; উদ্বাস্তু ২০,০৯৬ ; নারী ৭৯২।

সাওড়াবেড়ে জলপাই গ্রা, মহিষাদল, লো ৩,২৭৪।

সাঁকরাইল থা, হাওড়া সদর ম, আ ২৫ ; লো ৯৯,৩৮৪ , ঘ ৪,০০৭।

সাঁকরাইল থা, ঝাড়গ্রাম সদর ম, আ ১০৬ ; লো ৪৭,০০১ ; ঘ ৪৪২।

সাঁকরাইল গ্রা, থানা ঐ, হাওড়া, লো ১০,১৮৯।

সাগর থা, ডায়মন্ডহারবার ম, আ ২২৪ ; লো ৫১,৪৬৩ ; ঘ ২২৯।

সাগরদ্বীপ, হুগলি নদীর মোহনায়, গঙ্গার ব-দ্বীপের সর্ব পশ্চিমের দ্বীপ। কলিকাতার ৫১ মা দ দ-প, ১৮ মা দীর্ঘ ও ১ হইতে ৭ মাইল প্রশস্ত ; হুগলি নদীর এক শাখা মুরিগঙ্গা দ্বারা পূর্বদিকে মূল ভূখন্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; পশ্চিমে হুগলির মোহনা। প্রচন্ড সাইক্লোন ঘটিয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে স্নান উপলক্ষে বিরাট মেলা। দ-প উপকূলে বাতিঘর।

সাগরদীঘি থা, জঙ্গীপুর ম, আ ১৩৩ ; লো ৭৪,৫৪৫ ; ঘ ৫৫৯।

সাগরপাড়া গ্রা, জলঙ্গি, লো ৭,৮১২।

সাতখামার গ্রা, জলপাইগুড়ি, লো ৩,১৩৯।

সাতগ্রাম গ্রা, জামুরিয়া, লো ৩,২৯৮।

সাঁতরাগাছি গ্রা, জগাছা, লো ৫,২০৫।

সাঁত গ্রা, হীরাপুর, লো ৫,৯৮৯।

সাপটীবাড়ী গ্রা, ময়নাগুড়ি, লো ৬,২৬৬।

সাবড়া গ্রা, দাঁতন, লো ৩,৫০৬।

সালবনী থা, মেদিনীপুর সদর ম, আ ২১৩ ; লো ৬৮,২৬৬ ; ঘ ৩২০।

সালবনী গ্রা, থানা ঐ, লো ৩,৩৩৬।

সালখিয়া, হাওড়া নগরীর উত্তরস্থ শহরতলি। হাওড়ার ১·৫ মা উ উ-পূ, কলিকাতার ২ মা উ। পাট ও কার্পাসের কল, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, চর্ম কথা।

সালার গ্রা, ভরতপুর, লো ৪,৬৬৫।

সালানপুর থা, আসানসোল ম, আ ৫২, লো ৪৭,৩৫৪ ; ঘ ৯০৯, চিত্তরঞ্জন শহর এই থানায়।

সাহানপুর গ্রা, জগাছা, লো ৩,৭৭৭।

সাহাবাজপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৩,২৭৫।

সারেঙ্গা গ্রা, সাঁকরাইল, লো ৭,১৬৫।

সাহেবরামপুর গ্রা, জলঙ্গি, লো ৪,৯৪৭।

সিউড়ি শ, থানা ঐ, বীরভূম জেলার শাসনকেন্দ্র। কলিকাতার ১১০ মা উ উ-পূ। রাস্তা ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র (ধান, গম, ছোলা, আখ) ; চাউল কল, কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র বয়ন। পূর্বে পাল্কী ও কাঠের আসবাব নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ময়ূরাক্ষীর সেতুবাঁধ ৫ মা দূরে ; কৃষি ও গবাদি পশুর মেলা। আ ৫, লো ১৮,১৩৫ ; নারী ৮৩০।

সিউড়ি থা, বীরভূম সদর ম, আ ১১৩, লো ৮০,৮২৩ ; ঘ ৭১৫।

সিঙ্গুর থা, শ্রীরামপুর ম, আ ৫৭, লো ৯৫,৭৫৩ ; ঘ ১,৬৮৩।

সিঞ্চুলা গ্রা, ভুটানের দ-প, কোচবিহারের ৩৫ মা উ উ-পূ, ভারত-ভুটান প্রধান পথের উপর। ভুটান যুদ্ধের অবসানে (১৮৬৫) এখানে সন্ধি হয়।

সিঞ্চুলা গিরিপথ, বক্সার ২ মা উ, ভারত-ভুটান সীমান্তে, বাণিজ্য পথে ; ৫,৭০০ ফুট উচ্চ।

সিজবেড়িয়া গ্রা, উলুবেড়িয়া, লো ৩,৪৩৬।

সিমলাপাল থা, বাঁকুড়া সদর ম, আ ১১৯ ; লো ৪৯,৭৮২ ; ঘ ৪১৭।

সিয়ারশোল গ্রা, রানীগঞ্জ, লো ৭,১১৫।

সীতাই থা, দিনহাটা ম, আ ৬১, লো ২৪,০৫৪ ; ঘ ৩৯৪।

সুকানী গ্রা, রাজগঞ্জ, লো ৮,২৪৬।

সুতাহাটা থা, তমলুক ম, আ ১২৭ ; লো ৯৯,৩৮২ ; ঘ ৭৮১।

সুতী থা, জঙ্গীপুর ম, আ ১০২ ; লো ৯১,৬৮৫ ; ঘ ৮৯৬।

সুন্দরবন, গঙ্গার বদ্বীপের দক্ষিণাংশে জোয়ারের অরণ্যাচ্ছাদিত পলিগঠিত অঞ্চল। অপরিণত দ্বীপ ও খাড়ি বা নদী-বহুল। পূ-প প্রায় ১৬০ মা এবং উ-দ প্রায় ৩০-৫০ মা। আ ৩,২৩৪ ; সংরক্ষিত বনাঞ্চল ১,৬৩০ ব মা। কৃষিক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধি ও জলার জল নিষ্কাশন হইতেছে। প্রতি একরে প্রায় ২০ মণ ধান জন্মে। বনে বাঘ, কুমির, সাপ, হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু। কেওড়া নামে বড় গাছ নদীর ধারে জন্মে অন্য গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট, প্রধান গাছ সুন্দরী, পশ্চিমে গরান, সঙ্গে হিন্তাল, গেঁওয়া ইত্যাদি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে লো ২,৪৯৬।

সুবর্ণরেখা নং, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা। রাঁচির ১০ মা দ-প, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপত্তি, পূ রাঁচি পার হইয়া দ-পূ জামসেদপুর, সিংহভূমের তাম্রখনি অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলা অতিক্রম করিয়া বালেশ্বরের ২৮ মা পূ বঙ্গোপসাগরে ২৯০ মা।

সুরুল গ্রা, বোলপুর, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীনিকেতন’ নামে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় আছে।

সুলতানগঞ্জ গ্রা, কালিয়াচক, লো ৪,২৬৩।

সুলতানপুর গ্রা, দমদম, লো ৩,৬৫৪।

সেখালিপুর গ্রা, রঘুনাথগঞ্জ, লো ৪,৬৮৬।

সেরপুর গ্রা, মগরাহাট, লো ৩,৩৩৫।

সোনাটিকি গ্রা, জয়নগর, লো ৩,১২৫।

সোনাতলা গ্রা, কৃষ্ণনগর, লো ৩,২১০।

সোনামুখী শ, থানা ঐ, বাঁকুড়ার ২২ মা পূ উ-পূ। বস্ত্রবয়ন, গালা উৎপাদন। পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বস্ত্র বয়নের বড় কারখানা ও নীলের কুঠি ছিল ; চাউল, গম, যব, সরিষার ব্যবসায়। আ ৪, লো ১২,৩২৫ ; নারী ১,০৫৬।

সোনামুখী থা, বিষ্ণুপুর ম, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত, আ ১৪৭, লো ৬১,৩০৭ ; ঘ ৪১৮।

সোনারপুর থা, চব্বিশপরগনার সদর ম, আ ৬৬ ; লো ৮৮,৪১৩ ; ঘ ১,৩৪২।

সোনাডাঙ্গা গ্রা, কৃষ্ণনগর, লো ৩,১৭৮।

স্বরূপনগর থা, বসিরহাট ম, আ ৮৩, লো ৬২,০০০ ; ঘ ৭৪৩।

হুগলি জে, পলিগঠিত ভিজামাটি ও জলা অঞ্চল, উত্তর পশ্চিমে উচ্চ। প্রধান নদী দামোদর ও রূপনারায়ণ। আমন ধান প্রধান শস্য, আখ, পাট ও পানের বিস্তৃত চাষ ; আলু, বেগুন, কপি প্রভৃতি প্রচুর। হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বিপুল শিল্পায়িত। পাটশিল্প কেন্দ্র, চাউল ও কার্পাসের কল, রাসায়নিক দ্রব্য ও কাচ উৎপাদন। আ ১,২০৯ ব মা ; লো ১৫,৫৪,৩২০ ; ঘ ১,২৮৬।

হুগলি সদর ম, হুগলি জে, আ ৪৪৬, লো ৪,৫৪,৫৭৩ ; ঘ ১,০১৯।

হুগলি-চুঁচুড়া শ, থানা হুগলি, হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত, বিপুল শিল্পায়িত অঞ্চলে অবস্থিত, মহরমের জন্য ইমামবাড়া, সম্মুখে ২৭৭ ফুট দীর্ঘ। চাউল কল, হুগলি সপ্তগ্রামের অবনতির পর ১৫৩৭ খৃ অ পর্তুগিজ প্রতিষ্ঠিত, ১৬৩১ খৃ অ শাহজাহানের আদেশে বন্দর অধিকার ও পর্তুগিজ নিধন। প্রথম ইংরাজ কুঠি ১৫৬১ খৃ অ স্থাপিত, ১৬৯০ খৃ অ পরিত্যক্ত। মারাঠী লুণ্ঠন ১৭৪২। লো ৫৬,৮০৫।

হুগলি নং, গঙ্গার শাখা, নবদ্বীপ পর্যন্ত নাম ভাগীরথী, জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল হইতে নিম্নাংশের নাম হুগলি। বড় সমুদ্রপোত কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু চোরাবালি ও বানের জন্য জাহাজ চালনা কঠিন। বর্ষা ও শীতকালে গভীরতা প্রভেদ ২১ ফু। হাওড়া পুল কলিকাতা ও হাওড়া এবং উইলিংডন পুল বালী ও বরাহনগর সংযুক্ত করিয়াছে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও কাঁসাই প্রধান উপনদী। সাগরদ্বীপে বাতিঘর, অন্য একটি কাঁথির ১৩ মা পূ উ-পূ। সমস্ত শাখাটির দৈর্ঘ্য ৩২০ মা, হুগলি ১৬০ মা। নদীমুখের খাঁড়ির পরিসর ৩ হইতে ২০ মা।

হরিণঘাটা থা, রানাঘাট ম, কলিকাতার দুগ্ধ-পল্লী এই থানায়। আ ৬৫, লো ৩৭,৯২৭ ; ঘ ৫৮৩।

হরিপাল থা, শ্রীরামপুর ম, আ ৭১, লো ৮৪,৩১২ ; ঘ ১,১৮৪।

হরিপুর থা, মালদহ সদর ম, আ ১৫৩, লো ৭২,১৯৩ ; ঘ ৪৭১।

হরিশ্চন্দ্রপুর থা, মালদহ সদর ম, আ ১৫০, লো ১,০১,১৫৬ ; ঘ ৬৭৫।

হরিহরপাড়া থা, মুর্শিদাবাদ সদর ম, আ ৯৭, লো ৫৮,৫৭০ ; ঘ ৬০১।

হনুমন্তনগর গ্রা, ভগবানগোলা, লো ৬,১০৩।

হলদিবাড়ি থা, মেকলিগঞ্জ ম, আ ৮৬ ; লো ৪৬,৫৮০ ; ঘ ৫৪০।

হলদিবাড়ি শ, থানা ঐ, কোচবিহারের ৪৩ মা প ; চাউল, পাট, তামাক, তৈলবীজ, আখের ব্যবসায় ; আ ০·৫৬ ; লো ৩,১৬২।

হলদিবাড়ি চা বাগান গ্রা, ধূপগুড়ি, লো ৩,৪৬৮।

হাওড়া জে, হুগলি ও রূপনারায়ণের দোয়াবের দক্ষিণাংশ। ক্ষুদ্রতম জেলা, আ ৫৬৮ ব ম, লো ১৬,১১,৩৭৩ ; ঘ ২,৮৭৭। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬০ ই। পলিগঠিত। দামোদর, কানা দামোদর ও সবস্বতী জেলার জল নিকাশের পথ। পশ্চিমে জলাভূমির আধিক্য। হুগলি ও সরস্বতীর মধ্যে হাওড়া জলা, সরস্বতী ও কানা দামোদরের মধ্যে রাজপুর জলা, কানা দামোদর ও দামোদরেব মধ্যে আমতা জলা। আমন ধান প্রধান ; গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, পাট, শন, আলু বিপুলভাবে শিল্পায়িত। পিণ্ড লৌহের নানা রূপদান, কার্পাস ও পাট বয়ন, গাঁট বাঁধা, কাচ উৎপাদন, রেলের কর্মশালা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন।

হাওড়া সদর ম, হাওড়া জে, আ ১৭৪, লো ৯,২৮,৪৫৬ ; ঘ ৫,৩৩৩।

হাওড়া সিটি ন, কলিকাতার সহিত পুলদ্বারা সংযুক্ত। রেল ও রাস্তার জংশন। শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্র। পাটের গাঁট বাঁধা ও বয়ন, কার্পাস, চাউল, ডাল, ময়দার কল ; করাত কল ; তুলার বীজ ছাড়ানো ও গাঁটবাধা ; রাসায়নিক দ্রব্য ও কাচ উৎপাদন, হোশিয়ারী, সিগারেট, দড়ি প্রস্তুত, বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ; কলেজ। আ ১০, লো ৪,৩৩,৬৩০।

হাড়ওয়া থা, বসিরহাট ম, আ ১২১, লো ১,০২,৩৭৪ ; ঘ ৮৪৬।

হাতীর কুল গ্রা, উত্তরপাড়া, কোন্নগরের উত্তরে, তেলকল।

হান্টুপাড়া চা বাগান গ্রা, মাদিরাহাট, লো ৩,৬৯৯।

হাবড়া থা, বারাসাত ম, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত, আ ১০৯, লো ১,১১,২৫২ ; ঘ ১,০২৩।

হাবাসপুর গ্রা, ভগবানগোলা, লো ৫,৯৫৮।

হামপুকুরিয়া গ্রা, তেহট্ট, লো ৩,১১৮।

হামিদপুর গ্রা, কালিয়াচক, লো ৫,৬০৬।

হালিশহর শ, বীজপুর, হুগলির তীরে, কলিকাতার ২৫ মা উ ; পাট ও কাগজের কল , পূর্বনাম কুমারহাটা। আ ৫·৫, লো ৩৪,৬৬৬ ; নারী ৪৫৬ ও উদ্বাস্তু ৪,৮৭৬।

হাসনাবাদ থা, বসিরহাট ম, টাকির ১ মা দ-প, বারাসত-বসিরহাট রেলের শেষ সীমা, আ ১৫৬, লো ১,৪৫,৪৩৬ ; ঘ ৯৩২।

হাঁসখালী থা, রানাঘাট ম, আ ১০৩, লো ৫৫,১১৫ ; ঘ ৫৩৪।

হিজল, রাঢ় অঞ্চলে, মোর ও দ্বারকার সংগমস্থলে প্রায় ৫০ ব মা পরিমিত সমতল ক্ষেত্র হিজল নামে পরিচিত। মনে হয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জল আসিয়া এই নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হইত। এই সমতল ক্ষেত্র অতিদ্রুত কর্ষণাধীনে আনায়ন করা হইতেছে। সম্ভবত বহু হিজল গাছ জন্মে বলিয়া এই নাম।

হিজলগঞ্জ গ্রা, হাসনাবাদ, লো ৫,৪২৪।

হিজলপুখুরিয়া গ্রা, হাবড়া, লো ৩,৬৪০।

হিলি থা, বালুরঘাট ম, আ ৩৪, লো ৩৮,৭৮৭ ; ঘ ১,১৪১।

হিলি শ, থানা ঐ, আত্রাইর উপনদী যমুনার তীরে, ইংরেজবাজারের ৬০ মা পূ উ-পূ। প্রধান চাউল ছাটাই কেন্দ্র ; ধান, চাউল, পাট, আখ, সরিষার ব্যবসায। অপর নাম হিলি বন্দর। আ ১·৪৩ ; লো ৮,৩৪৬।

হেমতাবাদ থা, রায়গঞ্জ ম, আ ৭৪, লো ৩৪,৬৮০ ; ঘ ৪৬৯।

হীরাপুর থা, আসানসোল ম, আ ২৫, লো ৫৯,৯৩৪ ; ঘ ২,৪৩৬, শিল্প-থানা

হীরাপুর গ্রা, থানা ঐ, বার্ণপুরের ১ মা দ-প ; লৌহ ও ইস্পাতের কাবখানা ; লো ৫,৮৭৮ ; প্রাথমিক বিদ্যালয ৩।

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.
Agartala.

পবসবু-৫৩/৪-৭৮৮৫এক-৩ হাঃ